যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে

উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)

গবেষক

সাগরিকা সাহা

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জয়দীপ ঘোষ

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

কলা অনুষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

----

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of ----------------------

----

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor :
Dated :

Candidate :
Dated :

মুখবন্ধ

সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানবমনের গহনে লালিত নানা কাহিনি, ছিল না তখন মুখের ভাষা, ছিল কেবল সাঙ্কেতিক চিহ্ন। আদিম মানবের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপকথা-রূপকথার পথ পেরিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে আধুনিকতার পথে পা বাড়াল। এই আধুনিক বিশ্বেরই ফসল ছোটগল্প। বাংলাসাহিত্যের নবীনতম শাখা বাংলা ছোটগল্পের সূচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাত ধরে। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক ও কল্লোলযুগের ছোটগল্পকাররা ছোটগল্প নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রাক্-স্বাধীনতাপর্ব এবং স্বাধীনোত্তরকালের কয়েকদশকের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চাপানউতোরের প্রভাব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ন্যায় ছোটগল্পেও বিদ্যমান। ছোটগল্প মানে কেবল নিছক গল্প বা কাহিনির ঘনঘটা নয়, কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি নয়, স্বল্প পরিসরে চেতনাপ্রবাহ-কালচেতনা সবকিছু মিলেমিশে সৃষ্ট এক জটিল সময়লাঞ্ছিত আরশিই ছোটগল্প।

'বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)'- আমার এই গবেষণা ভাবনার অন্তরালে যে ভাবনা ক্রিয়াশীল সেক্ষেত্রে আমার কিছু ব্যক্তিগত অনুভবের কথা বলতে চাই। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি যারা সিডিউল্ডকাস্ট এবং সিডিউল্ডট্রাইব, তারা নাকি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়। সিডিউল্ড ট্রাইবদের ইংরাজি শব্দে সংক্ষিপ্ত ভাবে *ST* বলা হয়, এক্ষেত্রেও বলা হয়ে থাকে তারা 'সোনার টুকরো'। স্কুলজীবনে এই মজার ছলে শোনা কথাগুলো, আমার কিশোরী মনে বেশ আগ্রহ জাগায়। তখন নিতান্ত কল্পনাচ্ছলেই ভাবতাম যারা সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব তাদের জীবন ভীষণ ভালো, কোনো অভাব, কষ্ট-দুঃখ কিছুই বোধহয় নেই। পরক্ষণেই মনে হত, আমরাও তো শুনেছি সিডিউল্ড কাস্ট, তাহলে! তখন যদিও এই জাতিগত পার্থক্য কী সেই উপলব্ধিবোধ আমার হয়নি। সেই তখন থেকেই এই বিষয়ের প্রতি আমার আগ্রহের উদ্রেক। এমনকি ছোটবেলায় যখন বাড়িতে শুনতাম মা-ঠাকুমাদের কাছে আগে যারা উচ্চবর্ণের তারা নাকি এই সিডিউল্ড কাস্ট, ট্রাইব নিম্নশ্রেণি জাতির মানুষদের এতটাই অচ্ছ্যুত ভাবতেন যে তাদের ছায়া স্পর্শ করতেন না বা পাশের নিম্নবর্ণ বাড়ির গাছের ছায়া উচ্চবর্ণের বাড়িতে পড়লেও নাকি অশান্তি হত। বিবাহের কোনো প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও একই নিম্নরূপ ব্যবহার করা হত। এসব শুনে তখন বেশ অবাক লাগত, মনে হত মানুষ আবার উঁচু-নিচু কীভাবে হয়। স্কুলজীবনের পরে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবেশ করার পর 'কোটা' সম্বন্ধে

ধারণা হয়। যদিও ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এর কোনো প্রভাব আমার উপর পড়েনি কিন্তু পারিপার্শ্বিক মানুষদের নানান কথাবার্তা, এই কাস্ট নিয়ে আলোচনা আমার ছোটবেলা থেকে লালিত ধ্যানধারণাকে আরও তাড়িত করে। 'কোটায় চান্স পাওয়া' ছেলেমেয়েদের মেধা নিয়ে বর্তমানেও নানান তর্ক-বিতর্ক হয় কিন্তু সমাজের জাতিভেদ নিয়ে, কাস্টসিস্টেম নিয়ে কোনো কথা হয় না। যখন একটা জেনারেল কাস্ট এর ছেলেমেয়ের সাথে তফসিলি জাতি-উপজাতির ছেলে-মেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধ হয় তখন প্রকট হয় সমাজের বাস্তব মানসিকতা। বর্তমানে যদিও উচ্চবর্ণের ছেলে/মেয়ের সাথে তফসিলি জাতি-উপজাতির ছেলে/মেয়েদের বিবাহ হলে এককালীন অর্থপ্রদানের সরকারি প্রকল্প *'Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages'* হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তফসিলি উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ, তারপরেও কিন্তু এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও তফসিলি জাতি ও উপজাতির ছেলেমেয়েদের 'ছোটলোক' আরও নানান নিম্নরুচির অভিধায় দাগিয়ে দিতে সমাজ দ্বিতীয়বার ভাবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভাবনাচিন্তা থেকেই সমাজের এই প্রান্তবাসী মানুষ, জনজাতি জনজীবন নিয়ে কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয়। জানার ইচ্ছা হয় এই মানুষগুলির জীবনের বাস্তবিক রূপ কীরকম। সাহিত্যই সমাজের দর্পণ, সেই বাংলা সাহিত্যে, ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, সেই অনুসন্ধানই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

এই গবেষণাকার্য সফলভাবে কখনই সম্পন্ন হত না আমার অধ্যাপকদের সাহায্য ছাড়া। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক বাংলা বিভাগীয় অধ্যাপক ড. জয়দীপ ঘোষ স্যারের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং সাহায্য ব্যতীত এ গবেষণাকার্য সফল হত না। স্যারের কাছে আমি চিরঋণী, স্যারকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এই গবেষণায় বাংলা বিভাগীয় অধ্যাপক ড. বরেন্দু মণ্ডল মহাশয় তাঁর বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁর এই অবদানের কথা কেবল কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, স্যারকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রণাম। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. সুজিত মণ্ডল স্যারের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, স্যারকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আইভিদি ও হরিশদা যে কোনো বইয়ের দরকারে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ন্যাশনাল লাইব্রেরি, থেকেও আমি নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমায় নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

দিয়েছে আমার বন্ধু কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রীতম রজক, তার কাছেও আমি চিরঋণী। আমার গবেষণায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ছবি এবং সাক্ষাৎকার দিয়ে সাহায্য করেছেন- মনিকা হাঁসদা, মনিলা তামাং, করিশ্মা সুব্বা এবং ড. রূপালী মুর্মু। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমার গবেষণাকার্যে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছে আমার বাবা প্রণব সাহা, মা মিন্টু সাহা, দিদি সঙ্গীতা সাহা। যখনই আমার কোন বইয়ের প্রয়োজন পড়েছে, বাবা যেকোনভাবে তা আমায় এনে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা-আশীর্বাদই আমার কঠিন পথকে সুগম করে তোলে। সামাজিক এবং সাংসারিক কাজে আমায় অব্যাহতি দিয়ে আমার পড়াশোনায় নিরন্তর সাহায্য করেছেন আমার বাপি সমরেন্দ্রনাথ গাইন এবং মামনি মীরা গাইন। তাঁদের আশীর্বাদ আমার জীবনের পাথেয়। আমার বন্ধু এবং স্বামী অয়ন সবসময় যেভাবে আমার পাশে থেকেছে, আমার তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই, কেবল এটুকুই বলার সে পাশে না থাকলে কিছুই সম্ভব হত না। এই গবেষণায় আরও অনেক শুভানুধ্যায়ী দাদা-দিদি-বন্ধুরা আমায় নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করে নানাভাবে সাহায্য করেছে, সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

তারিখ- ৩০.৮.২০২৪

সাগরিকা সাহা

বাংলাবিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

অভিসন্দর্ভের গবেষণা পদ্ধতি

প্রদত্ত গবেষণাসন্দর্ভটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

(১) ভূমিকা, মূল আলোচনা- সাততি অধ্যায়, উপসংহার, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি, এই পাঁচপর্বে গবেষণাপত্রটি বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(২) গবেষণাপত্রটি আলোচনা সূত্রে তথ্যগত সাহায্যের জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক উপাদান- ছোটগল্প সংগ্রহ করা হয়েছে যা এই অভিসন্দর্ভে আকরগ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) সহায়ক উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, ইংরেজি গ্রন্থের পাশাপাশি বিভিন্ন রিপোর্ট, বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

(৪) সমগ্র গবেষণাপত্রটি অভ্র, কালপুরুষ ১২ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। শিরোনামের ক্ষেত্রে ১৬ ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজি শব্দগুলি ইতালিক করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি এবং তথ্যসূত্রর ক্ষেত্রে ১২ ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

(৫) অভিসন্দর্ভ রচনায় উদ্ধৃতি ব্যতীত বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান অভিধান বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

(৬) গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে *MLA Handbook for writers of research papers* বইটির সপ্তম সংস্করণটিকে মান্য করা হয়েছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা viii-xv

প্রথম অধ্যায়: ভারতীয় জনজাতি গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়: সংজ্ঞা ও স্বরূপ ১৬-৭২

১.ক| জনজাতির সংজ্ঞা, স্বরূপ ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

১.খ| জনজাতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয়: জনজাতি/আদিবাসী

১.গ| জনজাতি/আদিবাসী ও দলিতদের পার্থক্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজের রূপরেখা ৭৩-৮৯

তৃতীয় অধ্যায়: ১৯২৩-১৯৯০ দেশ-কাল, পটভূমি ও জনজাতি সমাজ ৯০-১১৪

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পকার (১৯২৩-১৯৯০) পরিচিতি এবং তাঁদের জীবনদর্শন ১১৫-১৫১

পঞ্চম অধ্যায়: জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পের (নির্বাচিত) পটভূমি-বৈচিত্র্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য ১৫২-২৯০

৫.ক| গল্পের পটভূমি-বৈচিত্র্য

৫.ক|১- গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.ক|২- কোলিয়ারিকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.ক|৩- নগরকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.ক|৪- রেলের কামরা ও রেলস্টেশনকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.ক|৫- পাহাড় ও অরণ্যকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.খ| গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য

৫.খ|১- ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|২- প্রেম-দাম্পত্য-পরকীয়া, মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|৩- রাজনীতিকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|৪- অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|৫- প্রকৃতিপ্রেম নির্ভরকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|৬- আর্থসামাজিক অবস্থান, সঙ্কট-সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয়

ষষ্ঠ অধ্যায়: গল্পে প্রান্তিক ও জনজাতি চরিত্রচিত্রণ এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ ২৯১-৩৮৩

৬.ক| মনস্তাত্ত্বিকদের মনস্তত্ত্বের রূপরেখা

৬.খ| গল্পে চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ

সপ্তম অধ্যায়: জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পে (নির্বাচিত) লোকায়ত জীবন ও লোকঐতিহ্য ৩৮৪-৪৬০

৭.ক| বাংলা ছোটগল্পে জনজাতির লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকউৎসব ও লোকদেবতা

৭.খ| বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি-লোকগান, লোককথা, লোকসংগীত, প্রবাদ-ধাঁধা-লোকশ্রুতি

৭.গ| লোকক্রীড়া ও লোকনৃত্য

৭.ঘ| পেশা ও লোকপ্রযুক্তি

৭.ঙ| খাদ্য-বস্ত্র-অলংকার

৭.চ| অঙ্কনকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

উপসংহার ৪৬১-৪৬৩

পরিশিষ্ট: ৪৬৪-৪৮৫

পরিশিষ্ট-১|

সাক্ষাৎকার ১

সাক্ষাৎকার ২

সাক্ষাৎকার ৩

পরিশিষ্ট-২|

ছবি (১-১০)

গ্রন্থপঞ্জি: **৪৮৭-৪৯৭**

আকর গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

পত্রিকা পঞ্জি

ব্যবহৃত রিপোর্ট

সহায়ক অভিধানপঞ্জি

বৈদ্যুতিন তথ্য

ভূমিকা

'বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)'- এই গবেষণার মূল অনুসন্ধান- ১৯২৩-১৯৯০ কালপর্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর অন্তেবাসী মানুষদের প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজচিত্র বাংলা ছোটগল্পকারদের লেখনীতে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে। জনজাতি', 'আদিবাসী', 'সিডিউল্ড ট্রাইব', 'ট্রাইব', 'গিরিজন', 'উপজাতি', 'বনবাসী' যে শব্দ দ্বারাই চিহ্নিত করা হোক না কেন অনাদিকাল থেকে এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই সমাজে সবদিক দিয়ে ঘৃণা-বঞ্চনা, শোষণের শিকার। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষে তফসিলি জাতির জনসংখ্যা ১১.৫ কোটি এবং তফসিলি উপজাতির জনসংখ্যা ৭ কোটি।[১] বলাবাহুল্য ভারতের সবথেকে বেশি শোষিত, উপেক্ষিত এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। এই গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনামে 'জনজাতি' শব্দটি প্রয়োগ করা হলেও মূল আলোচনায় 'আদিবাসী' এবং 'জনজাতি' এই শব্দবন্ধদ্বয় সর্বদাই সমধর্মী বিষয়কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। মনে করা হয়, ইউরোপীয়দের দ্বারা 'আদিবাসী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহারগত দিক দিয়ে খুব পুরানো নয়, কারণ প্রাচীন সাহিত্যে 'আদিবাসী' শব্দটি পাওয়া যায়নি। এদেশে বিংশ শতকের তিরিশের দশক থেকে 'আদিবাসী' কথাটি ব্যবহার শুরু হয়। ভারতবর্ষে 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'জনজাতি', 'গিরিজন', 'ট্রাইব' এই শব্দগুলি আদিবাসী উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে বোঝাতে পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে আক্ষরিক অর্থে 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'ট্রাইব' শব্দের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। 'তফসিলি উপজাতি' এবং 'আদিবাসী' শব্দটি প্রতিরূপ নয়, 'আদিবাসী' কথাটি যে কোনো দেশের আদি বাসিন্দাদের নির্দেশক। 'আদিবাসী' অর্থাৎ 'আদিম বাসিন্দা' বা 'আদি বাসিন্দা' এবং 'তফসিলি উপজাতি' একটি প্রশাসনিক শব্দ, যা অনগ্রসর, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য ব্যবহার করা হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে সমাজ একই অর্থে ব্যবহার করে। সাম্প্রতিককালে অনেকক্ষেত্রে 'আদিবাসী' শব্দটি নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা যায়, এই বিষয়ে সূর্য বালি মহাশয়ের *we are Scheduled Tribes not Adivasis* লেখাটিতে আলোকপাত করা হল-

> *The scheduled Tribes are addressed by a variety of terms- Mulnivasi, Deshaj, Vanvasi, Girivasi, Jungli, Adim and Adivasi. But all of terms, adivasi is the most negative and obnoxious.*[২]

সূর্য বালি মহাশয়ের লেখায় আরও বিস্তারিতভাবে আদিবাসী এবং উপজাতি নিয়ে আলোচনা আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করেন 'আদিবাসী' শব্দটি অপমানজনক এবং উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের বোঝানোর ক্ষেত্রে 'জনজাতি' কথাটি ইতিবাচক এবং সম্মানজনক, যদিও এক্ষেত্রেও অনেক দ্বিমত, তর্ক-বিতর্ক বিদ্যমান-

> *In India, the local equivalent of the term 'tribe' is often assumed to be 'jana' or 'communities of people' based on the usage of the term in ancient buddhist and puranic texts. in this conception, the term jana was used in oppposition to the term 'jati' to indicate that these communities were outside the jati or hierarchical caste system of social organisation. this view, however, was not universally accepted, since other cholars point out that the categories of 'Jana' and 'Jati' do not neatly overlap with that of tribe and caste respectively in the pesent context.*[৩]

আসলে 'জনজাতি', 'আদিবাসী', 'ট্রাইব' কোন শব্দই একমাত্রিক নয়, শব্দগুলির ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক। 'আদিবাসী' শব্দটির ক্ষেত্রে শুচিব্রত সেন মনে করেন-

> 'এই শব্দটি অনেকটা ছাতার মতো যার নীচে বিভিন্ন ধরনের জনজাতি গোষ্ঠীকে একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে'।[৪]

আমরা যদি 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহারের গভীরে দেখি-

> '১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার তথ্যে পেশাভিত্তিক যে জাতিবিন্যাস করা হয়, তাতে চাষবাস ও পশুপালন জাতির একটি 'জঙ্গলের অধিবাসী' বা 'বনবাসী' (*forest tribes*) বিভাগীকরণ করা হয়। সে সময়ের হিসাবে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ এই বনবাসী হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার তথ্যে এই বিভাগ 'অ্যানিমিস্টস্' (*animists*) হিসাবে দেখানো হয়। পরবর্তীকালে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের তথ্যে *Tribal Animists or people following tribal religion* হিসাবে পরিচিতি পায়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় এই জনগোষ্ঠীকে 'পাহাড়ি ও জঙ্গলের আদিবাসী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। আবার, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় 'আদিম

জনজাতি' (*Primitive Tribe*) হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এরপর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকারের অ্যাক্ট অনুসারে এই জনসমষ্টিকে 'পশ্চাৎপদ জনজাতি' হিসাবে গণ্য করা হয়। এরপর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এইসব পশ্চাৎপদ জনজাতি *Tribes* বা 'আদিবাসী' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে'।[৫]

আনুষ্ঠানিকভাবে বা সরকারিভাবে *Tribe* শব্দটি ব্যবহার করা হলেও আদিবাসীচর্চার বিভিন্ন গবেষণা মূলত আদিবাসী সত্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এছাড়াও আমরা যদি *REPORT OF THE BACKWARD CLASSES COMMISION* এর রিপোর্ট দেখি সেখানে বলা হয়েছে-

> *2.4 At the all-India level the first systematic attempt at the welfare of 'Depressed classes' was made with the introduction Montague-Chelmsford Reforms of 1919, when separate representation on a number of public bodies was given to members of these classes' at that time included 'Scheduled Castes'. 'Scheduled Tribes' and 'other Backward classes'. In the census of india 1931, the term 'depressed classes' was changed to 'exterior castes', which covered only the untouchable castes. Aboriginal and Hill Tribes were enumerated under the term 'Primitive Tribes'.*
>
> *2.6 It was under the Government of India Act 1935, that the 'Scheduled Castes' relaced 'Depressed classes' and separate lists of Scheduled Castes were notified for various provinces in 1936. Simultaneously, the term 'Primitive Tribes' was replaced by 'Backward Tribes' and their lists notified in respect of provinces where there was substantial representation of these tribes. It was only after Independence that the term 'Scheduled Tribes' in the constitution.*[৬]

এই রিপোর্টে জানা যায় স্বাধীনোত্তর ১৯৫০ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসিন্দা হিসাবে বিবেচিত জাতিগোষ্ঠীগুলির বেশিরভাগকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং সেইসময় থেকেই প্রজ্ঞাপিত ভারতের আদিবাসী মানুষেরা সরকারিভাবে পরিচিত 'তফসিলি উপজাতি' রূপে। ভারতীয় সংবিধান 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করে না, পরিবর্তে 'তফসিলি উপজাতি' বা 'জনজাতি' কথাটি ব্যবহার করে, এক্ষেত্রে ২০১৫ সালের *MSG-2 The Messenger* চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে দিল্লি হাই কোর্টের একটি রায়ে আলোকপাত করা হল-

> *The court observed that even the constitution of India in hindi does not use the word tribe therein is 'janajati'*।[৭]

ভারত তার ভূখণ্ডের ৪৬২ টি জনগোষ্ঠীকে 'তফসিলি উপজাতি' রূপে স্বীকৃতি দেয়, যাদের আদিবাসীই বলা হয়ে থাকে- *India recognizes 462 'scheduled Tribes' within its territory, also called Adivasi or "first inhabitants"*।[৮] আদিবাসী শব্দটি ব্যবহারে নানা বিতর্ক থাকলেও বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদগণ তাঁদের গবেষণায় জনজাতি মানুষদের 'আদিবাসী' এবং 'ট্রাইব' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পশুপতি প্রসাদ মাহাতো মহাশয় তাঁর *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন- দেশজ মানুষ যারা ভারতীয় সাংবিধানিক বিভিন্ন ধারা-উপধারাগুলিতে তফসিলি উপজাতি তথা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু হিসাবে চিহ্নিত, তারাই ভারতের আজকের আদিবাসী ও দলিত।[৯] সারমর্মে, 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'জনজাতি' এই শব্দবন্ধগুলি একই গোষ্ঠীর লোকেদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয় এবং 'জনজাতি' পরিভাষাটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের স্বরূপ সমৃদ্ধিকে পরিস্ফুট করে।

বিভিন্ন লেখালিখি, সাহিত্যে এবং বেশিরভাগ বাংলা ছোটগল্পেই প্রান্তিক জনজাতির মানুষদের পরিচয় হিসাবে 'আদিবাসী' কথাটি বহুলাংশে ব্যবহার হওয়ায় এবং এই গবেষণাপত্রের আলোচনার সুবিধার্থে 'জনজাতি' এবং 'আদিবাসী' দুই শব্দই সমভাবাপন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই গবেষণাপত্রটি ভূমিকা, উপসংহার এবং সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে জনজাতির সংজ্ঞা-স্বরূপ, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশটি জনজাতি গোষ্ঠী সম্পর্কিত নানান তথ্য আলোচনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই অধ্যায়টি মূলত তথ্যভিত্তিক। স্বাভাবিকভাবেই আদিবাসী সংক্রান্ত নৃতাত্ত্বিক নানান পূর্ববর্তী গবেষণা এবং গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই এই অধ্যায়ে জনজাতি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় তিনটি উপঅধ্যায়ে বিন্যস্ত, প্রথম

উপঅধ্যায়ে জনজাতি/আদিবাসী কারা? তাদের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় উপঅধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি জনজাতি গোষ্ঠীর তথ্যভিত্তিক পরিচয় আলোচিত এবং এই অধ্যায়ের শেষ তৃতীয় উপঅধ্যায়ে আদিবাসী এবং হিন্দু নিম্নবর্গের দলিত মানুষদের যে জাতিগত পার্থক্যের স্বরূপ তা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সমাজের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক ও জনজাতি সমাজজীবনের কালানুক্রমিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। যেকোন শিল্পমাধ্যমই একটা বিশেষ সময়ের দর্পণ। সাহিত্য কেবল শিল্পচর্চা নয়, শিল্পীর মননে-মস্তিষ্কে সময়ের প্রভাব থাকবেই, কালচেতনাকে উপেক্ষা করা যায় না, সেই চলমান সময়ের খণ্ড চকিত ভাব এবং নিজস্ব চিন্তাচেতনার বিমূর্ত রূপ প্রাণ পায় লেখকের কলমে, সাহিত্যের পাতায়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকে স্বাধীনোত্তর কয়েকদশকের কালান্তরে এবং রাজনৈতিক পালাবদলে আদিবাসী সমাজজীবনের হেরফের, আদিবাসীচিন্তার ক্রমপ্রসারণের ইঙ্গিত বোঝা সম্ভব একমাত্র সাহিত্যের মাধ্যমে। এই অধ্যায়ে প্রাচীন সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের কালান্তরে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্রের রূপরেখা নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯২৩ অর্থাৎ কল্লোল যুগ থেকে প্রাক্-বিশ্বায়ন পর্ব ১৯৯০, এই সময়পর্বে দেশ-কাল, পটভূমি আলোচনার পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে আদিবাসীদের অবস্থান চিত্র আলোচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এবং প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্ব, সমরকালীন ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্ব, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, স্বাধীনতা, সংবিধান, আদিবাসী স্বার্থে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানান আইন, নিয়ম-নীতি, তার সাফল্য-ব্যর্থতা, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, সরকার বদল, গণতন্ত্রের নামে প্রহসন, এই জোয়ার-ভাটায় রাষ্ট্রের উপেক্ষিত মানুষ যারা, প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের অবস্থান কীরূপ এই দেশ-কালের পটভূমিতে তা এই অধ্যায়ে খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পকারদের (১৯২৩-১৯৯০) পরিচিতি এবং লেখকদের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে যে জীবনসঞ্জাত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভিন্ন মানসপ্রবণতা, তাঁদের সমাজচেতনা, মুক্তদৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনদর্শন তা আলোচনা করা হয়েছে। নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে সময়ের দাবিকে উপেক্ষা না করে বিভিন্ন ছোটগল্পকার তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ, জীবনদর্শনের গভীর উপলব্ধি থেকে ছোটগল্পে আদিবাসী বিশ্ব নির্মাণের প্রয়াস করেছেন, আদিবাসী মানুষ ও তাদের যে জীবনসত্য তুলে ধরেছেন তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলির বিচিত্র

পটভূমি এবং গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়টি দুটি উপঅধ্যায়ে বিন্যস্ত- পটভূমি-বৈচিত্র্য এবং বিষয়-বৈচিত্র্য। জনজাতি জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পের বৈচিত্র্যময় পটভূমি এবং বিচিত্র জনজাতি বিষয়ক কাহিনির রূপায়ণ আদিবাসী জগতের পরিধিকে প্রতিবিম্বিত করেছে। ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে আদিবাসী মানুষগুলির অভিজ্ঞতা-বঞ্চনার গল্পও ভিন্ন। যে বিচিত্র পটভূমির আলোকে আদিবাসী জনজীবন আবর্তিত সেই আলোচনার সূত্রে পটভূমি বৈচিত্র্যের পাঁচটি শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এছাড়া গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে একইভাবে বিষয়কেন্দ্রিক শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের ব্যক্তিজীবন, ব্যক্তিসংশয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ, তাদের আর্থিক সঙ্কট-সমস্যা, সামাজিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও অবস্থান, তাদের দাম্পত্য-প্রেম-পরকীয়া-মনস্তত্ত্বের নানান স্তরীয় বিন্যাস, আরও নানান বিচিত্রমুখী বিষয় এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), আইভন পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬), এডলার, ইয়ুং, জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তাভাবনার আধারে গল্পের প্রান্তিক, জনজাতি চরিত্রগুলির জীবনের স্বভাব-স্বরূপ ও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম স্তরীয় বিন্যাস, মানবমনের অতল রহস্য অনুধাবনের প্রয়াস করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে, জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলিতে সংস্কৃতি ধারার যে ইতিহাসের বিবর্তন, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক উপাদান- 'স্থিতি' *(Persistence)*, 'সৃষ্টি' *(Invention),* এবং 'লয়' *(Loss),* বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বা 'অ্যাকালচারেশন', 'ডিফিউসান', 'কালচার কমপ্লেক্স'-এর প্রেক্ষিতে জনজাতি মানুষদের লোকায়ত জীবন, নানান লোকসংস্কার-বিশ্বাস, আচার-রীতি-নীতি-প্রথা, সংস্কৃতি, লোকাচার, উৎসব, ধর্মীয় ভাবনা, পেশা, খাদ্য-বস্ত্র-অলঙ্কারের যে চিত্র প্রস্ফুট, তারই রূপরেখা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও আরও নানান লোকসাংস্কৃতিক তত্ত্ব- 'মান্যা', 'ম্যাজিক', 'টোটেম', 'ট্যাবু'র আধারে সমাজের প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের সংস্কার-লোকবিশ্বাস-লোককথার অন্তর্নিহিত প্রত্যয় অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি ভূমিকা এবং সাতটি অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনার রূপরেখা নির্মাণ করা হয়েছে উপসংহারে। পরিশিষ্টের পরিশিষ্ট-১, এই অংশে তিন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-২, এই অংশে জনজাতি মানুষদের আচার-রীতি-খাদ্য-পোশাক, জীবনযাত্রার ১০ টি চিত্র দেওয়া হয়েছে।

গবেষণাপত্রের শেষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে- গ্রন্থপঞ্জি, পত্র-পত্রিকাপঞ্জি, ব্যবহৃত রিপোর্ট, অভিধানপঞ্জি, আর্কাইভাল ও বৈদ্যুতিন তথ্য।

সমগ্র আলোচনায় আমাদের মূল অনুসন্ধান- *Voiceless Section of Indian Society,* যারা আসলেই নিজেরা জানে না তাদের অধিকার, যারা বেঁচে থাকে কেবল বেঁচে থাকার দায়ে, জীবনের অভ্যাসে, যাদের জীবন এবং সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চবর্গীয় শ্রেণির হাতে, তাদের জীবনসমস্যা আধুনিক রাষ্ট্রের বাস্তব সত্যরূপ। ছোটগল্প স্বল্পায়তন, স্বল্প পরিসরের হলেও সেই স্বল্প পরিসরেই আবহমানকালের চালচিত্রের স্বরূপ ধরা পড়ে। এই অভিসন্দর্ভে জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব- ভারতবর্ষে বহু রক্তক্ষয়ের পর যে স্বাধীনতা এসেছিল, সেই স্বাধীনতার সত্যতা, সুখভোগ, অধিকার আদৌ কি প্রান্তিক জনজাতি সমাজ পেয়েছিল? স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার কর্তৃক আদিবাসী উন্নয়ন স্বার্থে নানান আইন-প্রকল্প গৃহীত হয়, তা ঠিক কতটা আদিবাসী জীবনচর্চা এবং তাদের প্রাতিস্বিক মূল্যবোধকে ছুঁয়ে তৈরি হয়েছিল এবং সরকারী প্রকল্পগুলি জনজাতি প্রান্তিক মানুষদের জীবনে কী আদৌ বাস্তবায়িত হয়েছিল? প্রাচীন থেকে বর্তমান সময়ের কালান্তরে শাসক ও শোষিতের চরিত্রের কি কোনো চরিত্রগত হেরফের ঘটেছিল? গল্পগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রশাসন ও ঊর্ধ্বতন উচ্চবর্গীয় শ্রেণির দ্বারা সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের নিয়ে মারণখেলা, অরণ্য এবং অরণ্যসন্তানদের নির্বিচারে মুছে ফেলার ধ্বংসলীলা, নারী নির্যাতন, আদিবাসী নারীদের অবস্থান, আদিবাসী মানুষদের নানান সংস্কারের অন্তরালে যে গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, নানান বিশ্বাস-প্রথা, রীতির নামে চলে আসা আদিবাসী সমাজের অন্ধকার দিক এবং আদিবাসী সমাজজীবনের উপেক্ষিত, ক্লেদাক্ত, বিপন্নতার নগ্ন বাস্তবরূপ উন্মোচনই এই গবেষণার মূল অন্বেষণ।

তথ্যসূত্র:

১. *REPORT OF THE BACKWARD CLASSES COMMISION*, Volume 1 & 2, Government of India, 1980, p. 2

২. https://www.forwardpress.in/2018/10/we-are-scheduled-tribes-not-adivasis/

৩. *REPORT OF THE HIGH LEVEL COMMITTEE ON SOCIO-ECONOMIC, HEALTH AND EDUCATIONAL STATUS OF TRIBAL COMMUNITIES OF INDIA*, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, May 2014, p. 51

৪. সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম*, কলকাতা: বুকপোস্ট পাবলিকেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩৯

৫. ঘোষ, দীপঙ্কর, *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা*, কলকাতা: অমরভারতী, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৫

৬. *REPORT OF THE BACKWARD CLASSES COMMISION*, Volume 1 & 2, Government of India, 1980, p. ৫

৭. https://blog.scconline.gen.in/post/2015/09/19/word-adivasi-does-not-mean-people-belonging-to-scheduled-castes-and-scheduled-tribes/amp/

৮. https://booksandideas-net.translate.goog/Claiming-Indigenousness-in-India.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=wa#nb2%7C

৯. মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ*, কলকাতা: পূর্বালোক পাবলিকেশন, জুলাই ২০১২, পৃ. ১১

প্রথম অধ্যায়:

ভারতীয় জনজাতি গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়: সংজ্ঞা ও স্বরূপ

'বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)'-শীর্ষক গবেষণায় আমাদের মনে প্রথমেই এই প্রশ্নটা আসে 'জনজাতি' কারা? বর্তমান আধুনিক যুগেও এই জনজাতিদের বাসস্থান, সমাজ, জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেকেই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নয়। এমনকি আমাদের শহুরে ঝাঁ চকচকে জীবনে দাঁড়িয়ে, বিলাসিতায় অভ্যস্ত জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে এই জনজাতি জীবনসংগ্রামের চিত্রকে বুঝে উঠতে পারা কঠিন। যাঁরা সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অধিকাংশই কেবলমাত্র বই পড়েই এই জনজাতি/আদিবাসী, দলিত, প্রান্তিক— এই শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত। প্রত্যক্ষ পরিচয়-অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষেরই হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের সাহিত্য থেকেই আদিবাসীদের পাওয়া গেলেও এদের নিয়ে লেখালেখি আগে যে খুব বেশি হয়েছে তেমনটা নয়, তবে সাম্প্রতিককালে দলিত বিষয়ে লেখালিখি হচ্ছে। আমাদের এই গবেষণার উদ্দেশ্য- মূলত বাংলা জনজাতি জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পকেন্দ্রিক এবং গল্পগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে প্রান্তিক ও জনজাতি জনগোষ্ঠীর অবস্থান কীরূপ, তার স্বরূপ নির্মাণ। এই অনুসন্ধান সম্পূর্ণতা পেতে পারে নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিদদের চিন্তাভাবনার আধারে, আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং প্রাক্-গবেষণামূলক নানান তথ্যের আলোকে। নিম্নে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

১.ক| জনজাতির সংজ্ঞা, স্বরূপ ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়:

ইতিপূর্বে ভূমিকায় 'জনজাতি', 'আদিবাসী', 'উপজাতি' শব্দবন্ধগুলির ব্যঞ্জনা স্পষ্ট করা হয়েছে, তাই অহেতুক এখানে আর সে বিষয়ে কথা বাড়ালাম না। ভারতবর্ষে 'আদিবাসী', 'জনজাতি', 'উপজাতি' শব্দগুলি আদিবাসী উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলিকে বোঝাতে পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। জনজতি/আদিবাসী অর্থ 'আদিম বাসিন্দা' (*autochthones)*, অর্থাৎ যারা এককালে কোনও অঞ্চল বা প্রদেশের প্রথম বাসিন্দা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের বুঝি। ঔপনিবেশিক কালে 'ট্রাইব' কথাটি ব্যবহার করা হত। উনিশ শতকের সাহিত্যচর্চায় বা নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় জনজাতির মানুষদের 'আদিম অধিবাসী', 'আদি বাসিন্দা', 'বনবাসী', 'আরণ্যক', 'আ দিম মানব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আদিবাসী শব্দটির প্রতিশব্দ 'ট্রাইব' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রিক *phylab* এবং ল্যাটিন শব্দ 'ট্রাইবাস'।[১] আদিবাসী কথাটি মূলত বাংলায় হিন্দি শব্দভাণ্ডার থেকে আগত। সুবোধ ঘোষ বলেছেন 'আদিবাসী' শব্দটি সম্পর্কে বলেছেন-

> 'আদিবাসী কথাটি নতুন। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্কে ভারতের কতগুলি শ্রেণি ও সমাজের নতুন নামকরণ হয়েছে। সাধারণত যাদের আদিম অধিবাসি (*aborigines*) বলা হতো, আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় তাদেরই আদিবাসী বলা হয়েছে'।[২]

ভারতের সাংবিধানিক সংজ্ঞায় 'তফসিলিভুক্ত উপজাতি' অর্থে আদিবাসী/জনজাতি গোষ্ঠীদের বোঝায়। আদিবাসীদেরকে 'জনজাতি', 'উপজাতি', 'ট্রাইব', 'সিডিউল্ড ট্রাইব', 'বনবাসী', 'গিরিজন' ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে পরিচয় দেওয়া হয়। যদিও এই নামগুলি আমাদের ভদ্রসমাজ দিয়ে থাকে, আদৌ তারা এই নামগুলি স্বীকার করল কিনা ভাবা হয় না। আসলে সভ্যসমাজ প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসীদের 'অসভ্য', 'বর্বর', 'বুনো', 'জংলী', এই ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছে সমাজের মূলস্রোত থেকে।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে যদি এই আদিবাসীদের দেখা যায়, তাহলে প্রথমেই দেখা যাবে এই ভারতবর্ষের একেবারে আদিম বাসিন্দা, এমন কিছু গোষ্ঠী যাদের নিজস্ব সমাজবন্ধন, ভাষা, ধর্ম, উপাসনার পদ্ধতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, আইন-কানুন, আচার-রীতি, নিয়ম-প্রথা, খাদ্যাভাস আছে। এমনকি তাদের সমাজের বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি পরিমণ্ডল বা জগৎ বা সমাজ আছে। তাদের বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়া, সংস্কার–সংস্কৃতি সব কিছুই এই সভ্য সমাজের থেকে অনেক আলাদা। আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য সর্বদাই সংগ্রাম করে চলেছে। তাদের জীবনচর্যা, ধর্মবিশ্বাস বা অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনায় সমগ্র চিন্তা-চেতনার দিক থেকে তাদের জীবনসংস্কৃতি প্রাচীন ভারতের মূল বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে। সামগ্রিকভাবে সভ্য সমাজের ভারতবাসীর সঙ্গে তুলনামূলক জীবনযাত্রায় জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ অনেকটা পিছিয়ে। এই এগিয়ে-পিছিয়ে থাকার মানদণ্ড সম্পূর্ণভাবে আধুনিক সমাজের দেগে দেওয়া। তারা এখনও পুরোপুরি আধুনিক ভারতবর্ষকে গ্রহণ না করতে পারায়, তাদের কাছে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা না পৌঁছানোর কারণে, তারা বর্তমান সমাজের সঙ্গে তাল না মেলাতে পারায়, ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, সংস্থানের মাধ্যমে এই সকল গোষ্ঠীর জীবনে এক স্থিতিশীল অর্থনীতির বুনিয়াদ রচনার প্রয়াস করা হয়েছে। **১৯৮১** সালের লোকগণনায় ভারতীয় জনসংখ্যার ৭.৭৬ অংশ আদিবাসী 'তফসিলিভুক্ত উপজাতি' হিসাবে স্বীকৃত। গোষ্ঠী হিসাবে এদের সংখ্যা ভারতে প্রায় ৪৬২। আদিবাসী অর্থে কোনও একক গোষ্ঠী বোঝায় না। ভাষার তারতম্য ও নানা আচার-রীতি মেনে

এদের মধ্যে বহুবিভাজন লক্ষণীয়। প্রকৃতি ও পরিবেশে নানান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের এবং গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে, কখনও তা দৃঢ় সুসংবদ্ধ হয়।

জনজাতি/ আদিবাসী সম্পর্কে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীদের মতামত:

নৃবিজ্ঞানী রালফ্ পিডিংটন (১৯০৬-১৯৭৪) এর বক্তব্য অনুসারে জনজাতি গোষ্ঠীর সংজ্ঞা–

> ‘এরা এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান’।[৩]

আদিবাসী গোষ্ঠীর সংজ্ঞায়নে নৃবিজ্ঞানী ড. রিভার্স (১৮৬৪-১৯২২) এর মত-

> ‘তারা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনে জটিলতা নেই, যারা এখনও একই ভাষা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সংগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়ম-কানুন রক্ষা করার জন্য যাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বা সংগ্রাম করে থাকে’।[৪]

আদিবাসী গোষ্ঠীর সংজ্ঞায়নে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৯০৩-১৯৬০) বলেছেন-

> ‘আদিবাসী সমাজ হল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা এক গোষ্ঠীর পরিবার, যাদের নামের সমতা থাকে। সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একইরূপ বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধা নিষেধ মেনে চলে এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা, সামঞ্জস্য ও আদানপ্রদান করে থাকে’।[৫]

নৃতাত্ত্বিক হেনরি মরগ্যান (১৮১৮-১৮৮১) সালে *Ancient Society* (১৮৭৭) গ্রন্থে এবং নৃতাত্ত্বিক ম্যারেট (১৮৬৬-১৯৪৩) সালে তাঁর *Anthropology* (১৯১২) গ্রন্থে আদিবাসীদের নিয়ে সমভাবাপন্ন বক্তব্য রেখেছেন।

উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী সম্পর্কে সমস্তরকম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে। অমলকুমার দাস তাঁর ‘আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা’ প্রবন্ধে জানান- ‘এই ‘আদিবাসী’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বিখ্যাত ভারতীয় সমাজসেবী ঠক্কর বাপা’।[৬] পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসীদের ‘উপজাতি’ বলে অভিহিত

করে। 'উপ' কথাটা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তো সভ্যসমাজ আসলে তাদের অপমান, একটা নিম্নমানের দৃষ্টিতে দেখার ইঙ্গিত দেয়। 'উপ' কথাটা হীন, তুচ্ছ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে বলে আমার মনে হয়। এই 'উপজাতি' অভিধার মধ্য দিয়ে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে তারা সমাজের মূলস্রোত থেকে ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন। আসলে কিন্তু ঠিক এর উল্টোটা হওয়া উচিত। আদি বাসিন্দারাই তো দেশের মূল সমাজের অংশ এবং আর্যরা, যারা বহিরাগত তারাই আসলে 'উপ', কিন্তু একথা কেউ ভাবতেই পারেনা। আদিবাসীরা আসলে আদিবাসী হিসেবে পরিচিত কারণ তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানেনা। তারা তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে আদিমতম পর্যায়েই রয়ে গেছে। নিম্নে আদিবাসীদের যে নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করা হবে তা বেশিরভাগই প্রাক্-গবেষণামূলক গ্রন্থভিত্তিক। এই আলোচনার ক্ষেত্রে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মহাশয়ের দুই খণ্ডের 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' গ্রন্থদুটির ঋণ অনস্বীকার্য।

ভারতবর্ষের আদিবাসীদের দৈহিক গঠন, মুখাকৃতি ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের প্রধান তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা— ১) নিগ্রোবটু (*Nigroito*), ২) প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতি (*Proto-Australoid*) এবং ৩) মঙ্গোলীয় শ্রেণি (*Mongoloid*)। নিগ্রোবটু জাতিকেই ভারতের প্রাচীনতম আদিবাসী বলে অনুমান করা হয়। দক্ষিণ ভারতের কাদা ইরুলার এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানী জারওয়া, ওঙ্গে প্রভৃতি এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে। ভারতের সমগ্র মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে এদের বাস। মধ্যভারত ও পূর্বভারতের ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, কোল প্রভৃতি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গোলীয় শ্রেণি— হিমালয়ের পাদদেশে মঙ্গোলীয় শ্রেণির জনজাতির বাস। ভুটান, নেপাল ও চিনের জনগণের সঙ্গে এদের গোষ্ঠীগত মিল রয়েছে।[৭]

ভারতবর্ষের ভাষানুযায়ী আদিবাসীদের চার ভাগে বিভক্ত করা হয়[৮]—

১। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী

২। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী

৩। তিব্বতী-চিনা বা সিনো-তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠী

৪। ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী।

১) অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী- প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলত সেই ভাষা অস্ট্রিক (মতভেদ আছে)। পরবর্তীতে বলা হয়, এই অস্ট্রিক ভাষা বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। ভারতে এই ভাষার প্রধান হিসাবে 'মুণ্ডারী' ভাষাকে ধরা হয়, যা সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ব্যবহার করে। এই অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা দু'ভাগে বিভক্ত—

ক. মানভূমের শাখা   খ. মুণ্ডা শাখা

আবার মুণ্ডা শাখার অনেক ভাগ, তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-

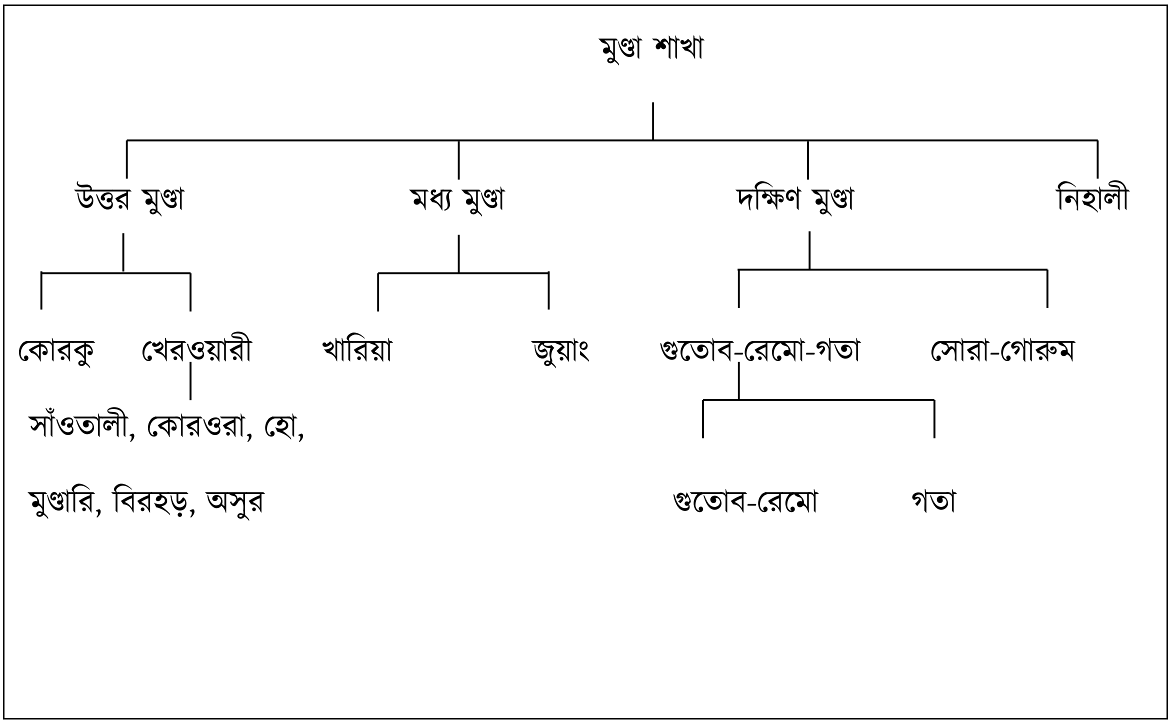

২. দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী— ইরুলা, টোডা, ওরাওঁ, গোণ্ড্, খোন্দ প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে।

৩. তিব্বতী-চিনা বা সিনো-তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠী।

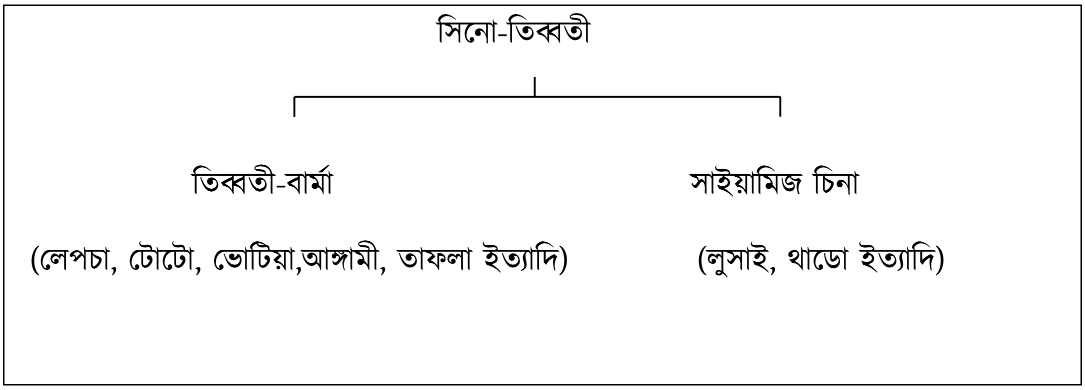

৪. ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী— এরা আদিবাসী হলেও কোনও কারণবশত এরা এদের নিজেদের মাতৃভাষা হারিয়ে 'সাদরি' অর্থাৎ এক ইন্দো-আর্য কথ্যভাষায় কথা বলে। চিকবরৈক, বেদিয়া, লোহরা প্রভৃতি ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

পশ্চিমবঙ্গের ৪০-টি আদিবাসী গোষ্ঠীকে ভাষানুযায়ী ভাগ করা যায়[৯]-

ক) অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী— ১) অসুর, ২) করমালি, ৩) কিসান, ৪) কোরওয়া, ৫) কোড়া, ৬) চেরো, ৭) নাগেসিয়া, ৮) বিরহড়, ৯) ভূমিজ, ১০) মাহ্‌লি, ১১) মাহালি, ১২) মুণ্ডা, ১৩) লোধা, ১৪) খেড়িয়া, ১৫) শবর, ১৬) সাঁওতাল, ১৭) হো।

খ) দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী— ১) ওরাওঁ, ২) খোন্দ্‌, ৩) গোণ্ড, ৪) মাল পাহাড়িয়া, ৫) শাওরিয়া পাহাড়িয়া।

গ) তিব্বতী-চিনা ভাষাগোষ্ঠী—১) গারো, ২) ভুটিয়া, ৩) চাকমা, ৪) লেপচা, ৫) রাভা, ৬) মেচ, ৭) হাজং

ঘ) ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী- ১) খার্‌ওয়ার, ২) গরেত, ৩) চিকবরৈক, ৪) পারহাইয়া, ৫) বিরজিয়া, ৬) বেদিয়া, ৭) বৈগা, ৮) লোহারা।

রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সালে সংবিধানের ৩৪২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে যে তালিকা *(Scheduled Tribes Order, 1950)* প্রচার করেন, তাতে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র সাতটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম উল্লিখিত ছিল—

PART VIII-WEST BENGAL

Throughout the state:-

1. Bhutia	*5. Munda*
2. Lepcha	*6. Oraon*
3. Mech	*7. Santal*[10]
4. Mru	

১৯৫৬-তে এই সাতটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ছাড়া আরও বারোটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম তফসিলভুক্ত করা হয়— হো, কোড়া, লোধা, খেরিয়া বা খাড়িয়া, মাল পাহাড়িয়া, ভূমিজ, চাকমা, গারো, হাজং, মগ, মাহালি, নাগেসিয়া এবং রাভা।[১১] ১৯৭৬ সালের *দ্য সিডিউল্ড কাস্টস্ অ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট* অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৩৮-টি আদিবাসী গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা হয়, এগুলি হল—

> 1.Asur 2. Baiga 3. Bedia, bediya 4. Bhumij 5. Bhutia, Sherpa, toto, dukpa, kagatay, Tibetan, yolmo 6. Birhor 7. Birjia 8. Chakma 9. Chero 10. Chik baraik 11. Garo 12. Gond 13. Gorait 14. Hajang 15. Ho 16. Karmali 17. Kharwar 18. Khond 19. Kisan 20. Kora 21. Korwa 22. Lepcha 23. Lodha, kheria, kharia 24. Lohara, lohra 25. Magh 26. Mahali 27. Mahli 28. Mal paharia 29. Mech 30. Mru 31. Munda 32. Nagesia 33. Oraon 34. Parhaiya 35. Rabha 36. Santal 37. Sauria paharia 38. Savar.[১২]

বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের ৪০ টি গোষ্ঠীকে 'তফসিলি উপজাতি' রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং তারাই এ রাজ্যের আদিবাসী/জনজাতি রূপে চিহ্নিত। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে তামাং ও লিম্বু বা সুব্বা জাতিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৫৯ টি তফসিলি জাতিকে চিহ্নিত ও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ৪০ টি জনজাতি গোষ্ঠীর জেলাভিত্তিক বসবাসের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল[১৩]-

অসুর— পশ্চিম দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার।

ওঁরাও— পুরুলিয়া,কোচবিহার, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি, কলকাতা।

করমালি— পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, মালদা।

কিসান— পুরুলিয়া দার্জিলিং ও বাঁকুড়া।

কোড়ওয়া— পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া।

কোড়া— কলকাতা, কোচবিহার, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

খারওয়ার— পশ্চিম দিনাজপুর।

গরেত— পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া।

গারো— কোচবিহার, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া কলকাতা।

গোণ্ড্— পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

চাকমা— কলকাতা, ২৪ পরগনা, দার্জিলিং, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম।

চিকবরৈক— দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুর।

নাগেসিয়া— ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, কলকাতা ও হাওড়া।

পারহাইয়া— পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

বিরজিয়া— পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

বিরহড়— পুরুলিয়া জেলা।

বেদিয়া— পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলা।

ভুটিয়া— কোচবিহার, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও কলকাতা।

ভূমিজ— কোচবিহার, ২৪ পরগনা, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

মাল পাহাড়িয়া— ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, কলকাতা ও হাওড়া জেলা।

মাহ্‌লি— পুরুলিয়া জেলা।

মাহালি— কোচবিহার, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি, কলকাতা জেলা।

মুণ্ডা— পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, ২৪ পরগনা, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বর্ধমান, কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা।

মেচ— কোচবিহার, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, হাওড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর, কলকাতা।

ম্রু— দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলি জেলা।

রাভা— কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কলকাতা।

লেপচা— কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, ২৪ পরগনা, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা।

লোধা, খাড়িয়া— পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, কোচবিহার, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা।

লোহার— পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া।

শাওরিয়া পাহাড়িয়া— পুরুলিয়া।

সাঁওতাল— পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা।

হাজং ও হো— ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন তফসিলি উপজাতি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা: ১৯৮১[১৪]

জাতি	জনসংখ্যা	জাতি	জনসংখ্যা
অসুর	৪, ২৮৬	বৈগা	১, ৬০৬
ওঁরাও	৪, ৩৭, ৫৭৮	ভুটিয়া	৪০, ১৯২
করমালি	১, ৪১৮	ভূমিজ	২, ৩৩, ৯০৬
কিসান	৫, ৩৭০	মগ	১, ০২০

কোরওয়া	২, ৪৯৩	মাল পাহাড়িয়া	১৭, ২০২
কোড়া	৯৬, ৮৩৫	মাহ্‌লি	১০, ৮২৭
খারওয়ার	১১, ৭২৬	মাহালি	৫০, ২৮৮
খোন্দ্‌	৬৩৯	মুণ্ডা	২, ৩০, ০১৬
গরেত	২, ১৯১	মেচ	২৬, ৯৫৯
গারো	৩, ২০৬	ম্রু	১, ২৩২
গোণ্ড	৪, ৯২৩	রাভা	১১, ২৫৬
চাকমা	১৪১	লেপচা	২৩, ৪০৯
চিক বরৈক	১২, ৬২৪	লোধা, খাড়িয়া	৫৩, ৭১৮
চেরো	১, ৬৬৫	লোহার	২৩, ৭৯৯
নাগেসিয়া	৭, ৭৪৫	শবর	৩৭, ২৩৭
পারহাইয়া	৩, ৭৪৫	শাওরিয়া পাহাড়িয়া	৪, ২৮৩
বিরজিয়া	৯১৩	সাঁওতাল	১৬, ৬৬, ৬১০
বিরহড়	৬৮৫	হাজং	১, ০৩৫
বেদিয়া	২৯,৩৯৬	হো	৩, ২০২
		অন্যান্য	৫, ৫০৬
মোট জনসংখ্যা	**৩০, ৭০, ৬৭২**		

আদিবাসীদের আজ আমরা যে অবস্থায় দেখি, প্রাচীন ইতিহাসে এই অবস্থা ছিল না। দু'একজন আদিবাসী জমিদার এবং রাজাদের কথা পুরানো বইপত্রে এবং বিভিন্ন নথিতে পাওয়া যায়। জানা যায় চতুর্দশ শতকে সৈয়দ ইব্রাহিম আলি চাম্পা দুর্গ আক্রমণ করলে সেখানকার সাঁওতাল রাজা সপরিবারে আত্মহত্যা করে।

মধ্যভারত এবং উত্তর ভারতে চেরো, নাগবংশী, লিম্বু রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে আর্যরা এদেশে আসার পর আদিবাসীরা তাদের সঙ্গে নানান ক্ষেত্রে সংগ্রামে পরাজিত হয়ে বনে, পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইংরেজ রাজত্ব শুরুর পর থেকে তারা আদিবাসীদের উপর নানা অজুহাতে করের বোঝা চাপিয়ে, জমিদার-মহাজনদের দিয়ে শোষণ করেছে। যখনই আদিবাসীরা প্রতিবাদ করতে গেছে তখনই বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। চুয়ার বিদ্রোহ (১৭৭০ ও ১৭৭৯), খাসি বিদ্রোহ (১৭৮৩), জাঠ বিদ্রোহ (১৮০৯), ভীল বিদ্রোহ (১৮১৮), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২), ভূমিজ বিদ্রোহ (১৮৩২), নাগা বিদ্রোহ (১৮৩৯), খোন্দ বিদ্রোহ (১৮৪৬), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫)— এইসব বিদ্রোহের কারণেই ইংরেজরা আদিবাসীদের বৃহত্তর মূলসমাজ থেকে সরিয়ে রাখে।[১৫] কিন্তু মিশনারিরাই জনজাতি মানুষদের স্বার্থে প্রথমে ছেলেদের ও পরে মেয়েদের স্কুল তৈরি করে এবং আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে। হাসপাতাল স্থাপন করে সেখানে আদিবাসী রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে। খ্রিস্টান মিশনারিদের কারণে আদিবাসী সমাজে শিক্ষার আলো প্রবেশ করে। এর পাশাপাশি তারা খ্রিস্টধর্ম প্রচারও করে আদিবাসীদের মধ্যে এবং এর ফলে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টান আদিবাসীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে গল্প আলোচনায় এই ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অবস্থান চিত্র পাওয়া যাবে, যেমন- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোতাম', রমাপদ চৌধুরীর 'দরবারী', সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' প্রভৃতি গল্পে উক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্ত বর্তমান।

স্বাধীনতা লাভের পর আদিবাসী সমাজকে ভারতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে সমানতালে যুক্ত করতে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর জাতীয় সংবিধানে বিশেষ সাংবিধানিক আইনের আওতায় রাখেন। যদিও এই সমস্ত সাংবিধানিক আইনের কারণে আদিবাসীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত দিক দিয়ে যে সুযোগ-সুবিধা পায়, তার কারণে অনেকেই যখন সামাজিক দিক দিয়ে উন্নতি করে, তখনও আমাদের সমাজের কিছু তথাকথিত ভদ্র-শিক্ষিত আধুনিক মানুষরা তাদের কটাক্ষ করতে, অপমান করতে পিছপা হয় না। তাই বলা যেতে পারে স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন সম্ভবপর হয়নি। তবে হ্যাঁ, আদিবাসী সমাজের কোন কোন গোষ্ঠীর কিছু লোকজন বর্তমানে শিক্ষার আলোয় মধ্যবিত্তের মত জীবনযাপন করছে। আবার অনেকেই তাদের

আদি বাসস্থান ছেড়ে আধুনিক সমাজের মধ্যে এসেছেন ঠিকই কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে কিন্তু দেখা যায় এখনও আদিবাসী সমাজের আশি শতাংশ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নীচে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার স্বাদ তারা সেভাবে পায়নি, তাদের জন্য আড়ম্বরের সঙ্গে লোক দেখানোভাবে সরকার প্রশাসনিকভাবে আদিবাসী স্বার্থে নানান প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও আদিবাসীদের জীবনে তার বাস্তবায়ন ঘটেনি। আমরা আমাদের গবেষণাকর্মের আলোচনায় যত এগোব, ততই এই সত্য আরও প্রকট হয়ে উঠবে। প্রান্তিক জনজাতি সমাজ বাস্তবতার এই নিদারুণ সত্যরূপ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে লেখকরা কীভাবে দেখিয়েছেন, সেটাই আমরা পরবর্তী আলোচনায় খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

আগেই বলা হয়েছে, আদিবাসীদের অনেকক্ষেত্রেই 'বনবাসী', 'বুনো', 'জংলি' বলে অভিহিত করা হয়, কারণ তারা বনে-জঙ্গলে বসবাস করে। আমাদের সুসভ্য সমাজ আসলে তাদের বাসস্থানের জন্য এই বন-বাদাড়ই বরাদ্দ করেছে। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এটা বলা হয়ে থাকে— 'ওই যারা পিঁপড়ের ডিম খায়', আসলে এই পিঁপড়ের ডিম খেয়ে বেঁচে থাকাটা আমাদের ভদ্র মানুষেরা কল্পনাতেই আনতে পারে না, তারা এটা বুঝতে পারে না যে কি নিদারুণ অভাবে তারা এই পিঁপড়ের ডিম খেয়ে খিদের জ্বালা মেটায়। কোনও শিশুর খিদে পেলে তাকে হাঁড়িয়া খাইয়ে দেওয়া হয়, যাতে সে না খিদের জ্বালায় কাঁদে, এমনকি আদিবাসী মানুষদের কাছে ভাত খাওয়া বিলাসিতার সমান। এরকম বহু দৃশ্য আমরা সাঁওতাল পরগনায় গেলেই পাওয়া যায়। তারপরও আমরা বলি আমাদের দেশ আধুনিক, আমরা মানবাধিকার দিবস পালন করি ধুমধাম করে। তারপরও কোনও আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ এই দারিদ্র সীমা পেরিয়ে উঠে আসলে তাকেও সারাক্ষণ 'নিম্নজাতি'র বলে অপমান-কটাক্ষ করা হয়।

আদিবাসী গোষ্ঠী মানেই তারা প্রকৃতির সন্তান। তাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে অরণ্য। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার প্রথম ১৮৬৪ সালের সরকারি 'অরণ্য আইন'-এর সাহায্যে আদিবাসীদের অরণ্য থেকে উৎখাত করে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার ও সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করে। এই কারণে অনেক ঠিকাদার তাদের মুনাফা লাভের জন্য অরণ্যে আগুন লাগিয়ে ইচ্ছাকৃত দাবানলের সৃষ্টি করে আর এই জনজাতি প্রান্তিক মানুষদের জীবনে অভিশাপ নেমে আসে। সমাজ তথাকথিত যাকে ভদ্র, আধুনিক বলে চিহ্নিত করে তারা সবসময়ই চেষ্টা করে এই 'অসভ্য', 'বর্বর' মানুষদের উপর অত্যাচার করে তাদের সামান্য অধিকারটুকু ছিনিয়ে নিতে। এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানতেও পিছপা হয় না।

যেমন, মেদিনীপুর জেলার আমডাঙ্গা গ্রামের ‘জাহেরথান’ নামক যে আদিবাসীদের পীঠস্থান তা বনদপ্তর আইন দেখিয়ে দখল করে নেয়। হিন্দুদের কাছে যেমন মন্দির, মুসলিমদের কাছে যেমন মসজিদ, সেই রকমই আদিবাসীদের কাছে ‘জাহেরথান’ হল তাদের উপাসনাস্থল। আদিবাসীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূলে আঘাত হানার ফলে তারা যখনই রুখে দাঁড়াতে গেছে সরকার তাদের কঠোর হাতে দমন করেছে। আসল সত্য এটাই রাষ্ট্রীয় অরণ্যনীতির কারণে আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। আদিবাসী সমাজ বর্তমান যুগে দাঁড়িয়েও শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, জমি, বাসস্থান ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকেই বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত।

প্রত্যেক জাতিরই মৌলিক এবং শাশ্বত অধিকার তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। পূর্বে ব্রিটিশদের শোষণ-উৎপীড়ন থেকে মুক্তিলাভের জন্য আদিবাসীরা অনেক বিদ্রোহ করলেও ব্রিটিশদের কাছে তারা পরাজিত হয়। পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতবর্ষেও জাতিসমস্যার মত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় লিখিত কিছু সাংবিধানিক আইন থাকলেও তা কিছুটা ফাইলবন্দী হয়েই রয়ে গেছে। ভারতবর্ষে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবন-সংস্কৃতি সবকিছুর সঙ্গে আধুনিক সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা পরিচয় না থাকায় তাদের সঙ্গে সমাজের মূলস্রোতের একটা দূরত্ব রয়ে গেছে। যতই সমাজসেবামূলক কাজ হয়ে থাক না কেন বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের কাছে আজও অপরিচিত এই জনজাতি সমাজ।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশটি জনজাতি গোষ্ঠীর সংস্কার-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল, বলাবাহুল্য নিম্নের আলোচনা মূলত প্রাক্-গবেষণা মূলক গ্রন্থ এবং আমার সংগৃহীত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক।

১.খ। বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর পরিচয়: আদিবাসী/জনজাতি

সাঁওতাল: সাঁওতাল গোষ্ঠী অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর মুণ্ডারী শাখার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল গোষ্ঠীই আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাঁওতাল জনজাতির বাস। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলায় সাঁওতালদের জনসংখ্যা ১৬,৬৬,৬১০। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় সাঁওতালদের পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বসতি।

পশ্চিমবাংলার বাইরেও ঝাড়খণ্ড, বিহার, আসাম, উড়িষ্যাতেও এদের বসতি আছে। ভারতের বাইরে বাংলাদেশ, নেপালেও সাঁওতাল জনজাতির বসতি আছে।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, 'সামন্তপাল' কথা থেকে 'সাঁওতাল' কথাটি এসেছে (যদিও এই নিয়ে বহু তর্ক ও দ্বিমত আছে)।[১৬] সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসারে 'খেরোয়ার' জনপ্রবাহ থেকে সাঁওতাল জাতির উদ্ভব এবং সাঁওতাল, মুণ্ডারি, হো, ভূমিজ, টুড়ি, কোড়া, আসুরি এবং কোরওয়া একই ভাষার ভিন্ন রূপ।[১৭] সাঁওতালরা নিজেদের 'হড়' অর্থাৎ 'মানুষ' বলে পরিচয় দেয়। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কথ্যভাষা সাঁওতালি, তবে সাঁওতালি লেখ্য ভাষা চর্চার জন্য রোমান হরফ, অলচিকি ও বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়েও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সে সাঁওতালি ভাষায় পড়ানো হয়।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মূল জীবিকা কৃষিকাজ। শিকার করে, বনজসম্পদ সংগ্রহ করে ও তা বিক্রি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। কয়লাখনি ও বহু জায়গায় শ্রমিক হিসাবেও সাঁওতালরা কাজ করে। এছাড়া ধানকাটা বা আরও অন্যান্য কাজেও সাঁওতালরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় দিনমজুরি খাটতে যায়। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বহু সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় তারা পাল্লা দিচ্ছে। সভ্যতা ও শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছে।

সাঁওতাল জনজাতিরা মূলত বন, জঙ্গল ও নদীর কাছাকাছি উঁচু জায়গায় দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে। তাদের মূলত মাটির বাড়ি, খড়ের বা টালির ছাউনি হয়। বাড়ির দেওয়ালে এরা নিজেরাই নানা রঙের দেওয়াল চিত্র আঁকে ও খুব পরিপাটি করে রাখে। এদের গ্রামের বা বসতির বাইরে বা প্রবেশমুখে থাকে 'জাহেরথান'। সাঁওতালদের গ্রামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য স্থান হল 'মাঁঝিথান'। দেবতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মারাঙ বুরু'। এছাড়াও সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা— সূর্যদেবতা বা 'সিঞবোঙ্গা' এবং এর পাশাপাশি 'বোঙ্গাবুরু', 'ঠাকাউর জীউর', 'মড়ে কো তুরুইকো', 'জাহের এরা', 'গোঁসাই এরা', 'জমসিম বোঙ্গা', 'পরগণা বোঙ্গা', 'মাঝি হাড়াম বোঙ্গা', 'বুরু বোঙ্গা', 'বির বোঙ্গা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৮] এছাড়াও সাঁওতালদের নিজস্ব গৃহদেবতা ও পারিবারিক দেবতা আছে। অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো সাঁওতালদের মধ্যেও ভূত, ডাইনি, ওঝা এসমস্ত কুসংস্কার বিদ্যমান।

সাঁওতালদের শ্রেষ্ঠ পরব বা উৎসব– 'বাহা' পরব, আষাঢ় মাসে 'এরক্‌সিম' উৎসব, পৌষ সংক্রান্তিতে 'সাকরাত' উৎসব, মাঘ মাসে 'মাগ সিম' পরব পালন করে এবং সাঁওতালদের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব 'মাঃ মঁড়ে'।[১৯] এছাড়াও বহু পরব সাঁওতালরা পালন করে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বারোটি গোত্রে বিভক্ত— (১) কিস্কু, (২) হাঁসদা, (৩) মাণ্ডি, (৪) হেমব্রম, (৫) মুর্মু, (৬) সরেন, (৭) টুডু, (৮) চঁড়ে, (৯) বাস্কে, (১০) বেস্‌রা, (১) বেদিয়া, (১২) পাউরিয়া এবং এই প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতীক (*Totem*) এবং 'ট্যাবু' আছে। (১) কিস্কু> শঙ্খচিল, (২) হাঁসদা> হাঁস, (৩) মাণ্ডি> মেরদা খাস, (৪) হেমব্রম> সুপারি, (৫) মুর্মু> নীলগাই, (৬) সরেন> সপ্তর্ষি, (৭) চঁড়ে> গিরগিটি, (৮) বাস্কে> পান্তাভাত, (৯) বেস্‌রা> বাজপাখি, (১০) পাউরিয়া> পায়রা।[২০] প্রতিটি গোত্র তাদের পূর্বপুরুষ বা গাছপালা, পশুপাখি নামে পরিচিত। সাঁওতালদের ধর্মের নাম 'সারিধরম' বা 'সারনা ধরম'। সাঁওতালদের এই ধর্ম একেবারেই নিজস্ব ধর্ম। কিছুটা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিল রয়েছে। এদের হিন্দুধর্মের ন্যায় মূর্তিপূজা হয় না। তবে এদের যে কোন পূজায় শালগাছ অপরিহার্য। সাঁওতালদের 'করম' উৎসব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিকার সাঁওতালদের একটি ধর্মীয় অংশ। তাই বছরে একদিন সাঁওতাল যুবকরা তীরধনুক নিয়ে শিকারে যায়। এদের নিজেদের শান্তি শৃঙ্খলা ও সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব আইন, পঞ্চায়েত আছে।

সাঁওতাল সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা নেই। সাঁওতাল সমাজে বহির্গোত্রে বিবাহের প্রচলন আছে, স্বগোত্রে বিবাহের রীতি নেই। সাঁওতাল সমাজে বহু ধরনের বিবাহ প্রথা আছে- (১) কিরিঞবীহু বাপলা, (২) টুঙকি দিপিল বাপলা, (৩) অর আদের বাপলা, (৪) ঞির বল বাপলা, (৫) ইতুৎসিন্দুর বাপলা, (৬) সাঙ্গা, (৭) কিরিঞ জাঁওয়ায় বাপলা।[২১] সাঁওতালদের বিবাহে কোন পণ নেওয়ার প্রথা নেই। সাঁওতাল সমাজে বিধবা বিবাহের চল আছে। 'দেবরবরণ' অর্থাৎ স্বামী মারা গেলে দেওরকে বিবাহের রীতি এবং 'শালিবরণ' অর্থাৎ স্ত্রী মারা গেলে বউয়ের বোনকে বিবাহরীতি প্রচলিত। তবে বড়ভাই কখনো ছোটভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে না। সাঁওতাল নারীরা অন্তঃসত্ত্বা হলে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। সন্তান জন্মের সময় 'সাড়িমদাল' বা চাল পাটানো নামক এক রীতি আছে। কন্যাসন্তান হলে ঝিনুকের খোল দিয়ে এবং পুত্রসন্তান হলে তীরের ফলা দিয়ে নাভিচ্ছেদন করা হয়। পুত্রসন্তানের ছয় মাস এবং কন্যা সন্তানের সাত মাসে মুখে ভাত অনুষ্ঠান হয়। সাঁওতালরাও হিন্দুদের মত মৃতদেহ দাহ করে আবার মুসলিমদের ন্যায় কবর ও দেয়। এদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য আলাদা করে কোন শ্মশান নেই, নিজেদের

জমির উপরই দাহ অথবা কবর দেওয়া হয়। অন্যান্য সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরাই অনেকাংশে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এগিয়ে, সভ্যতা ও শিক্ষার আলোকে আলোকিত।

শবর: আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া এক গোষ্ঠী এই শবর জাতি। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর, নদিয়াতে এদের বাস। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার ও উড়িষ্যাতেও শবরদের বাস রয়েছে। এই শবর উপজাতীয় গোষ্ঠী অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর এক বিশেষ শাখা। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন শবর ভাষা 'মুণ্ডারি গোষ্ঠী'র অন্তর্গত। এরা 'সাদরি' ভাষায় কথা বলে, পাশাপাশি বাংলা, হিন্দিতেও অনেকে কথা বলে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে শবরদের জনসংখ্যা ৩৭,২৪৭।

শবরদের পূর্বপুরুষরা 'ভীল' নামে পরিচিত। প্রাচীন সাহিত্য 'চর্যাপদ'-এ এই শবরজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। শবরদের ইতিহাস খুব সুস্পষ্ট জানা না গেলেও 'চর্যাপদ' এবং ইতিহাসবিদদের নানান গবেষণার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় শবররা বর্তমানে অবহেলিত হলেও পূর্বে তাদের একটা পরিচিতি ছিল সমাজে। শবররা মূলত আধুনিক লোকালয় থেকে দূরে নিজেদের বসতি স্থাপন করে। এরা বনে-জঙ্গলে বা উঁচু টিলায় বাস করে। শবরদের পেশাও যাযাবরের মতো, তাদের জমি জায়গা সেভাবে কিছু নেই। তারা অন্যের জমিতেই বেশিরভাগ কাজ করে। এর পাশাপাশি জঙ্গলের কাঠ, মধু, বিভিন্ন বনজ সম্পদ হাটে বাজারে বিক্রি করে দৈনন্দিন জীবনযাপন করে। এরা এখনও শিক্ষার আলোয় সেভাবে আলোকিত হতে পারেনি। শবরদের খুব কম সংখ্যক ছেলে-মেয়েই শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে আধুনিক জীবনে মাথা তুলে সফল জীবনযাপনে রত। এরা এখনও সেই আগেকার দিনের মতো খরগোশ, বনশুয়োর এইসব শিকার করে, শাল পাতা বিক্রি করে দিনযাপন করে।

শবরদের মধ্যে কোন গোত্র বা জাতপাত ভেদ নেই। শবররা চারটি শাখায় বিভক্ত— ঝরা, বসু ও জয়তপতী।[২২] এদের একে অপরের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এদের সমাজে নিজস্ব কিছু আইন-পঞ্চায়েত আছে। এই পঞ্চায়েত-ই কোনো অন্যায়ের শাস্তি দেয়। এদের সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার এখনও বিদ্যমান। অন্যান্য আদিবাসীদের সাথে এদের উৎসব বা অনুষ্ঠানে কোনো পার্থক্য বিশেষভাবে নেই। শবর সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে এবং বাল্যবিবাহও আছে। শবররা তাদের মৃতদেহ দাহ করে না, কবর দেয়। এদের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। এরা হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে বর্তমানে

হিন্দু দেব-দেবীদেরই পূজা করে। এই প্রবণতা অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এরা কালী, মনসা, শীতলা পূজা করে থাকে এবং দেবতার উদ্দেশে ছাগ ও মুরগি উৎসর্গ করে। শ্রাবণমাসের পূর্ণিমার দিনটি 'গামা পূর্ণিমা' হিসাবে পালিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর জনজাতি কল্যাণ স্বার্থে নানান সরকারী কর্মসূচি গৃহীত হলেও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো শবররাও আধুনিকতা ও শিক্ষার জগৎ থেকে অনেক পিছিয়ে।

লোধা: সংস্কৃত শব্দ 'লুব্ধক' অর্থাৎ ব্যাধ, এই শব্দবন্ধ থেকেই সম্ভবত 'লোধা' শব্দটি এসেছে। অনেকে মনে করেন ১৯০১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী লোধা জনজাতি মূলত মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের বাস। তবে জীবিকার কারণে বর্তমানে লোধারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। তবে লোধারা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের 'শবর' জাতি বলেও পরিচয় দেয়। তবে অনেক নৃতাত্ত্বিকের মতে লোধা, খেড়িয়া ও শবর একই জাতি। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে লোধা জাতির মানুষদের 'জন্মদাগী', 'চোর' এই সমস্ত অপবাদ সহ্য করতে হয়েছিল বংশ পরম্পরায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মানবাধিকার কমিশন খাতায়-কলমে এই কলঙ্ক দূর করলেও বাস্তবিক জীবনে এই কলঙ্ক বহু দশক পর্যন্ত থেকে গেছিল, তার প্রমাণ সাহিত্যে প্রাপ্ত। এই লোধারা পাখি শিকার করার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পাশাপাশি দিনমজুর খাটা, অন্যের জমিতে কাজ করেও এরা জীবিকা নির্বাহ করে।

১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রায় কুড়ি হাজার লোধার বাস। এই লোধা জনজাতিও জঙ্গলের ধারে, আধুনিক সমাজ থেকে কিছুটা দূরে নিজেদের গ্রামে বাস করে। এদের রান্নার জায়গায় উনানের কাছে মাটির একটি ঢিবি করে পূর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ করার রেওয়াজ বা রীতি আছে, যার নাম 'ইসান'। এই লোধাদেরও নিজস্ব পঞ্চায়েত আছে, অন্যান্য আদিবাসীদের মতই। লোধা সমাজের পুরোহিতকে 'দেহরি' বা 'দিহরি' বলা হয়ে থাকে। এই দিহরিরাই লোধা সমাজের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ যে কোনো অনুষ্ঠানের রীতি-নিয়ম ঠিক করে। লোধা সমাজে বিবাহের সময় কন্যাপণ দেওয়ার প্রথা আছে এবং তা মেয়ের মা গ্রহণ করে। লোধা সমাজে বিবাহের কোন মন্ত্র নেই। সমাজের কেউ মারা গেলে মৃতদেহ কবর অথবা দাহ হয়ে থাকে। অন্তঃসত্ত্বা নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে মূলত কবর দেওয়া হয়।

লোধারা নয়টি গোত্রে বিভক্ত এবং তাদের নিজস্ব গোত্র-দেবতা আছে[২৩]-

গোত্র	দেবতা	গোত্র	দেবতা
কোটাল	চাঁদ এবং কচ্ছপ	মল্লিক	মকর
ভক্তা বা ভুক্তা	চিরকা আলু	পরামানিক	এক জাতীয় পাখি
নায়েক	শালগাছ	দণ্ডপাট	বাঘ
দিগার	শুশুক	আড়ি	চাঁদামাছ
ভুঁইয়া	শোলমাছ		

লোধাদের দেবতা 'বড়াম' দেবতা। এছাড়াও দেবী চণ্ডী, শীতলা, বসুমাতার পূজাও করে থাকে। লোধারা জাদুমন্ত্র, ঝাড়ফুক, তুকতাকে বিশ্বাসী। এর পাশাপাশি তাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্রে (গাছগাছালি) রয়েছে প্রখর জ্ঞান। লোধা সমাজের নিজস্ব নাচ 'চাঙ নাচ', বাদ্যযন্ত্র 'চাদু' বা 'চাঙ্গুল'। এছাড়াও ঝুমুর বা পাতা নাচও করে।

খেড়িয়া: পূর্বেই বলা হয়েছে অনেকেই লোধা, খেড়িয়া ও শবরদের একই জাতি বলে মনে করেন। এই জাতিদের বৈশিষ্ট্যও প্রায় একই। লোধাদের পাশপাশি খেড়িয়াদেরও ব্রিটিশ শাসনকালে অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হত। স্বাধীনতা পরবর্তীতে, প্রায় পাঁচ বছর পর ১৯৫২ সালে এই ভ্রান্ত ধারণা আইন করে ত্যাগ করা হয়। রাসেল সাহেবের মতে, খাড়িয়া বা খেড়িয়ারা মুণ্ডাদের জ্ঞাতি বংশধর।[২৪] খেড়িয়ারা মূলত আদি কোল গোষ্ঠীর অন্তর্গত উপজাতি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার পাশাপাশি বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তে এদের বাস। খাড়িয়ারা মূলত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত— পাহাড়ি খাড়িয়া, দুধ খাড়িয়া, ঢেলকি খাড়িয়া।[২৫] পার্বত্য অঞ্চলে বা জঙ্গলের কাছাকাছি এলাকায় এদের বসতি দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পঁচিশ হাজার খেড়িয়ার বাস। এই খেড়িয়াদের মেয়েরা পেতলের নানা অলংকার ব্যবহার করে থাকে। তবে পাহাড়ি খেড়িয়াদের তুলনায় দুধ খেড়িয়া ও ঢেলকি খেড়িয়ারা একটু উন্নত। পাহাড়ি খেড়িয়ারা এখনও শিকার করে এবং বনজ সম্পদের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। পাশাপাশি দুধ খেড়িয়া ও ঢেলকি খাড়িয়া বা বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে অনেকটা উন্নত এবং তারা নিজেরা শিকারের

পাশাপাশি চাষাবাদকেও নিজেদের জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। খেড়িয়ারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, তাদের নির্দিষ্ট ট্যাবু আছে।

পাহাড়ি খেড়িয়া[২৬]

গোত্র	**গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক**	**গোত্র**	**গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক**
গুলগু	শোলমাছ	বাদ্যা	গুল
ভুইয়া	একরকম মাছ	জোরু	ইঁদুর
টেসা	এক জাতীয় পাখি	হেমব্রম	সুপারী

দুধ খেড়িয়া[২৭]

গোত্র	**গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক**	**গোত্র**	**গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক**
কুলু	কচ্ছপ	সামাদ	তিতির পাখি
টোপো	টোপো নামের পাখি	বা	ধান
ডুংডুং	পাঁকাল মাছ	সরেং	পাথর
বিলুং	লবণ	কিরো	বাঘ

ঢেলকি খেড়িয়া[২৮]

গোত্র	**গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক**	**গোত্র**	**গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক**
চারহা	চারহা নামের পাখি	সরেন	পাথর
মুরু	কচ্ছপ	সামাদ	হরিণ
বারলিহা	বারলিহা ফল	হাঁসদা	হরিণ
মেল	গোবর		

অন্যান্য আদিবাসীদের মত খাড়িয়া বা খেড়িয়াদেরও নিজস্ব পঞ্চায়েত থাকে। এই পঞ্চায়েতেই সব সমস্যার মীমাংসা করে। অন্যান্য আদিবাসীদের মত এদেরও দত্তকপুত্র নেওয়ার রীতি আছে। খাড়িয়া সমাজে বাল্যবিবাহ নেই। বিবাহ বিচ্ছেদকে 'সাত্তরাইদোম মেলায়ানা' বলে। খাড়িয়া সমাজে তিন শ্রেণি থাকায় তাদের মধ্যে অনেক রীতি, সংস্কার ভেদ আছে। পাহাড়ি খেড়িয়াদের ক্ষেত্রে এক বৎসর পর শিশুর নামকরণ হয়। ঢেলকি বা দুধ খেড়িয়াদের একুশ দিনের মাথায় নামকরণ হয়। খাড়িয়ারা সাধারণত মৃতদেহ কবর দেয়। খেড়িয়াদের দেবতা– 'গিরিং' বা 'বেরো' দেবতা। খাড়িয়াদের বিশ্বাস সকল পাহাড়েই দেবতাদের বাস। তারা ভূত, প্রেত, মন্ত্র, কুসংস্কারেও বিশ্বাসী। খেড়িয়াদের নিজস্ব কোনো উৎসবের নাম জানা যায়নি। তবে তারা হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে মনসা পূজা, দুর্গা পূজা, এছাড়াও অন্যান্য আদিবাসীদের পরবে তারা যোগদান করে।

ভূমিজ: ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ভূমিজদের জনসংখ্যা– ২,৩৩,৯০৬। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, বর্ধমানে এদের বাস। এর পাশাপাশি রাঁচি, ধানবাদ জেলাতেও তাদের বসতি রয়েছে। এককালে মুণ্ডারী ভাষা গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল ভূমিজ, কিন্তু বর্তমানে নিজেদের ঐতিহ্য, ভাষা তারা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। আদিবাসী প্রধান গ্রামেই ভূমিজদের বাস। ভূমিজরা মূলত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এর পাশাপাশি তারা শিকার করা, জাল বোনা, মজদুরি করেও সংসার চালায়। ভূমিজদের মধ্যেও গোত্রভাগ ও সেই গোত্রের টোটেম আছে-

> *Name of section & Totem- salrisi> sal fish, hansda> wild goose, leng> mushroom, sandilya> a bird, hemrom> betel palm, tumarung> pumpkin, nag> snake।*[২৯]

ভূমিজ সমাজেও নিজস্ব পঞ্চায়েত, রীতিনীতি, বিধি-নিষেধ আছে। ভূমিজ সমাজে মৃতদেহ দাহ করা হয়। ভূমিজরা অধিকাংশই হিন্দুধর্ম মেনে চলে। তবে এখনো তারা 'সিংবোঙা'র (সূর্যদেবতা) পূজা করে। ভূমিজরা বর্তমানে হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে তাদের আপন সমাজ-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য হারিয়ে হিন্দু মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। তারা অনেকেই নিজেদের আদিবাসী বলতে দ্বিধা বোধ করে। তাই তাদের নিজ মাতৃভাষা, ধর্ম প্রায় বিলুপ্তর পথে। 'সরাহুল' ভূমিজদের সবচেয়ে বড় উৎসব যা বৈশাখে পালিত হয়।

আগেই বলেছি ভূমিজরা অনেকাংশে হিন্দু মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ায় তাদের সমাজে, রীতিনীতিতে হিন্দুদের ছায়া লক্ষণীয়।

মুণ্ডা: ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মুণ্ডাদের জনসংখ্যা ২,৩০,০১৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় বেশিরভাগ জেলাতেই এদের বাস। মুণ্ডা শব্দটি সম্ভবত 'মুণ্ড' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'মাথা'।[৩০] সাধারণত গ্রামের মাথা অর্থাৎ গ্রামপ্রধান বা চলতি ভাষায় গ্রামপ্রধানকে বলা হয়। সমাজের নেতৃস্থানীয় মোড়লকেই মুণ্ডা বলা হত আদিবাসী সম্প্রদায়ে, ক্রমে সমগ্র গোষ্ঠীই মুণ্ডা নামে পরিচিত হয়। মুণ্ডারা তবে নিজেদের 'হোরো-কো' (অর্ধ-মানুষ) বলে পরিচয় দেয়।

নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের (১৮৭১-১৯৪২) বিবরণে পাওয়া যায় যে, মুণ্ডারা প্রথম উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস করত।[৩১] আর্যদের প্রবেশের পর ভারতের এই অন্যতম আদিবাসিন্দা অনার্যরা আজমগড়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে বেশিদিন আর থাকতে পারেনি। আজমগড় ছেড়ে তারা ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রবেশ করে। এই অঞ্চলটি ছিল পাহাড় ঘেরা ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। তারা জঙ্গল কেটে প্রথমে বসতি স্থাপন করত এবং তারাই সমবেতভাবে সেই জমির মালিকানা স্বত্বও ভোগ করত। তাদের বলা হত খুঁট কাট্টিদার। খুঁট কাট্টিদাররা সবাই মিলে পরিবারের ব্যবহারের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিত। এভাবেই ছোটনাগপুরের অরণ্য অঞ্চলে এখানে ওখানে খুঁটকাটতি প্রথা অনুসারে মুণ্ডা গ্রাম গড়ে ওঠে। আবার কয়েকটি মুণ্ডা গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে পট্টি এবং এই পট্টি প্রধানকে বলা হয় 'মানকি'। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডা জনজাতি, যাদের মূল বৃত্তি শিকার, পশুপালন, চাষ-বাস। মুণ্ডাদের অনেকেই সাদরি ভাষায় কথা বলে। তবে বাঙালিদের সংস্পর্শে থেকে থেকে অনেকেই বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। মুণ্ডারা ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল, রাঁচী, পালমৌ, সিংভূম, হারাজীবাগ, পূর্ণিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদের বসবাস। মুণ্ডাদের নিজস্ব অনেক রীতি-নীতি, আচার-নিয়ম আছে। তাদের বাড়িতে তুলসীতলা দেখা যায় এবং গ্রামের একটা পরিষ্কার জায়গা থাকে, যাকে 'সারনা' বলা হয়, এখানে পূজাপার্বণ করা হয় এবং অনুষ্ঠানে নাচগানের জন্য আখড়া বানানো হয়। মুণ্ডাদের মৃতদেহ দাহ করা হয় এবং প্রত্যেক গোত্রের তাদের আলাদা শশ্মান থাকে। মুণ্ডাগ্রামে অবিবাহিত ছেলেদের রাত্রে থাকার জন্য 'ঘুমঘর' বা 'গিতি-ওড়া' থাকে।

মুণ্ডা পুরুষরা পাঁচ-ছয় হাত লম্বা গামছা পরিধান করে, যা ‘বতই’ নামে পরিচিত এবং মেয়েদের কাপড়ের নাম ‘লাহাঙ্গা’ ও ‘পারিয়া’। আদিবাসীদের নিজস্ব পোশাক-পরিধান আছে, যা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের নারীদের শাড়ি পরিধান করার ধরন অনেক আলাদা, এছাড়া পুরুষরাও ধুতি পড়ে অনেকেই। এছাড়া আদিবাসী নারীরা যে ধরনের শাড়ি পড়ে তা মোটা সুতোর বোনা হয়। আদিবাসী নারীরা বাজু, বালা, চুড়ি, পায়ে নূপুর পরতে ভালোবাসে। এছাড়া তারা নানান বন্য ফুলে নিজেদেরকে সজ্জিত করতে ব্যবহার করে। মুণ্ডা সমাজে উলকির প্রচলন আছে, যা অনার্য সভ্যতার এক অন্যতম সংস্কৃতির অঙ্গ। বর্তমানেও ভারতবর্ষের নানান আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে শরীরে উল্কি আঁকার প্রবণতা বিদ্যমান।

রিজলি সাহেব (১৮৫১-১৯১১) তিন’শ চল্লিশটি মুণ্ডা গোত্রের কথা বলেছেন। মুণ্ডাদের পুরোহিতকে ‘পাহান’ বলা হয়। মুণ্ডা নারী অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন ‘গরাসি বোঙ্গা’র কাছে মুরগি মানত করা হয় ভবিষ্যত সন্তানের কল্যাণার্থে। মুণ্ডা সমাজে কখনো এক গোত্রে বিবাহ হয় না। মুণ্ডা সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে নানান রীতি প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি হল বিবাহের পাকা কথা হয়ে গেলে কনের বাড়িতে ‘দা আড়গু’ নামে এক অনুষ্ঠান হয়। মুণ্ডাদের সর্বপ্রধান দেবতা হলেন ‘সিংবোঙ্গা’, এছাড়াও ‘জাহের বুড়ি’, ‘চণ্ডী বোঙ্গা’, ‘বুরু বোঙ্গা’, ‘ইকিড় বোঙ্গা’, ‘নাকাএরা’ প্রভৃতি দেব-দেবতার নাম পাওয়া যায়। পাশাপাশি মুণ্ডা পরিবারের নিজস্ব গৃহদেবতাকে ‘ওড়াবোঙ্গা’ বলা হয়। অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় মুণ্ডাদেরও বিভিন্ন পরব আছে, যেমন- ‘মাগে পরব’, ‘সারহুল পরব’, ‘সহরায় পরব’, ‘করম পরব’, ‘কাদলেতা পরব’ প্রভৃতি। মুণ্ডারা নারী-পুরুষ একত্রে জমিতে চাষ করলেও নারীরা কখনো লাঙল স্পর্শ করে না। তবে বর্তমানে বেশ কিছু সংখ্যক মুণ্ডা আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে অন্যান্য পেশাতেও নিযুক্ত হচ্ছে।

ওঁরাও: ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ওঁরাও-দের পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা ছিল ২,৯৭,৩৭৪।[৩২] **১৯৮১** সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ৪,৩৭,৫৭৪ জন। জনসংখ্যার নিরিখে সাঁওতালদের পর এরাজ্যে ওঁরাওদের অবস্থান। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ওঁরাও উপজাতি। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের মতে ওঁরাওদের ভাষা ‘কুরখ’, তার সঙ্গে তামিল ভাষার মিল পাওয়া যায়।

পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়িতে ওঁরাওদের বাস বেশি। এছাড়াও কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মালদহ, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, নদিয়া, ২৪ পরগনা, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুরে এদের আদিবাস বলে মনে করা হয়। অনেকেই মনে করে ওঁরাওদের আদি বাসস্থান ভারতের পশ্চিমে গুজরাট অঞ্চলে, আবার

অনেকেই মনে করেন কোঙ্কণে। সেই কারণে ওঁরাওদের 'কাউঙ্কন' বলা হয়।[৩৩] এরা দেশান্তরী হয়ে ছোটনাগপুরে এসে ওঁরাও উপনামে পরিচিত হয় বলে অনেকের অভিমত।

পূর্বেই বলা হয়েছে ওঁরাওদের ভাষা কুড়ুখ ভাষা বা 'কুড়ুখ কাত্থা', এই কুড়ুখ ভাষার সৃষ্ট লিপিমালা 'তোলোং সিকি' নামে পরিচিত।[৩৪] **১৯৯৯** সালে এই লিপিমালার উদ্ভাবন ডা. নারায়ণ ওঁরাও, যা ওঁরাওদের সমাজ জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ওঁরাওদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এছাড়াও বর্তমানে জলপাইগুড়িতে চা-বাগানের শ্রমিক হিসেবে ওঁরাওদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। এই ওঁরাও শ্রমিকরা তাদের মাতৃভাষা ক্রমশ ভুলে গিয়ে সাদরি ভাষা ও বাঙালিদের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছে। এছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলেও ওঁরাওদের বাস দেখা যায়। সাঁওতাল-মুণ্ডা বা অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় তাদের মাটির ঘরের দেওয়াল আর খড় বা ছাপরার ছাউনি। ওঁরাও গ্রামে অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের জন্য 'ধুমকুড়িঅ' বা 'ধুমকুড়িয়া' বা 'মজলিসী' ঘর থাকত। ছেলেদের ঘরটিকে বা ধুমকুড়িয়াটিকে বলা হত 'জোংঘ-এর্পা' এবং মেয়েদেরটিকে 'পেল-এর্পা' বলা হয়। এই ঘরগুলির তত্ত্বাবধানে থাকে ওঁরাওদের বর্ষীয়ান মহিলা।

ওঁরাও পুরুষদের পোশাক– গামছা, ধুতি। মহিলারা মোটা তাঁতের শাড়ি পরিধান করে। এদের মধ্যে পেতল বা রূপোর গয়নার প্রচলন বেশি। ওঁরাও-রা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত এবং সমস্ত গোত্র সমান, এক্ষেত্রে কোনো উঁচু-নিচু বিচার নেই। ওঁরাও-রা তাদের গোত্রীয় ধর্মের প্রতীক বা টোটেমকে খুবই পবিত্র মনে করে। ওঁরাওদের অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর ন্যায় নিজস্ব পঞ্চায়েত আছে। পূর্বে দশ-বারোটা গ্রাম নিয়ে হত 'পারহা', আর এই পারহার প্রধানকে 'পারহারাজা' বলা হয় এবং পারহার অধীনস্ত গ্রামকে প্রজাগ্রাম বলা হয়। পারহা পঞ্চায়েতের ভার থাকত যার উপর থাকে 'মাহাতো' বলা হয়। ওঁরাওদের পুরোহিত 'পাহান' আমে পরিচিত। ওঁরাও সমাজে মুণ্ডা সমাজের ন্যায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত এবং এদের অসবর্ণ ও স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় ওঁরাওদের মধ্যেও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নিয়ে নানান সংস্কার বিদ্যমান। ওঁরাও সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়, আবার অনেকক্ষেত্রে দাহও করা হয়।

অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় ওঁরাওদের নিজস্ব কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান আছে। ওঁরাওদের 'সারহুল' উৎসব সবচেয়ে বড় উৎসব। মার্চ-এপ্রিল মাসে এই উৎসব পালিত হয়। এছাড়াও করম উৎসব, সহ্‌রাই,

টুসু, জানি, হোলি— এইসব উৎসব পালন করে থাকে। ওঁরাওদের মধ্যে যখন কোন গ্রাম থেকে কেউ বনে শিকারে যায় তখন তারা কেউই পাখি বধ করে না। ওঁরাওদের প্রধান দেবতা 'ধরমেশ', এছাড়াও ওঁরাও-রা সূর্যদেবতার পূজা করে থাকে। সাদা মোরগ কল্যাণার্থে উৎসর্গ করার রেওয়াজ আছে। এছাড়া ওঁরাও-রা 'চণ্ডী'-র পূজা করে। এদের মধ্যেও উলকি করার চল আছে।

তবে আধুনিক সভ্য সমাজের নিরিখে ওঁরাওদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষণীয়। বর্তমানে নারী-পুরুষ শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক উন্নতি লাভ করে, বিভিন্ন অফিস-আদালতে নিজেদের স্থান এরা করে নিতে পেরেছে।

বেদিয়া: বেদিয়া গোষ্ঠী ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর শাখা। প্রদ্যোত ঘোষের মতে- 'চম্পাতে পরিত্যক্ত সাঁওতালদের দ্বাদশতম গোষ্ঠী এই বেদিয়া'।[৩৫] ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বেদিয়া জনসংখ্যা ২৯,৩৯৬। বেদিয়াদের ভাষা 'সাদরি' ভাষা। পুরুলিয়া, নদিয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এদের বাস।

বেদিয়াদের রিজলি সাহেব মনে করতেন তারা সাঁওতালদেরই একটি শাখা। এছাড়াও অনেকেই বেদিয়াদের হিন্দু বলেও মনে করে। বেদিয়ারা নিজেদের মাঝি বা 'মহালী' বলে পরিচয় দেয় এবং ডালটন বেদিয়াদের 'বাজীগর/বাজীকর' অথবা 'নাট' সম্প্রদায়ভুক্ত বলেছেন।[৩৬] বেদিয়ারা মূলত যাযাবর শ্রেণির। তারা তুকতাক, ভিক্ষাবৃত্তি, বানর মারা, পাখি মারা, সাপখেলা দেখানো, সাপ ধরা, ওঝাবৃত্তি এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত। এরা অনেকে জাদুবিদ্যা আয়ত্ত করে।

বেদিয়াদের সাতটি উপশ্রেণি আছে— ১) বাবাজিয়া, লাভা, ২) বাজীগর, ৩) মাল, ৪) সাপুড়িয়া, ৫) মীর শিকার, ৬) সান্দার, ৭) বেদিয়া।[৩৭] এই শ্রেণিবিভাগ পেশাগত। বেদিয়াদের মধ্যে শিক্ষার হার ভীষণ কম এবং এদের মধ্যে কুসংস্কার অনেক বেশি। তবে বর্তমানে অনেক বেদিয়াই যাযাবর জীবন ত্যাগ করে কৃষি কাজকেই বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়ে স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস করছে।

অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় বেদিয়াদেরও নিজস্ব ছড়া, গান, নাচ আছে। ঝুমুর, টুসু, জাওয়া গীত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। বেদিয়াদের মধ্যে মৃতদেহ কবর ও দাহ দুই রীতিই প্রচলিত। এরা ঝাড়ফুঁক,

তন্ত্রমন্ত্রে খুব বিশ্বাসী। বেদিয়াদের মধ্যে মনসা পূজার চল বর্তমান। এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিমের মিশ্র সংস্কৃতি বিদ্যমান ।

হো: **১৯৮১** সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে হো জনজাতির জনসংখ্যা ৩,২০২। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'হো' গোষ্ঠী। অনেক গবেষকই হো-দের মুণ্ডা জাতির শাখা বলে মনে করেন। হো জনজাতির আদিবাস ছোটনাগপুর অঞ্চলে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এদের বাস। নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন, হো উপজাতির সঙ্গে আর্য রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। হো-রা বর্তমানে বাঙালিদের সংস্পর্শে এসে তারা অনেকেই নিজেদের ভাষার পাশাপাশি বাংলা-হিন্দি ভাষাতেও পারদর্শী হয়ে উঠছে।

পাহাড়ের গায়ে কিংবা জঙ্গলপ্রান্তে হো'দের গ্রাম। এক-একটি গ্রামে দু-তিনটি পাড়া বা 'টোলা' থাকে। সন্ধ্যায় নাচ-গান-গল্প-আড্ডায় নিজেরা মেতে ওঠার জন্যই গ্রামের মাঝে একটা জায়গা থাকে, যাকে 'আখড়া' বলা হয়। গ্রামের একপ্রান্তে থাকে 'জাহেরা', এখানে দেবতাদের উদ্দেশে পূজা করা হয়। হো-দের মধ্যে অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় 'পচাই' বা 'হাঁড়িয়া' তৈরি এবং খাওয়ার চল আছে। হো-দের বর্তমান প্রজন্ম কৃষিকাজ, ক্ষেত-মজুরি করছে, তবে তাদের প্রধান জীবিকা ছিল শিকার। তবে বর্তমানে অনেকেই শ্রমিকের কাজও করছে। হো-দের মধ্যে উল্‌কির প্রচলন আছে।

হো-রাও বিভিন্ন 'কিলি' বা গোত্রে বিভক্ত। নিজ গোত্রের ধর্মীয় প্রতীককে তারা খুবই পবিত্র মনে করে এবং তারা এই 'টোটেম' বা ধর্মীয় প্রতীক যেগুলো কোনো নামধারী জীবজন্তু বা গাছপালার নামে নামাঙ্কিত, তাদের কোনো ক্ষতি করে না। হো সমাজের মোড়লকে বলা হয় 'মুণ্ডা'। এই মোড়লরা ও গ্রামের কিছু সদস্য মিলে গ্রামে কোনো সমস্যা হলে তার সমাধান করে। 'হো'-দের পুরোহিতকে 'দিউরি' বলা হয়। এরা বংশানুক্রমিকভাবে নিযুক্ত থাকে। হো-দের আদিধর্ম 'সর্বপ্রাণবাদ'। 'সিংবোঙ্গা' বা সূর্যদেবতা হো-দের প্রধান দেবতা। এছাড়াও 'মারাং বোঙ্গা' (পাহাড়-পর্বতের দেবতা), 'নাগেএরা' (ঝরণার দেবতা), 'পাউড়ি চুরদু বোঙ্গা' (গভীর জলাশয়ের দেবতা), 'ইকির বোঙ্গা' (নদী-দেবতা), 'সাঙ্গার বোঙ্গা' (শিকারের দেবতা), 'সনা চুরদু বোঙ্গা' (ধান দেবতা), 'জিদবোঙ্গা', 'কুমবু বোঙ্গা', 'হাংকার বোঙ্গা' ইত্যাদি দেবতা হো-সমাজে পূজিত।[৩৮] হো-রাও ভূত-প্রেত, যুগিনী, জাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী।

হো-জনজাতির জন্ম-মৃত্যু-বিরহ নিয়ে নানান সংস্কার দেখা যায়। শিশু জন্মের সময় 'ঘাসী' সম্প্রদায়ের মেয়েরা ধাই-মা'র কাজ করে এবং অন্তঃসত্ত্বাকালীন হবু মায়েরা হাঁড়িয়া তৈরি করে না। হো সমাজে শুভকাজে মোরগ ও হাঁড়িয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করার রেওয়াজ আছে। একই গোত্রে ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন নেই। তবে বড়ভাই মারা গেলে ছোটভাই বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। হো সমাজে চার ধরনের বিবাহের প্রচলন আছে- 'আন্দিবিবাহ', 'রাজখুসী বিবাহ', 'আনাদের বিবাহ', 'অপরতাপি বিবাহ'।[৩৯] হো সমাজে মৃতদেহ দাহ করা হয়। হো-সমাজে মৃতদেহ সৎকারে মেয়েরা বিশেষভাবে অংশ নেয়, যা অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ে বিশেষ দেখা যায়না। বলা যেতে পারে এই রীতি বা সংস্কারটি হো জাতির একেবারে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। চিতায় আগুন দেয় স্ত্রী, বোন কিংবা অবিবাহিতা কন্যা।

হো-দের 'পৌষ পরব', 'জমনামা', 'মাঘে পরব', 'বাহা পরব', 'বাতাউলি উৎসব', 'কোলোম-বোঙ্গা' উৎসব গুরুত্বপূর্ণ। হো জাতি সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী, তারা বিশ্বাস করে প্রকৃতির সবকিছুর অন্যান্য দেবতার এবং অপদেবতার অস্তিত্ব বর্তমান। তাদের দেবতাদের প্রতি যেমন রয়েছে গভীর বিশ্বাস, তেমনি অপদেবতাদের প্রতিও তাদের বিশ্বাস, নানান সংস্কার রয়েছে।

কোড়া: দ্রাবিড়ীয় অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত মুন্ডাদের এক বিচ্ছিন্ন শাখা এই আদি অষ্ট্রাল শ্রেণির আদিবাসী 'কোড়া' বা 'কাওরা' জাতি। এই কোড়া জাতির মানুষ মাটি কাটার কাজ বা দিনমজুরী, ক্ষেতমজুর হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে। সাঁওতালি ভাষায় 'কোড়া' শব্দের অর্থ 'ছোট'। সম্ভবত এরা নিজেদের জমি হারিয়ে পেশাগত কারণ বা অন্য আরও কোনো কারণ থাকতে পারে। যে কারণেই হোক এরা মুন্ডা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সাঁওতালরা বা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এদের 'পতিত' বা সমাজের চোখে যারা ছোট সেই হিসাবে 'কোড়া' বলত।

১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে কোড়াদের জনসংখ্যা ৯৬,৮৩৫। কোড়া জনজাতির আদিনিবাস সম্পর্কীয় সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, তবে এদের নিয়ে নানা কিংবদন্তী গল্প বা কাহিনী আছে। কোড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাগ দেখা যায়— 'ধলো', 'মালো', 'শিখরিয়া', 'সোনারেখা', 'বাদামিয়া'।[৪০] আবার শিখারিয়াদেরও ভাগ আছে, 'ঝোটয়া', 'গুড়ি', 'বাওড়া'। রিজলি সাহেবের মতে ধলভূম থেকে আগতরা ধলো, মানভূম থেকে যারা আগত তারা মালো, আর যারা শিকার অঞ্চল থেকে আগত তারা শিখরিয়া,

সুবর্ণরেখা নদীর পাশাপাশি থেকে যারা আগত তারা সোনারেখা নামে পরিচিত। তবে আদিনিবাস সম্পর্কীয় সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও মনে করা হয় তারা ছোটনাগপুর, তারপর সেখান থেকে ধলভূম, মানভূম, হাজারীবাগ এই সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে এদের বেশ কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। কোড়া জনজাতির মানুষদের পেশা কৃষিকাজ এবং মাটিকাটা, শিকার দিনমজুরী করা। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের ন্যায় এরাও দারিদ্র্য জর্জরিত জীবনযাপন করে। তবে বর্তমানে অনেকটাই এরা মূল সমাজের সংস্পর্শে এসেছে।

অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় কোড়া জনজাতি নানা গোত্রে বিভক্ত এবং প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতীক আছে। গোত্র এবং গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক: চিড়ু> কাঠবিড়াল, বুৎকু বা সুয়ের> শুয়োর, কাছুয়া> কচ্ছপ, সানদোয়ার> ঢেঁকির রং, ছাগের> ছাগল, হুরদুয়ার> হলুদ, তামগেঁড়িয়া> তামা, সমর> শোলমাছ।[৪১] মালদা জেলার কোরা সমাজ কতকগুলি গোত্র অবলম্বনে গঠিত, যা 'পারিস' নামে অভিহিত আদিবাসী ভাষায়। এই সমাজ পরিচালনার মূল দায়িত্ব থাকে চারজন মহৎ বা সদস্য- গড়েৎ, পরামানিক, মাহাত এবং আইনি মোড়ল। এর পাশাপাশি এই কোড়া সমাজের বিবাদ বা নানান কিছু সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ও নিয়মকানুন থাকে। এটা পুরুষতান্ত্রিক, এক্ষেত্রে মেয়েরা থাকে না। এই সমাজ পরিচালনায় যে চার মহৎ থাকে তারাই পঞ্চায়েতেরও প্রধান।

কোড়া জনজাতি মনে করে প্রকৃতির সব বস্তুর অন্তরালে দেবদেবী রয়েছেন। সেই কারণেই বৈশাখ মাসের নির্দিষ্ট সময়ে তারা এই সব দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেয় যা 'সওয়া লাখ কা পূজা' নামে খ্যাত। এছাড়া তাদের প্রধান তিনটি উৎসব- ভাদ্রমাসে করম পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, মাঘ মাসে সহরায়। কোড়াদের গ্রাম্য দেবতা হল গরাম ঠাকুর এবং বনজঙ্গলের দেবতা বাগেশ্বর। এছাড়া হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকায় তাদের মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্ত নির্ভর সম্প্রদায়ই বিদ্যমান। এছাড়াও শিব, মনসা, শীতলা, কালী এই সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর পূজাও কোড়ারাও করে। এদের বাড়িতে তুলসী মঞ্চ থাকে। কোড়ারা যেমন দেবদেবীতে বিশ্বাসী তেমনই এরা ভুতপ্রেত, জাদুমন্ত্রে, তুকতাকে কুসংস্কারেও বিশ্বাসী এবং নানান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের চল ভীষণভাবে রয়েছে। কোড়া সমাজে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা চালু আছে। কোড়াদের বিবাহে কন্যাপণ আছে ও বিবাহের আলোচনার মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে একজন 'আগনা' ব্যবস্থা

থাকে। কোড়াদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। কোড়া জনজাতির বিবাহের ক্ষেত্রে স্বগোত্র বিবাহ হয় না তবে মাতৃগোত্রে তিন পুরুষ বাদে বিবাহরীতি প্রচলিত।

১৯৫৬ সালে কোড়াদের আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৯২ শতাংশই নিরক্ষর। তবে বর্তমানে আধুনিক সমাজের সংস্পর্শে এসে কিছুটা শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে কোড়া সমাজে।

মাহালি: ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মাহালিদের জনসংখ্যা ৬১,১১৫। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই এই মাহালি জনজাতির বাস, বিশেষত পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি এবং মেদিনীপুরে এদের বাস বেশি। রিজলি সাহেব মনে করতেন কোন কারণবশত মাহালিরা সাঁওতাল গোষ্ঠীরই এক বিচ্ছিন্ন শাখায় পরিণত হয়েছে এবং ক্রমশ পৃথক আদিবাসী পরিবার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। মাহালি জনজাতি পাঁচভাগে বিভক্ত— 'বাঁশফোড় মাহালি', 'পাটর মাহালি', 'সুলংকি মাহালি', 'মাহালি মুন্ডা' ও 'তাঁতি মাহালি'।[৪২] এছাড়াও ওঁরাও মাহালি ও কোল মাহালিও আছে। বাঁশফোড় মাহালিদের জীবিকা সবরকম বাঁশের সরঞ্জাম নির্মাণ। পাটর মাহালিরা মূলত ঝুড়ি নির্মাতা ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সুলুংকি মাহালিরা মূলত দিনমজুর ও কৃষিকাজই করে এবং তাঁতি মাহালি তাদের পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল পালকি বওয়ার কাজ অর্থাৎ তারা ছিল পালকি-বেহারা। মাহালি মন্ডারা বাঁশের বেতের কাজ করত। এরা মুন্ডাদের বিচ্ছিন্ন শাখা হিসাবে বলা হয়। জীবিকার বৈচিত্র্যের কারণেই বোধহয় তারা তাদের মূল সমাজ বা গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলেই ধারণা করা হয়।

মাহালিরা মুন্ডারী ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে না। হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে তারা বাংলাতেই কথা বলে। পুরুলিয়া বা মানভূমের লোক যে বাংলা ভাষায় কথা বলে তাকে মানভূমি বাংলা বলা হয়। মাহালিরাও সেই মানভূমি বাংলাতেও কথা বলত। মাহালিরা নিজস্ব গ্রাম পত্তন করেনা, এরা সাঁওতালদের সাথেই একই গ্রামে মিলেমিশে থাকে। কিন্তু সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষদের বাড়ি অনেক পরিস্কার এবং দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন থাকে কিন্তু মাহালিদের বাড়ির দেওয়ালে কোনো চিত্রাঙ্কন থাকে না। তাদের বাড়ি ঘর খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয় না। অন্যান্য আদিবাসীদের বাড়ির ন্যায় মাহালিদেরও মাটির বাড়িই হয়। মাহালি জনজাতির পুরুষরা পোশাক হিসাবে গামছা, ধুতির ব্যবহারই

বেশি করে আর মহিলারা মোটা সুতির শাড়ি। মাহালি জনসমাজে উলকি করার প্রচলন আছে। ওদের ভাষায় উলকিকে ‘গোদনা’ বলে। ছেলেরা বাঁ হাতে এবং মেয়েদের বুকে উলকি থাকে।

মাহালিরা ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর ন্যায় নানান গোত্রে বিভক্ত এবং তাদেরও নানান গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতীক আছে। রিজলি সাহেবের মতে মাহালিদের গোত্র ও গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক –

Name of section & Totem- Dungri- Dumur fig, Turu- Turu grass, kanti- Ear of any animal, Hansda- Wild goose, Murmu- Nilgai.[৪৩]

উক্ত বিভিন্ন গোত্রের নিয়ম, রীতি আলাদা। মাহালি সমাজে শিশু জন্মানোর পর পাঁচদিন অশৌচ পালন করা হয়। মাহালি সমাজে বাল্যবিবাহ নেই। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় কন্যাপণ প্রথা আছে। মাহালি সমাজে মৃতদেহ কবরও দেওয়া হয় আবার দাহও করা হয়। মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোত্রের নিয়ম ভিন্ন। উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাহালিরা সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাওদের সমস্ত উৎসব পালন করে। তবে মাহালিরা সূর্যদেবতার উপাসক। বৈশাখ মাসে ‘সিঞ বোঙা’ (সূর্যদেবতা)-র উদ্দেশে পাঁঠা, মুরগি, পায়রা উৎসর্গ করে। মাহালি পরিবারে গৃহদেবতা হিসাবে ‘অড়াঃ বোঙ্গা’-কে পূজা করা হয়, পাশাপাশি ‘ধরমদেবতা’, ‘গরাম ঠাকুর’ ও মনসাদেবীরও পূজা করা হয়। এছাড়াও ‘দশালী পূজা’ ও ‘ফেঙ্গুয়া পরব’ (হোলি) পালন করা হয়। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় এরা নবমীতে দেবীর উদ্দেশে পাঁঠা কিংবা পায়রা উৎসর্গ করে। ঝুমুর নাচ-গান প্রচলিত মাহালি সমাজে। কালী পূজার সময় মাহালিরা ‘গোরেয়া’ বা ‘গবরা’ পূজা করে। এছাড়া ‘টুসু পরব’, ‘মাগ্‌সিম পূজা’ ও ‘সারহুল’ উৎসব মাহালি জনজাতির মধ্যে প্রচলিত।

মাহালিদের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় দারিদ্র্যপূর্ণ। তারা হস্তশিল্প অর্থাৎ বাঁশ, বেতের শিল্পে নিযুক্ত হওয়ায় বর্তমান সমাজে এই হস্তশিল্পের চাহিদা পূর্বের তুলনায় সামান্য হলেও বেড়েছে, সেই কারণেই মাহালি জনজাতির জীবনে কিছুটা হলেও আলো প্রবেশ করেছে।

বিরহোড়/ বিরহড়: ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বিরহড়দের জনসংখ্যা ৬৫৮। বিরহড়রা জনজাতি বেদিয়া জাতির মতো যাযাবর মনোবৃত্তির। এই কারণেই এদের সঠিক জনসংখ্যা পাওয়া যায় না এবং এরা সংখ্যায় অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় নিতান্তই কম। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, সিংভূম, উড়িষ্যায়

এদের বসতি যাযাবর মনোবৃত্তি হলেও সরকারি উদ্যোগে বাগমুন্ডি থানায় 'ভূপতিপল্লী' নামক স্থানে স্থায়ী বাসের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

অস্ট্রো-এশিয়া গোষ্ঠীর মুন্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিরহড় জনজাতি। বিরহড় জনসমাজের মানুষরা সাঁওতালী, মুন্ডারী, বাংলা ও হিন্দি ভাষাতে কথা বলে। যাযাবর হওয়ায় এরা বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে থাকায় নিজেদের আদিবাসী ভাষা ব্যতীত বাংলা, হিন্দি এই সমস্ত ভাষাকে তারা আপন করে নিয়েছে। বিরহড়রা মুন্ডাদের শাখা অথবা মুন্ডারা বিরহড়দের শাখা এই নিয়ে দ্বিমত আছে। বিরহড়দের আদি বাসস্থান ছোটনাগপুর। বিরহড়রা মূলত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত— 'উথলু' বা 'ভুলিয়া' এবং 'জাঘি' বা 'থানিয়া'।[৪৪] 'উথলু' বা 'ভুলিয়া' গোষ্ঠী মূলত যাযাবর শ্রেণির এবং তারা মূলত শিকার ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং 'জাঘি' বা 'থানিয়া' গোষ্ঠী স্থায়ী বসবাসে বিশ্বাসী মনোভাবপন্ন। এদের জীবিকা মূলত কৃষিকাজ ও পশুপালন।

বিরহড়দের পাহাড়ের তলে বা জঙ্গলে পাতা দিয়ে বানানো কুটিরকে 'কুম্ব' বলা হয় এবং বসতিটিকে 'টান্ডা' বলা হয়। 'গিতিওড়া' নামে অবিবাহিত ছেলেদের জন্য একটি ঘর বা কুটির কোনো কোনো বসতিতে থাকে। বিরহড়দের বসতির পাশে তাদের শিকার দেবতার থান থাকে যাকে তাদের ভাষায় বলে 'জিলুজায়ার', 'সেন্দ্রা বোঙ্গা'। বিরহড় জনজাতির মেয়েরা পাতার অলংকার খুব ব্যবহার করে। বিরহড় জনজাতিও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত— হেমব্রম, ইন্দুয়ার, লাথা, মুরমু, মারান্ডি ইত্যাদি।[৪৫] বিরহড়দের জনসমাজের গোষ্ঠী প্রধানকে 'নায়া' বলা হয়। ওঝাদের বলা হয় 'মাটি'। বিরহড়রা ডাইনি বিদ্যা, জাদুমন্ত্রে প্রবল বিশ্বাসী। বিরহড়দের জন্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে সন্তান জন্মের পর 'শাঠিয়ারি' অনুষ্ঠান হয়। বিরহড়দের বিবাহ পাঁচ রকমের হয়— ১। সদর বাপলা, ২। উড়াউড়ি বাপলা, ৩। গোলামী ঘেটে বাপলা, ৪। বোলো বাপলা, ৫। অপরতাপ্পি বাপলা।[৪৬] বিরহড়রা মৃতদেহ দাহ করে না, কবর দেয়। মৃতদেহের আত্মার শান্তির জন্য 'উমলু আদের' নামে অনুষ্ঠান করা হয়। বিরহড় জনসমাজে আলাদা গোত্রের আলাদা আলাদা বোঙ্গার বা দেবতার পূজা করা হয়। তবে মূলত 'সিংবোঙ্গা' বা সূর্যদেবতার পূজা বিরহড় জনসমাজের সকল গোত্রের মানুষই করে। সিংবোঙ্গা ছাড়া 'চাউরাশি বোঙ্গা', 'সেন্দরা বোঙ্গা' (দেবীচণ্ডী), 'বনলুমাই', 'কুন্দ্রিবোঙ্গা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। করমপরব পালন করা হয় বিরহড় জনসমাজে। এছাড়াও 'সস বোঙ্গা' পরব, 'সোহরায়', 'সরহুল' উৎসবও পালন করা হয়। হনুমান শিকার বা 'গরি সেন্দ্রা'

বিরহড় জনসমাজে একটি বড় উৎসব। উৎসবে এরা অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় মাদল, ধামসা এসব তাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

অসুর: ১৯৭১ সালে আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে অসুরদের জনসংখ্যা মাত্র ৬১১, ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিবঙ্গে অসুর জনজাতির জনসংখ্যা ৪২৮৬ এবং ১৯৯১ সালে ৪৯৬৮।[৪৭] অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত এই অসুর জনজাতি নিয়ে নানান মত, নানান তথ্য, ইতিহাসে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে 'অসুর' শব্দটি পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত বা প্রথম সারির দেবতাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। ঋগ্বেদের পরবর্তী পর্যায়ে অথর্ববেদে 'অসুর' শব্দটি দেবতাদের শত্রু বা দৈত্য অর্থাৎ ঋগ্বেদের একেবারে বিপরীতার্থে ব্যবহার করা হয়। আমাদের পৌরাণিক কাহিনি বা মিথগুলো প্রচলিত দেবাসুরের যে দ্বন্দ্বের কথা পাওয়া যায় তা আসলে আর্য-অনার্যদের যুদ্ধের ইতিহাস। আর্যরা যখন অনার্যদের পরাজিত করে, সেক্ষেত্রে বিজয়ীরা বিজিতদের প্রতি অপমানসূচক প্রতিশব্দ হিসাবে আর্যরা অনার্যদের অসুর নামে চিহ্নিত করে। ভারতের প্রাচীন প্রাগার্যযুগের আদিম বাসিন্দাদের দাসু, দস্যু, রাক্ষস, কিরাত, কিন্নর প্রভৃতি বিদ্বেষমূলক, অপমানজনক ও ঘৃণাসূচক নামে চিহ্নিত করা হয়। অসুর নাম ও জাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য অবতারণা করা হয়েছে। আম্বেদকর অসুর জনজাতি সম্বন্ধে বলেছিলেন, যারা সুরা পান করতেন তারা সুর বা দেবতা এবং যারা সুরা পান করতেন না তারা অসুর বা অনার্য, এছাড়া ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় বলেছিলেন— সুর দেবতার উপাসক আর্যরা এই আর্য-বিদ্বেষী 'মেডিটারেনিয়ন' জাতিদের অসুর নামে চিহ্নিত করে।[৪৮]

অসুর জনজাতির আদিনিবাস সম্পর্কে ছোটনাগপুরের পাহাড়ি অঞ্চল অনুমান করা হয়। ছোটনাগপুরে যে সমস্ত তাম্রযুগের ধাতব দ্রব্যের নিদর্শন পাওয়া তা অসুরদের নির্মাণ ও প্রচলন বলে অনেকের মত। রিজলি সাহেবের মতে ওড়িষ্যা, মধ্যভারত ও ছোটনাগপুরের সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পূর্বসূরি এই অসুর জনজাতি। অসুর জনগোষ্ঠীর মানুষ মুন্ডারী ভাষার অন্তর্গত অসুরী ভাষায় কথা বলে, পাশাপাশি তারা বাংলা ভাষাও বিহার-ঝাড়খন্ডে হিন্দি ও সাদরি ভাষা ব্যবহার করে থাকে। অসুর জনজাতির ঐতিহ্যগত জীবিকা বা পেশা লোহা গলানো, নানান ধাতব দ্রব্যের কাজ। পরবর্তীতে তাদের পেশার বদল হয়ে তারা কৃষিজীবী ও ক্ষেতমজুরী করে। অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর ন্যায় অসুররাও বিভিন্ন গোত্রে বা কিলিতে বিভক্ত এবং সেই গোত্রের ধর্মীয় প্রতীকও বিভিন্ন— আইন্ড> বানমাছ, কাছুয়া> কচ্ছপ, নাগ> সাপ,

টির্কি> এক জাতীয় পাখি, বারোয়া> বনবিড়াল, হাওয়ার> চিচিঙ্গা, রটে> ব্যাঙ, শিয়ার> শিয়াল ইত্যাদি।[৪৯] রিজলি সাহেবের মতে অসুর জনজাতির কতগুলি ভাগ আছে— আগারিয়া, বিরজিয়া, লোহরা-অসুর, কোল-অসুর, পাহাড়িয়া অসুর।[৫০]

অসুর অধ্যুষিত গ্রামে অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় নিজেদের যাবতীয় বিবাদ, সমস্যার সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত আছে। পঞ্চায়েতে- মাহাতো, বৈগা, পূজার ও গরেত এই চারটি পদাধিকার থাকে। অসুর সমাজে শিশু জন্মানোর পর পাঁচদিন অশৌচ পালন করা হয়। ছেলেরা কৈশোর থেকে যৌবন বয়সে পদার্পণকালে তাদের জন্য গ্রামে একটি রাত্রিনিবাস ঘরের ব্যবস্থা থাকে যাকে ধুমকুড়িয়া বলে। অসুর সমাজে বাল্যবিবাহ নেই। কন্যাপণ প্রথা আছে। অসুর সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে পাঁচ ধরণের বিবাহরীতি আছে— ১. ঘটক নিয়োগের দ্বারা বিবাহ, ২. জোড়পূর্বক বিবাহ, ৩. মজুরি খেটে বিবাহ, ৪. বদল বিবাহ, ৫. পালিয়ে বিয়ে। এদের দেবরবরণ রীতি প্রচলিত অর্থাৎ অন্যান্য প্রায় সকল আদিবাসীদের গোষ্ঠীর ন্যায় অসুর জনজাতির মধ্যেও বড় ভাইয়ের মৃত্যু হলে ছোটভাই বড়ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। অসুর সমাজে 'সিং বোঙ্গা', 'মারাংবোঙ্গা'র পূজা করা হয়। পূজায় মোরগ উৎসর্গ করার চল আছে। অসুর জনসমাজে প্রচলিত উৎসব-অনুষ্ঠান— 'সোহরায়', 'ফাগু', 'করম', 'সরহুল' উৎসব, 'নাওয়াখানি' উৎসব। অসুরদের মৃতদেহ সাধারণত কবর দেওয়া হয়, আবার দাহও করা হয়।

গোন্ড: স্বাধীনতার পূর্বে এবং **১৯৫১** সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গোন্ড জনজাতি পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে পঞ্চাশের দশকে জীবিকার সন্ধানে তারা বাংলায় আসে বলে ধারণা করা হয়। **১৯৫৬** সালে গোন্ডদের আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়। **১৯৮১** সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষে গোন্ড জনজাতির জনসংখ্যা ৭৩, ৮৮, ৪৩৬ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,৯২৩। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটকে এদের বাস। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই গোন্ড জনজাতির মানুষরা তাদের নিজস্ব ভাষা 'গোন্ডী'। এছাড়াও তারা যে অঞ্চলে বাস করে সেই ভাষা যেমন- হিন্দি, বাংলা, তেলেগু ব্যবহার করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, মালদহ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে এদের বাস।

গোন্ড জনজাতির মানুষ দিনমজুর হিসাবে ইটভাটা, ক্ষেতমজুরের পেশাকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে, পাশাপাশি বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রয় করা, কৃষিকাজও করে। গোন্ড জনজাতির

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই দিনমজুরের কাজ করে। গোন্ড জনজাতির মানুষ সংসার চালানোর জন্য বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকে। গোন্ড সমাজের মেয়েরা নানা ধরনের উলকি করায় শরীরের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। এটা যদিও তাদের কোনো রীতি নয়, এটা তাদের সাজের অঙ্গ বলা যেতে পারে। গোন্ড সমাজ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত— অভিজাত, সাধারণ শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণি। এই শ্রেণি বিভাগের ধরন অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগের থেকে অনেক আলাদা। গোন্ড জনজাতির মানুষরাও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ও তাদের সেই গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতীক আছে। একই গোত্রে কখনও বিবাহ হয় না। এদের বিবাহ চার ধরনের হয়— 'সত্তাবত্তা বিয়া', 'বিয়া', 'ওহারজাওয়াই বিয়া' ও 'চারনিংনি বিয়া'।[৫১] এই সমাজে পুনর্বিবাহকে 'পাত খাদি' বলা হয়। গোন্ড সমাজে দেবরবরণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে।

গোন্ড অধ্যুষিত গ্রামে তাদের নিয়ম শৃঙ্খলা সমস্ত সামাজিক নিয়ম বিধিরক্ষা ও সমস্যা বিবাদ মেটানো এসবের জন্য নিজস্ব পঞ্চায়েত বা আইন আছে। পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যক্তিকে মুখিয়া বলা হয়। গোন্ড সমাজে শিশুর জন্মের সময় কোন খাসি জাতীয় বৃদ্ধা মহিলা ধাই-মার কাজ করে। জন্মের পর ২১-৩০ দিন অশৌচ পালন করা হয়। গোন্ড সমাজে মৃতদেহ দাহ বেশি করা হয়, কদাচিৎ কবর দেওয়া হয়। গোন্ড্দের প্রধান দেবতা 'বড়দেও' এছাড়াও 'নারায়ণ দেও', 'দুলহাদেও', 'কালীমাতা', 'বানজারিদেবী' ইত্যাদির পূজা ও পূর্বপূরুষদের উদ্দেশে তারা পূজা করে। গোত্র ভিন্ন বা গোত্র এক হলেও পুজোর রীতি এক হয় না। এক একটা গোত্রের একাধিক দেবদেবী। গোন্ড সমাজে গ্রাম পুরোহিতকে 'দেবারী' এবং বংশ পুরোহিতকে 'কাতোরা' বলা হয়। দেবদেবীর পাশাপাশি ভুত-প্রেত, অপদেবতা, জাদুমন্ত্র, কুনজর ও তুকতাক, ডাইনির উপর তাদের প্রবল অন্ধ বিশ্বাস। অন্যান্য আদিবাসী উৎসবগুলোই গোন্ড সমাজে পালিত হয়। পাশাপাশি হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে থেকে গণেশ পূজা, শিবরাত্রি, দশহরা, তুলসী পূজা এগুলো তাদের জীবনের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে।

খোন্দ্: **১৯৮১** সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে খোন্দ্ জনজাতির জনসংখ্যা ৬৩৯। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত খোন্দ।। জনজাতির মাতৃভাষা খোন্দী। তবে প্রয়োজনবোধে যে রাজ্যে বাস করে সেই রাজ্যের প্রাদেশিক ভাষা, যেমন— পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী খোন্দ্ জনজাতি বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বর্ধমানে এদের বাস পাশাপাশি উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে খোন্দ জনজাতির বাস রয়েছে।

খোন্দ্ জনজাতির মানুষদের পেশা- কৃষিকাজ ও দিনমজুর। খোন্দ্ অধ্যুষিত গ্রামে তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েতের পদাধিকার পাঁচ সদস্যব্যক্তি থাকে— মাঝি, বিশিমাঝি, দন্ডসেনা, প্রধান এবং দল বেহেরা। খোন্দ্ পরিবারে শিশু জন্মের সময় ডোমজাতির কোনো বৃদ্ধা মহিলা ধাইমার কাজ করে ও বারোদিন অশৌচ পালন করা হয়। খোন্দ্ সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা নেই, তবে কিছু আদিবাসী সমাজের ন্যায় অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রামে 'গিতিওড়া' বা রাত্রিনিবাসের জন্য ঘর থাকে। খোন্দ্ জনজাতির মধ্যে তিনধরনের বিবাহরীতি প্রচলিত— গোপনে পালিয়ে বিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, ঘটক নিয়োগের মাধ্যমে বিবাহ। খোন্দ্ জনজাতির গোত্র অন্যান্য আদিবাসীদের মতো নয়, বড় জটিল। খোন্দ্ সমাজে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় ও একদিন অশৌচ পালন করা হয়। দশদিন পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। খোন্দরা সর্বপ্রাণবাদী। তাদের প্রধান দেবতা, সূর্য দেবতা। আদিবাসী সমাজে সূর্যকে সকলেই মহাশক্তিশালী হিসাবে প্রাধান্য দেয়। অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় শিক্ষার আলো এই সমাজে প্রবেশ সেইভাবে না করতে পারায় তারাও নানান কুসংস্কার বিশ্বাসী। খোন্দ্ জনজতির নিজস্ব বড় উৎসব— 'নবানন্দ', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই উৎসব পালিত হয়। হিন্দুদের নবান্ন উৎসবের ন্যায়ই এই নবানন্দ উৎসব। পাশাপাশি পৌষ পরব, শিবরাত্রি, রথযাত্রা এই সব হিন্দু উৎসব তারা পালন করে। খোন্দ্ জনজাতিতে একসময় নরবলি প্রথা বা 'মারিয়া' বা উৎসর্গ প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে নরবলি প্রথার উচ্ছেদ হলে নরবলির বদলে তারা মোষবলি প্রথা গ্রহণ করে।

কোরওয়া/কোড়ওয়া: **১৯৭১** সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে কোড়ওয়া জনজাতির জনসংখ্যা ৩২২২।[৫২] পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বীরভূম, নদিয়া, বর্ধমান, দুই পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে এদের বাস। এছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ এলাকায় এদের বাস। অনেকের ধারণা, কোড়া এবং কোড়ওয়া একই জনজাতি, কিন্তু এরা আলাদা এবং একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র জাতি। এদের আদি নিবাস পালামৌ অঞ্চল।

কোড়ওয়াদের অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে পূর্বে চিহ্নিত করা হয়েছিল। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের (১৮৫১-১৯৪১) গ্রন্থে কোড়ওয়াদের নিয়ে বলা হয়েছে, কোড়ওয়ারা মনে করত তারা সব কাকতাড়ুয়াদের বংশধর। আদি অস্ট্রালগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোড়ওয়া জনসমাজ মুন্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। কিন্তু তারা সাদরি, বাংলা, হিন্দি ভাষায় কথা বলে।

কোড়ওয়ারা পাহাড়ি এলাকার উঁচু এলাকায় তাদের বসতি স্থাপন করে। কোড়ওয়ারা জনজাতির মানুষ পূর্বে ঝুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক ঝুমচাষ নিষিদ্ধ করায় কোড়ওয়ারা তাদের জীবিকা হারিয়ে পশুপাখি শিকার, মধু সংগ্রহ, ক্ষেতমজুর হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে। কোড়ওয়া জনসমাজ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত— ডিহারিয়া কোড়ওয়া এবং পাহাড়িয়া কোড়ওয়া। প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক আছে— আইন্দুয়ার গোত্র> বানমাছ, বাঘের গোত্র> বাঘ, হার গোত্র> লাঙ্গল, গিনুয়ার> পাঁকাল মাছ, হাঁসদা> বুনো হাঁস, সুগা> টিয়া পাখি, সাম্প> সাপ ইত্যাদি। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত মুর্মু, সরেন, হাঁসদা— এই গোত্রগুলো কোড়ওয়া জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সঠিক কারণ জানা যায়নি। কোড়ওয়া জনসমাজের নিজস্ব পঞ্চায়েত প্রধানকে ‘মুখিয়া’ বলা হয়। এছাড়াও আর এক প্রধান থাকে তাকে ‘বড় মুখিয়া’ বলা হয়। কোড়ওয়া জনসমাজে একেবারে স্বতন্ত্র নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা হল প্রত্যেক গোত্র পঞ্চায়েত থাকে। কোড়ওয়া জনসমাজে ফাল্গুন মাসে বিবাহ হয় এবং দেবরবরণ রীতি আছে। একই গোত্রে কখনও বিবাহ হয় না। কোড়ওয়া জনসমাজে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। কোড়ওয়া জনসমাজের সর্বপ্রধান দেবতা- ‘ভগ্‌তয়ান’, এছাড়াও ‘সূর্যদেব’, ‘দুলহাদেহ’, ‘মুরকিমাতা’ ইত্যাদি দেবতাদের পূজা হয়। কোড়ওয়ারা তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নিয়মিত পূজা দেয়। অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় কোড়ওয়া জনসমাজেও ভূত-প্রেত, অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত। কোড়ওয়া জনজাতির নিজস্ব সেরকম উৎসব না থাকলেও তারা অন্য আদিবাসীদের উৎসবগুলোকেই পালন করে থাকে। অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় কোড়ওয়া জনসমাজের বেশ কিছু মানুষ শিক্ষিত।

নাগেসিয়া/কিসান: আদমশুমারী অনুযায়ী **১৯৯১** সালে পশ্চিমবঙ্গে নাগেসিয়া জনজাতির জনসংখ্যা ১৭,৮১৪।[৫৩] পশ্চিমবঙ্গের মালদা, জলপাইগুড়ি, বীরভূমে এদের বসতি রয়েছে। তবে মধ্যপ্রদেশে নাগেসিয়া জনজাতির বাস সবচেয়ে বেশি। অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নাগেসিয়া জনজাতির ভাষা কুরুখ ভাষা। তবে পশ্চিমবঙ্গে তারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলে না, তারা সাদরি, হিন্দি ও বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকে। উড়িষ্যায় সম্বলপুরী ভাষা ব্যবহার করে। নাগেসিয়া জনজাতি কিসান জনজাতি হিসাবেও পরিচিত। ভারত সরকারের *National Commision for Scheduled Tribes* এর পক্ষ থেকে সার্কুলার জারি করে জানানো হয়- *kisan community as synonym of nagesia, nagesia listed at SL. no. 32 in the list of scheduled tribes of chhattosgarh state.*[৫৪] অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গেও নাগেসিয়ারা

নাগেসিয়া কিসান নামেই পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ডে এদের বাস রয়েছে। রিজলি সাহেবের গ্রন্থে নাগেসিয়া জনজাতির ক্ষেত্রে নাগেশ্বর/নাগেশর কথা দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। তারা নিজেদের ছোটনাগপুরের নাগবংশী রাজাদের বংশধর বলে মনে করে।

নাগেসিয়া জনজাতি মূলত তিনশ্রেণিতে বিভক্ত— 'তেলিয়া নাগেসিয়া', 'ধুরিয়া নাগেসিয়া', 'সিন্দুরিয়া নাগেসিয়া'। এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত নাগেসিয়াদের বিবাহ রীতি আলাদা। তেলিয়ারা বিবাহে সিঁদুরের পরিবর্তে তেল, ধুরিয়ারা ধুলো এবং সিন্দুরিয়ারা সিঁন্দুর ব্যবহার করে তাকে। এদের মধ্যে বিধবাবিবাহের চল আছে। এদেরও দেবরবরণ ও শালীবরণ রীতি প্রচলিত বিবাহের ক্ষেত্রে। নাগেসিয়াদের জীবিকা মূলক কৃষিকাজ, ক্ষেতমজুরী। এর বাইরে উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী নাগেসিয়ারা চা-বাগানে শ্রমিকের কাজ করে, কলকারখানাতেও কাজ করে।

অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় নাগেসিয়াদের গোত্র বিভাগ সম্পর্কে সেভাবে জানা যায়নি। তবে তারা 'বন', 'বনজ' এবং 'বান গনঝু' পদবী ব্যবহার করে থাকে। নাগেসিয়া সমাজের নিজস্ব পঞ্চায়েত প্রধানকে মাহান বা মাহাতো বলা হয়। শিশু জন্মের পর নাগেসিয়া পরিবার বারোদিন অশৌচ পালন করে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। নাগেসিয়া জনসমাজে মৃতদেহ সৎকারে দাহ ও কবর এই দুই রীতিই প্রচলিত। কেউ মারা যাওয়ার পর নাগেসিয়া পরিবারে দশদিন অশৌচ পালন করা হয়। নাগেসিয়া সমাজের প্রধান দেবতা— 'আঁধারিয়া মাতা', এছাড়াও 'রাজমোহিনী', 'সাহানি গুরু', 'গাহিরা গুরু', এই সমস্ত দেবদেবীর কথাও পাওয়া যায়। প্রত্যেক নাগেসিয়া বাড়িতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূজা নিবেদনের রীতি আছে। নাগেসিয়াদের নিজস্ব উৎসব 'নাওয়া' উৎসব, নবান্ন উৎসবের ন্যায় উৎসব, এছাড়া দিওয়ালি, মাঘ পরব, ফাল্গুন উৎসব পালন করে থাকে। ১৯৫৬ সালে নাগেসিয়া জনজাতি আদিবাসী তালিকাভুক্ত হয়।

নাগেসিয়া জনজাতির মানুষ নিজেদের কিসান বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিভিন্ন রাজ্যেও নাগেসিয়া ও কিসান জনজাতিকে সমগোত্রীয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবে নাগেসিয়া এবং কিসান এই দুই জনজাতির মধ্যে একদল নিজেকে নাগবংশী কিসান বলে, তারা উলকি করায় না আর কিসান জাতির কিছু মানুষের মধ্যে উলকির প্রচলন আছে। নাগেসিয়া জনজাতির সেভাবে আলাদা করে গোত্রের সন্ধান না পাওয়া গেলেও পশ্চিমবঙ্গে কিসান জনজাতি বিভিন্ন গোত্রের কথা পাওয়া যায় ও

সেই গেত্রের ধর্মীয় প্রতীকের সন্ধানও পাওয়া যায়— লাকড়া> বটগাছ, একা> কচ্ছপ, বেকা> নুন, খালে> দই ইত্যাদি। এইসব গোত্রের উপগোত্রও থাকে, যাকে ‘খুদি’ বলা হয়। যেহেতু নাগেসিয়া কিসান জাতি নিজেদের সমগোত্রীয় মনে করে তাই এখানে একসাথেই আলোচনা করা হল।

মালপাহাড়িয়া: ১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মালপাহাড়িয়া জনজাতির জনসংখ্যা **১৭,০২০। ১৯৯১** সালে এই জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়– ৩৪,৩০২।[৫৫] পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, বীরভূম, হুগলি, বর্ধমান জেলায় এদের বাস। মালপাহাড়িয়াদের আদি বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদদের নানান মতামত পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগনার রাজমহল পাহাড়ের পার্বত্য অঞ্চলে এবং মাল পাহাড়িয়া জনজাতির বাস। তবে রাজমহল পাহাড়বাসী এবং এই মালপাহাড়িয়ারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে দ্রাবিড় শব্দ ‘মালের’ থেকে ‘মাল’ শব্দটি আসে এবং মাল শব্দের অর্থ পাহাড় বা পর্বত। আবার তামিল ভাষাতেও ‘মলয়’ অর্থ পাহাড়।[৫৬] এক এক অঞ্চলের মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে এক একরকমের লোকবিশ্বাস প্রচলিত তাদের অতীত নিয়ে, জন্মকথা নিয়ে।

মালপাহাড়িয়াদের দুটি খন্ড জাতি আছে— ‘মালপাহাড়িয়া’ ও ‘কুমারভাগ পাহাড়িয়া’। আবার জানা যায়, কাদার পাহাড়িয়া নামক আর এক শ্রেণির কথা। তবে শাওরিয়া পাহাড়িয়া ও কাদার পাহাড়িয়াদের সাথে মাল পাহাড়িয়াদের কোনরকম সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না। কুমারভাগ পাহাড়িয়াদের সাথে মাল পাহাড়িয়াদের বিবাহ হয়। শাওরিয়া পাহাড়িয়াদের থেকে মালপাহাড়িয়ারা বংশ মর্যাদায় নিজেদের উঁচু বলে মনে করে।

পশ্চিমবঙ্গের মালপাহাড়িয়াদের মূল পেশা কৃষিকাজ, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর। পূর্বে শিকার ও ঝুমচাষ ছিল এদের পেশা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় মালপাহাড়িয়াদের মুলত দুই শ্রেণি পাওয়া যায়— ‘রায় মালপাহাড়িয়া’ ও ‘পুবাড় মালপাহাড়িয়া’। এরা দুর্গা, কালী, মনসা, শীতলা পূজা করে পৌষ-পার্বণ উৎসবও পালন করে। আবার উত্তর অঞ্চলের মালপাহাড়িয়ারা দক্ষিণ অঞ্চলের মালপাহাড়িয়াদের ‘মালের’ বলে এবং দক্ষিণের লোক উত্তর অঞ্চলের মাল পাহাড়িয়াদের ‘চেট’ বলে অভিহিত করে। এদের মধ্যে বিত্তবানরা ‘সিংহ’, মধ্যবিত্তরা ‘গৃহী’, তৃতীয়শ্রেণি ‘মাঝি’ ও চতুর্থ নিম্নবিত্তরা ‘আহুতি’ নামে পরিচিত। মাল পাহাড়িয়াদের মধ্যে এরকম অঞ্চলভেদে পার্থক্য বিদ্যমান।

অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় মালপাহাড়িয়াদের গোত্র নেই, কুল বর্তমান। কুলের নাম– আঢ়িতি এর অর্থ শিকারী, দেঢ়িতি অর্থ পূজারী, গৃহী অর্থ গৃহস্থ, মাঝি অর্থ মোড়ল, পূজার অর্থ পূজারী এবং সিকদার। মালপাহাড়িয়াদের ব্যবহৃত পদবী হল– সিং, মাঝি, কুমার, দেঢ়ি, আঢ়ি প্রভৃতি। পিতৃতান্ত্রিক মালপাহাড়িয়া সমাজের নিজস্ব পঞ্চায়েতই তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে। এদের সমাজে অসবর্ণ বিবাহ ও আত্মীয় বিবাহের চল নেই। পাঁচরকমের বিবাহ প্রচলিত— সম্বন্ধ করে বিয়ে, প্রেম করে বিয়ে, বদলী বিয়ে, গোলামী খেটে বিয়ে ও পোষ্যপুত্র হয়ে বিয়ে। বিধবা বিবাহের চল আছে। শালপাতা ছিঁড়ে এদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। বহুবিবাহের চল আছে এই সমাজে। এদের ঘটককে 'সিথু' বলে। বিবাহরীতিতে মাতুল একটা বড় ভূমিকা পালন করে। শিশু জন্মালে নয়দিন অশৌচ পালন করা হয়। মালপাহাড়িয়া সমাজে মৃতদেহ কখনও দাহ করা হয়, কখনও কখনও কবর দেওয়া হয় এবং পাঁচ থেকে একুশদিন অশৌচ পালন করা হয়।

মালপাহাড়িয়াদের প্রধান উপাস্য দেবতা সূর্য দেবতা। সূর্যদেবকে ‘গোঁসাই’ নামে অভিহিত করে। এছাড়াও ‘ধরিত্রী গরামি গোঁসাই’, ‘সিংহবাহিনী’র পূজাও তারা করে। এছাড়া তাদের সমাজে ছাগ, মুরগী, শুকর বলির প্রথাও আছে। মালপাহাড়িয়াদের প্রধান উৎসব পাড়ো, বৈশাখ মাসে পালিত হয়। তাদের যেহেতু পার্বত্য অঞ্চলে বাস সেখানে ভুট্টা তাদের প্রধান খাদ্য হওয়ায় নতুন ভুট্টা ওঠার পর ভুট্টার শস্যদানা দিয়েই তারা নবান্ন উৎসব পালন করে। ১৮৫৫-৫৬ সাল নাগাদ তারা বিহার থেকে জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে আসে এবং ১৯৫৬ সালে তারা আদিবাসী তালিকাভুক্ত হয়।

চেরো: ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে চেরো জনজাতির জনসংখ্যা ১৬৬৪।[৫৭] পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, দুই চব্বিশ পরগনা, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদিয়া, দার্জিলিং জেলায় এদের বাস। চেরো জাতির সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়— ১৯১৩ সালে চেরো জাতির প্রধান ভাগবতরাই পালামৌ আক্রমণ করে ও সেখানে তারা দুশো বছর রাজত্ব করে। এছাড়া চেরো জনজাতি নানান আদিবাসী বিদ্রোহে বারবার যোগ দেয়। চেরো সমাজে ‘রাই’ পদবী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসাবে গণ্য।

চেরো জাতির মূল জীবিকা কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও তা বাজারে বিক্রয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে চা-বাগানে শ্রমিকের কাজও করে। প্রোটো অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত চেরোরা তাদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে সর্দার ভাষা, হিন্দি, বাংলা ভাষায় কথা বলে। রিজলি সাহেব চেরো সমাজের দুটি শ্রেণির

কথা বলে— বাবুয়ান বা বারো হাজার, তেরো হাজার।[৫৮] এই বারো ও তেরো হাজার শ্রেণির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হয় না, বা অন্য কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না। চেরো সমাজে গোত্রকে পারিস বলা হয়, তাদের কয়েকটি গোত্র— 'রাউতিয়া', 'ছোটকা কুঁয়ার', 'বড়কা কুঁয়ার', 'মাহাতো', 'মাঝিয়া' ইত্যাদি।

চেরো সমাজে পঞ্চায়েত পরিচালনার ভার যার উপর থাকে তাকে মাহাতো বলে। পঞ্চায়েতে আরও চার-পাঁচজন দায়িত্বে থাকে। চেরো সমাজে উল্‌কি প্রচলন আছে। চেরো সমাজে শিশু জন্মানোর পর ছ'দিন অশৌচ পালন করা হয় ও সাতদিনের দিন 'ছাতি' অনুষ্ঠান হয়। চেরো সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা ও দেবরবরণ রীতি আছে। এদের বিবাহ চার রকমের— 'চারকে বিবাহ', 'ধারাও বিবাহ', 'দোলা বিবাহ' ও 'সামাই বিবাহ'। চেরো সমাজে মৃতদেহ দাহ করা হয় ও দশদিন অশৌচ পালন করা হয়। চেরো পরিবারে প্রত্যেক বাড়িতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পূজা নিবেদনের জন্য একটা থান থাকে। এছাড়া গ্রামে একটা সার্বজনীন পূজার জন্য মণ্ডপ বা থান থাকে, যাকে 'গামহেল' বা 'সারনা' বলা হয়। চেরোদের দেবতা— 'বনজারি', 'গড়েয়া', 'ধরতি', 'দিউহার' প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা তারা করে। এছাড়া তারা হিন্দুদের শিব, নারায়ণের পূজাও করে। চেরোদের নতুন বছর শুরু হয় চৈত্রমাসে, বাঙালিদের যে মাসে বছর শেষ, সেইমাসেই এদের বছর শুরু। এদের প্রধান উৎসব সরহুল, করম, হোলি উৎসব।

কুরমালি/করমালি: ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে করমালি জনজাতির জনসংখ্যা ৯০,৮৪৯।[৫৯] পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, হুগলি জেলায় এদের বাস। আদি অষ্ট্রাল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই করমালি জনজাতি নিজেদের মুন্ডা, হো ও সাওঁতালগোষ্ঠীর ন্যায় 'হড়' বলে। এছাড়াও তাদের গোষ্ঠীর আর এক নাম 'কলথ'। মুন্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত করমালি জনজাতির নিজস্ব ভাষা করমালি। এই করমালি ভাষার সাথে সাঁওতালি ভাষার প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান। বর্তমানে করমালি জনগোষ্ঠীর মানুষও তাদের নিজস্ব ভাষা ভুলে বাংলা, হিন্দি, সাদরি এবং যে অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

করমালি জনজাতির মানুষ বনজ সম্পদ সংগ্রহ, কৃষিকাজ, ক্ষেতমজুর, শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। করমালিরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত— 'সঝাওয়ান', 'টিরকি', 'কাইথওয়ার', 'বেলেওয়ার' ইত্যাদি। করমালি সমাজের নিজস্ব যে পঞ্চায়েত, তার প্রধানকে মুন্ডা বলে এবং গ্রামের পুরোহিতকে পাহান বলে। করমালি পরিবারে শিশু জন্মানোর পর পাঁচদিন অশৌচ পালন করা হয়। করমালি সমাজে

বাচ্চার মুখে ভাতের কোনো অনুষ্ঠান হয় না। করমালি সমাজে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় এবং দশদিন অশৌচ পালন করা হয়। মুন্ডা সমাজের অনেক রীতির সথে করমালি সমাজের মিল বর্তমান। করমালি সমাজের উৎসব 'করমপূজা', 'সহরায় উৎসব', 'দুর্গাপূজা', 'নাওরাখানি' উৎসব করমালি সমাজে পালিত হয়। অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় করমালি সমাজ এখনও শিক্ষার আলো থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত।

শাওরিয়া পাহাড়িয়া: ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে শাওরিয়া পাহাড়িয়াদের জনসংখ্যা ৪৫৯০।[৬০] পশ্চিমবঙ্গের মালদা, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, নদিয়া, বর্ধমান জেলায় এদের বাস। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহারে এদের বসতি রয়েছে। এদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ খুব কমই জানে। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে চরম দ্রাবিড়ীয় রূপ।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শাওরিয়া পাহাড়িয়াদের নিজস্ব ভাষা মালতো ভাষা, প্রয়োজনের তাগিদে তারা বাংলা, হিন্দি ভাষাও ব্যবহার করে থাকে। এদের জীবিকা কৃষিকাজ, মহুয়া মদ তৈরি করে বিক্রি ও ইটভাটায় শ্রমিক রূপে তারা কাজ করে, পাশাপাশি তারা পশুপাখি শিকারও করে। পূর্বে এরা খুব অপরাধপ্রবণ, লুটপাট করা জাতি ছিল, বর্তমানে তা পাল্টেছে। শাওরিয়া পাহাড়িয়া সমাজের মেয়েরা উলকি করে। এদের সমাজে গোত্রের ভাগ নেই, তবে তারা চারকুলে বিভক্ত— 'বালকো', 'গোড়া', 'কচলুস', 'ককেকা'। এদের পরিবারে শিশু জন্মালে পাঁচদিন অশৌচ পালন করা হয়। এদের সমাজে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় ও এক্ষেত্রেও পাঁচদিন অশৌচ পালন করা হয়। শাওরিয়া পাহাড়িয়া সমাজে বিবাহের ঘটককে সিঠু বলে। এদের তিন ধরনের বিবাহ প্রচলিত— পোষ্যপুত্র হয়ে বিবাহ, বদলী বিবাহ, গোলামী বিবাহ পাশাপাশি সাধারণভাবে কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ রীতি আছে।

শাওরিয়া পাহাড়িয়ারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এদের দেবতাকে এরা 'বেড়ো' নামে অভিহিত করে এবং সমস্ত দেবতার নামের শেষে গোঁসাই যুক্ত করে। এদের প্রধান দেবতা 'রকমি গোঁসাই', এছাড়াও 'দোয়ার গোঁসাই', 'গুমু গোঁসাই', 'কুল গোঁসাই' উল্লেখযোগ্য। শাওরিয়া পাহাড়িয়া জনসমাজে 'খাংরা' পূজা, 'গৃহনির্মাণ' পূজা, 'বাজরা' পূজা ইত্যাদি উৎসব পালিত হয় এছাড়াও অগ্রহায়ণ মাসে 'বাদনা' পরবের সময় 'জানথার' পূজা করে এরা। ছাগবলি প্রথা আছে এদের সমাজে। শাওরিয়া পাহাড়িয়া সমাজের নিজস্ব যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে সেখানে পাঁচপদকর্তা থাকে— মাঝি হারাম, পরামাণিক, নাইকি, জগে মাঁঝি, গড়েত।

রাভা: পশ্চিমবঙ্গে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী রাভা জনজাতি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলে এদের বাস। এছাড়া আসাম, সিকিম, হিমাচলপ্রদেশ এদের বসতি রয়েছে। রাভা জনজাতির জীবনে মাছ খুব বড় ভূমিকা পালন, সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানে মাছ মঙ্গল চিহ্ন হিসাবে থাকে। সাংস্কৃতিক পরম্পরা, পূজা-পার্বণ, নানান জীবনশৈলীতে মাছ একটি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। রাভা জনজাতির মৎস্যশিকার একটি লোক উৎসব। এই মাছ শিকার তাদের লোকজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাভা জনগোষ্ঠীর আর এক উৎসব 'বাইখো', যা জ্যৈষ্ঠ মাসে পালন করা হয়। রাভা জনজাতির মৎস্যশিকার উৎসবে মৎস্যকেন্দ্রিক অনেক লোকগাথা, রোমান্টিক কাহিনিও রচিত হয়েছে তাদের ভাষায় রাভা জনজাতির নিজস্ব নৃত্য-গীত 'চাথা'। রাভা জনজাতির মধ্যে অনেক গোষ্ঠী বিভাগ আছে। রাভা সমাজ মূলত তিনটি প্রধান গোত্রে বিভক্ত- 'চুরচুং', 'হাটো', 'রাইদুং'।

ইন্দো মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত এই রাভা জনজাতির মানুষের মাতৃভাষা রাভা, তবে তারা কাজের প্রয়োজনে হিন্দি ভাষাও ব্যবহার করে, নেপালী ভাষাও ব্যবহার করে। আসামের পঞ্চম বৃহত্তম তফসিলিভুক্ত উপজাতি এই রাভা জনজাতি। রাভাদের জীবিকা ঝুম চাষ, চাষাবাদ, তাঁত বোনা, তা শ্রমিক হিসাবে কাজ করা। তবে বর্তমানে অনেকে চাকরি বা অন্য অনেক পেশার সাথে নিযুক্ত। রাভা জনজাতি মূলত প্রকৃতির আরাধনা করে, তারা প্রকৃতির উপাসক। তাদের মূর্তি পূজা নেই। এদের প্রধান দেবদেবী— 'ঋষি বা মহাকাল', 'বঙ্গতুক', 'বসেক' ইত্যাদি।[৬১] বর্তমানে অনেক রাভা উপজাতির মানুষ হিন্দু মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে এবং অনেকে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করছে।

ভুটিয়া/ভোটিয়া: ভুটিয়া জনজাতির জনসংখ্যার আধিক্য ভুটান, নেপালে, ভারতে তারা কমসংখ্যক। ভুটিয়ারা তিব্বত থেকে ইন্দোতিব্বত সীমান্ত বরাবর হিমালয় পর্বত মালায় বসতি স্থাপন করে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, কোচবিহার অঞ্চলে তাদের বাস। ভারতবর্ষের সিকিম, উত্তরাখন্ড, হিমাচলে ভুটিয়া জনজাতির বাস বেশি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের আদিম জনজাতি এই ভুটিয়া জনগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে তিব্বতি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি হিন্দু সংস্কৃতির উপাদানও বিদ্যমান।

ভুটিয়ারা ভুটিয়া ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে, পাশাপাশি কাজের প্রয়োজনে তারা হিন্দি, নেপালী ভাষাও ব্যবহার করে থাকে। ভুটিয়াদের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। ভুটিয়ারা পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাদের দেবতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'মহাদেব', 'গাবালা', 'সাঁই', 'লান্দে' ইত্যাদি। ভুটিয়ারা

ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। ভুটিয়ারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের ধর্ম লামাস্টিক বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং অ্যানিমিজমের মিশ্রণকে প্রতিফলিত করে অর্থাৎ তারা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তবে বেশিরভাগ আদিবাসী গোষ্ঠী 'সর্বপ্রাণবাদে' বিশ্বাসী। ভুটিয়ারা হিন্দুদের অনেক উৎসবই পালন করে। ভুটিয়া জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরিষদ বা সংগঠনের নাম 'চিদ্‌পুসমাজ' বা 'গেম্বু'।[৬২]

ভুটিয়ারা ব্যবসায়ী, ট্যুর গাইড, শেরপা হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে, পাশাপাশি তারা পশু পালন করে। 'লোসার' হল তিব্বতি নববর্ষ যা ডিসেম্বর মাসে ভুটিয়ারা পালন করে। ভুটিয়ারা তাদের মৃতদেহ দাহ করে তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কবর দেয়। ভুটিয়া মহিলাদের পোশাক তাদের হাতে বোনা এবং অঞ্চল ভেদে তা পরিবর্তিত। ঐতিহ্যবাহী নারী পোশাক- '*Chyung – bala*'।[৬৩] ভুটিয়াদের প্রধান খাদ্য চাল, গম, বাজরা, বার্লি। তারা শুকরের মাংস, গরুর মাংস খায়, এবং অ্যালকোহল পান করে। অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে ভুটিয়ারা অনেক বেশি শিক্ষিত, সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশ।

গারো: ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গারো জনজাতির জনসংখ্যা ৩,৬৭৩।[৬৪] পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলাতেই এদের বাস। গারো জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা গারো তিব্বতি-বর্মি পরিবারের বোড়ো গোষ্ঠীর ভাষা।

গারো সমাজে সন্তানের মায়ের পরিচয়ে পরিচয় নির্ধারিত হয়। এই মাতৃলাইন অনুযায়ী গারোদের পাঁচটি গোষ্ঠী বিভাগ রয়েছে— 'মারাক', 'সাংমা', 'মোমিন', 'আরেং', 'শিরা'।[৬৫] এই গোষ্ঠীগুলি আবার কতকগুলি গোত্রে বা তাদের ভাষায় 'মাচং' -এ বিভক্ত। এদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক এবং অন্যান্য আদিবাসী সমাজের থেকে আলাদা। সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয় মায়ের কনিষ্ঠা কন্যা। পাহাড়ে বসবাসকারী গারোরা ঝুমচাষ করে এবং সমতলে বসবাসকারীরা ধান, ভুট্টার চাষ করে। কৃষিকাজই এদের মূল পেশা। গারোদের ধর্ম- সাংসারেক। এদের অনেকেই আবার খ্রিস্টান ধর্মও গ্রহণ করে থাকে। গারোদের মধ্যে শিক্ষিতের হার প্রায় ৭৭ শতাংশ।

গরেত/গোড়াইত: ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী গরেত জনজাতির জনসংখ্যা ৩,০২৪।[৬৬] পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় এদের বাস। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ঝাড়খন্ডে এদের বসতি রয়েছে। স্যার রিজলি সাহেব মনে করতেন এই গরেত জাতি কোড়া জাতিরই বিচ্ছিন্ন অংশ।

গরেত জাতি কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত— ‘খালকো’, ‘টোপোয়ার’, ‘কেরকেট্টা’, ‘খালকো’, ‘ধন’, ‘মোনতিরকি’। গোষ্ঠীর নামকে এই গরেত জনজাতির মানুষ তাদের পদবি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। গরেতদের উৎসব- করম, সহরাই ও সরহুল উৎসব। কোনো মুন্ডা জাতির লোক তাদের পূজায় পুরোহিতের কাজ করে থাকেন। এদের মূল পেশা কৃষিকাজ, ঢোল বাজানো, মাছ ধরার জাল বানানো।

চাকমা: পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং জলপাইগুড়িতে এদের বাস। রিজলি সাহেব পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী একটি লোহিটিক জাতি হিসাবে চাকমা জনজাতিকে চিহ্নিত করেছিলেন। চাকমাদের অতীত নিয়ে অনেক দ্বিমত আছে, যেমন কেউ মনে করেন তারা চট্টগ্রাম আক্রমণকারী মোগলসৈন্যর সাথে এসেছিল, কেউ মনে করেন মালয় উপদ্বীপ থেকে আগত। চাকমাদের অনেক পূর্বপুরুষ খান পদবি ব্যবহার করত। তবে রিজলি সাহেব মনে করতেন তাদের আগমন আরাকানের দিক থেকে, কারণ তাদের ভাষায় আরাকানের ভাষা ব্যবহার রীতির লক্ষণ দেখা যায়।

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়। এরা ক্ষেতমজুরীও করে আবার অনেকে চাকুরীরত। চাকমা জাতির মধ্যে সাক্ষরতার হার বেশি।

চিকবরৈক/চিকবারাইক: চিকবরৈক জনজাতির আদি বাসস্থান ছোটনাগপুর অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী চিরবরৈক জনজাতি মূলক ঝাড়খন্ড থেকে আসা বলে মনে করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও নদিয়া জেলায় এদের বাস। এই জনজাতি সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। এই জনজাতির মানুষ সাদরি ও বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকে। পশ্চিবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খন্ড জেলায় এদের বসতি রয়েছে। চিকবরৈক জনজাতির মানুষ তন্তুবায়, কৃষি ও অনান্য ধরনের পেশায় নিযুক্ত। তাদের দেবতা— ‘দেবিমাই’, ‘সুরজাহি’, ‘বড়পাহাড়ি’, এঁদের পুজো করে চিকবরৈক জনজাতি। পাশাপাশি তারা হিন্দু জনজাতির সংস্পর্শে থাকায় তারা অনেকটা হিন্দু মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। এই জনজাতির নিজস্ব উৎসব— করম, সরহুল প্রভৃতি। এরা আদিবাসী হলেও বর্তমানে তারা তাদের নিজেদের স্বর্ধম ভুলে অনেকেই নিজেদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে থাকে আবার অনেকে খ্রিস্টানধর্মও গ্রহণ করেছে। চিকবরৈক জনজাতি কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত— ‘সোনা’, ‘বক্সি’, ‘ইন্দুয়ার’, ‘বাসেরা’ প্রভৃতি।

মগ: ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মগ জনজাতির জনসংখ্যা ১,০২০ এবং ১৯৯৯ সালে ৪,৩৩২।[৬৭] পশ্চিবঙ্গের মগ একটি ছোট জনজাতি। এদের বাস উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হুগলি,

জলপাইগুড়ি, বর্ধমান জেলায়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসামে এই জনজাতির বাস রয়েছে। মগদের আদি বাসস্থান আরাকান। মগ জলদস্যুদের কথা বাংলা সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। এরা মূলত তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত— 'থংঠা', 'জুমিয়া মগ' এবং 'বাইদা'। তিব্বতি বর্মাভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত মগ ভাষাই মগ জনজাতির মাতৃভাষা, এছাড়া তারা বাংলা, হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে থাকে। মগ জনজাতির মানুষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রধান উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা ও তীর্থস্থান বুদ্ধগয়া।

মগ জনজাতির মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ সাক্ষরতার হার। এই জনজাতির অনেক মানুষ চাকরিরত আবার অনেকে যারা নিম্নবিত্ত তারা শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর হিসাবেও কাজ করে। এরা বেশিরভাগই শহরবাসী, তাই অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় অনেকটাই আধুনিক ও সুশিক্ষিত।

মেচ: পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় এদের বাস। রিজলি সাহেবের মতে মেচ জনজাতি মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মেচ জনজাতির মধ্যে দুটো গোষ্ঠী বিভাগ রয়েছে— অগ্নিয়া মেচ ও জাতি মেচ। আবার অগ্নিয়ামেচ গোষ্ঠীর মধ্যে বারোটি ভাগ রয়েছে। অগ্নিয়া মেচ ও জাতি মেচ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের চল আছে। তবে মেচদের ক্ষেত্রে তিন প্রজন্মের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। অগ্নিয়ামেচদের বাবার ক্ষেত্রে সাত প্রজন্মের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। মেচরা নিজেদের হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং শৈব বলে পরিচয় দেয়। তারা শিব, কালীর পুজো করে। মোষ, ছাগ, মুরগি, শুয়োর বলি দেওয়ার প্রছা আছে। মেচদের বিবাহে কন্যাপণ লাগে ও বিধবাবিবাহ রীতি প্রচলিত। মেচদের পুরোহিতকে 'ধামি' বলা হয়। মেচ জনজাতির মানুষ শিব ও কালী পুজোর পাশাপাশি তাদের আরও কিছু দেবদেবী রয়েছে— 'সিমিসিং', 'তিস্তা বুড়ি', 'মহেশঠাকুর' ইত্যদি। মেচ জনজাতির লোকের পেশা- রেশমচাষ, কৃষিকাজ, ও বর্তমানে কেউ কেউ চাকুরিরত। মেচ জনজাতিতে মৃতদেহ দাহ ও কবর দেওয়া এই দুই রীতিই প্রচলিত।

লেপচা: মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত লেপচা জনজাতির বাস পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সিকিম, নেপাল ও ভুটানে লেপচা জনজাতির বাস। তিব্বতি বর্মি ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত লেপচা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা লেপচা, এছাড়াও কাজের প্রয়োজনে তারা নেপালী, হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

লেপচা জনজাতি দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত- 'রং' ও 'খাম্বা' এবং লেপচাদের উপাস্য দেবতা- 'খান - চেন-জং'।[৬৮] লেপচাদের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। এই জনজাতির অনেকে মনে করে তারা চিনাপ্রদেশ থেকে আগত।

এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মূলত। তবে এদের মধ্যে আবার অনেকে খ্রিস্টান, অনেকে হিন্দু। এদের মূল পেশা ব্যবসা ও কৃষিকাজ। এদের উৎসবে বৌদ্ধ লামারা পৌরহিত্য করে।

হাজং: **১৯৯১** সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে হাজং জনজাতির জনসংখ্যা ১,৫২৭।[৬৯] পশ্চিমবঙ্গের মালদা, জলপাইগুড়ি, উত্তর ২৪ পরগনা, দার্জিলিং জেলায় এদের বাস। হাজং সমাজে মায়ের পরিচয় সন্তানের পরিচয় হয়। হাজং সমাজের দুটি ভাগ- হাজং ও খাটাল। হাজং হিন্দু সমাজের অনুরূপ গোত্র ও পদবি ব্যবহার করে থাকে। হাজং জনজাতির মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

তামাং: ১৯৭৬ সালের 'দি সিডিউল্ড কাস্টস্ এ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট' অনুসারে পশ্চিবঙ্গের যে ৩৮টি জনজাতি গোষ্ঠীর নাম তালিকাভুক্ত ছিল, সেই তালিকায় তামাং জনজাতির নাম ছিল না। পরবর্তী দীর্ঘ আন্দোলনের পর তামাং এবং লিম্বু জাতিকে সিডিউল্ড ট্রাইব কাস্ট হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়। **২০১১** সালের জনগণনার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে তামাং জনজাতির জনসংখ্যার ১,৪৬,২০৩।[৭০] পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং, দার্জিলিং জেলাতেই মূলত এসের বাস। এছাড়া সিকিম, নেপাল ও ভুটানে এদের বসতি রয়েছে।

তামাং জনজাতির মূলপ্ত নিজস্ব জাতির ট্র্যাডিশনাল গান-নাচকে 'তামাং সেলো' বলে। তামাং জনজাতির ছেলেদের কোটকে *Khenjo/Todung* বলে এবং প্যান্টকে *surlung / surtan* বলে এবং মেয়েদের জামাকে *khenja* বলে, স্কার্টকে *shama* বলে। তামাং জনজাতির গুরুকে লামা বলা হয়। তামাং জনজাতির মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়। তবে অনেকে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হয়। তামাং জনজাতির নিজস্ব তামাং লিপি এবং ভাষা আছে। সিকিমের তামাং জনজাতির অনেকেই তামাং ভাষা ব্যবহার করলেও পশ্চিমবঙ্গের তামাংরা বেশিরভাগ নেপালী ভাষায় কথা বলে। এর পাশাপাশি অনেকে হিন্দি ভাষাও ব্যবহার করে। তামাংদের কাছে বুদ্ধপূর্ণিমা খুব গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বর্তমানে এদের শিক্ষার হার অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় অনেকটি বেশী।

তামাং জাতি সম্পর্কে গায়েত্রি ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে জানান–

> *The District Handbook Darjeeling (compiled and edited by A. Mitra) census 1951 noted that the Tamangs are Mongolian or semi-mongolian tribe who were among the earliest settlers of Nepal.*[৭১]

দীর্ঘ বাইশ বছরেরে লড়াইয়ের পর ২ রা আগস্ট, ২০০২ সালে লোকসভা বিলে তামাং এবং লিম্বু জনজাতি St. বিলের আওতায় আসে-

> *Finally the Tamang Community has been recognized as a Scheduled Tribe. This was possible only after a 22 years long struggle by the All India Tamang Buddhist Associtiion.*
>
> *The required Bill, placing the Tamang and the Limbu Communities in the St. Category was passed at this Lok Sabha Session.*[৭২]

লিম্বু: তামাং এবং লিম্বু জনজাতির সিডিউল্ড ট্রাইব তালিকাভুক্ত হওয়ায় ইতিহাস একই। তামাং জনজাতির আলোচনা সূত্রে তা আলোচনা করা হয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে লিম্বু জনজাতির জনসংখ্যা ৪৬,৮৪৭।[৭৩] লিম্বু/সুব্বা জনজাতির বাস মূলত পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায়, এর পাশাপাশি সিকিম, আসাম, নেপাল, ভূটান, নাগাল্যান্ডে এদের বসতি রয়েছে।

লিম্বু জনজাতির আসল নাম- *Yakthung* বা *Yakthum* এবং লিম্বু ছেলেদের বলা হয় '*yakthungba*' এবং মেয়েদের বলা হয় '*cykthumma*'।[৭৪] লিম্বু এবং সুব্বা বর্তমানে একই জাতি হিসাবে গণ্য হলেও পূর্বে এই নিয়ে নানান গোষ্ঠীগত বিতর্ক ছিল। লিম্বু গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং মাতব্বর লোকদের সুব্বা বলা হত। কিন্তু তা নিয়ে নানা স্বগোষ্ঠী বিরোধ হওয়ায় বর্তমানে এই ভেদাভেদ করা হয় না। লিম্বু গোষ্ঠী প্রকৃতির পূজারী হয়, তারা মাতৃকা শক্তিকে প্রাধান্য দেয়। তাদের বেশিরভাগ হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। তারা নেপালী ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে থাকে। লিম্বু জনজাতির মানুষ বিশেষত যারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী তারা তাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম ভুলে হিন্দু ধর্ম মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের ৪০ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত নানান তথ্য, তাদের জনসংখ্যা, নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ, ভাষা, সংস্কার-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, উৎসব, আইন সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল।

১.গ| জনজাতি/আদিবাসী ও দলিতদের পার্থক্য:

গবেষণাপত্রের পরবর্তী আলোচনার পূর্বে আদিবাসী এবং দলিত বা নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে তফাৎ ঠিক কোথায় এই বিষয়ে স্পষ্টরূপ ধারণা থাকা দরকার। আদিবাসী, জনজাতি, উপজাতি এই শব্দবন্ধগুলির ব্যাঞ্জনা, ব্যবহারিক রূপ, 'আদিবাসী' কারা, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়— এই সবকিছুই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আদিবাসী সম্পর্কিত একটি সম্যক ধারণা নির্মাণের চেষ্টা করেছি। সাধারণত অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের দলিত যারা সাংবিধানিক ভাবে তফসিলি জাতি অর্থাৎ *Scheduled Caste* হিসাবে চিহ্নিত তাদেরকেই আদিবাসী বা উপজাতি বা জনজাতি বলে ধারণা করা হয়। এপ্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি লেখা চোখে পড়ল, *সুখবর* পত্রিকায় আশিস মিশ্র *রাঢ় বাংলার জনজাতির লোকায়ত আখ্যান* শীর্ষক লেখায় ডোম, বাগদি, বায়েন প্রভৃতি জাতিকে জনজাতি বলে উল্লেখ করেছেন-

> 'এটি নিছক সমাজ বিজ্ঞান নয় বা ক্ষেত্র সমীক্ষা নয়- ডোম, বাগদি, বায়েন প্রমুখ জনজাতি গোষ্ঠীর উৎস, জীবন-যাপন, তাঁদের সংস্কৃতি আর ইতিহাস; যার নির্মাণ ও বিনির্মাণ করেছেন মনিশঙ্কর'।[৭৫]

'জন' অর্থ মানুষ এবং 'জাতি' অর্থ সম্প্রদায়, জনজাতি শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'মানুষের সম্প্রদায়'। আক্ষরিক অর্থের প্রেক্ষিতে আশিস মিশ্র মহাশয়ের লেখায় ডোম, চণ্ডাল, মেথর জাতিকে জনজাতি হিসাবে উল্লেখে কোনো অসংগতি নেই একথা সত্য, কিন্তু বিভিন্ন দেশে 'জনজাতি' অর্থে দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে বোঝাতে ব্যবহার করা হলেও এদেশে মূলত 'জনজাতি' শব্দটি উপজাতি বা *Schedule Tribe* গোষ্ঠীকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। 'বাগদি' 'ডোম', 'চণ্ডাল', 'মেথর', 'বাগদি'— এরা কেউই কিন্তু জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, এই জাতিগুলি নিম্নশ্রেণি ঠিকই, ভারতীয় সংবিধানে এরা 'তফসিলি জাতি' বা scheduled caste হিসাবে চিহ্নিত এবং হিন্দু ধর্মালম্বী। সাহিত্যের অনেক জায়গাতেও নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের 'ট্রাইব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নিম্নবর্গীয় বা ব্রাত্য বলে সমাজে যারা চিহ্নিত, যারা দলিত বলে চিহ্নিত, তাদের সঙ্গে আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থা এবং উচ্চবর্গীয় সমাজের দ্বারা শোষণের চিত্র প্রায় একই বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় দলিত শ্রেণি নিয়ে প্রচুর লেখালিখি পাওয়া যায় বা বলা যেতে পারে প্রায় সকল সাহিত্যিকেরই লেখায় নিম্নবর্গীয় দলিতদের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু আদিবাসীদের কথা বেশিরভাগ লেখকদের লেখায় পাওয়া যায় না। মাহাতো জাতি নিয়েও প্রচুর তর্ক, দ্বিমত আছে। তারা

নিজেদের আদিবাসী বলে দাবি করলেও আইনে তাদের জনজাতি তালিকায় নাম নেই। তবে মাহাতোরা অনেকক্ষেত্রে সাঁওতাল গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে পরিচয় দেয় এবং বাংলা অনেক ছোটগল্পে তাদের আদিবাসী হিসাবে দেখানো হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক, এছাড়া প্রাচীন থেকে আধুনিককালের সাহিত্যিকগণের প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাত্যজীবনকে আশ্রয় করে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন চর্যাপদে আমরা শবর জনজাতির উল্লেখ পাই, পাশাপাশি 'ডোম', 'চামার' এই সমস্ত নিম্নবর্গীয় জাতি-জীবনের কথাও পাই। এক্ষেত্রে একটা কথা বলা যেতেই পারে, সাহিত্যিকদেরও হয়ত ধারণা ছিল শবর, ডোম, চামার— এরা একই শ্রেণির। কারণ তৎকালীন সময়ে সরকার কর্তৃক এই বর্ণভেদ প্রথা ছিল না। ভারতবর্ষে প্রায় সাড়ে চারশো'র কাছাকাছি আদিবাসী উপজাতি আছে। ১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষে *Scheduled Tribes* বা আদিবাসী জনসংখ্যা ৫,১৬,২৮,৬৩৮। নিম্নবর্গীয় বা দলিত যারা সমাজে ব্রাত্য বলে পরিচিত তাদের সঙ্গে আদিবাসীদের ধর্ম, ভাষা, রীতি-আচার পৃথক। আমাদের জনসমাজের এক বিপুল অংশ যারা চাষাবাদ করে, বা ডোমবৃত্তি, চামারবৃত্তি, মাছধরা প্রভৃতি এই ধরনের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত, তারাই নিম্নশ্রেণির জাতি, সমাজে 'ব্রাত্য' বা 'দলিত' নামে পরিচিত। পেশাভিত্তিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত দিক দিয়ে জনজতি এবং নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষ একই শ্রেণির। আদিবাসী সম্পূর্ণ আলাদা একটা গোষ্ঠী সম্প্রদায় এবং এদের ধর্ম, ভাষা, আইন সবকিছু আলাদা। সাঁওতাল, বাউরি, ডোম একই গ্রামে পাশাপাশি বসবাস করলেও সাঁওতালদের ধর্ম সারনা, ভাষা সাঁওতালি, বাউরি ও ডোমদের ধর্ম হিন্দু এবং ভাষা বাংলা এবং তাদের উৎসবও আলাদা, তবে দুই জাতির দীর্ঘ সহাবস্থানের ফলে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভাবন হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে আদিবাসী ও দলিত নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষদের পার্থক্য এবং স্বরূপ নির্মাণের প্রয়াস করা হল।

এই আলোচনায় মূলত সমাজে দলিত নিম্নবর্গ এবং আদিবাসীদের স্বরূপগত পার্থক্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নিম্নবর্গ' শব্দটি বহু বিতর্কিত প্রসঙ্গ। নিম্নবর্গের আওতায় কারা এই নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। আন্তেনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) কথিত *Subaltern*-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগ থেকেই দেখা যায় পেশাগত দিক থেকে শ্রমনির্ভর শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান। তবে যে সমাজব্যবস্থা থেকে নিম্নবর্গের উৎপত্তি, সেই সমাজব্যবস্থা সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত, ফলে

সময়ের সঙ্গে এই বর্গের মানুষদের সংজ্ঞাও বদলে যায়। পৃথিবীতে ইতিহাস, শাস্ত্র সবকিছুই ক্ষমতাবানের লিখিত ইতিহাস। সেই ইতিহাসে উচ্চবর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নবর্গের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

'নিম্নবর্গ' শব্দটিই একটি সাপেক্ষ-শব্দ এবং রাজনৈতিক শব্দ তো বটেই কারণ, সকল মানুষই যেখানে রক্তমাংসে গড়া সেখানে কেবল শ্রমের কারণে, জাতির কারণে বর্গীকরণ। নিম্নবর্গ বা দলিত শব্দটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাকরণের বিপুল আখ্যানের সংহত রূপ। আর্য সভ্যতার পূর্বে এরূপ বর্ণভেদ, জাতিভেদ ছিল না। আর্যগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য— এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এই আর্যরাই এদেশে আসার পর এদেশের আদিম বাসিন্দাদের পরাজিত করে 'দাস'-এ পরিণত করে এবং এই পরাজিত মানুষদের 'শূদ্র' নামে বর্ণিত করে। এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। বর্ণগতভাবে ও কর্মবিভাজনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জনজীবনের বিভেদ যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আর্যরা গুণগত বিভেদ করে। যে কারণে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থগত-পেশাগত দিক দিয়ে বিভাজন পরিলক্ষিত। নিম্নবর্গের সংজ্ঞা করতে গিয়ে বলা যেতে পারে, যারা পেশাগত দিক দিয়ে হীন কর্মে ব্রতী (এই 'হীনকর্ম' পরিভাষাটি তর্কসাপেক্ষ) জাতিগত দিকে অচ্ছুৎ, জল-অচল, শিক্ষাগত দিক দিয়েও যারা পিছিয়ে, অর্থনৈতিক অসাম্যের বলি হয়ে দরিদ্র, যাদের উচ্চতনরা কেবল প্রয়োজনে ব্যবহার ও শোষণ করেছে তাদেরকে নিম্নবর্গ আখ্যা দেওয়া হয়।

আদিবাসীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ে পূর্বেই করা হয়েছে, সুতরাং এখানে বিস্তারিতভাবে পুনর্বার আর আদিবাসী প্রসঙ্গে কথা বাড়ালাম না। বর্তমান আলোচনার মধ্যে দিয়ে আদিবাসী ও দলিত নিম্নবর্গের তফাৎটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আদিবাসী এবং নিম্নবর্গ বা দলিত শব্দদুটির অভিব্যঞ্জনা অনেক আলাদা তা এতক্ষণে সুস্পষ্ট। আমার গবেষণার বিষয় জনজাতি সম্পর্কিত, সেক্ষেত্রে আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয় বা দলিতদের পেশাগত, অর্থনৈতিক দিকটি সামাজিক ক্ষেত্রে অনেকটা এক হওয়ায় এবং আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যটা ঠিক কি সেই বিষয়ে সমূহ ধারণা তৈরির কারণে এই আলোচনার প্রয়োজন। কারণ সমাজের অনেকাংশেরই ধারণা সাঁওতাল, শবর, বেদিয়া এবং ডোম, চণ্ডাল, চামার এরা একই জাতির মানুষ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এক শ্রেণি হলেও সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও জাতিগত দিক দিয়ে যে এরা পৃথক এবং স্বতন্ত্র। সকল আদিবাসীই দলিত, নিম্নবর্গীয় এবং প্রান্তিক কিন্তু সকল দলিত, নিম্নবর্গীয় এবং প্রান্তিক মানুষ আদিবাসী বা জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ভারতের সংবিধানে ভারতের আদিম বাসিন্দা যারা, আদিম জাতি, তফসিলিভুক্ত উপজাতি বা সিডিউল্ড ট্রাইব হিসাবে চিহ্নিত, তাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের নিম্নবর্গীয় মানুষদের পার্থক্যটা ঠিক কীরূপ, এই বিষয়ে সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) তাঁর *ভারতের আদিবাসী* (১৩৫৫) গ্রন্থে বলেছেন—

> ‘বৈগা, ভীল, গন্দ, কোল, কোরকু এবং সাঁওতাল প্রভৃতি বিশিষ্ট উপজাতীয়ের মধ্যে কারা ভারতের প্রকৃত আদিম অধিবাসী অথবা কারা প্রথম ভারতে এসে বসতি স্থাপন করেছে তা সম্ভবত কখনই জানা যাবে না। ...এদের আচার-ধর্ম ও ভাষার সঙ্গে হিন্দুদের আচার-ধর্ম ও ভাষা এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য এখন খুঁজে বের করা অসম্ভব। আধুনিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিরাট জাতিগুলির সঙ্গে এরাও ক্রমশ যদিও মিশে যেতে চলেছে, তবুও এদের বর্তমান অবস্থা হিন্দু সমাজ থেকে অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট এবং পৃথক’।[৭৬]

হিন্দুদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং জাতিগতভাবে নিম্নশ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত তাদের ‘অন্ত্যজ’ বলা হয়। তারা দীন, ঘৃণিত হলেও তাদের ধর্ম হিন্দু কিন্তু তারা আদিবাসী নয়। যদিও বর্তমানে অনেক আদিবাসী নিজেদের ধর্ম বদল করেছে এবং নিজেদের ধর্মের বদলে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী হিসাবে পরিচয় দিলেও তাদের মূল ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথক ও স্বতন্ত্র। আদিবাসী/ জনজাতি অর্থেই প্রান্তিক, দলিত, নিম্নবর্ণ কিন্তু প্রান্তিক, দলিত, নিম্নবর্ণ, অন্ত্যজ অর্থেই আদিবাসী বা জনজাতি গোষ্ঠী বোঝায় না। সর্বোপরি আলোচনার পর বলা যায়, আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয় দলিতদের জাতিগত পার্থক্যের স্বরূপ স্পষ্ট।

তথ্যসূত্র:

১. দত্ত, কৃত্তিবাস, *আদিবাসী সমাজ*, কলকাতা: তুহিনা প্রকাশনী, পুস্তকমেলা ২০২৩, পৃ. ১৩

২. ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী*, কলকাতা: ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ: নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৯

৩. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন: সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ.১

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৬. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা), *লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ৩৩

৭. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৩

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪-৫

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬

১০. *The Gazette of India*, published by The Manager Govt. of India press, New Delhi, 6th september 1950, page. 601

১১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১০

১২. *List of notified scheduled tribes*, The scheduled castes and scheduled Tribes orders (amendment) act, 1976, annexure- IB

১৩. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৩২-৩৪

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৬

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

২০. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৯৩

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১-২০৭

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

২৯. Risley, H.H. *The TRIBES AND CASTES OF BENGAL*, Vol 1, Calcutta: the general secretariat press, 1891, page. x|v

৩০. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৪৬

৩১. Roy, Sarat Chandra, *The mundas and their country*, Calcutta: the city book society, 1912, page. 25

৩২. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৯৩

৩৩. ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা: পুস্তক বিপণী, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭৪

৩৪. https://bn.m.Wikipedia.org/wiki. Date-2.2.2022

৩৫. ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা: পুস্তক বিপণী, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৫৫

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

৩৮. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১১৯

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫-১১৭

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৪৩. Risley, H.H. *The TRIBES AND CASTES OF BENGAL*, Vol 1, Calcutta: the general secretariat press, 1891, page. x|v

৪৪. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১২৮

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৫

৪৭. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৮

৪৮. রবিদাস, বাবুল, *অসুর জাতির ইতিহাস, (http://sanbad.net.bd/opinion/open-discussion/77413)* date- 12.7.22

৪৯. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১১

৫০. Risley, H.H. *The TRIBES AND CASTES OF BENGAL,* Vol 1, Calcutta: the general secretariat press, 1891, page- 24-25

৫১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১১৬-১১৭

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৫৪. *NATIONAL COMMISION FOR SCHEDULED TRIBES,* GOVERNMENT OF INDIA , file no: 17/2/Inclusion/2013/RU-III Dated: 30.9.2013

৫৫. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, তৃতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৩৬

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৫৮. Risley, H.H. *The TRIBES AND CASTES OF BENGAL*, Vol 1, Calcutta: the general secretariat press, 1891, page- 199

৫৯. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, তৃতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৫

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৬১. গুপ্ত, অঞ্জলিয়েন, *রাভা লোকজীবনে না খেন*, http://irrabotee.com/in-anjaly, date: 14.01.23

৬২. রাণা, সন্তোষ কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী*, কলকাতা: গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১০০

৬৩.http://www-oncyclopedia-com.translate.goog/humanities/encyclopedias-almanacs-iranscripts-and-maps-/bhutia?-x-tr-si=er&-x-h=bn&-x-tr-hi-+bne-x-tr-pto=tx date: 14.7.23

৬৪. রাণা, সন্তোষ কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী*, কলকাতা: গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৯২

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৭০. https://www.populationu.com/in/west-bengal-population date: 2.2.23

৭১. Bhattacharyya, gayatri, *The protean identity of the Tamangs of India*, The Eastern Anthropologist, ২০১৬, page- 305-321

৭২.https://timesofindia,indiatimes.com/city/Kolkata/tamangs-and-limbus-are-now-st/articleshow/32994949.cms, date: 2.2.23

৭৩. Debnath, Debasish, *The limbus of North Bengal : an anthropological study in two districts of west bengal, man, environment & society*, Arf journal, vol 1. no. 2, 2020, page- 129.

৭৪. Subba, Chaitanya, *The culture and religion of Limbus*, The University of Michigan, published by K.B. Subba, 1995, page- 20

৭৫. আশিস মিশ্র, *রাঢ় বাংলার জনজাতির লোকায়ত আখ্যান*, কলকাতা: সুখবর পত্রিকা, ১ জুলাই ২০২৪, পৃ. ৬

৭৬. ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী*, কলকাতা: ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, রথযাত্রা ১৩৫৫, পৃ. ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়:

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজের রূপরেখা

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে সাহিত্যিকদের লেখনীতে, বস্তুনিষ্ঠায় প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তার-ই অনুসন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এদেশের প্রথম আদিবাসী বা 'আদিম বাসিন্দা', অর্থাৎ আদি বসতকারী যারা ভারতবর্ষের, তারাই আদিবাসী, এদেশের জনজাতি। আর্যরা এদেশে এলে প্রথমেই ভারতবর্ষের আদিম বাসিন্দা বা আদিবাসী যারা তাদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত হয়, যুদ্ধ হয় ও তারাই আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে দাসে পরিণত হয়। প্রাগার্য যুগে বর্ণবিভাগ ছিল না, এর পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই বর্ণভেদ হয়। যুগ-যুগান্ত ধরে এই 'দাস' জাতি— আর্যদের কাছে ঘৃণ্য এবং হীন। সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজে অবহেলিত, শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের শুলুকসন্ধান কীভাবে হয়েছে এবং তা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে সেই অন্বেষণের সম্পূর্ণতা পেতে, বাংলা সাহিত্যে আদিবাসীদের অবস্থান চিত্র তুলে ধরতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে আধুনিক সাহিত্যের কালান্তরে আলোকপাত করতেই হয়। যেকোন ক্ষেত্রেই বর্তমান সময়কে উপলব্ধি করতে ও বিশ্লেষণ করতে, একটি জাতি সম্পর্কে জানতে, তার সমাজ-সংস্কৃতির ঐতিহ্য-পরম্পরা সন্ধানে পূর্ববর্তী সময় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান-ধারণা থাকা প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের কালান্তরে কথাসাহিত্যিকদের আদিবাসী চেতনার ক্রমপ্রসারণে বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র কীভাবে ফুটে উঠেছে তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রয়েছে সমকালীন সমাজবিষয়ক তথ্য। সমকালের নানান সংকট, বর্ণাশ্রম প্রথা, বিভিন্ন জীবিকা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্র চর্যাগীতিতে লিপিবদ্ধ, বৈষ্ণব পদাবলীতে রয়েছে ভক্তিপ্রেমের পাশাপাশি সামাজিক চিত্র, পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য জীবনীকাব্যে চিত্রিত মধ্যযুগের ইতিহাস। এই সমস্ত কাব্যে চিত্রিত ঘটনাবলী সমকালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিপুণ ভাবে ব্যক্ত করে। এই যে ইতিহাস, তা মাটির তলায় প্রাপ্ত উপকরণের থেকে বেশি পাওয়া যায় লেখায়। যেমন, হরপ্পা- মহেঞ্জোদারো সভ্যতার লিপি খুব বেশি উদ্ধার করা যায়নি, কিন্তু মোগল আমল সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হয়েছি পুরোপুরি প্রায় লেখার মধ্যে দিয়েই। বৌদ্ধদের সময়কাল সম্পর্কে জেনেছি চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (আনুমানিক ৩৩১ খ্রিস্টাব্দ- আনুমানিক ৪২২) এর 'ফো-কু-কি' গ্রন্থ, হিউয়েন সাং (আনুমানিক ৬০২ খ্রিস্টাব্দ- আনুমানিক ৬৬৪

খ্রিস্টাব্দ) এর লেখা মূল গ্রন্থ- 'সি-ইউ-কি' এর অনুবাদ *Buddhist records of the western world* বই থেকেই। এঁরা যদি না লিখতেন তৎকালীন সময়কাল-দেশ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা যেত না। হর্ষচরিত থেকে হর্ষবর্ধনের আমল, কালিদাসের লেখা থেকে যেমন গুপ্তযুগের কথা পাওয়া যায়, তেমনই উনিশ-বিশ শতকের সাহিত্য থেকেই সেই সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়, সম্যক ধারণা তৈরি হয়। সাহিত্যেও থাকে ইতিহাসের উপাদান, একজন সাহিত্যিক শুধু ভাবে বিভোর হয়ে লিখছেন তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই তিনি কখনও ইতিহাসবিদের, কখনও সমাজতত্ত্ববিদের আবার কখনও মনস্তত্ত্ববিদের কাজ করেছেন। 'সাহিত্য সমাজের দর্পণ' একথা চিরন্তন সত্য। সাহিত্য না থাকলে আমাদের জানাই হত না প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ইতিহাস।

ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য- *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত,* আবহমানকাল ধরে আমাদের ঐতিহ্যের বাহক। হিন্দুশাস্ত্রে জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথার নানান দৃষ্টান্ত বর্তমান। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ। বেদের প্রথম ভাগ *ঋগ্বেদ সংহিতায়* আর্য ও অনার্য জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্যদের চিরশত্রু, বিরুদ্ধবাদী, অনাচারী, বিজিত জাতি হিসাবে অনার্যদের পরিচয় পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদে* দেখা যায় আর্যদের আগমনের পূর্বে অনার্যদের কথা পাওয়া যায়, যারা 'অসুর' নামে পরিচিত। এছাড়া 'দাস' জাতি ও 'দস্যু' জাতির উল্লেখও আছে। অসুর, দাস বা দস্যু– এরা সকলেই কৃষ্ণবর্ণ এবং এরাই *ঋক্‌সংহিতায়* 'অমানুষ', 'অযজমান' প্রভৃতি নামে খ্যাত। মুখ্যত এই 'দাস' ও 'দস্যু' জাতির সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধ হয় এবং আর্যরা বারবার এই অনার্যদের পরাভূত করে ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। আর্যরা গঠন করে এক নতুন সমাজব্যবস্থা ফলত মূল অধিবাসীরা বাধ্য হয়ে তাদের অধিকার ছেড়ে পরিণত হয় দাসে। চিরকাল তারা মনুষ্যেতর জীবনযাপন করেছে। প্রাগার্য পর্যায়ে নৃতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, সিন্ধু উপত্যকায় যে নাগরিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, ভারতে প্রাগার্য যুগের যে সভ্যতা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা তা মোটেই আর্য সভ্যতার থেকে হীন ছিল না। বর্তমানে নানান গবেষণায় একথা প্রমাণিত তারা অনেক উন্নত ছিল। সেই সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিল এই 'অসুর' সম্প্রদায়। *রামায়ণেও* দেখি আর্য-অনার্যদের লড়াই। ভারতে আর্যদের আগমনের পর থেকে আর্য এবং এদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অহরহ সংগ্রাম লেগেই থাকত। আর্যরাও তাদের প্রবল প্রতিপক্ষের শক্তি খর্ব করতে এবং নিজেদের প্রভাব বিস্তারে মরিয়া হয়ে ওঠে, সেই কারণে তারা অনার্যদের 'দানব', 'দৈত্য', 'পিশাচ', 'অসুর' প্রভৃতি বিভিন্ন মর্যাদাহীন আখ্যায়

ভূষিত করেছে। রামায়ণে বর্ণিত রামের পরম বন্ধু নিষাদ সম্প্রদায়ভুক্ত রাজা গুহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই নিষাদ সম্প্রদায় হল আদি অষ্ট্রাল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, এরা হল ব্যাধ। রামায়ণে সীতা উদ্ধারের জন্য রাম বানর, হনুমান, ভাল্লুক প্রভৃতির সাহায্য নেয়। অনেক গবেষকের মতে আমরা যদি এই হনুমান, বানর প্রজাতিকে আক্ষরিক অর্থে ধরে নিই তাহলে *রামায়ণ* একটি রূপকথার কল্পকাহিনি মাত্র হয়ে যায়। অনেকের মতেই রামায়ণের এই বানর, হনুমান প্রজাতি আসলে ভারতের সেই আদিম বাসিন্দা। রিজলি সাহেবের মতে লোধারা শবর প্রজাতি। পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ এরা নিষাদ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। *রামায়ণ*-এও আমরা শবরী কাহিনি পাই। তৎকালীন সমাজেও কঠিন জাতিভেদ প্রথা ছিল। শূদ্র ও বর্ণবাহ্যদের হীন চোখে দেখা হত, তাদের কোন সামাজিক সম্মান ছিল না। রামায়ণে রামের দ্বারা এক শূদ্র তপস্বী শম্বুককে হত্যা জাতিভেদ প্রথার উদাহরণ। বাল্মিকীর রামায়ণের উত্তরকাণ্ড-র এই 'শম্বুকবধ' কাহিনি থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন যুগে সমাজের চোখে শূদ্রের তপস্যা, বিদ্যা শিক্ষা, ন্যূনতম মানবিক অধিকার ছিল না, তারা অস্পৃশ্য।

সুদীর্ঘকালের ভারতীয় ঐতিহ্যর ধারা বহনকারী *মহাভারত*-এ তৎকালীন আর্য-অনার্য ভেদ, জাতপাতের ভেদাভেদ, বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় আছে। *মহাভারত*-এ দাস, নিষাদ, পুলিন্দ, শবর, দস্যু, অসুর, ব্যাধ, কিরাত প্রভৃতি আদিম অনার্য জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। কথায় বলা হয় *মহাভারতে* যে বিষয়ের উল্লেখ নেই, সারা ভারতেও তার অস্তিত্ব নেই। মহাভারতে বর্ণগত শ্রেণিবৈষম্যের ভয়াবহ জাত্যাভিমানজাত নগ্নরূপ স্পষ্ট। অস্ত্রগুরু দ্রোণ অরণ্যচারী নিষাদকে শিষ্যরূপে স্বীকার করতে তাঁর ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বাধা লাগে। দ্রোণাচার্য একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে অস্বীকার করে। এছাড়াও মহাভারতের স্থানে স্থানে জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ পাই। মহাভারতে মানুষের বর্ণের কথার পাশাপাশি চন্দ্রকে ক্ষত্রিয় ও অগ্নিকে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে প্রান্তিকতার তত্ত্ব তৈরি হয় অনেক পরে। ভারতে আর্যদের আগমনের পরে তারা তাদের বুদ্ধি ও লেখালেখির জোড়ে প্রভু হয়ে বসল এদেশে। যারা আর্য নির্মিত তত্ত্ব তথা ধর্মগ্রন্থ, স্মৃতিপুরাণ মেনে চলল না, নিজেদের সংস্কৃতির ধারা মেনে চলল, আর্যরা তাদের 'দাস' বা 'দস্যু' নামে অভিহিত করল। *বেদে (পুরুষোক্ত)* উল্লিখিত সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হতে বৈশ্য ও চরণ হতে শূদ্র জাতি উৎপন্ন হয়েছে বলা হয়েছে। যারা এই চার বর্ণ হতে পৃথক তাদের 'সঙ্করজ' বলা হয়। *মনুসংহিতা*য় অনার্য 'ভ্রষ্টক্ষত্রিয়'

আখ্যায় ভূষিত। *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণে শূদ্রকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে— সৎ শূদ্র (জলচল) ও অসৎ শূদ্র (জল অচল)। আর্যরা এদেশে তাদের প্রভুত্ব বিস্তারের পর আমাদের দেশে তাদের সাহিত্য 'মেইনস্ট্রিম' হয়ে গেল, যারা বাদবাকি পড়ে রইল তারা প্রান্তিক। আর্যদের রচিত সাহিত্য বা শাস্ত্র, তাতে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জোয়ালে, ক্ষমতারক্ষার তাগিদে বর্ণভেদের কথা লিখেছেন। প্রাচীন বর্ণভেদ ছিল কর্মভেদে, কিন্তু ধীরে ধীরে বর্ণভেদ জন্মগত হয়ে দাঁড়াল। বর্ণব্যবস্থার একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় উচ্চবর্ণের গভীর স্বার্থ এবং সামাজিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের শোষণ, যা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন নিজেদের স্থান বা কাজ পরিবর্তন করতে পারেনা, তেমনই বর্ণভেদ জন্মগত হওয়ায় নিম্নজাতি রূপে চিহ্নিত মানুষদের জন্যও উচ্চবর্গীয় শ্রেণি দ্বারা নির্ধারিত একটা সামাজিক গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, যেমন- মন্দিরে পৌরহিত্যের অধিকার কেবল ব্রাহ্মণদের। *ধর্মশাস্ত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি একজন মানুষ পূর্বজন্মে ভালো কৃতকর্মের ফলে সে উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষ তার পূর্বজন্মের ঘৃণ্য কৃতকর্মের ফলে সে নিম্নজাতিতে জন্মগ্রহণ করে, এমনকি সে গাধা বা শূকররূপেও জন্মগ্রহণ করতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে 'চর্যাপদ'কেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বলা হয়। চর্যাপদে 'শবর', 'কাপালিক', 'ডোম', 'চণ্ডাল' ইত্যাদি আদিবাসী এবং নিম্নবর্গ প্রান্তিক মানুষদের সমাজজীবন চিত্র লিপিবদ্ধ। ভারতের আদিম জনজাতি শবর গোষ্ঠী। চর্যাপদের ২৮ এবং ৫০ নং পদে শবর-শবরী জীবনের সজীব জীবনালেখ্য লিপিবদ্ধ, এই দুই পদের কবি শবরীপাদ, যিনি তাঁর গুরু নাগার্জুনের আদেশে শ্রী পর্বতে বসবাসকালীন শবরজাতিসুলভ জীবনযাপন করেন। এর পরবর্তীতে 'শবরীশ্বর' বা 'সিদ্ধ শবরী' নামে পরিচিত হন। চর্যাপদের ২৮ নং পদ—

'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরিহণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।। ধ্রু।।
উথও সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
নিঅ ঘরণী ণামে সহজ সুন্দারী।।ধ্রু।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।

একেলি সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী।।ধ্রু।।

... গিবিবরসিহ সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে।। ধ্রু’।।[১]

চর্যায় এই ২৮ সংখ্যক গানের বা পদের সৌন্দর্য মূলত ঐতিহাসিক মূল্যায়নেই, কেবল কাব্য সৌন্দর্যেই সাহিত্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় না। এই পদে প্রাচীন বঙ্গের প্রাগার্য আদি জনগোষ্ঠীর পরিচয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত। পদে উল্লেখিত ‘শবর’ আর্য-পূর্ব আদি অস্ট্রাল জনগোষ্ঠী এক সুপ্রাচীন জনজাতি। তাদের বাস উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে, শবর বিহারের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র- এই তিন ধাতুতে নির্মিত খাট পাতে এবং বিহারকালে তাম্বুল, কর্পূর খায়। শবর রমণীরা একা সেজেগুজে বনবিহারে যেত। শবরী কন্যাদের পরিধেয় ছিল ময়ূরের পালক নির্মিত এবং গলায় অলংকার হিসাবে থাকত গুঞ্জা বিচির মালা, কর্ণে কুন্তল। এই পদ থেকে জানা যায় তারা ব্রাহ্মণদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য। চর্যাপদে শবর বিষয়ক আরেকটি পদ, ৫০ নং পদ—

‘গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী হেঞ্চে কূরাঢ়ী।

কণ্ঠেঁ নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।।ধ্রু।।

ছাড়ুছাড় মাআমোহা বিষমো দুন্দোলী।

মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী।। ধ্রু।।

হেরি ষে মরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।

ষুকড় এবে রে কপাসু ফুটিলা।।ধ্রু।।

তইলা বাড়ির পাসেঁ রে জোহ্নাবাড়ি ভাএলা।

ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলি আ।।ধ্রু।।

কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা।

অনুদিণ সবরো কিংপি ণ চেবই মহাসুহেঁ ভেলা।।ধ্রু।।

চারিবাসে গড়িলা রেঁ দিআঁ চণ্ডালী

তঁহি তোলি শবরে দাহ কএলা কান্দল সগুণ শিআলী।।ধ্রু।।

মারিল ভব মত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।

হের সে শবরো ণিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী।।ধ্রু'।।[২]

এই পদে শবর-শবরী লৌকিক সমাজজীবন চিত্র ছাড়া তাদের বৌদ্ধতন্ত্রে একটি ভূমিকা সুস্পষ্ট। বৌদ্ধতন্ত্রে শবর বজ্রাধর, শবরী দেবী, নৈরাত্মা। দেহের শীর্ষকমলে সহজকায়ে তাদের মিলন মহাসুখ। এই পদেও শবরদের বাস পর্বতেই এবং তাদের বাড়ির পাশেই 'কঙ্গুচিনা', কাপাস ফোটে। এই পদে তাদের জীবিকার উল্লেখও পাওয়া যায়। তাদের কৃষিনৈপুণ্য পরিচয়ের পাশাপাশি শবরদের যে ব্যাধ বৃত্তি ছিল তা বোঝা যায়। তাদের মৃত্যুর পর হিন্দুদের মতই শবদাহ করা হত এবং দশদিকে কাক বলি দেওয়া হত। এই কাকবলি প্রথা প্রাচীন আদিবাসী প্রথা যা বর্তমানে লুপ্ত।

এছাড়াও 'চর্যাপদ'-এ নিষাদ, ডোম, চণ্ডাল, কাপালিক নিম্নজাতির কথা পাই, যারা শবরদের ন্যায় ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে অস্পৃশ্য ও অবহেলিত। 'নিষাদ' জনগোষ্ঠী আদিম অষ্ট্রালের এক গোষ্ঠী, যাদের জীবিকা শিকার। মানুষের অস্তিত্বের প্রায় বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত শিকার ও সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে। প্রাচীনে এবং বর্তমানেও বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিকার ও সংগ্রহের জীবনযাত্রা দেখা যাবে। ৬ এবং ২৩ সংখ্যক পদে এই নিষাদজাতির এবং ১০, ১৪, ১৮, ১৯ সংখ্যক পদে ডোম জাতির কথা পাওয়া যায়। ৪৭ এবং ৪৯ সংখ্যক পদে চণ্ডালদের কথা পাই। ৫০ সংখ্যক পদে চিত্রিত শবরের মৃত্যু হলে, চণ্ডালকে দিয়ে শবদাহ করা হয়েছে। চণ্ডাল ও ডোম জাতির অবস্থান হিন্দুসমাজের একেবারে নিম্নস্তরে। চর্যাপদে ডোম, চণ্ডাল জাতির জীবনচিত্র উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত। চর্যাপদে মূলত সেন আমলের সামাজিক বৈষম্য, উচ্চবর্ণের মানুষদের নিম্নবর্ণের প্রতি বিভিন্ন ধরনের ব্যভিচার-অন্যায় এবং নিম্নবর্ণের অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, চর্যাপদে বর্ণিত এই প্রান্তিক ও জনজাতির জীবনচিত্র প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চর্যাপদের পর বাংলা ভাষার দ্বিতীয় প্রাচীনতম নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াইকে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মহাশয় 'সাঁওতাল' সমাজের চরিত্র বলে মনে করেছেন।[৩] ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণ ও ক্ষমতার বদল ঘটে। তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিম্নবর্গের কাছাকাছি আসে, তখন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ক্রমে নিম্নবর্গীয় মানুষদের লৌকিক দেব-দেবী মনসা, চণ্ডী, কৃষকদেবতা শিব এবং প্রণয়বিলাসী দেবতা কৃষ্ণ এবং তাঁদের মাহাত্ম্যকেও

স্বীকার করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এই বর্গ সংযোগে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলার নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যায়িকাগুলিতে লৌকিক দেবদেবী, নিম্নবর্গের দেবদেবীরা স্থান পায়, সূত্রপাত ঘটে 'মঙ্গলকাব্য'র। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ বলতে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বলা হয়, তবে ত্রয়োদশ শতক থেকেই মঙ্গলকাব্য রচনার আয়োজন চলছিল বলা চলে। মঙ্গলকাব্যের দেবতা ও মানুষের লড়াইয়ে ফুটে উঠেছে সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের চিত্র। এই মঙ্গলকাব্য উৎপত্তির মূলে, তৎকালীন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, আবহমানকাল ধরে চলে আসা জাতি বিপর্যয় এবং নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গের টানাপোড়েন ও সংঘাত। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন- দেশীয় ধর্মসংস্কৃতির যে চর্চা সেনযুগের আগে বাংলার বুকে চর্চিত হত তা অবলুপ্ত হয়নি, সমাজদেহে থেকে গেল এবং বাঙালি হিন্দুদের সামজিক জীবনের এই সন্ধিমুহূর্তে দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নতুন আদর্শের সংঘাতে বাংলা পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৪] মঙ্গলকাব্য মূলত পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয়। মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন নিম্নবর্গীয় মানুষ দিনের পর দিন অবহেলিত হতে হতে, তারাও উচ্চবর্গীয়দের কাছে প্রয়োজনীয় হতে পারে, মঙ্গলকাব্যের বিশ্লেষণে তা যেন প্রকট হয়ে ওঠে। মূলত তুর্কিদের কাছে পরাজিত হিন্দুসমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে চাইল পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যে দিয়ে।

যে সময়ে মঙ্গলকাব্য রচনা হয়েছে সেই সময়ে আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয় যারা, তাদের মধ্যে বর্গীকরণ ছিল না। তৎকালীন সময়ে আদিবাসী ও প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় যারা তারা প্রায় একই ছিল সমাজের কাছে। শ্রমনির্ভর শ্রেণিবিভাগে আদিবাসী ও নিম্নবর্গ হিন্দুদের-দের মধ্যে পার্থক্য নেই। সেই যুগে বর্ণগত ভেদাভেদ ভীষণরূপে প্রতীয়মান এবং এই ভেদাভেদের কারণে যে মানুষগুলো সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে ছিল তারাই মঙ্গলকাব্যের মুখ্য চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে, উঠে এসেছে তাদের জীবনসমস্যার কথা। তৎকালীন যুগে বর্তমান সমাজের ন্যায় এই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া ছিল না। তৎকালীন সময়ে আর্য ও অনার্যদের নিয়ে গঠিত সমাজ ব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান ছিল সর্বনিম্ন। এই শূদ্রদের মধ্যে আদিবাসীরাও অন্তর্ভুক্ত। এই পিছিয়ে পড়া, অচ্ছুত মানুষগুলো, যাদের পেশাগত পরিচয় একই, তারাই প্রান্তিক-নিম্নবর্গ।

মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে প্রথমেই আসি 'মনসামঙ্গল' কাব্যে। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে চণ্ডালজীবনের কথা পাই। এই কাব্যে দেখি রাখালদের দলপতি লাটিক চণ্ডালের হাত থেকে দেবী মনসা

পূজা নিয়েছেন। এছাড়া লখিন্দর ও বেহুলা যখন নিজ দেশে ফেরে তার ডোমের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। বিপ্রদাস পিপিলাই 'মনসামঙ্গল'-এ জাতিভেদে ক্লিষ্ট সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের আসলে মনসার পূজা প্রচারের মাধ্যমে মূলসমাজে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির ইচ্ছাপূরণ ঘটাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এখানে মনসা যেহেতু কাব্যে নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিনিধি, সেক্ষেত্রে মনসা চরিত্রে দুটি চাপ অনুভূত হয়- উচ্চবর্গে গৃহীত দেবতাদের চাপ এবং নিম্নবর্গের পূজক সমাজের চাপ। এছাড়া মনসামঙ্গলে নেতা- প্রত্নইতিহাসের নিত্যাদেবীর ঐতিহ্য বহন করে এনেছে যোগী সম্প্রদায়। এঁরা বরাবরই যাযাবর। আমাদের ঐতিহ্যে যখন ধরা পড়লেন তখন থেকেই এঁরা শিবের অনুচর।[৫] নেতা-র বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'বিভাব' পত্রিকায় সুকুমার সেন 'মহাদেবী নিত্যা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। যাযাবর আদিবাসীরাই আসলে যারা অনার্য, যারা এদেশের আদিম বাসিন্দা ছিল। এছাড়া মনসা পূজা ও তৎসংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠান আলোচনার ক্ষেত্রে বারংবারই নিম্নবর্গীয় সমাজ ও বাংলার জনজাতিদের প্রসঙ্গ এসেই যায়। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নানান আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মাতৃকা পূজা আর কৃষিকর্মের বিকাশের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী, যেখানে নারী দেবতার সংখ্যাই বেশি, যাদের উৎপত্তি মূলত অনার্য সমাজে। তার কারণ বিশ্বের বিভিন্ন আদি জনগোষ্ঠীতে মাতৃকাপূজা প্রাধান্য পেত। প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অনার্যদের উপাস্য দেব-দেবীর মধ্যে অন্যতম মনসা ও চণ্ডী। মনসা ও চাঁদ সদাগরের যে সংঘাত তা আসলেই আগন্তুক আর্যদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অনার্যদের সংঘাতের কাহিনি।

ভারতবর্ষ, এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও সর্পপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে বর্তমান সময়ে কৃষির সঙ্গে মাতৃকা পূজা নানা প্রতীকের মধ্য দিয়ে চলে আসছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও মনসাবৃক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে আর্য এবং অনার্যদের ধ্যানধারণার সংমিশ্রেণে কল্পিত মনসা চরিত্রটি। তবে মনসাদেবী যে নিম্নবর্গের মানুষের পূজিতা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। সাঁওতাল, ওঁরাও, কুর্মী, হো এছাড়াও আরও জনজাতি এবং প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত।

'মনসামঙ্গল' কাব্য আলোচনার পর আসি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কথায়। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে আরাধ্যা দেবী চণ্ডী বিন্ধ্যবাসিনী বা অরণ্যচারিণী। চণ্ডীও নিম্নবর্গের উপাস্য দেবী, কিন্তু আর্য-পরবর্তী সময়ে অনার্য-

আর্য সংমিশ্রণে চণ্ডী যুগে যুগে বিবর্তিত। ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওঁরাও উপজাতির মধ্যে ‘চণ্ডী’ নামক এক দেবীর অস্তিত্ব আছে। মুণ্ডাভাষী বিরহোড় জাতির মধ্যেও ‘চণ্ডীবোঙ্গা’ নামক দেবতার অস্তিত্ব আছে-

> ‘আনুমানিকভাবে দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত উপপুরাণ যেমন ‘দেবীভাগবত’, ‘বৃহদ্ধর্মপুরাণ’, ‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’, ‘হরিবংশ’ প্রভৃতিতে চণ্ডীর নাম উল্লিখিত আছে। এদের মধ্যে কোনো কোনো পুরাণ একেবারে অর্বাচীন না হইলেও, ইহাদের যে সকল অংশে চণ্ডী কিংবা চণ্ডিকার নামের উল্লেখ আছে, তাহা যে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, আদিবাসী সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াই এই দেবী কালক্রমে উচ্চতর হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন।’[৬]

চণ্ডীমঙ্গলে দেখি দেবী চণ্ডী প্রথম পশুদের দ্বারা পূজিত হয়। এই পূজায় অনার্য পূজার ইঙ্গিত বর্তমান। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক কালকেতু ব্যাধ। এই ব্যাধবৃত্তি আমরা আদিবাসী জনজাতির পেশা হিসেবেই দেখেছি। তৎকালীন সময়ে পেশাভিত্তিক জাতিভেদ নির্দিষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে বোঝাই যায় কালকেতু চুয়ার জাতি, আদিবাসী গোষ্ঠীরই ছিল। কালকেতু অভিশপ্ত হয়ে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে, যা সমাজে প্রান্তিক নিম্নবর্গের এবং তা যেন অভিশাপের রূপ হিসেবে প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে সমাজে জাতিভেদ প্রথার নিষ্ঠুর সত্যরূপ পরিস্ফুট। নিম্নবর্গে ব্যাধরূপে জন্ম নেওয়াটাই যে অভিশাপের তা স্পষ্ট। এছাড়া কাব্যে কোল, হাঁড়ি, চামার, কিরাত, বাউরি ইত্যাদি প্রান্তিক জাতির উল্লেখ পাই। কালকেতু কলিঙ্গরাজের যুদ্ধে যোগ দিতে গেলে উক্ত জাতির লোকেরা কালকেতুর পক্ষে যোগ দেয়। এদের বাস জঙ্গলে, এরাই সমাজের অপাঙক্তেয়, গোত্রহীন, নিচুশ্রেণির মানুষ যারা চিরকালই প্রয়োজনে ব্যবহৃত ও যারা শ্রমের বিনিময়ে টিকে থেকেছে। তৎকালীন সময়ে ‘নীচজাতি’র অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা হল, দেবী যখন কালকেতুকে নিজ পরিচয় দিয়ে বর দান করলেন, তখন কালকেতুর মনের কথা—

‘হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি।
কি কারণে মোর ঘরে আসিলে পার্ব্বতী’।।[৭]

এরপরে কালকেতু সমাজের প্রান্তিক নিম্নবর্ণের হওয়ায় রাজন্যবর্গ তাকে অস্পৃশ্য প্রতিপন্ন করে অপমান করার জন্য বলে—

'ছুঁইতে নিষেধ বেদে অতি হীন জাতি'[৮]

কাব্যে এই নিচ জাতি বলে কালকেতুকে যে অপমান বা তার স্বগতোক্তি, সবকিছুতেই স্পষ্ট সমাজের সামাজিক ভাবনা, প্রান্তিক জীবন ও নিম্নবর্গের অবস্থান চিত্র।

'চণ্ডীমঙ্গল'-এর পর আসি ভারতচন্দ্রের লেখা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের আলোচনায়। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দেবী অন্নদা, চণ্ডীরই আর এক রূপ। কাব্যে 'ব্যাসপর্ব' সমাপ্তির পর শুরু 'হরিহরের পালা'। এই হরিহর পালায় কুবের সহচর বসুন্ধর অভিশপ্ত হয়ে বাংলার বার্জুয়া পরগনার অতি দরিদ্র বিষ্ণু হোড়ের স্ত্রীর গর্ভে জন্মায়। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি নিম্নবর্গে জন্মানো একটা অভিশাপ। এখানেও দেখি বসুন্ধর হোড় জাতির ঘরে জন্মায়, সাঁওতালরা 'হড়' নামে পরিচিত। আর এক জনজাতি 'বিরহোড়'। এখানে বিষ্ণু হোড় কোন জাতি তার উল্লেখ নেই। কিন্তু সে যে নিম্নজাতির একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কারণ অন্নদাও নিম্নবর্গেরই পূজিতা এবং বিষ্ণু হোড়ের পেশা থেকে বোঝা যায় সে নিম্নবর্গীয়। তবে নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই হরিহোড় পালার বিষ্ণু হোড় আদিবাসী সম্প্রদায়ের হতেও পারে। কারণ আদিবাসীদের সঙ্গে বিষ্ণু হোড়ের জীবনযাপনের যে চিত্র পাই এবং তার পদবির সঙ্গে সাযুজ্য বর্তমান।

'রায়মঙ্গল' কাব্যের অধিষ্ঠিত দেবতা দক্ষিণ রায়। ইনি ব্যাঘ্রের উপদ্রব উপশমের দেবতা। সুন্দরবন অঞ্চলে এই দেবতার পূজার প্রচলন বেশি। দক্ষিণ রায় তিনি অনার্যদের দেবতা, প্রাগার্য সময়ে ব্যাঘ্রপূজার প্রচলন যে ছিল তা মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের সময় জানা যায়। ছোটনাগপুরের সাঁওতালদের মধ্যে ব্যাঘ্রপূজার প্রচলন আছে। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জীবনচর্যা ও জীবনসমস্যা চিত্রিত।

মঙ্গলকাব্য ধারায় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে নিম্নবর্গের মানুষ দ্বারা পূজিত ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৈদিক দেবতা সূর্যদেবতার মিল যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনই প্রাগার্য সময় থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য 'সূর্যদেবতা'র মিলও পাওয়া যায়। আদিবাসীদের প্রধান দেব-দেবতাদের মধ্যে সূর্যদেবতা অন্যতম, যা

'সিং-বোঙ্গা' নামে প্রচলিত। ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে আদিবাসীদের ধর্মাচার গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউ সেনের কাহিনির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে কালুডোম আর লখাই ডোমের বীরত্বের কাহিনি। লাউ সেনের সেনাবাহিনীতে ডোম জাতির মানুষ আছে। ডোম পণ্ডিত ছাড়া ধর্মের পূজা হয় না। এছাড়া লোহাটা বর্জর, যে চণ্ডাল সম্প্রদায়ের।

চর্যাপদে ও মঙ্গলকাব্যে যে ডোম, চণ্ডাল অন্ত্যজ জাতির কথা পাই, তারাও ছিল শবর জাতির মানুষদের মতই সমাজের কাছে অস্পৃশ্য ও অবহেলার পাত্র। এর থেকেই বোঝা যায় যে তৎকালীন সময়কালেও জাতিভেদ প্রথা ছিল প্রকট। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারায় এসেছে মনসা, শিব-চণ্ডী, সূর্যদেবতা ও ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবকুল। চণ্ডীমঙ্গল-এ বর্ণিত কালকেতু চুয়ার জাতি। 'শিবায়ন' কাব্যে চণ্ডীর কোচনী বেশ ধারণ। কোচনী অর্থাৎ আদিবাসী কোচজাতীয় রমণী। ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর হল প্রাগার্য সূর্যদেবতা। এই সূর্যদেবতা বা ধর্মঠাকুর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের উপাস্য। মূলত এইসব দেবতা অনার্য তথা বন্য জাতির দেবতা রূপে পূজিত।

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে শ্রীচৈতন্য, কবীর, গুরু নানক প্রমুখ মনীষীদের আবির্ভাব ও ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচারের ফলে তৎকালীন সময় এবং তৎপরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণে গোঁড়ামি, সমাজচেতনা, মানবতার মূল্যবোধ, বঙ্গসাহিত্যে সরসতা, ভক্তিবাদের প্রাবল্য, সামাজিক সাম্যবাদ, প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রয়াস দেখা যায় ফলত সাহিত্যে প্রান্তিক, অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষরা উঠে এল। মধ্যযুগ পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকযুগের গোড়ার দিকে উনিশ শতকে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মূল্যায়ন নবরূপে উদ্ভাসিত। উনিশ শতকে বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিবান মানুষেরা প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে উৎসাহ বোধ করেন। ইতিমধ্যেই ইংরেজ প্রশাসক, নৃতত্ত্ববিদ ও মিশনারিরা জনজাতি বা 'ট্রাইব' সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় লেখালিখি শুরু করেছিলেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরে নৃতত্ত্ব বা মানববিজ্ঞান চর্চার বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়- হেনরি মেইন এর *অ্যানসিয়েন্ট ল* (১৮৬১) এবং *ভিলেজ কমিউনিটিজ ইন দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট* (১৮৭১), ই.বি. টাইলরের *রিসার্চেস ইনটু দ্য আর্লি হিস্ট্রি অব ম্যানকাইন্ড* (১৮৬৫), *প্রিমিটিভ কালচার* (১৮৭১), ল্যুই হেনরি মর্গান এর *সিস্টেমস অব কনস্যানগুইনিটি অ্যান্ড অ্যাফিনিটি অব দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি* (১৮৭১) প্রকাশিত হয়।[৯] সে সময়ে বিদেশীদের দ্বারাই মূলত আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে লেখালিখি হয়, কিন্তু এই রচনার পিছনে মূলত রাজনৈতিক স্বার্থ এবং

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য এবং ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) আদিবাসী জনসমাজের কথা তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ'(প্রথম খণ্ড ১৮৮৭, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯২) এর অন্তর্গত 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'জাতিতত্ত্ব' বিষয়ক গবেষণায় বলেন– বঙ্গের কৈবর্ত মূলত অনার্য বংশ সম্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে নয়টি আদিবাসী জাতির কথা বলেছেন— (১) সাঁওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (৪) মুণ্ড বা মুণ্ডারী, (৫) বীরহোড়, (৬) বাড়ুয়া, (৭) কুবু বা কুকু বা মুযার্সি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং।[১০] এছাড়াও তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা ও বাসস্থান নিয়েও আলোচনা করেছেন। অনার্যদের দ্রাবিড় বংশীয় ও কোলবংশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে আদিবাসীদের বসত অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন–

> 'জুয়াঙ্গোরা উড়িষ্যার ঢেঁকানান ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। কুর বা মুর্যাসির সঙ্গে এই ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নেই। খাড়িয়ারা সিংভূমের অতিশয় পার্বত্য প্রদেশে বাস করে। মালভূমের পাহাড়েও তাদের পাওয়া যায়। বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। ইহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত 'অসুর' নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুর্কু জাতি আরও পশ্চিমে।
>
> সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যায় বৈতরণীর তীর পর্যন্ত ৩৫০ মেইল ব্যাপী অঞ্চলে বাস করে। কোথাও কম, কোথাও বেশি। যে প্রদেশ এখন 'সাঁওতাল পরগণা' বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর– এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালদিগের বাস আছে। হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়কা বা লড়াইয়া কোল বলে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়ানাগপুর অঞ্চলে বাস করে'।[১১]

এই প্রবন্ধে কেবল আদিবাসী সমাজ সম্পর্কিত তথ্য, আর্য-অনার্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে কেবল, আদিবাসীদের জনজীবন প্রতিফলিত হয়নি। এই সময়েই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) 'পালামৌ' (১২৮৭-৮৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। 'পালামৌ' ভ্রমণমূলক কাহিনি হলেও, এই রচনায় কোল ও অসুর জনজাতি জীবনের কিছু চিত্র পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) 'রাজকাহিনী'র

(১৯০৯) চারটি কাহিনি- ‘শিলাদিত্য’, ‘গোহ’, ‘পদ্মিনী’ ও ‘বাপ্পাদিত্য’। ‘গোহ’ ও ‘বাপ্পাদিত্যে’র কাহিনিতে ভীল জনজাতির জীবনযাপনের চিন্তা-চেতনা ও ভীল বিদ্রোহের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া লেখিকাদের লেখনীতেও আদিবাসী প্রসঙ্গ পাওয়া যায়- স্বর্ণকুমারী দেবীর কর্নেল টডের রাজস্থানের কাহিনি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা ‘মিবাররাজ’ (১৮৮৭) এবং ‘বিদ্রোহ’ (১৮৯০), উভয় রচনাতেই আদিবাসী ভীল গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ, ভীল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক উপাদান উপজীব্য। এছাড়া উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে ও বিশ শতকের একেবারে সূচনাতে স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘নীলগিরির টোডা জাতি’ (ভারতী, মাঘ ১৩০২), গিরিবালা দেবীর ‘সিংভুমের কোলজাতি’ (ভারতী, ভাদ্র ১৩০০), হেমন্তকুমারী দেবীর ‘খাসিয়া জাতি’ (অন্তঃপুর, ১৩০৮) আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। এব্যতীত বঙ্গসংস্কৃতি চর্চায় আরও অনেক সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, ইতিহাসবিদ প্রমুখ দিকপালদের লেখনীতে আদিবাসী জনজীবন চর্চার নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ সমৃদ্ধ হয়েছে। বহু খ্যাত-অখ্যাত, অজ্ঞাত লেখকদের আদিবাসী চর্চা সংকলন তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত লেখকদের লেখায় আদিবাসীচর্চার সন্ধান পেলেও উনিশ শতকে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আদিবাসীদের জীবনচর্যার নিবিড়রূপ সেইভাবে বিশেষ পাওয়া যায় না, তারা তখনও সমাজের ন্যায় সাহিত্যেও ব্রাত্যই। বীরভূমে লালমাটির দেশে রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ সময় যাপন করেছেন, সেখানকার পল্লী প্রকৃতিকে অনুভব করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে আদিবাসীরা খুব বেশি স্থান পায়নি। তবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে গড়ে ওঠা সাঁওতালদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সম্যক পরিচয়ের সন্ধানে একটি গবেষণা সমিতি ছিল এবং আদিবাসী জীবনচর্চাকেন্দ্রিক ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালনায় হাতে লেখা ‘শান্তি’ (শ্রাবণ, ১৩২১) পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথ আদিবাসীদের কথা উল্লেখ করেছেন ‘পল্লীপ্রকৃতির’ অভিভাষণে (বৈশাখ, ১৩৪৭)—

> ‘সেখানকার মানুষ যারা সাঁওতাল – সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি’।[১২]

রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে অন্য লেখকদের লেখাতেও আদিবাসীরা গুরুত্ব পায়নি খুব বেশি। তারা অপাঙ্‌ক্তেয়, উপেক্ষিত। রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা যেটুকু আদিবাসীদের কথা পাই, সেটাকে কখনই আদিবাসীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র বলা যায় না। ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২) কাব্যের ‘কোপাই’ (১লা ভাদ্র, ১৩৩৯) কবিতায় সাঁওতাল মেয়ে তার শ্রমের যথোপযুক্ত মূল্য পায় না, শ্রম-শোষণের একটি চিত্র পাই। রবীন্দ্রনাথের

'বীথিকা' (১৯৩৪) কাব্যগ্রন্থের 'সাঁওতাল মেয়ে' (৪ঠা মাঘ, ১৩৪১) কবিতায় আদিবাসী সাঁওতাল রমণীর দৈহিক সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণিত –

'যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে

শিমুলগাছের তলে কাঁকরবিছানো পথ বেয়ে।

মোটা শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ'।[১৩]

এছাড়া 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'ক্যামেলিয়া' (২৭ শে শ্রাবণ, ১৩৩৯) কবিতাতেও আদিবাসী রমণীর কথা পাই–

'ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।

... বাইরে থেকে মিষ্টিসুরে আওয়াজ এলো, 'বাবু, ডেকেছিস কেনে'।

বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া

সাঁওতাল মেয়ের কানে,

কালো গালের উপর আলো করেছে'।[১৪]

রবীন্দ্রসাহিত্যে আদিবাসী রমণীদের নিয়ে রোমান্টিসিজমের ভাবনা থাকলেও আদিবাসী সমাজ জীবনচর্যার চিত্র সেভাবে পাওয়া যায়না। 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাসে দেখা যায়, পুরোহিত বিল্বন ঠাকুর নক্ষত্র রায়ের বিরুদ্ধে আদিবাসী সৈন্যদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে রাজা গোবিন্দমানিক্যকে উপদেশ দেন। এছাড়া কুকি জনজাতির কথা পাওয়া যায়। 'দুরাশা' (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫) গল্পে দেখি লেপচা জনজাতি 'ম্লেছজাতি' বলে উল্লিখিত। গল্পের কাহিনি এক ম্লেছ ভুটিয়া নারীকে কেন্দ্র করে। বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যসম্ভারে জনজাতিদের কথা যেটুকু ধরা পড়েছে তা যেন তাঁর সৃষ্টির কণামাত্রও নয়। রবীন্দ্রসাহিত্য এবং সমসাময়িক সাহিত্যিকদের লেখায় নিম্নবর্গীয় হিন্দু অন্ত্যজ শ্রেণির কথা থাকলেও, জনজাতিরা ব্রাত্য।

উনিশ শতকের আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত জাতিতত্ত্ব ও পরিচয়মূলক লেখার প্রবণতা পরবর্তী বিশ শতকে আরও ত্বরান্বিত ও ব্যাপ্ত। কথাসাহিত্যের 'কল্লোলযুগ' বলে খ্যাত সময়পর্বে 'কল্লোল' (১৯২৩), 'সংহতি' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬) 'প্রগতি' (১৯২৭) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় একদল তরুণ প্রজন্মের লেখকদের আবির্ভাব ঘটে। এই তরুণ লেখকরা রবীন্দ্রবিরোধী, কথাসাহিত্যের পূর্বতন প্রচলিত রীতি,

ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে বাস্তবতার প্রতি প্রবল ঝোঁক থেকে এক অভিনববীক্ষার সাহিত্য রচনা করতে উদ্যোগী হয়ে তারা প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত, আদিবাসী জীবনচর্যা রচনায় ব্রতী হলেন। আদিবাসী সমাজজীবনের নিবিড় রূপ, যা এতদিন অধরা ছিল তা এই তরুণ লেখকদের হাত ধরে বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত হল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী মানুষেরা উঠে এসেছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী-এর হাত ধরেই, বলা যেতে পারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাত আদিবাসী জনজীবনের সমাজ-সংস্কার-সংস্কৃতি–ব্যক্তিমানুষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সর্বোপরি অজ্ঞাত প্রান্তিক জনজীবনের দ্বার উন্মোচিত হল। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলা সাহিত্যে আদিবাসীজীবন যতটুকু পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব পরিচয়মূলক বিশ্লেষণী তত্ত্বমূলক লেখাই প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া সাহিত্যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে লেখায় কেবলই আদিবাসী রমণীদের নিয়ে রোম্যান্টিসিজমের লক্ষণই প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বা তাদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার বা তাদের প্রতি বিশেষ পর্যবেক্ষণের কোন প্রতিফলন সেভাবে বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ‘বসুমতি’ পত্রিকায় প্রকাশিত জনজাতি জনজীবন, কয়লাখাদান অঞ্চলের আদিবাসী কুলিকামিনদের হৃদয় রহস্য নিয়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘কয়লাকুঠি’ গল্পটি বাংলা সাহিত্য জগতের এক নব দিগন্তের উন্মোচনের পাশাপাশি পাঠকসমাজকেও নবরসের আস্বাদনে উজ্জীবিত করেছিল। বাংলা সাহিত্য জগতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরীর লেখনীতে প্রথম আবিষ্কৃত হল এক অনাবিষ্কৃত জগৎ, পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রফুল্ল রায় প্রমুখের কলমে এই ধারা অব্যাহত। সেই ধারা আরও সমৃদ্ধ হয় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিত, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই প্রমুখের কলমে।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, *চর্যাগীতির ভূমিকা,* কলকাতা: ডি.এম লাইব্রেরি, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯০, পৃ. ২১৫

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

৩. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক্-বৈদিক প্রভাব,* প্রকাশনায়: সুশীল বাস্কে, কলকাতা: সুবর্ণরেখা, দ্বিতীয় প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১১৫

৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা: কলকাতা বুক হাউস, ১৩৪৬, পৃ. ৪

৫. বসু, পথিক (সম্পা.), *বিভাস,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯৪, পৃ. ২৮১

৬. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দশম মুদ্রণ: ২০০২, পৃ. ৪৩৭

৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডী,* এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিঃ, ১৯২১, পৃ. ৭১

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

৯. ঘোষ, দীপঙ্কর, *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা,* কলকাতা: অমরভারতী, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৪

১০. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২,* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, নবম মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২, পৃ. ৩৫১

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশতি খণ্ড),* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৭৪, পৃ. ৫৯৯

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *বীথিকা,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ভাদ্র ১৩৫২, পৃ. ৮৯

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *পুনশ্চ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পঞ্চম সংস্করণ: আষাঢ় ১৪০০, পৃ. ৯৬

তৃতীয় অধ্যায়:

১৯২৩-১৯৯০ দেশ-কাল, পটভূমি ও জনজাতি সমাজ

সমকালকে সংরক্ষিত রাখবার অন্যতম মাধ্যম সাহিত্য। সাহিত্যিকরা চিরকালই এই বিষয়ে সচেতন। মানুষের অতীতের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রয়েছে সমকালীন সমাজবিষয়ক তথ্য এবং এই সমস্ত রচনায় চিত্রিত ঘটনাবলী সমকালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিপুণ ভাবে ব্যক্ত করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের কালান্তরে প্রতিফলিত প্রান্তিক ও জনজাতি সমাজের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর চার দশকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, তথ্য আলোচনা করা হবে। ১৯২৩ থেকে ১৯৯০ সময়পর্বে দেশ-কালের পটভূমি, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাস ও সময়ের প্রেক্ষাপটের ক্যানভাসে জনজাতি সমাজ— এই অধ্যায়ের অনুসন্ধান। এই সময়কালের প্রেক্ষাপট আলোচনায় প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর দেশ-কাল, রাজনীতি এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে আলোকপাত করা হল।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে দেশ-কাল, পটভূমি ও জনজাতি সমাজ:

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আরাকান-রোসাঙ রাজসভায় রচিত দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের কাব্যে। এই কাব্য থেকেই জানা যায়, বাংলার প্রত্যন্ত সীমায় হিন্দু-বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। অষ্টদশ শতকেও সাহিত্যে কাল সচেতনতার মনোভাব স্পষ্ট। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', রামপ্রসাদের 'শাক্তপদাবলী'তে মোগল সেনা শাসন ও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু, মন্বন্তর, কোম্পানির আগমন অর্থাৎ তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র লিপিবদ্ধ। উনিশ শতকের সাহিত্যে সতীদাহ-নিবারক আন্দোলন, বিবাহ বিধবা, কৌলীণ্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও বিভিন্ন আন্দোলন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচিত্র ঘটনাবলী চিত্রিত। বিংশ শতাব্দীর বাংলা রাজনৈতিকভাবে উত্তাল ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে দেশের জনতা উত্তাল হলে তার প্রভাব সাহিত্যেও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাঙালির, আপামর ভারতবাসীর। ইংরেজরা দেশাধিকার করার পর বিদ্রোহের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। ইংরেজরা খনিজ সম্পদের লোভে আদিবাসীদের বাসভূমিতে বারবার আঘাত করতে থাকে। অরণ্য অঞ্চলে বেশিরভাগ খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ায় আদিবাসীদের বাসভূমিতে ইংরেজ সরকার হস্তক্ষেপ করে এবং বনভূমির পরিমাণ যেমন কমতে থাকে তেমনই আদিবাসীরা ক্রমাগত

সর্বস্বহারা হতে থাকে। স্বাধীনতার আগে ও পরে এবং বর্তমানেও প্রায় একই অবস্থা। এপ্রসঙ্গে অচিন্ত্য বিশ্বাস মহাশয় তাঁর ‘আদিবাসী জীবন সংগ্রাম’গ্রন্থে তরুণ বিকাশ লাহিড়ীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন–

> ‘ভারতে ব্রিটিশ শক্তি কায়েম হবার আগে গহন অরণ্যসমূহ দেশের চার কোটি আদিবাসীর নব্বই শতাংশ বাস করতেন। ১৮৭৫ সালে ইংরেজ রোজ যে অরণ্য আইন চালু করে তার ফলে ভারতের বনাঞ্চলসমূহ ধীরে ধীরে সরকারের আওতায় আসতে শুরু করে, আদিবাসীদের উদ্বাস্তু হওয়া শুরু হয়। যখন ভারত স্বাধীন হল, বনভূমির শতকরা সাত্তাত্তর ভাগ সরকারী নিয়ন্ত্রাধীন ছিল। ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। আদিবাসীদের পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে খুঁজতে হচ্ছে নতুন জীবিকা।’[১]

আদিবাসীরা সভ্যতার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে তাদের জীবনের বিনিময়ে, শ্রমের বিনিময়ে সভ্যতার উন্নয়ন হয়েছে আর ক্রমাগত এক শ্রেণির মানুষ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল থেকেই বাংলা আন্দোলনে আলোড়িত। ১৯০৫ সালে ভারতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রোধ, এরপর দেশের মানুষের স্বদেশী আন্দোলন, যার প্রভাব দেশের প্রতিটা কোণায় পড়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), যুদ্ধ পরবর্তী সময় জাতীয় জনজীবন ও সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। ত্রিশের দশকে দেশ জুড়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং অহিংস সত্যাগ্রহের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। লবন সত্যাগ্রহ বাংলার ঘরে ঘরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর উল্লেখ আমাদের নির্বাচিত আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী গল্পেও পাওয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমরকালীন পরিস্থিতির আঁচ বাংলা সাহিত্যে আসে, লেখার বাঁকবদল ঘটে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯৪২-এর ‘অগাস্ট আন্দোলন’ বা ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন, এর পরেই ১৯৪৩-এর মন্বন্তর বা ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিফলন। বাংলায় এক সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, মন্বন্তর, কালোবাজারি, খাদ্যসংকট, চোরাকারবার, বুর্জোয়া ও ধনতান্ত্রিক সমাজের উত্থান, বোমার ভয়ে কলকাতার লোকেদের শহর ছেড়ে গ্রামে পলায়ন, সাহেবদের একে একে দেশত্যাগের ঘটনা মূর্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। বাংলা আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী ছোট গল্পগুলিতেও এই চিত্র প্রস্ফুট। শহর ছেড়ে যখন মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের তাগিদে গ্রামে যায় তখন তাদের পরিচয় ঘটে সমাজের

প্রান্তবাসী জনজাতি জীবনের সঙ্গে। এই যন্ত্রণাকাতর উত্তাল সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে গল্পগুলি বিশ্লেষণে স্পষ্টরূপ পাওয়া যাবে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতে আদিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। আদমশুমারী অনুযায়ী ১৯৮১ স্বাধীনতা উত্তরকালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫,৯৬,২৮,৬৮৩। ১৯৪১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী আদিবাসীরা 'উপজাতি' রূপে চিহ্নিত হয়, ১৯৫০ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি আদেশনামায় ঘোষিত হয় 'তফশিলী উপজাতি' হিসেবে।[২] পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে তালিকার পুনর্বিন্যাস করা হয় ও সংশোধিত রূপ প্রকাশ পায়। ১৮৬১ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাশ হয় পার্লামেন্টে এবং পরবর্তীতে ১৮৭০ সালে ভারত সরকার আইন অনুযায়ী 'উপজাতি স্বতন্ত্রকরণ আইন' কার্যকর হয়। উক্ত আইনানুযায়ী আদিবাসী অঞ্চলগুলি চিহ্নিত হয় 'তফশিলী অঞ্চল' বা '*Scheduled Tracts*' নামে এবং ১৮৭৪-এর উক্ত বিধি অনুযায়ী 'তফশিলী জেলা' আইন রূপে স্বীকৃতি পায়।[৩] ১৯১৭ সালে আদিবাসীদের স্বার্থে গৃহীত হয় 'ভূমি হস্তান্তর আইন' (*Land Transfer Act*)।[৪] এই আইন অনুসারে গভর্নর এজেন্টের বিনা অনুমতিতে আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি জমি হস্তান্তর করতে পারবে না, আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে হলে এজেন্সি অঞ্চলের আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে, ডিক্রি পেলেও কোন ব্যক্তি আদিবাসীর অস্থায়ী সম্পত্তি নেওয়া বা ক্রয় করার অধিকারী হবে না। ১৯১৭ সালে সংগঠিত হয় মেড়ি আন্দোলন।[৫] এই আন্দোলনের উল্লেখ সাহিত্যে খুব একটা পাওয়া যায় না। ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৯৫ সালের বিরসামুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডাবিদ্রোহের পর চালু হয় ভারতের 'বন আইন'। এরপরও জমিদারদের নিদারুন অত্যাচার শোষণের কারণে আদিবাসীরা 'মেড়ি আন্দোলন' করে। এই মেড়ি আন্দোলনের পর ইংরেজরা অন্যায়ভাবে তাদের দমন করে এবং বহু আদিবাসীকে দ্বীপান্তর করে, হত্যা করে। এই আন্দোলনে ব্যর্থ হলেও বিভিন্ন জনজাতির মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এরপরই ১৯১৮ সালে আদিবাসী সমাজের 'রক্ষামূলক ব্যবস্থা'র জন্য ও আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 'বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন' সংশোধন করা হয়।[৬] ১৯১৫-২০ সালের ইংরেজ শাসকদের শাসন ও শোষণের অন্তর্নিহিত অর্থ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষগুলো বুঝে নেওয়ায় রাঁচি, হাজারিবাগ, চাইবাসা অঞ্চলের অধিকার সচেতন মুণ্ডারা তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯২০-২২ সালে গোটা ভারতবর্ষে 'অসহযোগ আন্দোলন'-এ জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভ প্রকাশ পায়। ফলশ্রুত ১৯২৪ সালে

‘বেগার প্রথা’র মত শোষণকারী কুপ্রথার উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য গভর্মেন্ট একটি সার্কুলার জারি করেন।[৭] যদিও যতই নিয়ম হোক এই নিয়মের তোয়াক্কা গর্ভমেনট অফিসাররা নিজেরাই খুব একটা করত না, এর পঞ্চাশ-ষাট বছর পরও বাস্তবে বেগার প্রথা রয়েই যায়। সাহিত্য সময়-ইতিহাসকে তুলে ধরায়, সত্তর আশির দশকের বাংলা জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্প মহাশ্বেতাদেবীর ‘নুন’ গল্পে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৯৩০-৩২ সালে যে কৃষক আন্দোলন সমগ্র ভারতে তীব্র রূপ ধারণ করে সেই আন্দোলনের শরিক হিসাবে জনজাতি মানুষদের সংখ্যা নেহাত সামান্য ছিল না। ১৯৩০ সালের একটি রিপোর্টে স্বীকার করা হয় আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন তথা আদিবাসীদের শিক্ষার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করা বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এবং সামাজিক দিক দিয়ে, গঠনমূলক কাজের অগ্রগতি আদৌ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। স্পষ্টই বোঝা যায় নামমাত্রই এবং নিয়মরক্ষার্থে যে আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে নানা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যা শুধুই কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ।

প্রকৃতির আদি ভূমিপুত্র আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা যে ভারতীয় সমাজেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তারা যতই সভ্য জগতের অন্তরালে বিরাজ করুক, পর্বত-অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেও এরাও যে মানুষ এই সহজ সত্যটুকু দেশীয় জমিদারগোষ্ঠী, শাসকগোষ্ঠী কি বহিরাগত ইংরেজ সরকার কোনোদিনই তা উপলব্ধি করেনি। বিদেশী ইংরেজ সরকার এবং জমিদার-মহাজন-মিশনারি খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা এই মানুষগুলোর অসহায়তার, সরলতার সুযোগ নিয়ে অকথ্য অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়ন চালিয়েছে। জমিদার ইংরেজ সরকারের কাছে ইজারা নিয়ে জঙ্গলে চালু হয় ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ (১৭৯৩) এর মত আইন। যার ফলে উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষের নিজস্ব বাসভূমি জঙ্গলমহলের অধিকার চলে যায় জমিদারগোষ্ঠীর হাতে। জমিদার ও ইংরেজ সরকার ছাড়াও ধর্মযাজক ও তার পাশাপাশি সভ্যসমাজের বহু মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের অকথ্য অত্যাচার, নির্মমভাবে শোষণ, আদিবাসীদের নিজ বাসভূমেই পরবাসীর মতো বাস করা, তাদের দারিদ্র্যর সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তকরণ, আদিবাসীদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার, এই সবকিছুই সহ্য করতে আদিবাসী মানুষগুলোর বুকে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তাদের মনেও প্রশ্ন ওঠে যে, অরণ্যের প্রতি তাদের অধিকার নেই কেন? অরণ্যে মধু সংগ্রহ, পশু-পাখি শিকার, কাষ্ঠাহরণ সবকিছুতেই ইংরেজরা কর বসালে জীবিকার সন্ধানে আদিবাসী মানুষরা শ্রমিক হিসাবে কাজ করা শুরু করে কয়লাখাদানে, চা শ্রমিক হিসাবে আরও নানান জায়গায়। পাশাপাশি শ্রমিক হিসাবে অরণ্যচ্ছেদনে

জঙ্গলের কাঠ কাটতে আদিবাসী মানুষদের শ্রমকে কাজে লাগালেও তারা তাদের যথাযোগ্য পারিশ্রমিকটুকুও পায় না। বেগার খাটানো প্রথা রয়েই যায়। আদিবাসীদের সাথে হওয়া অন্যায়ের এই করুণ চিত্র শৈলজনন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বলিদান', 'সব ভূতুড়ে' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাসফুল', রমাপদ চৌধুরীর 'জলরঙ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভোগবতী', এরকম আরও অনেক গল্পে পাওয়া যায়। আদিবাসীদের বাঁচার তাগিদেই, অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হতে অর্থনৈতিক অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে তাদের রক্তে বিদ্রোহের সুর জেগে ওঠে, ফলে বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়েছে নানান বিদ্রোহ- 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১, ১৮৫৪-৫৬, ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫, ১৮৮০-৮১), 'নীল বিদ্রোহ' (১৯২১-২২, ১৯৪২), 'মুণ্ডা বিদ্রোহ' (১৮২০, ১৯১৫, ১৯৩৯), 'হরিবালা আন্দোলন' (১৯১৫), 'রাজমোহিনী আন্দোলন' (১৯১৫), 'কোল বিদ্রোহ' (১৮২০-১৯০০, ১৯২০-২১), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৯৪২), 'ওয়ার্‌লি বিদ্রোহ' (১৯৪৫-১৯৪৭)।[৮]

ব্রিটিশ সরকার ও জমিদার-মহাজন-শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার মূল কারণ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বিপুল কর ও খাজনার ভার, তাদেরর স্বাধীনতায় দিনের পর দিন হস্তক্ষেপ, তাদের বাসস্থান, জমি, এমনকি আদিবাসী নারীদের উপর শাসকগোষ্ঠীর লোলুপ দৃষ্টি। আদিবাসী সহজ সরল মানুষগুলো যখন তাদের উপর হয়ে চলা অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে সচেতন হয় তখন বারংবার আদিবাসী বিদ্রোহ ঘটে। ভারতের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যেমন আদিবাসীরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য, তাদের ভূমি বাঁচানোর তাগিদে, জীবন-জীবিকা-অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একাধিকবার বিদ্রোহ করেছে, তেমনই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসী গোষ্ঠীর (বিশেষত সাঁওতাল গোষ্ঠী) সক্রিয় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আদিবাসী নেতারা যেমন দুর্গা টুডু, মেল সিং, বাবুরা পাহাড়িয়া প্রমুখ সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সাহসিকতার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নেতৃত্ব দেন। আদিবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম করে তা গণআন্দোলনের ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'তেভাগা' আন্দোলন। ইংরেজ ও জোতদার-জমিদারদের শোষণনীতির বিরুদ্ধে বাংলার বিপর্যস্ত কৃষক একজোট হয়ে লড়াই করেছিল। ১৯৪৭-১৯৫০ খ্রিঃ, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হাজং, গারো, কোচ, ডালু প্রভৃতি উপজাতি সম্প্রদায়ের মিলিত কৃষক আন্দোলন 'হাজং বিদ্রোহ' ব্যাপকতর রূপ নেয়। এই আন্দোলনের জেরেই ইংরেজ শাসনের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথার ভাঙন শুরু হয় এবং জমিদারী শোষণের মূল ভিত্তি কেঁপে

ওঠে। জমিদারি শোষণব্যবস্থা 'টঙ্কপ্রথা'র অবসান ঘটে। ভারতের আদিবাসী জাতির যে বিদ্রোহ, যে সংগ্রামের চিত্র পাওয়া যায়, তা মূলত সামাজিক সমতা ও অধিকারবোধজনিত।

স্বাধীনোত্তর পর্বে দেশ-কাল পটভূমি ও জনজাতি সমাজ:

স্বাধীনোত্তর পর্বে মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ এই সবকিছুর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। অর্থনৈতিক সমস্যা, পরিকাঠামোর অভাব, উক্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলার কারণে দেশের জনজাতি মানুষ ও নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রচিত হয় ভারতের বৃহত্তম সংবিধান, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়ন বিধি। শতকরা পঞ্চাশজনের অধিক যে স্থানে আদিবাসী বসতি, সেরকম জেলা বা পরগনাকে 'তফশিল অঞ্চল বা আদিবাসী অঞ্চল' রূপে ঘোষণা করা হয়। পিছিয়ে পড়া আদিবাসী মানুষদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়ন, চেতনার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদে তফসিলি উপজাতির অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে আদিবাসী সমাজের সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পরিবর্তন, আদিবাসী সমাজজীবনকে কুসংস্কারমুক্ত ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠাকল্পে সমস্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 'স্বাতন্ত্রকরণ', 'সমন্বয়করণ' ও 'আত্মীকরণ'- এর প্রয়োজন বলে মনে করেন নৃতাত্ত্বিকরা। আদিবাসীদের উন্নয়নের স্বার্থে সরকার উন্নয়নমুখী যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল- কৃষি আইন, সম্পত্তি আইন কার্যকর করা, ভূমি সংরক্ষণ, অরণ্য সংরক্ষণ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভিন্ন মেডিক্যাল ক্যাম্প, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি। আদিবাসী জাতির জীবনযাপন বা তাদের চেতনার পরিচয় বিশ্লেষণের জন্য একান্তভাবে দেশের ১৯৪৭-১৯৯০ সময়পর্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক। একশ' কুড়ি কোটির জনসংখ্যাযুক্ত দেশের বৃহদাংশ জুড়ে থাকা এদেশেরই আদিম অধিবাসীদের চাওয়া-পাওয়া, না-পাওয়া, ক্ষোভ-বঞ্চনা, শোষণের ইতিহাস, সংস্কৃতি-সংস্কারের চেতনা, সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য, জীবনের বস্তুগত সত্যকে উপলব্ধি করতে চাইলে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ একান্ত বিধেয়।

আমাদের মূল আলোচনায় গল্পগুলি পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে গল্পগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ, আদর্শ, অবনমন-অনাদর্শ, সামাজিক বিপর্যয়-অবক্ষয় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসমূহ দেশের তৎকালীন সময়ের পটভূমির প্রেক্ষিতেই রচিত ও বিচার্য। সাহিত্যই সমাজের দলিল, একথা সত্য। প্রত্যেক কথাসাহিত্যিকই দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল, তাই বাস্তবের কঠিন সত্য, সামাজিক জটিল জীবন প্রক্রিয়ার ছিন্নভিন্ন রূপই সাহিত্যে প্রতিফলিত।

১৯৪৭ খ্রি. ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন হয়। জওহরলাল নেহেরু ঘোষিত 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংবিধানের নিয়মাবলী পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ এই সময়কালে গৃহীত প্রকল্পের রাজনৈতিক সাফল্য ও ব্যর্থতা, তার প্রভাব ও জনজাতি মানুষদের আর্থ সামাজিক অবস্থানচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

১৯৫০ সাল থেকে কার্যকরী ভারতীয় সংবিধানের ২২টি ধারায় আদিবাসীদের কল্যাণ স্বার্থে নানান পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আদিবাসীদের উন্নয়ন ও কল্যাণ স্বার্থে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মোট ১৮টি সভা যেমন– ১৯৪৯-৫০ সালে আয়েঙ্গার সভা, ১৯৫৯-৬০ সালে ভেরিয়ার এলুইন সভা ইত্যাদি আরও নানান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকার কর্তৃক এবং আদিবাসী মন্ত্রণালয় কর্তৃক *The Tribes' Adivisory Council* এবং *Tribal Cultural Research Institute* স্থাপন করা হয়।[৯]

ভারতীয় সংবিধানে তফসিলি উপজাতি ও তফসিলি জাতি সমূহের কল্যাণস্বার্থে নানান নির্দেশ দেওয়া আছে। সমতা অধিকারের ক্ষেত্রে ১৫ নম্বর[১০] ধারা অনুসারে কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে অথবা তন্মধ্যে কোন একটিও হেতুতে রাজ্য কোন নাগরিকের প্রতিকূলে বিভেদ করবে না। কোন নাগরিকত্ব কেবল ধর্ম, জাতি, লিঙ্গের কারণে দোকানে, সার্বজনিক ভোজনালয়, হোটেল, সার্বজনিক প্রমোদস্থলে প্রবেশের ক্ষেত্রে অথবা সরকার কর্তৃক জনসাধারণের ব্যবহার স্বার্থ নির্মিত কুয়ো, পুকুর, সড়ক, সার্বজনীন সমাগমস্থল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো তফসিলি জাতি ও উপজাতির সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। নারী ও শিশুদের জন্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য কর্তৃক গৃহীত কোনো বিশেষ বিধান তা তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে সমরূপে গৃহীত। ১৬ নং ধারায়[১১] বলা হয়েছে– রাজ্যের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিক তফসিলি জাতি ও উপজাতি সকলে সমান সুযোগ পাবে,

কোনো বিভেদ থাকবে না এবং অনগ্রসর শ্রেণির অনুকূলে চাকরির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৭ নং ধারাতে[১২] বলা হয়েছে অস্পৃশ্যতার বিলোপন সম্পর্কে। অস্পৃশ্যতার আচরণ দন্ডনীয় অপরাধের আওতায় গণ্য। ১৯ নং ধারায়[১৩] সকল নাগরিকের প্রতি বাক্-স্বাধীনতা, ভারতের যে কোনো ভাগে স্থায়ী বসবাসের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ২৩ নং ধারায়[১৪] বলা হয়েছে– কোনো মানুষকে ক্রয়-বিক্রয় ও বেগার খাটানো বা বলপূর্বক শ্রম নেওয়া দন্ডনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রে কোনো বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ধর্ম, প্রজাতি, জাতি কোনো কারণে রাজ্য কোনো বিভেদ করবে না। ২৫ নং[১৫] ধারানুসারে যে কোনো ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও পালন করতে পারে। ২৯ নং ধারা[১৬] বলা হয়েছে সংখ্যালঘুবর্গের স্বার্থ রক্ষার্থে কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়কে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। এছাড়া এই ২৯ নং ধারার আর একটি উপধারাতে বলা হয়েছে– ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, বা ভাষার কারণে কোনো নাগরিককে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশে বাধা দেওয়া যাবে না। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে মৌলিক অধিকার সমূহের ক্ষেত্রে ৩০ নং ধারায়[১৭] বলা হয়েছে– সকল সংখ্যালঘুবর্গ ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে, সরকার কোনরকম বিভেদ করবে না। ৩৮ নং ধারায়[১৮] বলা হয়েছে রাজ্য জনকল্যাণ বর্ধনের জন্য নানান সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও রক্ষণ করবে। বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতিদের মধ্যে আয়ের অসমতা হ্রাসের প্রয়াস করবে রাজ্য। অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়নের জন্য ও সমতাবিধানের জন্য রাজ্য সচেষ্ট হবে। ৪৬নং ধারায়[১৯] বলা হয়েছে– তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য দুর্বলতর বিভাগের জন্যে শিক্ষা বিষয়ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের এবং সকলপ্রকার অবিচার ও শোষণ থেকে রাজ্য তাদের রক্ষা করবে।

সংবিধানের দশম ভাগে ২৪৪ নং ধারায়[২০] তফসিলি জাতি ও উপজাতি ক্ষেত্রসমূহ, মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরার অধিবাসীদের নিয়ে বলা হয়েছে। ৩২৫ নং ধারায়[২১] রাজ্যের বিধানমন্ডলের সদনে বা যে কোনো সদনে নির্বাচনার্থে সমস্ত মানুষ জাতি নির্বিশেষে নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কোনো জাতিবৈষম্য করা যাবে না। ৩২০ নং ধারায়[২২] কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগ মারফত চাকুরি ক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকার মান্যতা ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৩৩০ নং ধারায়[২৩] লোকসভাতে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের ষোড়শ ভাগে ৩৩০-৩৩২ নং ধারানুসারে তফসিলি উপজাতি সমূহের জনসংখ্যা ও সংরক্ষণ নিয়ে বলা হয়েছে। ৩৩২ নং ধারায়[২৪] বলা হয়েছে তফসিলি উপজাতি সমূহের জন্য প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভায় আসনসমূহ সংরক্ষিত থাকবে। এক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম আসামের জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের তফসিলি উপজাতিসমূহ ভিন্ন ৩৩২ নং ধারায় তৃতীয় উপধারায় বলা হয়েছে– কোনো রাজ্যের বিধানসভায় তফসিলি উপজাতিসমূহের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যার সাথে ঐ সভার মোট আসন সংখ্যার যথাসম্ভব সেই অনুপাত থাকবে যে অনুপাত থাকবে যে অনুপাত ঐ রাজ্যের তফসিলি জাতি ও জনজাতিসমূহের জনসংখ্যার সাথে ওই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে। ৩৩৪ নং ধারায়[২৫] সংরক্ষিত আসনের বয়স সময়সীমার (চল্লিশ বৎসর) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৩৩৫ নং ধারা[২৬] অনুসারে কোনো রাজ্যের কার্যাবলী সংক্রান্ত কৃত্যক ও পদসমূহে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ও রাজ্য সরকারের চাকরির ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও জনজতি সমূহের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ৩৩৮ নং ধারায়[২৭] বলা হয়েছে ভারতের সংবিধানের তফসিলি জাতি ও জনজাতির সমূহের জন্য যে সমস্ত রক্ষনসমূহ অর্থাৎ নিয়মনীতি, আইন তৈরী হয়েছে তার সুষ্ঠ প্রয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এক বিশেষ আধিকারিক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। ৩৩৯ নং ধারাতে[২৮] ঘোষণা করা হয়েছে তফসিলি এলাকা ও তফসিলি জনজাতিসমূহের কল্যাণ হেতু ভারতের রাষ্ট্রপতিপ্রতি দশ বছর অন্তর একটি কমিশন নিয়োগ করে জনজাতি সমস্ত এলাকা, উন্নয়ন ও শাসন সম্পর্কিত অবস্থার তথা প্রতিবেদন দ্বারা জানতে চাইবেন বা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী গ্রহণ করতে পারে। ৩৪০ নং ধারায়[২৯] অনগ্রসর শ্রেণিসমূহের সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক নানান অসুবিধা তদন্তের ক্ষেত্রে সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক নানান অসুবিধা তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশন নিয়োগের কথা উল্লিখিত। ৩৪১ ও ৩৪২ নং ধারায়[৩০] মাধ্যমে রাজ্যগুলি তার রাজ্যপালের সাথে পরামর্শের পর রাষ্ট্রপতি ও সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিলি জাতি ও জনজাতিসমূহের যে ভাগ রয়েছে বা বিশেষ গোষ্ঠী রয়েছে তার তালিকাভুক্ত গোষ্ঠীগুলিই ওই রাজ্যের তফসিলি জাতি ও জনজাতি রূপে তালিকাভুক্ত হবে। এছাড়াও ৩৪১ নং ধারার দ্বিতীয় ভাগে বলা হয়েছে সরকার লোকসভায় আইন প্রণয়ন করে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি তালিকার পুনর্বিন্যাসও করতে পারেন। ৩৬৬ নং ধারার[৩১] ২৩, ২৪, ও ২৫ নং উপধারায় বলা হয়েছে ৩৪১ নং ধারানুসারে রাজ্য ও রাজ্যপাল দ্বারা নির্ধারিত জনগোষ্ঠী সংবিধানেও রাজ্যের তফসিলি জাতি ও জনজাতি রূপে পরিগণিত হবে।

উক্ত সংবিধানের ২২ টি ধারা আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধান দ্বারা তফসিলি জাতি ও জনজাতিসমূহের জন্য যে সমস্ত রক্ষাকবচ বা নিয়মাবলী নির্ধারিত তা আলোচনা করা হল। প্রত্যেক রাজ্যের জেলায় তপসিলি উপজাতি কল্যাণ বিভাগের অফিস করা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আদিবাসী কল্যাণ স্বার্থে নানা পদক্ষেপে নেওয়া হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা আদৌ কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল তা আমাদের পরবর্তীতে ছোটগল্পগুলি আলোচনাতেই দেখা যায়। কারণ গল্প কেবল কাহিনি মাত্র নয়, গল্পের স্বল্প পরিসরেই প্রতিবিম্বিত সমাজ-সময়, মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি। আদৌ প্রত্যাশিত কোনো অগ্রগতির আলোই যে আদিবাসী সমাজকে স্পর্শ করেনি, উন্নয়নের সাথে বাস্তবের দূরত্ব থেকেই যাওয়ার মূল কারণ– আদিবাসী স্বার্থে গৃহীত নানান উন্নয়ন প্রকল্পগুলি তাদের জীবনচর্চা, প্রাতিস্বিক মূল্যবোধের কথা ভেবে তৈরি হয়নি কেবল নিয়মের স্বার্থে নিয়ম হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'জগমোহনের মৃত্যুর' গল্পে খাতায়-কলমে হওয়া সরকারী প্রকল্প, আইন এবং প্রান্তিক, জনজাতি জীবনে তা কতটা কার্যকরী হয়েছিল তারই বাস্তবিক রূপের প্রতিফলন ঘটে-

> 'আদিবাসী উন্নয়ন আপিস শহরে শহর অনেক দূর। সেখানে নিয়ন আলো ও ঘুরন্ত টেবিল চেয়ার পর্যন্ত অরণ্য গ্রামবাসীরা যেতে পারে না। যাবার কোনো কারণও খুঁজে পায় না তারা। কেন না, আদিবাসী যখন দপ্তরে আপিসে যায়, তখনও কেন যেন তার এবং ওই চেয়ারের মধ্যেকার দূরত্ব যোজন যোজন থেকে যায়। ঘোচে না'। [৩২]

১৯৪৮ সালে প্রথম 'ভারতীয় আদিমজাতি সেবক সংঘ' স্থাপিত হয়, সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। পশ্চিমবঙ্গে 'সমাজসেবক সংঘ' ও আদিবাসী কল্যাণ সমিতি' স্থাপিত হয়। এই আদিবাসী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত হলেও এখানে কর্মরত মানুষরা আদতে আদিবাসী দরদী প্রকৃতপক্ষে না হওয়ায় অনেকসময় আদিবাসী মানুষদের প্রকৃত বিপন্নতায় তারা পাশে দাঁড়াতে পারেনি। এই সমস্ত বিধিবিধান, নিয়মাবলী থাকা সত্ত্বেও আদিবাসী মানুষগুলো কী আদৌ সমানাধিকার, বেগারশ্রম, শোষণ, জাতি বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল? তার উত্তর পাওয়া যায় ইতিহাসে-সাহিত্যে। ইতিহাস, সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সাহিত্যের পাতাতেই লিপিবদ্ধ জাতির ইতিহাস। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ছোটগল্পগুলি আলোচনায় উদ্‌ঘাটিত হবে সমাজের বাস্তবতা, ভারতের আসল সত্যচিত্র ।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ-সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেশের জনসাধারণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ১৯৫০-এর মার্চ মাসে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন'। দেশের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষ, উপজাতি মানুষরা সামাজিক জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে কার্যত যখন দিশেহারা, আর্থিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও স্বচ্ছলতার জন্য প্ল্যানিং কমিশন, 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র মধ্য দিয়ে উন্নয়নের রূপায়ণ করার দিকে সচেষ্ট হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:[৩৩]

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১-১৯৫৬) খসড়া পেশ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, দেশভাগ এই সবকিছুর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রবলভাবে প্রভাব ফেলে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য মুদ্রাস্ফীতির গতিরোধ করা, খাদ্যসমস্যা এবং পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচামালের অভাব হ্রাস, বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের পরিকল্পনা করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে খসড়া পেশ করা হয় সেক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার উন্নতিকল্পে 'হ্যারাণ্ড-ডোমার' মডেল অনুসরণ করা হয়। বলাবাহুল্য, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যথেষ্ট সফলভাবে রূপায়িত হয়। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যের পরিমাণ ছিল শতকরা ১২ ভাগ। এই আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১৭ ভাগ। তবে এই পরিকল্পনায় সাফল্যের পাশপাশি কিছু ব্যর্থতাও ছিল। বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায়নি, বরং তা বৃদ্ধি পায়। নিম্নবর্গের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সর্বসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি কার্যত খুব বেশি করা সম্ভবপর হয়নি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:[৩৪]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অব্যাহত রেখে 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র (১৯৫৬-৬১) খসড়া পেশ করা হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ —

১) জাতীয় আয় শতাংশ হারে বৃদ্ধি,

২) বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান,

৩) শিল্পোন্নয়ন,

৪) আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অসমতা হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকার সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উক্ত 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' অধ্যাপক পি.সি. মহলানবিশ মডেল অনুসরণে রচিত। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ৫ শতাংশ, কিন্তু তা ৪ শতাংশে দাঁড়ায়। প্রথম পরিকল্পনায় আমরা দেখি 'কৃষি ও সেচ' প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 'শিল্প ও পরিবহন' উন্নয়নে প্রাধান্য পায়। এই পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটে। দুর্গাপুর, ভিলাই ও রৌরকেল্লায় নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। এই শিল্পোন্নয়ন ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মুদ্রাস্ফীতি ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, বেকারত্বের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ লক্ষ, ভোগ্যদ্রব্যের অভাব, বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও অবনতি ঘটে এবং সম্পদ ও আয় বণ্টনের অসমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত, আদিবাসী সকল মানুষই অর্থনৈতিক সংকটের শিকার হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:[৩৫]

'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (১৯৬১-১৯৬৬)-র উদ্দেশ্য —

১) কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য বজায়,

২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি,

৩) আয় ও সম্পদ বণ্টনের অসমতা হ্রাস,

৪) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ,

৫) অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টন, প্রভৃতি।

কিন্তু বলাই বাহুল্য, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। কৃষি ও শিল্প দুই ক্ষেত্রেই এই ব্যর্থতা। দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যহত থাকে। ১৯৬২ তে ভারত-চিন যুদ্ধের কারণে কমিউনিস্ট ভাবধারায় ভাঙন তৈরি হয়। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়। নেহেরুর মারা যাওয়া, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংঘাত, রাজনীতিতে অস্থিরতায় আর এক মাত্রা যোগ করে। বেকারত্বের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়নে এক ডলারের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি। উল্লেখ্য ১৯৬২-তে ভারত-চিন যুদ্ধ, ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও ১৯৬৫-৬৬-তে ভয়াবহ খরা, এই সবকিছু 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:[৩৬]

১৯৬৬ সালে ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিভিন্ন আন্দোলন, যুদ্ধ, খরা, মুদ্রাস্ফীতি, টাকার মূল্য হ্রাস প্রভৃতি কারণে ভারতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত। ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয় এবং তিন বছরের পরিকল্পনা (১৯৬৬-১৯৬৯) সংগৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় বেশি গুরত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে পূর্বে গৃহীত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।

উক্ত পরিকল্পনায় শিল্প উৎপাদন ও কৃষিক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি ঘটে। ১৯৬৭-৬৮তে 'সবুজ বিপ্লব' সংঘটিত হওয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি ঘটে ও খাদ্যসংকট অনেকাংশে দূরীভূত হয়। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় আয় ৮.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে 'প্ল্যানিং কমিশন' পুনর্গঠিত হয় এবং ইন্দিরা গান্ধী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হন। গৃহীত হয় 'চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (১৯৬৯-১৯৭৪)। উক্ত পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বনের পাশাপাশি শিল্পের ক্ষেত্রে ইণ্ডিকেটিভ প্ল্যানিং টেকনিক গৃহীত হয়। কেবল কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন নয় কংগ্রেসেও তখন বিভাজন দেখা যায়-আদি ও নব্য। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সবমিলিয়ে এক সংকটের পটভূমি। চিন-ভারত যুদ্ধের কারণে উন্নয়নমূলক খাতে বরাদ্দ কমিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বেশি করা হল। খাদ্যের বিপুল সংকট দেখা দেয়, খাদ্য আন্দোলন হয়, বহু নিরীহ- নির্দোষ মানুষ প্রাণ হারায় পুলিশের গুলিতে। বলাবাহুল্য মুখ থুবড়ে পড়ে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। চূড়ান্তভাবে অসফল হয়। এর পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ফলে দারিদ্র্যের মাত্রাও সংকটজনক

অবস্থায় এসে পৌঁছায়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত-পাক যুদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে আরও তীব্রতর করে তোলে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:[৩৭]

'পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (১৯৭৪-১৯৭৯) খসড়া অনুমোদিত হলেও, এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপায়ণ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। ১৯৭৫ সালে ২৬ জুন দেশে 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণার ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তে তিনটি আর্থিক বছর (১৯৭৪-১৯৭৭)-এর বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ায় কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। জনতা সরকার ক্ষমতায় এলে নতুন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করে। প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। জনতা সরকারের গৃহীত 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র মূল লক্ষ্য দেশের দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, অর্থনৈতিক স্বয়ংস্তরতা অর্জন, বেকারত্ব হ্রাস। ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় এলে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নতুনভাবে রূপ পরিগ্রহ করে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:[৩৮]

'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (১৯৮০-১৯৮৫)-র মূল লক্ষ্য সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা, সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, স্বেচ্ছামূলক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, প্রযুক্তি বিদ্যায় স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পরিকল্পনা, বেকারত্বের অবসান, গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনে রেকর্ড (১৪২ মিলিয়ন টন) ঘটলেও এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইস্পাত, কয়লা, শস্য এসব কিছুর ক্ষেত্রে আয় পূর্বের তুলনায় অনেকটা কমে যায়। ১৯৮৪-৮৫ সালে ঘাটতির পরিমাণ ৩৯৭২ কোটি টাকা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:[৩৯]

ভারতবাসীর জন্য, জনসাধারণের স্বার্থে 'সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (১৯৮৫-৯০) গৃহীত হয়। উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমূহ– উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্বের অবসান, কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি, চিকিৎসা ও শিল্পব্যবস্থার উন্নতি, সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ঘূর্ণাবর্তের আবহে এই পরকল্পনা কোনো বাস্তবায়িত রূপ পায়নি। বেকার সমস্যা, কালোবাজারি, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর ঝোঁক, গ্রাম ও শহরের মধ্যে অর্থবৈষম্যের একটা ব্যবধান– এই সবকিছু উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, গান্ধীজীর মৃত্যুর পর গান্ধীযুগের অবসান ঘটে। জওহরলাল নেহরুর গৃহীত 'পঞ্চবার্ষিকী পরকল্পনা'য় আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যগুলি–

- আদিবাসী জঙ্গল ও ভূমির উপর স্বাধীনতা দিতে হবে।
- আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিল্পের উপর জোর দিয়ে তাদের নিজেদের প্রতিভার ভিত্তিতেই তাদের উন্নতি সাধন করতে হবে।
- তাদের মধ্যে থেকে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করে তাদের শিক্ষা দিয়ে তাদেরই উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করতে হবে।
- তাদের ওপর অতিরিক্তভাবে বাহ্যিক ক্ষমতা বা শাসন প্রয়োগ করা যাবে না। বরং তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।
- নৃতাত্ত্বিকভাবে আদিবাসী উন্নয়নের কাজ করতে হবে। সামাজিক শোষণ মুক্ত করে আদিবাসী অফিসার দ্বারাই আদিবাসী অঞ্চল ও আদিবাসী মানুষগুলোর উন্নতিসাধন সম্ভব।

বলাবাহুল্য উক্ত পরিকল্পিত লক্ষ্যগুলি আদিবাসীদের স্বার্থে সুখকর শুনতে লাগলেও বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে তা খুব বেশি সম্ভবপর হয়নি। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, আদিবাসী মানুষদের নিয়ে অনেক পরিকল্পনা হলেও কার্যত তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়নি।

ভারতের আদিবাসীদের উন্নয়ন স্বার্থে ১৯১৯ সালে শাসন-সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষা অর্থাৎ তাদের জমি রক্ষা, সেই জন্যই ১৯১৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন'কে সংশোধন করা হয়। ১৯৩৯ সালে আইনের সাহায্যে এবং বিভিন্ন আন্দোলনের কারণে আদিবাসীদের জমি রক্ষার বিষয়টিই অধিকতর গুরুত্ব পায় এবং পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে পাশ হয় 'ভূমি সংস্কার আইন'।[৪০] স্বাধীনতা উত্তরকালে 'জমিদারি প্রথা' উচ্ছেদ করে সরকার। ১৯৫২ সালে বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনকল্পে আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলত ভূমিসংস্কার বিষয়ক যাবতীয় সিদ্ধান্ত কমিশন গ্রহণ করে। প্ল্যানিং কমিশন ভূমি বন্টনে জমির মালিকানার বিষয়ে তফসিলিভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের অগ্রাধিকার দেয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে 'ভূমিসংস্কার' গুরত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কৃষক আন্দোলন 'তেভাগা আন্দোলন' (১৯৪৬) কৃষকদের অধিকারের লড়াইয়ে এক শক্তিশালী আন্দোলন। এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব স্বাধীনতা উত্তরকালে রয়ে যায়। তেভাগা আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, কৃষক শ্রেণির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী কৃষকরা অংশগ্রহণ করে ব্যাপকভাবে। আদিবাসী কৃষকশ্রেণি রক্ত জল করে চাষ করেও ফসলের কানাকড়ি পায় না, করের বোঝায় তারা নিঃস্ব। দিন শেষে আইনের মারপ্যাঁচে জমিদার, জোতদার, মহাজন শ্রেণি কৃষকের পরিশ্রমের ফসল আত্মসাৎ করে দিনের পর দিন। অভাবে দিনের পর দিন বঞ্চনার শিকার হতে থাকায় আদিবাসীদের মধ্যেও শ্রেণিসংগ্রামের আগুন জ্বলে ওঠে। সুদীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত বেদনায় জোতদার-জমিদার-মহাজনরা লোভের হাত বাড়ালে সেই কালো শোষণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে তারা জীবন দিয়ে লড়াই করে। শ্রমিক-কৃষকদের পাশাপাশি প্রান্তিক উপজাতির মানুষেরা যোগ দিয়ে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এই কৃষক-শ্রমিক-আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম 'তেভাগা'র ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয় ও ভূমিসংস্কার আইন কার্যকর হয়।

পঞ্চাশের দশকে মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগের ফলে দেশ জুড়ে বেকারত্ব, খাদ্যসংকট, কালোবাজারী মাথা চাড়া দেয়। স্বাধীনতার পর সরকার কর্তৃক নানান আইন-প্রকল্প প্রণয়ন। ষাটের দশকে দেশের মধ্যে ঘনায়মান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকটের অভিঘাত সামাজিক শ্রেণিগুলির পাশাপাশি ছাত্রসমাজের উপরও পড়েছিল। দেশজুড়ে ছাত্রবিপ্লবের জোয়ার, তার পাশাপাশি খাদ্যসংকট ও জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা (১৯৬৪), এই সব মিলিয়েই ছয়ের দশকের চালচিত্র। খাদ্যসঙ্কট এতটাই প্রবল রূপ ধারণ করে, ভারত সরকারকে বিদেশ থেকে সাহায্য নিতে হয়। পাশাপাশি

এসময় পশ্চিমবঙ্গ চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্য। ১৯৬০ সালে গঠিত ইউএন ধেবার এর সভাপতিত্বে পরিচালিত 'সিডিউল্ড এরিয়াজ এ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্' কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে-

> *Minerals in India are found mostly in tribal areas. The mining Industry results in concerned with activity gives us though to rehabilitating tribals and utilizing the manpower resources available locally is a tragedy of the situation।*[৪১]

আদিবাসীদের বাসস্থানই চোরাকারবারিদের আওতায় চলে যায়। সে সময় ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে বহরমপুরে গুলিতে অনেকে মারা যায়, যাদের মধ্যে অনেক আদিবাসীও ছিল। এর প্রতিবাদে এরপর গোটা পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে হারিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি জয়ী হয়। এর প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য অসীম রায়ের 'আরম্ভের রাত' গল্পটি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত।পাশাপাশি এই সময়েই কৃষক আন্দোলনের নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। বুর্জোয়া অর্থনীতি এই সময় ধনীদের আরও ধনী ও কৃষক-শ্রমিকদের আরও গরীব করছিল। এরপর ষাটের দশকের শেষের দিকে জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। ১৯৬৭ সালে হিমালয়ের পাদদেশে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি গ্রাম থেকে উদ্ভূত, যা ষাটের দশকে স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে উপজাতি-কৃষক বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীতে এই আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। এই আন্দোলনের সঙ্গে পরবর্তীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনও মিশে যায়।

স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সংঘটিত নকশাল আন্দোলন। এক নতুন মূল্যবোধ, সমাজ গড়বার লক্ষ্যে ছিল এই আন্দোলন। চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল ও কানু সান্যাল-এর নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল, বড় জমিদারদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নেওয়া এবং কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণ করা। এই আন্দোলনে আদিবাসীদের ব্যাপক যোগদান ছিল, তবে পরে এই আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্বের অভাব ও ভাবধারার বিচ্ছিন্নতার ফলে নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়। নকশাল দলগুলো সাধারণত বাংলার প্রান্তিক সমাজে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব

করে। এর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক। বাংলা জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পেও জনজাতিদের এই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যোগ ও তার প্রভাব প্রতিফলিত।

এছাড়াও সত্তরের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনবার 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করা হয়। 'জরুরি অবস্থা' হল রাষ্ট্রপতি দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে যদি মনে করেন বহিঃআক্রমণ, যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ কোনো জটিলতার কারণে দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, সংকটাপন্ন, অত্যন্ত জটিল, অবস্থা গুরুতর রূপ ধারণ করেছে, তা মোকাবিলার জন্য সেক্ষেত্রে তিনি সমগ্র দেশের জন্য অথবা দেশের নির্দিষ্ট কোনো অংশের জন্য 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' জারি করতে পারেন। এই জরুরি অবস্থা প্রথমে সর্বাধিক ছয় মাস পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে এবং পরবর্তীতে পার্লামেন্টের অনুমোদনে এই জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানো যায়। ভারতীয় সংবিধানে তিন প্রকার জরুরি অবস্থা জারি হয়– ১) জাতীয় জরুরি অবস্থা, ২) রাজ্য শাসনতান্ত্রিক সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা ও ৩) আর্থিক জরুরি অবস্থা। ভারতবর্ষে এখনও অবধি তিনবার 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' জারি হয়েছে— ১) ১৯৬২ সালে চিনের ভারত আক্রমণের সময়, ২) ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এবং ৩) ১৯৭৫ সালে প্রথমবার দেশের অভ্যন্তরীণ সংকটাপন্ন অবস্থার জন্য। ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন জরুরি অবস্থা জারি করেন। দীর্ঘ একুশ মাস ধরে চলতে থাকা এই জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার একেবারে নষ্ট করে দেয়। এই জরুরি অবস্থার প্রতিফলন সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়। এই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং ১৯৭৭ সালের ২১ জুন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা, এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা, রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বড় রদবদল।

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় এলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাশাপাশি তিনি ১৯৭৫ সালে একটি জাতীয় কুড়ি দফার অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রকাশ করেছিলেন, সেই বিষয়েই পুনরায় নবউদ্যোগে ভাবনায় দিকপাত করেন। ১৯৮২ সালে আবার নতুন কর্মসূচী এবং নিম্নবর্গীয় কেন্দ্রিক নানান কর্মসূচি গ্রহন করেন। কিন্তু কার্যত উন্নয়নের বাস্তবিক সাফল্যমণ্ডিত রূপায়ণ অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮০ সালে বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দুবের সভাপতিত্বে নিম্নবর্গদের জন্য 'মণ্ডল কমিশন' গঠন করেন।[৪২] মণ্ডল কমিশন হল সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল সিং মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পরে সরকারিভাবে ঘোষণা করেন ৩৭৪৩ টি জাতিগোষ্ঠীকে অন্যান্য

অনগ্রসর জাতি হিসেবে, যা ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় ৫২ ভাগ।[৪৩] মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে সারা দেশে আলোড়ন ও নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল, অনগ্রসরতার মানদণ্ড দেওয়া দরকার দারিদ্র্যর নিরিখে। এছাড়াও ভূমিসংস্কার, অনুন্নত শ্রেণির জন্য ২৭ শতাংশ ও তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য ২২.৫ শতাংশ সরকারী চাকরি সংরক্ষণের কথা এবং মণ্ডল কমিশনের সমীক্ষায় বলা হয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে নিম্নবর্গের বাস্তব অবস্থার কোনো বদল ঘটেনি।[৪৪]

১৯৮৪ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বের নানান প্রান্তের আদিম অধিবাসীদের বিষয়ে জেনেভা শহরের মানবাধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের একটি উপসমিতিকে তথ্যসংগ্রহ করার দায়িত্বে বহাল করে। ১৯৮৮ সালে দলিলটি '*Draft universal Declaration on Indigenous Right*' নামক খসড়া আকারে প্রকাশিত হয়।[৪৫] উক্ত খসড়ায় চোখ বোলালেই বোঝা যায় সভ্যতার নামে আদিবাসী মানুষগুলির উপর কি পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছে।

এতো গেল আইনের কথা। আইনের বাইরে সাহিত্যের স্বাধীনতা পরবর্তী লেখায় শিল্পরূপের নানান পরিবর্তন ঘটেছে। দেশকালের সঙ্গে ছোটগল্পের যোগ অবিচ্ছিন্ন। ১৮৫৪-১৯৬৯ এবং পরবর্তী সময়েও বেশ কয়েক হাজার আদিবাসীদের আসামে চা-বাগানে 'সস্তা শ্রমিক' হিসাবে চালান করা হয়। এই চিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস', এছাড়াও আরও অনেক ছোটগল্প আলোচনায় পাওয়া যায়। এই কাহিনিগুলিতে, গল্পগুলিতে লিপিবদ্ধ কাহিনিই তথ্য হয়ে ওঠে। প্রতিটা গল্পের পরতে পরতে লিপিবদ্ধ আদিবাসীদের উপর হয়ে চলা ছলনা, অত্যাচারের কথা।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেবল হস্তান্তরিত হয়নি, সমাজসাহিত্য-সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই ঘটেছিল যুগান্তরের সূচনা। জাতীয় জনজীবনে যে বিপর্যয়, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যসংকট, শ্রমিক আন্দোলন, বেকারত্ব, একদিকে মূল্যবোধের অবক্ষয় অন্যদিকে বিক্ষোভ। এই সময় সাহিত্যে বেশি সামাজিক অবক্ষয় ধরা পড়েছে। দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশভাগের যন্ত্রণা, নির্বাচন, রাজনীতি, মধ্যবিত্তদের জীবন পঞ্চাশ-ষাটের দশকের সাহিত্যে বেশি স্থান পেয়েছে। ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে এবং বিশ শতকের সাতের দশকেই বাংলা কথাসাহিত্যে

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রূপায়ণে রাজনৈতিক পরিপ্রশ্নের এক নতুন বীক্ষা সংযুক্ত হয়েছিল। নকশালবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আদিবাসীদের সংযুক্তিকরণে এবং নকশালপন্থীদের আদিবাসীরা সমর্থন জানানোয় একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়। নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয় ঠিকই কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ে, শাসকশ্রেণির মুখোশ খসে পড়ে। সাতের দশকে রাজনীতি সচেতন বাঙালি মনন আদিবাসীদের ওপর প্রতিনিয়ত ঘটে চলা রাষ্ট্রীয় শোষণকে লিপিবদ্ধ করল সাহিত্যে। সাতের দশক থেকে গল্পের পালাবদল-

> "গল্পকারেরা প্রায় সবাই জন্মেছেন চল্লিশের দশকে। ষাট দশকের দ্বিতীয়ার্থে এবং সত্তর দশকের প্রথমার্থে যখন এঁরা সবাই কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র, তখন পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার বইছে।... নকশালবাড়ি আন্দোলনে সেই কর্মসূচিতে একটি স্বতন্ত্রমাত্রা যোগ করেছে। সত্তর-আশির ছোটগল্পকারদের মধ্যে খুব খুব অল্পজনই তার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।"[৪৬]

সাতের-আটের দশকেই আদিবাসীকেন্দ্রিক গল্প উপন্যাসের ভাবনা ও ফর্ম আমূল বদলে যায়। ১৯৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'। এই সময়ই গ্রামের মানুষের সাথে শহুরে মানুষদের যোগ বাড়ে। এর আগেও যোগ ছিল কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে। নিম্নবর্গ নিয়ে, শাসক ও শোষিতদের নিয়ে, রাষ্ট্রের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাংলা ছোটগল্পে প্রাধান্য পেল। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'পঞ্চায়েত আইন' চালু হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও আদিবাসীরা শোষণমুক্ত হয়নি তার চিত্র গল্পগুলিতে লিপিবদ্ধ। নিম্নবর্গ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাস্রোত আদিবাসী বিষয়ক কাহিনির ভিতর প্রবাহিত হতে দেখা যায়।

একটি জাতির অগ্রগতিতে সমাজ-সময়-পরিপ্রেক্ষিত ও সরকার কর্তৃক গৃহীত নানান আইন, আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ। একটি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ— এসব ক্ষেত্রে দেশ-কালের পটভূমি গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতিকে যথার্থ অর্থে বুঝতে সেই সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান-ধারণা থাকা অপরিহার্য। গল্পে কেবল কল্পকথা বা নিছক কোনো প্রান্তিক, আদিবাসী সমাজ নিয়ে কাহিনি পরিবেশিত যে হয়নি তা এই সময়ের আলোচনায় স্পষ্ট। লেখকদের পরিবেশিত তথ্য গল্পের মাধ্যমে তা কতখানি সত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল, গল্প যে কেবলই গল্প নয়, তা সমাজের দলিল–

একথা পরবর্তী গল্পগুলি নিবিড় বিশ্লেষণ ও আলোচনায় নিশ্চিতরূপে স্বীকৃতি পাবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিত আদিবাসী মানুষদের উপর কীরূপ প্রভাব ফেলেছিল, তা গল্পের নিরিখে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র:

১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *আদিবাসী জীবন সংগ্রাম*, কলকাতা: বৃন্দবাক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৬ ই আগস্ট, ১৯৯৭, পৃ. ২১

২. রায়, হিমাংশুমোহন, *ভারতের আদিবাসী*, কলকাতা: মণ্ডল এন্ড সন্স, মহালয়া ১৩৮৭, পৃ. ২৫

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৪. দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ*, কলকাতা: পুস্তক বিপনী, দ্বিতীয় সংস্করণ: মাঘ ১৪২৬, পৃ. ১৩

৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *আদিবাসী জীবন সংগ্রাম*, কলকাতা: বৃন্দবাক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৬ ই আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ৫০

৬. দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ*, কলকাতা: পুস্তক বিপনী, দ্বিতীয় সংস্করণ: মাঘ ১৪২৬, পৃ. ১৩

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৮.বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড),*কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, মে ১৯৮৭, পৃ. ৭

৯. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *আদিবাসী জীবন সংগ্রাম,* কলকাতা: বৃন্দবাক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৬ ই আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ৩৯

১০. ভারত সরকার, *ভারতের সংবিধান,* বিধি ও মন্ত্রণালয়, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৮৭, পৃ. ৫

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১-১৫৩

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

৩২. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা রচনাসমগ্র (দশম খণ্ড),* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০৯, পৃ. ৩১৮

৩৩. দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ,* কলকাতা: পুস্তক বিপনী, দ্বিতীয় সংস্করণ: মাঘ ১৪২৬, পৃ. ৮২

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৪১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *আদিবাসী জীবন সংগ্রাম*, কলকাতা: বৃন্দবাক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৬ ই আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ৫৫

৪২. মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ*, কলকাতা: পূর্বালোক, পূর্বালোক সংস্করণ: জুলাই ২০১২, পৃ. ৫৩-৫৫

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৪৪. সেন, সুজিত (সম্পা.), *জাতপাতের রাজনীতি*, কমলেন্দু ধর, *দেশবাসী আর আদিবাসী প্রবন্ধ*, কলকাতা: ১৯৮৯ পৃ. ১৯৫-১৯৬

৪৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *আদিবাসী জীবন সংগ্রাম* , কলকাতা: বৃন্দবাক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৬ ই আগস্ট, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬

৪৬. রায়, অলোক, *বিশ শতক*, কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৪৫

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পকার (১৯২৩-১৯৯০)পরিচিতি

এবং

তাঁদের জীবনদর্শন

১৯২৩-১৯৯০ সময়কালীন বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র আলোচনার সম্পূর্ণতা পেতে এই অধ্যায়ে নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পকারদের পরিচয়, তাঁদের জীবনদর্শন, সাহিত্যকর্ম আলোচনা করা হল। সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্যের মূলে থাকে তাঁদের জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দর্শন, যুগযন্ত্রণা, সময়ের প্রতিফলন। সাহিত্যিকদের জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে প্রতিফলিত। জীবনদর্শনের আধারে সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে লেখকদের সাহিত্যমানস সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য সমাজের দর্পণ-দলিল। সাহিত্যিকদের সাহিত্যমানস সমৃদ্ধ হয় তাঁদের জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে। এই গল্পগুলি কেবল গল্প নয়, একটি জাতির ইতিহাস, জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্যার তথ্য। সমাজচিন্তার সঙ্গে যদি লেখকের আত্মজিজ্ঞাসা যুক্ত না হয়, সেক্ষেত্রে সেই সমাজকে নিয়ে লেখা সাহিত্য কেবল গল্পকথা হয়ে থেকে যায়, তা এক জাতির, মানুষের বিশাল সমৃদ্ধ ঐতিহ্য-র বাহক হতে পারে না। ছোটগল্পকাররা কেবল মনগড়া কোনও কাহিনি বা কল্পলোক রচনা করেননি আদিবাসীদের নিয়ে, এগুলো তাঁদের প্রত্যক্ষদর্শন, জীবনোপলব্ধি থেকে উঠে আসা চিন্তাভাবনার আধারে সৃষ্ট, এই কার্যকারণ সূত্রে প্রান্তিক, জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি আলোচনার পূর্বে লেখক পরিচিতি, তাঁদের আদিবাসী চর্চা, জীবনবীক্ষা জানা আবশ্যক।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০): বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, উত্তরচব্বিশ পরগনার মুরাতিপুর গ্রামে। লেখকের পৈতৃক নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুরে। পিতা– মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত পন্ডিত এবং পান্ডিত্যের জন্য শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হয়ে ছিলেন। মাতা– মৃনালিনী দেবী। প্রাথমিক শিক্ষা লেখক তাঁর পিতার কাছে থেকে অর্জন করেছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতার রিপন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে ওই কলেজ থেকেই বি.এ ও এম.এ পাশ করেন।

তিনি শিক্ষকতার পেশাতেই সারাজীবন ছিলেন। বিভূতিভূষণের কাছে জীবন এর সম্পূর্ণতা পায় বস্তুজীবন ও অবস্তুজীবন এই দুইয়ের সমন্বয়তায়। তিনি ছিলেন সমগ্র জীবনের উপাসক। সাহিত্য জীবনের বহিরঙ্গ বর্ণনায়, চরিত্র বিবর্তন ও রূপায়ণে এবং সংলাপ রচনায় তাঁর মতো একান্তভাবে বাস্তবানুগ সাহিত্যিক মনন পাওয়া দুষ্কর। লেখকের সাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতির সাথে মানুষের জীবনচিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লেখায় একইসাথে রোমান্টিসজম ও বাস্তববোধ অন্বিত। কর্মসূত্রে তিনি কিছুদিন ‘গোরক্ষিনী সভার’

প্রচারক হিসাবে বাংলা বিহার, ত্রিপুরা ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরেন। তাঁর এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত। এছাড়া ও তিনি খেলাৎচন্দ্র ঘোষের এস্টেটের ভাগলপুর সার্কেলের সহকারী ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করায়, লেখকের ভাগলপুরে থাকার অভিজ্ঞতাও *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাসে পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে সমগ্রজীবনের সন্ধান রয়েছে, গল্পের মূল উৎসভূমি- আধ্যাত্মিক উপলব্ধি গভীর প্রকৃতিবোধ ও সর্বোপরি সাধারণ মানুষের প্রতি অসাধারণ মমতা। প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষ ও মানুষের জীবনই লেখকের সাহিত্য সৃষ্টির মূল ধ্রুবতারা। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন, তাঁর গল্পে বহুবর্ণের মানুষের আনাগোনা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা গল্প *উপেক্ষিতা,* লেখকের প্রথম জীবনের গল্পে রোমান্টিসিজমের ভাবনা থাকলেও পরবর্তী জীবনের গল্পে বা জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা গল্পে তিনি সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনের দিকে শিল্পসন্ধানী দৃষ্টি মেলে দিলেন। মানবজীবনের একটা সামগ্রিক দার্শনিকতা বিভূতিভূষণের সাহিত্যে উঠে আসে।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে মানুষের সততা, সারল্য, নিখাদ খাঁটি মনের মানুষদের আনাগোনা বেশি, লেখকের সাহিত্যে বিত্তবান শহরে মানুষদের প্রতি একটা স্বভাবত ঔদাসীন্য ভাবলক্ষ্য করা যায়, তা বলে তিনি নগরবিমুখ ছিলেন না। তাঁর বহু সাহিত্যে শহরে মানুষ এলেও তিনি আসলে নাগরিক আড়ম্বতা বিমুখ ছিলেন। তিনি সংসারিক কোলাহলের বাইরে প্রকৃতির রূপ, সৎ, সহজ, সারল্যে পূর্ণ গ্রামীন মানুষদের খাঁটি বলে মনে করতেন। তাই বিভূতিভূষণ মানবজীবনের অকৃত্রিম ছবিগুলোকেই তিনি তাঁর ছোটগল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র (১৯২৩-১৯৯০)- এই গবেষণাকার্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সিঁদুরচরণ, বোতাম, অরণ্যে, শিকারী* ('কথাসাহিত্য', পৌষ ১৩৫৬), *কবি, কয়লাভাঁটা, কুশল পাহাড়ী, কালচিতি* ('যুগান্তর', আশ্বিন ১৩৫৫) *ছোটনাগপুরের জঙ্গলে* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। গল্পগুলিতে বিভূতিভূষণের অন্তর্লোকের বৈশিষ্ট্য, মনোভাবনা প্রতিফলন ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে লেখক সারাণ্ডা, রাঁচি, হাজারিবাগের বনাঞ্চল সন্নিহিত বিভিন্ন বনাঞ্চলে ঘুরেছেন আর সেই সময়কে, ভ্রমণ কাহিনিকে শাশ্বত করেছেন বিভিন্ন লেখনীতে। গল্পগুলিতে মূলত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর পাশাপাশি

আদিবাসী মানুষদের সহজ-সরল জীবনযাপন ও শহুরে মানুষদের দৃষ্টিতে এই প্রাকৃতিক নিসর্গের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১): রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্য জগতের এক অন্যতম বলিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম– বীরভূমের লাভপুর গ্রামে, ১৩০৫ সালের ৭ ই শ্রাবণ, শুক্রবার (১৮৯৮ খ্রি. ২৩ জুলাই), মৃত্যু– ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা প্রভাবতী দেবী, স্ত্রী উমাশশী দেবী। তারাশঙ্কর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করতেন। আই.এ পড়াকালীন ব্রিটিশ-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় লেখককে কারাবরণ করতে হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বীরভূমে। মুণ্ডারী ভাষায় বীরভূমের 'বীর' শব্দের অর্থ 'জঙ্গল'। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ঘোষ বলেছেন-

> 'বাংলার রাঢ় অঞ্চল আদিবাসী প্রধান। স্তরিত শিলার মত্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম ক্রম সংস্কৃতির উপাদান নানা রূপে ও বিচিত্র বিন্যাসে গ্রথিত হয়েছে'।[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যমানস এই প্রেক্ষাপটেই পরিপুষ্ট। তাঁর লেখায় সমাজ চেতনার পাশাপাশি মানুষের জীবনের টানাপোড়েন, আদিবাসী মানুষদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনযাপন, কুসংস্কার, পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রণা, দাঙ্গা, ইতিহাসের পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, তাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টির জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী ছিল এবং তাঁর লেখা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম– ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি গল্পগ্রন্থ, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধের বই, ৪টি আত্মজীবনী, ১টি প্রহসন, ২টি ভ্রমণ কাহিনি, ১টি কাব্যগ্রন্থ। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি, জ্ঞানপীঠ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী পুরস্কারে পুরস্কৃত হন।

১৯৪৭-এর সময়ে আমরা দেখি তারাশঙ্করের ব্যাধি জর্জরিত ভগ্ন স্বাস্থ্য, মানসিক অবসাদ। স্বাস্থ্যহানির পাশাপাশি লেখকের মানসিক অবসাদের নিগূঢ় কারণ বলা যেতে পারে তাঁর মনের নাস্তিক্যবাদ ও আস্তিক্যবাদের দ্বন্দ্ব। তখন তিনি মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি কমিউনিস্ট

ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে থাকেন। লেখকের কথায়, 'তখন (১৯৪৪-৪৫), আমি প্রাণপণে বিজ্ঞানবাদী ও নাস্তিকতায় বিশ্বাসী'।[২] কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স-এর সাম্যবাদী ভাবধারার আদর্শ, লেনিনের আদর্শের প্রতি তারাশঙ্কর আকৃষ্ট না হয়ে তখন পারেননি, কারণ নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের দুঃখে তাঁর গভীর বেদনাবোধ, এর পাশাপাশি শ্রেণি-শোষণহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন, ঐক্যের স্বপ্ন লেখককে ভাবিয়ে তুলেছিল। লেখক নিজে জমিদার বাড়ির সন্তান হওয়ায় এবং কৈশোরে বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষুদিরাম বসুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তিনি ১৯১৮-১৯৩০ সময়কালে আর্তদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এই কারণে আদিবাসী মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজৈবনিক লেখা থেকে জানা যায়, বীরভূমে বাড়ি হওয়ার সুবাদে বাউরি, বেদে-বাজিকর, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের ছোট থেকেই দেখে বড় হয়েছেন, তারই প্রতিফলন ঘটেছে লেখকের লেখায়।

আমাদের গবেষণাকার্যের আলোচনাসূত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে— *বেদের মেয়ে* ('শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৫৬), *শিলাসন* ('যুগান্তর পূজাসংখ্যা', ১৩৫৮), *বরমলাগের মাঠ* ('চতুরঙ্গ',১৩৬০), *কমলমাঝির গল্প* ('জয়যাত্রা', ১৩৬৩), *সাপুড়ের গল্প* ('তরুণের স্বপ্ন', ১৩৬৫), *সুকু ও ভুকু* (১৩৬৮), *একটি প্রেমের গল্প* ('অমৃত পূজাসংখ্যা', ১৩৭১), *শঙ্করীতলার জঙ্গলে* ('যুগান্তর', ১৩৭৩), *দেহের প্রদীপে রূপের শিখা* ('জলসা পূজাসংখ্যা', ১৩৭৪), *অক্ষয়বটোপাখ্যানম্* ('শুকসারী', ১৩৭৬), *প্রত্যাখ্যান* (১৩৭৭), *যাদুকরের মৃত্যু* ('কামধেনু', অজ্ঞাত), *নারী ও নাগিনী* ('দেশ শারদীয়া', ১৩৪১), *বেদেনী* ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৪৬), *যাদুকরী* ('আনন্দবাজার শারদীয়া', ১৩৪৮), *ঘাসের ফুল* ('প্রবাসী', কার্তিক ১৩৪১)। লেখকের বেশিরভাগ গল্পে বেদে-বাজিকর জাতির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়- *নারী ও নাগিনী, যাদুকরী, বেদেনী, বেদের মেয়ে, সাপুড়ের গল্প* ইত্যাদি এছাড়াও সাঁওতাল জাতির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়- *একটি প্রেমের গল্প, ঘাসফুল, কমল মাঝির গল্প* পাশাপাশি বহু গল্পে বাউরি বা বাগদী প্রান্তিক জাতির কথা, আদিবাসী এবং এই প্রান্তিক মানুষদের একত্রে বসবাসের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। গল্পগুলিতে রাঢ় বাংলার আদিবাসী জীবনচর্যা, তাদের কুসংস্কার, ধর্মাচরণ, প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র লিপিবদ্ধ।

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯): বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ছদ্মনাম বনফুল। জন্ম– ১৯ শে জুলাই ১৮৯৯, পূর্ণিয়া জেলায়। মৃত্যু- ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। বনফুলের আদি নিবাস হুগলি জেলার শিয়াখালা গ্রামে। লেখক

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আই.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন হাজারীবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়েন ও পাটনা মেডিকেল থেকে এম.ডি করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় *মালঞ্চ* পত্রিকায় একটি কবিতা প্রথম প্রকাশ হয়। লেখক হাজারের বেশি কবিতা, ৫৮৬ টি ছোটগল্প, ৬০টি উপন্যাস ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

বনফুলের হ্রস্বাবয়ব গল্পসূত্র ও গল্পের আখ্যানপ্রকরণ নির্মাণ গঠনে আজও তিনি অবাক ক্ষমতাশালী লেখক বাংলা সাহিত্যে। বনফুল এমন একজন লেখক যাঁর লেখায় জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জীবনের গভীর আবেগ বর্তমান। লেখক নিজে চিকিৎসক হওয়ায় জীবন ও পৃথিবী, মানুষ সম্পর্কে একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। জীবন বহুবিচিত্রের সমন্বয়, হাস্য-করুণ, অতিপ্রাকৃত, অদ্ভুত সব বোধের বিচরণ বনফুল তাঁর সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেন নাটকের দৃশ্যের মতো ছোট ছোট অংশ নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। তিনি সবটুকুকে একসাথে এক নজরে দেখেননি, বলাবাহুল্য লেখক উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য যেটুকু দরকার তার একটিও বেশি শব্দ বা বর্ণনা খরচ করেননি। গল্পের সমাপ্তির শেষবাক্যে সর্বদাই অদ্ভুত বিদ্যুৎচমক সমাপ্তি আছে। চেনাজানার বাইরে অচেনা একটা পরিমন্ডল বা দৃষ্টিকোণ আছে যা সাধারণ, প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র। বনফুল তাঁর সাহিত্য বা ছোটগল্পে চেনা দেখার মধ্যেও সেই স্বতন্ত্র, অচেনা দেখার পরিমন্ডল গড়ে তুলেছেন।

বনফুলের ছোটগল্পে এক বাস্তবের সঙ্গে অন্য বাস্তবের বিরোধিতা চিত্রের পাশাপাশি গল্পের প্রতিটা বাক্যই গল্প সংগঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। আমাদের গবেষণাকার্যে বনফুলের *তবে কি?, মনিকাঞ্চন, বুধনী* গল্পত্রয়ী নির্বাচন করা হয়েছে। *তবে কি?, মণিকাঞ্চন* গল্পদ্বয়ে অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বিষয় থাকলেও এই রূপকের আড়ালে থাকে গভীর জীবনবোধের দৃষ্টিকোণ। বাস্তবকে ছেড়ে অতিপ্রাকৃত, অতিলৌকিক রূপকের আশ্রয় ও তার সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর মানুষের সম্পর্ক এসব কিছুর অন্তরালে বনফুলের নিছক বাস্তবকে ভাঙচুর করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু তা বলে গল্পগুলো অবাস্তব বা বাস্তবহীন নয়, গল্পের মধ্যে বরং সুগভীর দৃষ্টিকোণ বর্তমান। লেখক ছদ্মনামের ন্যায় জীবনরসেও ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি তার মধ্যে দিয়ে গভীর জীবনদর্শন উপলব্ধি করার বার্তা দিয়েছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬): বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধায়ের জন্ম বীরভূমের রূপসীপুর গ্রামে ১৯০১ সালের ১৯শে মার্চ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শৈলজানন্দের ও জন্মস্থান রাঢ়অঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ উজ্জ্বল নক্ষত্ররা যখন বাংলা সাহিত্যাকাশে বিরাজমান সেই সময়ে একেবারে অন্যধারার ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য নিয়ে হাজির হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজানন্দের পোশাকি নাম ছিল শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাকনাম শৈলজা। কিন্তু *ভারতবর্ষ* পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন এক মেয়েলি নাম না-মঞ্জুর করায়, শৈলজা নামের সাথে আনন্দ যোগ করে হয়ে গেল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে তৎকালীন প্রচলিত সাহিত্য ধারার বাইরে সাহিত্যে যে এক নতুন ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়েছিল সেই সমস্ত তরুণ লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দের হাত ধরে প্রথম সমাজে সবচেয়ে উপেক্ষিত ব্রাত্য আদিবাসী সমাজের জীবনচিত্র, আর্থ সামাজিক অবস্থান ফুটে ওঠে। উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যে আদিবাসীদের আনাগোনা থাকলেও, সেখানে জাতিতত্ত্ব চর্চা, নৃতাত্ত্বিক দিক আলোচিত, তাদের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির অন্তরঙ্গরূপ প্রাধান্য পায়নি। বলা চলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জনজাতি জনজীবন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় পদার্পণ করে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শৈলজানন্দের অভিজ্ঞতা দুভাবে হয়েছিল বলা চলে, প্রথমত লেখকের জন্মস্থান বীরভূমে, গ্রামীণ পরিবেশে বড় হওয়ায় আশৈশব তিনি সাঁওতালদের সরল, নির্লোভ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, লেখকের মাতামহ অর্থাৎ দাদামশাই বর্ধমানের অণ্ডালের রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কয়লা খনির মালিক। এই সূত্রে রানিগঞ্জের কয়লাখনির মানুষদের জীবন সম্পর্কে পরিচয় ছিল এবং শৈলজানন্দ রাঢ় অঞ্চলের মানুষ হওয়ায় আদিবাসী মানুষদের জীবনচর্যার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এছাড়াও তিনি কর্মসূত্রে কুলিমজুরের খোঁজে যেতেন সাঁওতাল পরগনার বিভিন্ন সাঁওতালপল্লীতে। এই সময়ই শৈলজানন্দ মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় সাড়া জাগানো ছোটগল্প *কয়লাকুঠি* লেখেন, এই গল্পের বিষয়বস্তু তা বাংলা সাহিত্যে যেন এক অপ্রত্যাশিত চমক, বাংলা সাহিত্য জগতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন। গতে বাঁধা প্রথাগত চলার পথের অভিমুখ পরিবর্তন

করে এক নতুন পথচলা, এই সাহসী পদক্ষেপ অর্থাৎ *কয়লাকুঠির* গল্পগুলি রচনায় কী মনোভাব ক্রিয়াশীল সে বিষয়ে লেখক নিজেই বলে গেছেন-

> 'কয়লাকুঠির দেশ। রবিবার দিন ছুটি পেলেই দুজনে (অর্থাৎ শৈলজানন্দ এবং কাজি নজরুল ইসলাম) দুটি খাতা নিয়ে চলে যাই বহু দূরে। একদিন এক কয়লাখাদের পাশে সাঁওতাল কুলি-ধাওড়ার কাছে আমরা বসে বসে গল্প করছি। আমার বেশ মনে আছে- দূরে চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠছে, চানকের মুখে হেডগিয়ারের চাকা ঘুরছে, তার উপর পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে, ঢং ঢং ঘণ্টা বাজছে, মাটির নিচ থেকে কয়লা বোঝাই টবগাড়ি উঠছে, দূরে একটা আমবাগানের পাশে হঠাৎ কোথায় যেন একটা মাদল বেজে উঠল। এই সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে একটি অপূর্ব ভাব জাগল যে আমি আর কিছুতেই তাকে ভুলতে পারলাম না। বাড়ি ফিরে এসে গল্প লিখতে বসে গেলাম। লিখলাম 'কয়লাকুঠি'। চারদিন লাগল শেষ করতে। আমার গল্পের একমাত্র শ্রোতা নজরুল। তাকে শোনালাম।... তারপর থেকেই আমি গল্পের পর গল্প লিখে চলেছি। আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি এবং চরিত্ররা সব সাঁওতাল কুলি মজুর'।[৩]

লেখকের এই গল্প প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *প্রবাসী* পত্রিকায় *সাহিত্যে নবত্ব* প্রবন্ধে বলেন-

> 'শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি-দরিদ্রনারায়ণের পূজারীর মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যেসব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি'।[৪]

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর *সাহিত্যবিতান* গ্রন্থে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন–

শৈলজানন্দই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে Regional অর্থাৎ অঞ্চল বিশেষ ও সমাজ বিশেষের জীবনকে গল্প উপন্যাসের বিষয়ীভূত করেছিলেন।[৫]

প্রেমেন্দ্র মিত্র শৈলজানন্দের সাহিত্য সম্পর্কে *অমৃতবাজার* (২রা মাঘ ১৩৮২) পত্রিকায় বলেন-

‘এরই মাঝে বাংলা সাহিত্যে অপ্রত্যাশিত চমক লাগল শৈলজানন্দের গল্পে। কয়লাকুঠির গন্ধ। সেখানকার সাঁওতাল, আদিবাসী কুলি–কামিনদের নিয়ে লেখা। সে গল্পের বিষয় শুধু আলাদা নয়, তার পরিবেশ থেকে সুর স্বর সবই ভিন্ন। ... শৈলজনন্দ শুধু মানুষ নিয়ে নতুন ধরনের গল্প লেখেননি, সাহিত্যের ভূগোলই আশ্চর্যভাবে বিস্তৃতি করে দিয়েছেন। আঞ্চলিক সাহিত্যের সত্যকার সূত্রপাত শৈলজানন্দের সেই কয়লাকুঠির গল্পে। ...শৈলজানন্দ ইচ্ছা করলে এই কয়লাকুঠির কাহিনী লিখেই সাহিত্য জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন’।[৬]

মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়াও শৈলজানন্দের নতুনমাত্রার সাহিত্য নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *মানিক বিচিত্রায়* লেখেন-

‘কল্লোলপন্থী হয়েও শৈলজানন্দ বাংলা গল্পের ভৌগলিক এবং মানবিক সীমান্তরেখাকে অনেকখানি প্রসারিত করে দিতে পেরেছিলেন। এনেছিলেন কয়লাকুঠির মানুষদের, আদিম মানুষদের, এনেছিলেন তাদের বিষমাখানো ‘কাঁড় বাঁশকে’ আর এনেছিলেন তাদের উগ্র অমার্জিত কামনাকে’।[৭]

শৈলজানন্দের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মেহনতি মানুষদের জনজীবনের নিবিড় রূপ, তাদের চরিত্র, মন-মানসিকতা, সংস্কার-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যকদের লেখায় নিম্নবর্গীয়দের কথা আছে, তারাও পেশাগত, আর্থ-সামাজিক অবস্থানের নিরিখে জনজাতি গোষ্ঠীর সমগোত্রীয় বলা চলে কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতিই আদিবাসীদের স্বতন্ত্রতার কারণ। বাংলা সাহিত্যে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের কথা পেলেও সমাজের প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের জীবনের নিবিড় রূপ সেভাবে শৈলজানন্দের আগে পাওয়া যায়নি। স্পষ্টত বোঝা যায়, সমাজে জনজাতিদের অবস্থান অন্ত্যজ নিম্নবর্গীয় মানুষদের থেকেও

নিম্নে, তারা সমাজে ব্রাত্য। সাহিত্যই সমাজের প্রতিচ্ছবি, সাহিত্যের দর্পণে শৈলজানন্দের পূর্বে আদিবাসীদের প্রতিচ্ছবি যেটুকু পাওয়া যায় তা নামমাত্রই, তাই বলা চলে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই নতুন পথের পথপ্রদর্শক।

১৯২৩-১৯৯০ সময়পর্বের বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র, এই আলোচনায় শৈলজানন্দের *কয়লাকুঠি* ('বসুমতী', কার্তিক ১৩২৯), *নারীর মন* ('কল্লোল', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০), *মা* ('কল্লোল', বৈশাখ ১৩৩০), *ঝুমরু* ('কল্লোল', আশ্বিন ১৩৩০), *পৌষ-পার্বণ* ('বাসন্তী', ফাল্গুন ১৩৩০), *রাঙাশাড়ি, রহস্যময়ী* ('কলকাকলি', ১৩৭১), *কালো-কালো মানুষ, সারি-পাঁচি, প্রতিবন্ধক, সাঁওতাল, সাঁওতাল পল্লী, পলহানের বিহা* ('কালিকলম', ১৩৩৩), *বনবিহগী* নামান্তর *বনের হরিণ ছিল বনে, রেজিং রিপোর্ট* ('প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩২৯), *সব ভূতুড়ে, মরণবরণ* ('কল্লোল', মাঘ ১৩৩০), *বন্দী* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। শৈলজানন্দের ছোটগল্পে সাঁওতাল, বাউরি গোষ্ঠীর মানুষদের সহাবস্থান, তাদের বাঁচার লড়াই, আদিবাসীদের সুস্থ-স্বাস্থোজ্জ্বল আদিম জীবনের নিঃসঙ্কোচ প্রেম-ঈর্ষা-আত্মত্যাগ, চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব এবং গল্পগুলির গভীর বিশ্লেষণে কয়লাকুঠির কুলিকামিনদের জীবনের তীব্র শোষণ-বঞ্চনার চিত্র, তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়িত জীবনযাপনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫): বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম একজন কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী। জন্ম ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬, ভট্টবাজার, পূর্ণিয়া জেলা, বিহার। মৃত্যু ৩০ মার্চ, ১৯৬৫। সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য, 'তিনি লেখকের লেখক'। খুব কম সংখ্যক গল্প-উপন্যাস লিখেও সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর লেখার মধ্যে বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে বিদগ্ধ মানসিকতা, সমাজদর্শন প্রসঙ্গে যে গভীরতম চিন্তাভাবনা, লিখনশৈলী নিয়ে যে নিত্য নবচমক এবং গভীরতর চিন্তাভাবনা তা লেখককে বাংলা সাহিত্য জগতে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর আদি নিবাস ছিল কৃষ্ণনগর, নদিয়া জেলা, কিন্তু কর্মসূত্রে লেখকের পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী আইন ব্যবসার সূত্রে ১৮৯৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়ায় চলে যান। লেখকের শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মজীবন, সাহিত্যসাধনা সবকিছুই পূর্ণিয়াতেই। লেখকের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে এই পূর্ণিয়ার অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত। ১৯২৪ সালে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেন স্কলারশিপ নিয়ে। এরপর ১৯২৬-

এ পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করেন। ১৯৩০-এ অর্থনীতিতে এম.এ এবং ১৯৩১ সালে পাটনা ল কলেজ থেকে আইন বিষয়ে পাশ করেন। ১৯৩২-১৯৩৮ সময়কালে আইনব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী পূর্ণিয়ায় ভাষণ দিতে আসেন। সেখান থেকে সতীনাথ ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং বলা যেতে পারে লেখকের রাজনৈতিক জীবনপর্বের সূচনা হয়। তিনি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এছাড়াও বহু সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও 'ভাদুড়ীজী' নামে খ্যাত হন। তিনি তাঁর জীবনে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তিনবার কারাগারে বন্দী হন– ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২-১৯৪৪। লেখকের কাছের বন্ধু বীরেন ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় রাজনীতি থেকে ১৯৪৮ সালে তিনি সরে আসেন এবং সাহিত্য সাধনা শুরু করেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন বিদেশী লেখক– স্পিনোজা, লুকাচ, অ্যাশাল মন্টেগু, সার্ত্রে এছাড়াও শেক্সপিয়র, আইনস্টাইন, কার্ল মার্ক্স, পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের সান্নিধ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস *জাগরী* বাংলা সাহিত্যের মাইলস্টোন। লেখকের পূর্ণিয়া থাকার অভিজ্ঞতা, সমাজসেবার জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জীবনযাপন, আদিবাসী মানুষদের জীবনযাপন খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা, পাশাপাশি রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় ভাষা চর্চা ও নানাবিধ গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, এই জীবনসঞ্জাত বীক্ষাই তাঁর বিভিন্ন লেখার গ্রিনরুম।

আমাদের গবেষণাকার্যের স্বার্থে সতীনাথ ভাদুড়ীর– *বন্যা, আন্টাবাংলা, অভিজ্ঞতা, মহিলা- ইন-চার্জ, রথের তলে* গল্পগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী বাহ্যজীবনের ঘটনাকে অন্তরের সঙ্গে একাত্ম করে নিতেন, তাই তার বাল্যবয়সের স্মৃতি পরবর্তীতে সাহিত্যে প্রতিফলিত। স্কুল বয়সে দেখা প্ল্যান্টারস্ ক্লাবের স্মৃতির পলি *আন্টাবাংলা* (শারদীয় দেশ ১৩৫৪) গল্প। এই তীক্ষ্ণধী, সত্যপ্রিয় মানুষটি সমাজের বাস্তবতার, রাজনীতির নগ্ন সত্যরূপ, আদিবাসী মানুষের জীবনযাপনের চিত্র রাখঢাক না রেখে গল্পগুলিতে তুলে ধরেছেন। লেখকের বেশিরভাগ গল্পের পটভূমি ও মানুষ বহির্বঙ্গের।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬): কল্লোলযুগের শক্তিশালী কলমের অধিকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ সালের ২৯শে মে। বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে লেখকের জন্মস্থান এবং তাঁর পিতার কর্মস্থল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম- মানিক। পিতার চাকরিসূত্রে মানিককে দুমকা, আড়া, সাসারাম, কলকাতা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বারাসাত, টাঙ্গাইল, মেদিনীপুর নানা স্থানে যেতে হয়।

স্নাতকস্তরে থাকাকালীনই *বিচিত্রা* পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প *অতসীমামী* (১৯২৮) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-শরৎ প্রভাবমুক্ত স্বতন্ত্রধারার লেখক হিসাবে খ্যাতি পান মানিক। জীবনের প্রথম পর্বে মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার, আইভন পাভলভ প্রমুখ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। সাহিত্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষের মনের অতলে থাকা জটিলতা উন্মোচন করেছেন, তেমনি মার্কের শ্রেণিসংগ্রামতত্ত্বের বিশ্লেষণও করেছেন, পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্বসঙ্কুল জীবনাচরণ, মানুষের অন্তঃজীবন তুলে ধরেছেন।

আমাদের গবেষণায় আলোচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সাঁওতাল* গল্পে সভ্য ও আদিম মানুষদের মনের দ্বিধা, তাদের আদিমজীবনের দৃঢ় মনোভাব উন্মোচিত। লেখকের দ্বিশতাধিক ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন একাধিকবার উঠে এলেও আদিবাসী জনজীবন কেবলমাত্র *সাঁওতাল* ('নতুন জীবন', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২) গল্পে এবং *দর্পণ* (১৯৪৫) উপন্যাসে পাওয়া যায়। আদিবাসী মানুষেরা মানিকের সাহিত্যে প্রায় ব্রাত্যই বলা চলে।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০): কল্লোলযুগের অন্যতম শক্তিশালী বাংলা ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষের জন্ম ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে, হাজারিবাগে। আদিনিবাস বাংলাদেশ। কৈশোর ও যৌবনে কেটেছে হাজারিবাগে। মৃত্যু: ১৯৮০। লেখকের কেবল সাহিত্যে নয় নৃবিদ্যাতেও যথেষ্ট পারদর্শীতা ছিল। সুবোধ ঘোষ ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, হাজারিবাগ শহরের সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। দারিদ্রের কারণে পড়াশোনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং তিনি জীবিকার সন্ধানে বের হন। সুবোধ ঘোষের জীবিকা বিচিত্র- টিউশানি, ট্রাক-বাস ড্রাইভারি, সার্কাস পার্টিতেও কাজ করেছেন, এছাড়া তিনি বোম্বে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঝাড়ুদারের কাজও করেছেন। এমনকি মহামারির টাকা দানের কারণবশত পূর্ব আফ্রিকা

পর্যন্ত পাড়ি দেন। অভাবের কারণে কমবয়স থেকেই তিনি জীবিকার সন্ধানে ছিলেন। তিরিশের দশকের শেষে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব লেখকের ছোটগল্পগুলি।

এখানেই বন্ধুদের অনুরোধে ১৯৪০ সালে তাঁর প্রথম গল্প লেখেন- *অযান্ত্রিক*, এই একই সময়ে লেখেন *ফসিল*। এই দুটি গল্প রচনার মাধ্যমে সুবোধ ঘোষ নিজেকে বাংলা সাহিত্যে গল্পকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গভীর আর্থসামাজিক চেতনা, প্রখর বাস্তববোধ, জীবনে এত পেশার অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন জায়গার অভিজ্ঞতা, মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী প্রবণতাকে ছোটগল্পের জগতে তিনি নতুনভাবে রূপ দিলেন। বিশিষ্ট দার্শনিক ও হাজারিবাগে থাকাকালীন মহেশ ঘোষের লাইব্রেরিতে প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সামরিক বিদ্যা নিয়েও পড়াশোনা করেন। *ভারত প্রেমকথা, কিংবদন্তীর দেশে*- এই লেখাগুলো পুরানকথা, লোককথা, উপকথা থেকে নেওয়া গল্পের সঙ্কলন। এর পাশাপাশি *ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস, অমৃতপথযাত্রীর* মতো গবেষণাধর্মী লেখাও লেখেন। এছাড়াও তাঁর নৃবিদ্যাতেও জ্ঞান ছিল, সুবোধ ঘোষ প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক যিনি গল্প-উপন্যাস রচনার পাশাপাশি পৃথকভাবে আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক স্বরূপের কথা ভেবেছেন এবং আদিবাসী বিষয়ক প্রবন্ধধর্মী রচনায় নিজস্ব চিন্তা ব্যাক্ত করেছেন সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর *ভারতের আদিবাসী* নামক গবেষণাগ্রন্থে। হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে পড়াকালীন সুবোধ ঘোষ নৃবিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায়ের লেখালিখির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং আদিবাসীদের নৃতত্ত্ব বিষয়ে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই আগ্রহ এবং মনের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক হওয়ার সুপ্ত বাসনা, আকাঙ্ক্ষা থেকেই যে আবেশ-কৌতূহল-আগ্রহের জন্ম হয়েছিল, তারই সঞ্চয় গল্প- উপন্যাসে প্রতিফলিত। তিনি আদিবাসী নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন পাশাপাশি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূলে। আমাদের গবেষণাপত্রের জন্য সুবোধ ঘোষের- *ফসিল* (১৯৪০), *চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ* ('মন্দিরা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১), *লঘু আরণ্যক, উচলে চড়িনু* গল্পগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে।

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯): বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম স্মরণীয় ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদার। সাহিত্যিকের জন্ম ১৯১৪ সালের ১৪ই নভেম্বর। লেখকের পিতা পুলিশ অফিসার হিসাবে কলিকাতায় কর্মরত ছিলেন। সাঁওতাল গরগনার রিখিয়াতেও তাঁদের বাড়ি ছিল। এছাড়া তাঁদের স্থায়ী বিনাস ছিল টাকিতে। কমলকুমারের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই প্রায় শিল্পসাহিত্যের সাথে যুক্ত

ছিলেন। ফলত কমলকুমারের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয় শৈল্পিক আবহে এবং বিচিত্র স্থান। লেখকের সাহিত্যপ্রীতির সূত্রপাত ঘটে তাঁর মা রেণুকাময়ীর সাহচর্যে। কমলকুমার মজুমদারের ধর্ম, পুরাণে, সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জন্মায় তাঁর মায়ের সূত্রেই। জীবনের প্রথমে কমলকুমার জাহাজ এক্সপোর্ট, ইম্পোর্ট এইসব কাজ করেন। এছাড়াও আরও নানান ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমা পরার ভয়ে কমলকুমারের পরিবার সাঁওতাল পরগনায় চলে যায়। সাঁওতাল পরগনার পটভূমি লেখকের ছোটগল্পের পাতায় আলোচিত হয়েছে বারবার। এইসময়ই সাঁওতাল পরগনার আদিবাসী প্রান্তিক মানুষজনদের সাথে লেখকের পরিচয় ঘটে। এরপরে কলকাতায় ফিরে শিল্পসাহিত্যের সাথে যুক্ত হয়। তিনি লেখালিখির পাশাপাশি চলচ্চিত্র ও নাট্যচর্চাও করেন।

কমলকুমার তাঁর সমকাল দ্বারা যতটা না প্রভাবিত ছিলেন, তার থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন অধীতবিদ্যার মাধ্যমে। পারিবারিক শিল্পমনস্কতা, কমলকুমারের মধ্যে প্রথিত ছিল। ফরাসি, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও ছিল অগাধ জ্ঞান। কমলকুমারের পান্ডিত্য, জ্ঞানের বিশালতা ও ব্যপ্তি বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। লেখকের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের সূচনা থেকে বোঝা যায় ভারতীয় পৌত্তলিক চেতনা কমলকুমারের রচনার চালিকাশক্তি। কমলকুমার মজুমদার কেবল বিষয় ভাবনার ক্ষেত্রে নয়, স্বতন্ত্র রীতির প্রয়াসী তিনি, ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় অভিনবত্বের স্বাদ অন্বিত। মানবজীবনের নানা জটিলতা সংকটের চিত্র, প্রেমকে তিনি নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। কমলকুমার মজুমদারের লেখা গতি পায় *উষ্ণীষ* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। লেখক সামগ্রিক গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ের গল্পে কৃষক আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র মানুষদের অসহায়তা চিত্রিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে কাহিনির থেকেও থিম এবং ভাষাগত পরীক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে সমষ্টিচেতনার পাশাপাশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যাও তাঁর গল্পে দেখা গেছে, এছাড়াও শহরের অভিজাত শ্রেণি বনাম দরিদ্র মানুষের রাজনৈতিক সমস্যা।

উষ্ণীষ পত্রিকায় ১৩৪৪ সালে লেখকের প্রথম ছোটগল্প *লালজুতো* প্রকাশিত হয়। গল্পটি মধুর প্রেমের গল্প হলেও তা গতানুগতিক নয়। সামাজিক সংকটের পাশাপাশি প্রেম কমলকুমারের অনেক গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। ফ্রয়েডীয়, মার্কসীয় দুই মতাদর্শই লেখকের গল্পে পাওয়া যায়। লেখকের শিল্পসৃষ্টির

প্রকৃত স্ফুরণ ঘটে ১৯৫৫ সালে 'জল' গল্পের মাধ্যমে। লেখক গল্পে খুব সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের, তাদের বর্তমান ভবিষ্যতকে এমনভাবে এনেছেন যেখানে কাহিনির কোনো ঘনঘটা নেই। লেখক তাঁর রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'খেলা' এবং 'বাগান' এই ক্রম দিয়ে বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাস লেখেন। এই বাগান সিরিজের অন্তর্গত *বাগান কেয়ারি* ('বারোমাস', ১৯৭৮) গল্পটি আমাদের অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে। গল্পে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের সূক্ষ্মতা, প্রান্তিক মানুষের মৃত্যুর স্বরূপ চিত্রিত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০): খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, অবিভক্ত বাংলার অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বালিরডাঙ্গিতে (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত)। লেখকের প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৩ সালে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কারণবশত ১৯৩৫ সালের ১ মে লেখককে ফরিদপুর ত্যাগ করতে হওয়ার কারণে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি বরিশালের বিক্রম কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে ভর্তি হন ও নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে ১৯৩৬ সালে আই.এ. পাশ করেন এবং ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পরীক্ষায় 'ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৬০ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দচন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি কলেজ, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা শুরু ১৯৪৫ সালে *বীতংস* গল্প দিয়ে। লেখকের লেখালিখির শুরু ছোট থেকেই প্রায়। তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয় *মাসপয়লা* শিশু মাসিকে। এছাড়াও তিনি *সন্দেশ, মুকুল, পাঠশালা, শুকতারা* প্রভৃতি পত্রিকায় *সুনন্দর জার্নাল* লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এসময় তিনি বড়দের জন্য *শনিবারের চিঠি, চতুরঙ্গ, বিচিত্রা* ও *আনন্দবাজারে* লেখালিখি করেন। পিতার সাহচর্যে বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকা পড়েই লেখকের শৈশব কেটেছে। লেখকের লেখায় চল্লিশের দশকের যুদ্ধ, মন্বন্তর, শ্রেণিগত ব্যবধান, উঁচুতলার মানুষের অমানুষিকতা এবং নিম্নশ্রেণিকে শোষণ, দাঙ্গা, আন্দোলন এর প্রভাব স্পষ্ট। আমাদের গবেষণাকার্যের আলোচনা প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *বীতংস* ('শারদীয়

আনন্দবাজার', ১৩৪৯), *সৈনিক* (১৩৫০), *ভোগবতী, বনতুলসী,*– এই গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। লেখকের গল্পে সময়ের অসহিষ্ণুতার ও যুগযন্ত্রণার পাশাপাশি মানবজীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব, জনজাতি মানুষদের সহজ-সরলতা, বঞ্চনা, অসহায়তা তাদের উপর হয়ে চলা শ্রমশোষণের চিত্র লিপিবদ্ধ। লেখকের গল্পে সমাজ বাস্তবতার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ মূর্ত।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১): এক সচেতন সংবেদনশীল সত্তার পরিচয়, কল্পনাকুশল মননশীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁর ছোটগল্পে সেই অমিয়ভূষণ মজুমদারের জন্ম ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মার্চ। জন্মসূত্রে কোচবিহারের বাসিন্দা হলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার সারা থানার অন্তর্ভুক্ত পাকুরিয়া গ্রামে।

কাহিনি, চরিত্র ও আঙ্গিকের নবনির্মাণে তিস্তা-তোর্ষা-ধরলা-গদাধরের অনন্ত প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময়ের জীবনের নির্মোহ রূপকে তুলে এনেছেন লেখক তাঁর ছোটগল্পে। তবে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনজাতি সমাজ লেখকের উপন্যাসে যতটা উপস্থিত, ততটা ছোটগল্পে নয়। অমিয়ভূষণের জীবন ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট, ছোটগল্পের অভিনবত্ব, প্রাচ্যপুরাণের নবনির্মাণের সঙ্গে পাশ্চাত্য পৃথিবীর নির্মোক পরিত্যক্ত জীবনকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ দর্শনে প্রকৃত সত্যের যে সন্ধান তাঁর লেখনিতে প্রাপ্য, তাতে পরিস্ফুট লেখকের জীবনদর্শন। অমিয়ভূষণের জীবনের প্রায় পুরোটা সময় উত্তরবাংলার প্রান্তিক কোচবিহারে কাটলেও, তাঁর দর্শনে-চৈতন্যে বিরাজিত দেশজ ও আন্তর্জাতিক ভাবনা। নানা বিতর্কিত মতাদর্শ ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, সাহিত্যের বিষয় ভাবনার অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়ে তিনি বলেছেন -

> 'আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুডসের আড়তের বাইরে মেদিনীপুর থেকে সিকিওম সীমান্ত ছড়ানো কলকাতার বাইরে যে ভূমি ... যাকে প্রকৃতপক্ষে *hinterland* ভাবা হয়। সেখানে দলে দলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে ভালুক চেহারার কালো কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাওন্সের যোগান ঠিক রাখে, যে ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন, সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক

বড়, সেখানে বাঙালিদের দেশভাগের সাতভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি। তা বকখালি হোক, শুকনা হোক কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি না। কলকাতাকেই বলতে চাইছি বেরিয়ে এসো ইংরেজিয়ানা থেকে, দেখো এই মাতৃভূমি, ভালোবাসো একে, মরবে না, কাদায় ডুবে যাচ্ছ, ধোঁয়ায় দম বন্ধ, কতদিন আর অ্যাংলো স্যাকসনি মুখোশে থাকবে'।[৮]

জীবনসম্পর্কিত এই তীক্ষ্ণ জীবনবোধ থেকেই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে নগরকেন্দ্রিক আধিপত্য বর্জিত উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও তৎসংলগ্ন মানুষ। জন্মসূত্রে কোচবিহারের মানুষ হওয়ায় অত্যন্ত কাছে থেকে তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পাহার, নদী, অরণ্য প্রকৃতি, সেই সব অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মানুষদের সংস্কার-বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর এই নিবিড় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদিবাসীদের অতীত ইতিহাস ও তাদের জীবনাচরণের মধ্যে দিয়ে ছোটগল্পের কথাবস্তুতে কৌম জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক রূপকে তুলে ধরেছেন। প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র অন্বেষণে, আমাদের গবেষণায় লেখকের *দুলারহিনদের উপকথা, তুলাইপাঞ্জার রোয়া, সাদা মাকড়সা* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদার উত্তরবাংলার জনজাতির জীবনের টানাপোড়েন, দেহজ ভালোবাসা, অবদমিত বাসনার অভিব্যক্তির পাশাপাশি ইতিহাস বোধ, কালচেতনা, বাস্তবতা পরবাস্তবতা, মানুষের প্রকৃতিমুগ্ধতা, অতীতচারিতা, ঐতিহাসিক সংকেত তিনি তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পঙের পার্বত্য পরিবেশে নিম্নবর্গীয় সমাজের জীবনের ছবি, মানবাত্মার আত্ম-উন্মোচিত তাঁর ছোটগল্পে।

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮): গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর জন্ম ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২। কৈশোর কেটেছে খড়্গপুরে লেখকের বাবার কর্মসূত্রে। তাঁর বাবা ছিলেন ভ্রমণবিলাসী। তাই স্কুলজীবনেই পুরো পরিবারের সাথে প্রায় পুরো ভারতই লেখক ঘুরেছেন। এই ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার কারণেই আদিবাসী মানুষদের সামনে থেকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখায়। বন্ধুদের তাগিদে এবং ওই ভারতভ্রমণের পুঁজি নিয়েই তাঁর লেখা আজকাল সাপ্তাহিক পত্রিকায় চার পাতার গল্প ট্র্যাজেডি। এরপর তাঁর লেখার শুরু *বারো ঘোড়ার আস্তাবল, বনবাতাস, রত্নকূট, সহযোগ* -এর মত বহু অনন্য সাধারণ সব গল্পের সৃষ্টি।

লেখক অল্প বয়স থেকেই লেখালিখি শুরু করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। লেখকের বহু উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– টেস্টটিউব বেবির জনক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী অবলম্বনে ১৯৮২ সালে লেখা গল্প *অভিমন্যু*, যার কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্রকার তপন সিনহা হিন্দি ভাষায় নির্মাণ করেন– 'এক ডাক্তার কি মওত' সিনেমা। এছাড়া লেখকের গল্প অবলম্বনে তৈরি 'তখনই', 'পিনিক', 'বনপলাশীর পদাবলী' প্রভৃতি ছায়াছবি উল্লেখযোগ্য।

রমাপদ চৌধুরী তাঁর বৈচিত্র্যময় ও অনন্য সাহিত্যকৃতির জন্য নানান পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৭২ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন। লেখকের প্রায় দেড়শ ছোট গল্প আর পঞ্চাশের উপর উপন্যাসের সংখ্যা। এই অনন্য লেখনী পৃথিবী গড়ে তুলে হঠাৎ রীতিমতো ঘোষণা করেই তিনি তাঁর কলমকে থামিয়ে দেন। সময়ের অভিজ্ঞতা, যুগের যন্ত্রণা, রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি তাঁর ভারতভ্রমণের পুঁজি ও জীবনের আকাবাঁকা পথ ও অভিজ্ঞতাই লেখকের সাহিত্যের ভাষা ও বিষয়বস্তুর মূলে। 'বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজ– একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)'–শীর্ষক গবেষণাপত্রের আলোচনার্থে লেখকের *তিনতারা* (১৩৫৫), *বনবাতাস* (১৩৫২), *দরবারী* (১৩৫৮), *জলরঙ* (১৩৫৮), *লাটুয়া ওঝার কাহিনী* (১৩৫৯), *ইম্‌লী* (১৩৬০), *রেবেকা সোরেনের কবর* (১৩৬০), *ঝুমরা বিবির মেলা, মানুষ অমানুষের গল্প* (১৩৬৬), *নারীরত্ন* (১৩৬২), *ভারতবর্ষ* (১৩৭৫) গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। শৈলজানন্দের ন্যায় কয়লাখাদানের শ্রমিকদের জীবনের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু রমাপদ চৌধুরীর গল্পে কয়লাখাদানকেন্দ্রিক শ্রমিকদের হৃদয়াবেগের থেকে প্রাধান্য পেয়েছে আদিবাসী শ্রমিকদের বিপর্যস্ত-বিপন্ন জীবনের কথা, শ্রমের রাজনীতি-ষড়যন্ত্র চিত্রিত, পাশাপাশি আদিবাসীদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার, আদিবাসীদের অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার, আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান, সমাজের প্রান্তবাসী মানুষগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস প্রাধান্য পেয়েছে।

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮): বাংলা সাহিত্যজগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে যে সমস্ত গুণী সাহিত্যিকদের সাহিত্য দ্বারা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কথাসাহিত্যিক হলেন সমরেশ বসু। কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু জন্মগ্রহণ করেন

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাজানগর গ্রামে ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর। পিতা মোহিনীমোহন বসু, মা শৈবালিনী দেবী। তাঁর পিতৃদত্ত নাম সুরথনাথ বসু, পরবর্তীকালে শ্যালক কর্তৃক প্রদত্ত নাম সমরেশ।

এই নামেই তিনি বাংলা সাহিত্যজগতে, পাঠক সমাজে সুপরিচিত এবং সমাদৃত। শুধুমাত্র স্বনামে নয়, তিনি ‘কালকূট’ ও ‘ভ্রমর’ ছদ্মনামেও লিখেছেন। লেখকের পিতা মোহিনীমোহন বসু ছিলেন চিত্রাঙ্কণে পারদর্শী এবং মা শৈবালিনীর মধ্যেও ছিল এক অসাধারণ গুণ। তিনি ছিলেন ব্রতকথার নিপুণ কথাশিল্পী। মায়ের সাহচর্যেই লেখক শৈশবে নিজের মধ্যে এক বিচিত্র কল্পলোকের বীজ বপন করেছিলেন। সমরেশ ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত গিরিশ মাস্টারের পাঠশালায় পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে গ্রাণ্ডারিয়া গ্র্যাজুয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ পনেরো বছর বয়সে তাঁকে তাঁর বড়দা মন্মথনাথের কাছে নৈহাটিতে পাঠানো হয়। সেখানে স্কুলের নথি থেকে জানা যায় তিনি অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন, এরপর আর কোনো তথ্য নেই। এখানেই লেখকের প্রথাগত শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে। লেখকের দাদা মন্মথনাথের মতে সমরেশ ছিলেন ‘অনিচ্ছুক মেধাবী পড়ুয়া’। এইসময় থেকেই অর্থাৎ লেখক তাঁর ষোলো কি সতের বছর থেকেই ‘বীণা’ নামক হাতে লেখা পত্রিকার প্রকাশক, লেখক এবং তিনি এই পত্রিকাতে ছবিও আঁকতেন। ছোট থেকেই স্কুলের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ সেইভাবে না থাকলেও গান-বাজনা, লেখালেখি ও ছবি আঁকার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এছাড়া থিয়েটার ও বাঁশি বাজানো, খেলা, ব্যায়ামের প্রতি ছিল অদম্য আগ্রহ।

সমরেশ বসু নিজ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন খুবই ব্যতিক্রমী ও দুঃসাহসী মানুষ। নৈহাটিতে থাকাকালীন সমরেশের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে দেখা দেয় জণ্ডিস। লেখকের বড়দা তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় খুব একটা মনোযোগ দেন না, ফলে ভালোভাবে চিকিৎসা হয় না। নৈহাটিতে সমরেশের বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁর বড়দি গৌরী, যিনি নিজের গয়না বন্ধক রেখে তাঁকে সুস্থ করেন, সেই গৌরীর সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে সমরেশের। এই গৌরী ছিলেন স্বামী পরিত্যক্তা ও সমরেশের থেকে বয়সে বড়। তৎকালীন সময়ে বয়সে বড় ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার সঙ্গে ঘর বাঁধা এক দুঃসাহসিক কাজ ও তার পাশাপাশি ব্যতিক্রমী ও বৈপ্লবিকও বটে। লেখকের এই দুঃসাহসিক চরিত্র তাঁর জীবনের পাশপাশি লেখনীতেও বর্তমান। ১৯৪১ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে আতপুরে চটকলের বস্তিতে সংসার পাতেন সমরেশ-গৌরী। তখন লেখকের জীবিকা ছিল পোলট্রি ফার্মের ডিম বিক্রি। এই ডিম বিক্রির জন্য সাহেব

কোয়ার্টারে তাঁর যাতায়াত ছিল। এই সময়েই তিনি মেমসাহেবদের মনের কথা-অভিজ্ঞতা শুনেছিলেন, আর সেখানে থেকেই তিনি যেন নারী হৃদয়ের সহজাত ব্যথাকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধি অভিজ্ঞতা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে সবকিছুই লেখকের সাহিত্য মানসকে সমৃদ্ধ করেছে।

আতপুরের বস্তিতে থাকাকালীন ১৯৪২ সালে জগদ্দলের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তিনিই লেখককে কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত করেন। আতপুর, জগদ্দল শ্রমিকপ্রধান এলাকা হওয়ায় সমরেশ শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দীর্ঘদিন জড়িত থাকায় শ্রেণি সচেতনতা তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে। লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা, এছাড়া বস্তির যে সামাজিক নানান সমস্যা তাই হয়ে ওঠে লেখকের শিল্প। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট আদর্শ, বিয়াল্লিশের উন্মাদনা ও *জনযুদ্ধ* নামক ব্রিটিশ বিরোধী পত্রিকার অমোঘ আকর্ষণ তাঁকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। 'উদয়ন' বলে একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলেন তাঁরা কয়েকজন মিলে। এই লাইব্রেরিতেই তিনি ফ্যাসিসিজম্ নিয়ে কিছু বই পড়েন। এছাড়াও এই লাইব্রেরিতে তিনি মার্কসবাদ সম্বন্ধীয় বই, গোর্কি, টলস্টয়, চেকভ, বলজ্যাক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের বই পড়তেন। জীবনের সঞ্জাত অভিজ্ঞতা-জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই তাঁর লেখার সূত্রপাত। ১৯৪৬ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর কলমে নিঃসৃত প্রথম রচনা, ছোটগল্প *আদাব*। প্রথম উপন্যাস *নয়নাপুরের মাটি* (প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস নয়)। তবে *আদাব*-এর আগেও *স্বাধীনতা* পত্রিকায় *শেষ সর্দার* নামে তাঁর একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি যে শ্রেণির উপর বিশ্বাস করেছিলেন, রাজনীতির উপর বিশ্বাস করেছিলেন, তার সঠিক রূপ যেন ধীরে ধীরে বদলে যায়, তাই তাঁকে সেই পথ ছেড়ে দিতে হয়।

লেখক যখন যা বিশ্বাস করেছেন সেই পথে তখন নির্দ্বিধায় চলেছেন, আবার যখন বুঝেছেন সেই পথ সঠিক নয় সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এছাড়াও লেখক অকপটে স্বীকারও করেছেন বহু নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। একসময় জরাইকেলার অরণ্যে থাকাকালীন মাংরি নামক এক আরণ্যক মেয়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়। এছাড়াও বি.টি. রোডের ধারে অন্ত্যজ মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেন। সাহিত্যের যা কিছু তা জীবনের থেকেই নেওয়া। তার জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না, তা সততই জীবন্ত অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান, আত্মোপলব্ধি আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই লেখক লিখে গেছেন। দারিদ্র্য, জীবনের অভিজ্ঞতা,

নিরুপায় মানুষের জীবনসংগ্রাম, জীবনচেতনা, মনস্তত্ত্ব চেতনা, যৌন চেতনা, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চেতনা— এই জীবনবীক্ষাকে উপজীব্য করেই লেখকের কলম থেকে প্রায় দুশোর মত ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যজগতকে সমৃদ্ধ করে।

আমাদের গবেষণাকার্যের নিমিত্তে সমরেশ বসুর— *গুণিন, নির্বাসিতা, শান বাউড়ির কথকতা, জীবিকা, অরণ্যনিশি, আইন নেই, উত্তাপ, সহযাত্রী, অস্তিত্ব* গল্পগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬): বাংলা সাহিত্যের অনন্য কথাসাহিত্যিক ও মানবাধিকার আন্দোলন কর্মী মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৪ জানুয়ারি ১৯২৬, ঢাকা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ব্রিটিশ ভারতে (বর্তমান বাংলাদেশে)। মৃত্যু ২৮ জুলাই ২০১৬। পিতা কল্লোল বর্গের বিশিষ্ট সাহিত্য সাধক মনীশ ঘটক এবং মাতা ধরিত্রী দেবী। মহাশ্বেতা দেবীর স্বামী নবান্ন নাটকের রূপকার এবং আধুনিক বাংলা নাট্যজগতের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য। লেখিকার একমাত্র পুত্র ব্যতিক্রমী সাহিত্যসাধক নবারুণ ভট্টাচার্য।

মহাশ্বেতা দেবীর শৈশব শিক্ষা রাজশাহীতে। পরবর্তীতে তিনি বিশ্বভারতী থেকে ইংরাজি সাহিত্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন এবং আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রংমশাল পত্রিকায় লেখেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখনীর জন্য এবং সমাজকর্মী হিসাবে অনেক সম্মাননা পান। সাহিত্য আকাদেমি, জ্ঞানপীঠ, পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ প্রভৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছত্তিশগড়ের উপজাতিদের অধিকারের কথা, তাদের লড়াইয়ের কথা, ছোটনাগপুরের পাহাড়-জঙ্গল, না খেতে পাওয়া মানুষের কথা বারবার বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে। তিনি আদিবাসীদের লড়াই, তাদের উপর হয়ে চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারবার সোচ্চার হয়েছেন। আজীবন মহাশ্বেতা দেবী জড়িয়ে ছিলেন আদিম জনজাতির মানুষগুলোর সঙ্গে। পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে সমাজের মূলস্রোতে আনার লক্ষ্যে নানান কর্মসূচি নিয়েছেন। সমাজের দলিত মানুষদের নিয়ে ওঁর লেখনী অস্ত্রের প্রয়োগ ও মানবাধিকার আন্দোলনকারী হিসেবে উনি চিরস্মরণীয়। লেখিকার কথাসাহিত্যে বারবার ফুটে উঠেছে ভারতবর্ষের শোষিত, উপজাতির মানুষদের উপর ক্ষমতাশালী, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের দুর্নীতি, প্রশাসনের হাতে উপজাতীয় মানুষদের বঞ্চনার ছবি।

লেখিকার গলার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর কলমও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে তৎকালীন সরকারের কৃষিজমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে।

'বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজ— একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)' শীর্ষক গবেষণার জন্য মহাশ্বেতা দেবীর অগ্নিগর্ভ (১৯৮০) গল্পসংকলনের অন্তর্গত *দ্রৌপদী* ('পরিচয়', ১৯৭৭), *অপারেশন? বসাই টুডু* ('কৃত্তিবাস', পৌষ-মাঘ ১৯৭৭), *জল, এম. ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ* ('সত্যযুগ', ১৯৭৭), *নৈঋতে মেঘ* (১৯৮০) গল্পসংকলনের অন্তর্গত *জগমোহনের মৃত্যু, শিকার, নুন ('পরিচয়', ১৯৭৮), শিশু* ('পরিচয়', ১৯৭৮), *বিছন* (১৯৭৬), *ধৌলী* (১৯৮০), *রুদালী* (১৯৮০), *ডাইনি* (১৯৮০), এছাড়া *ঘণ্টা বাজে* ('বর্তিকা', ১৯৮০), *জঙ্গল* ('ঋতুপত্র গাঙ্গেয়', ১৯৮৬), *অর্জুন* ('দৈনিক বর্তমান', ১৯৮৪), *সমাজবাদ ববুয়া* ('প্রমা', অক্টোবর ১৯৮৩) *লাইফার* (১৯৮৩), *রাবণবধ* (১৯৯০), *হরিরাম মাহাতো* ('বারোমাস' পূজাসংখ্যা ১৯৭৯), *সাগোয়ানা* ('সত্যযুগ' শারদীয়, ১৯৭৯), *প্রেতোৎসব, দৌলতি, পালামৌ* ('শিলাদিত্য', ১৯৮৩), *গোহুমনি* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত গল্পগুলি সাতাত্তর ও তার পরবর্তী সময়ে লেখা। গল্পে বর্ণিত কাহিনির বাস্তবতা, আদিবাসী জীবনের নগ্ন স্বরূপ, প্রশাসনের দায়সারা রূপ পাঠককে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেয়। প্রতিটা গল্পের কাহিনিই যেন গল্পের মোড়কে এক একটা ডকুমেনটেশন।

অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬): চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্য জগতের অন্যতম এক কথাসাহিত্যিক অসীম রায়। অসীম রায়ের জন্ম ৭ ই মার্চ, ১৯২৭, বরিশাল জেলা, ঢাকায়। পিতা- ভবেশচন্দ্র রায়, মাতা- জ্যোৎস্না দেবী। লেখক ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রিলাভ করেন এবং ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

অসীম রায় বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে একজন খ্যাতিমান লেখক হওয়ার পাশাপাশি তিনি তাঁর পেশা হিসাবে সাংবাদিকতাকেও বেছে নেন। ১৯৫০ সালে ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র *দ্য স্টেটস্‌ম্যান* এর প্রকাশকালের শুরুর সময় থেকে তিনি এখানে পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। লেখকের প্রথম লেখালেখির সময় 'প্রবল আশা ও আশাভঙ্গের আলোড়নের' সময়। লেখকের

হাতেখড়ি কবিতা দিয়ে, তারপর উপন্যাস। ১৯৪৬ এর দাঙ্গা, যুদ্ধ যন্ত্রণা, দেশভাগ, স্বাধীনতা এক অস্থির সময়, যুগযন্ত্রণা যা দেশের ইতিহাসকে ওলোটপালট করে দিচ্ছে, এই জীবনজাত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ দর্শনই লেখককে গদ্যের জগতে নিয়ে আসে। ১৯৬৮ সালে নকশাল আন্দোলনের সময় প্রকাশিত লেখকের প্রথম গল্প *আরম্ভের রাত,* লেখকের ছোটবেলার স্মৃতিমাখা সাহিত্য তাঁর *আবহমানকাল* উপন্যাস। লেখকের স্কুলে পড়বার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা-আতঙ্ক-যন্ত্রণা। কলেজে পড়াকালীন সময়ও স্বাধীনতা, দাঙ্গা, দেশভাগ, ছাত্রাবস্থায় অসীম রায় কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। যৌবনের অস্থির সময় তাঁকে নিয়ে যায় কবিতার সন্নিকটে এবং যন্ত্রণাময় জীবন নিয়ে যায় উপন্যাসের আঙিনায়। ১৯৪৬ এ প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *একালের কথা*।

অসীম রায় *স্টেটস্‌ম্যান, টাইম্‌স অফ্‌ ইন্ডিয়া, অমৃতবাজার* পত্রিকায় কাজ করেন। অসীম রায় তাঁর সাহিত্য জীবনে অনেক পরে প্রায় মধ্যগগনে এসে গল্প রচনায় হাত দেন। গল্প সম্পর্কে লেখক বলেছেন- 'ব্যক্তিগত ছোটখাটো ঘটনার যে অপরিসীম ব্যাঞ্জনা তা গল্পে ছোট গল্প ধরবার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করি'।[৯] লেখক হিসাবে দায়বদ্ধতার সাথে বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মোপলব্ধির বিকাশ ঘটেছে অসীম রায়ের ছোটগল্পে। পাশাপাশি যুগযন্ত্রণা, অস্থির দেশকাল-সময়ের পটভূমি এবং ছোটবেলায় বাবার চাকরি সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরির সুবাদে সঞ্জাত নানা অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষদর্শিতার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে অসীম রায়ের ছোটগল্পে। লেখকের ছোটগল্পে পারিপার্শিক জগতের জীবন্ত রূপ ধরা পড়েছে, তা যেন গল্প কাহিনি নয়, কাহিনির উত্তরণ ঘটেছে জীবনের পর্যায়ে। অসীম রায়ের গল্প সংখ্যা মোট চৌষট্টি। বাংলা ছোটগল্পে ১৯২৩-১৯৭৭ সময়পর্বে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র আলোচনার স্বার্থে অসীম রায়ের *দুই বৃদ্ধের কাহিনি* ('দেশ', ১৯৭৪), *শৈলেনবাবু সমাচার* ('শারদীয়া সাহিত্যপত্র', ১৯৭০) *আরম্ভের রাত (শারদীয়া* এক্ষণ', ১৯৬৮), *তাড়ি* ('জাগৃহি', ১৯৭১), *সুন্দর* ('শারদীয়া ঘরোয়া', ১৯৭৮), গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। লেখকের গল্পে আদিবাসী জীবনচর্যার নিবিড়রূপ পাওয়া না গেলেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর খুবই অল্প সংখ্যক মানুষদের মধ্যেও যে রাজনীতি সচেতনতা আছে, এছাড়া তাদের জীবনের নানা প্রসঙ্গ, মনস্তত্ত্ব গল্পে পাওয়া যায় ।

প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪): বাংলা সাহিত্যের ক্ষুরধার লেখক প্রফুল্ল রায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, অখণ্ড বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়ায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে তাঁরা

ভারতবর্ষে চলে আসেন। বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছিল পূর্ববঙ্গে। এপার বাংলায় চলে আসার পর শুরু হয় জীবন সংগ্রাম।

লেখকের প্রথম উপন্যাস পূর্ব পার্বতী (১৯৫৭), প্রথম ছোটগল্প মাঝি। এছাড়াও লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কেয়াপাতার নৌকো (২০০৩), শতধারায় বয়ে যায় (২০০৮), উত্তাল সময়ের ইতিকথা (২০১৪), নোনা জল মিঠে মাটি (১৩৬৬), ধর্মান্তর, ভাতের গন্ধ, একটা দেশ চাই, রামচরিত্র। তিনি তাঁর অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতিস্বরূপ 'সাহিত্য আকাদেমি', 'বঙ্কিম', 'রামকুমার ভুয়ালকা', পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড-এর 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট', 'শরৎ স্মৃতি' প্রভৃতি বহু সম্মাননায় সম্মানিত হয়েছেন। লেখকের বহু রচনাকে অবলম্বন করে টেলিফিল্ম, সিরিয়াল তৈরি হয়েছে এবং তা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

এক দেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আরেক দেশে আসা, কঠিন জীবন সংগ্রাম, দেশের মানুষের বেঁচে থাকার যে কঠিন লড়াই, আত্মানুসন্ধান— এই সবকিছু এবং মানুষের ভিতরের নানান রূপ লেখকের গল্পে ফুটে উঠেছে। এর পাশাপাশি ভারতবর্ষে পিছিয়ে পড়া মানুষ, দেশের নিজের মানুষ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের সঙ্গে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন তাদের জীবনোপলব্ধিকে খুঁজে বের করতে। আদিবাসী মানুষ, যারা সমাজে আজও ব্রাত্য তাদের না জানলে তিনি মনে করেছিলেন 'ভারতবর্ষের হৃৎকম্পন অনুভব করা অসম্ভব'।[১০] পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সিংভূম, বিহার, ত্রিপুরার আদিবাসীরা লেখকের সাহিত্যে বিরাজমান। এই বিপুল অভিজ্ঞতাই লেখকের সৃজনশক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের গবেষণাকার্য প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের— কার্তিকের ঝড়, বন্যা এবং চুনাও, চারিদিকে কুয়াশা, সাতঘরিয়া, ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী গল্পগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সবকটি গল্পের পটভূমি ও গল্পের মানুষ বহির্বঙ্গের।

দেবেশ রায় (১৯৩৬): বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর দেদীপ্যমান জ্যোতিষ্ক যিনি নিজ সাহিত্যকর্মের দ্বারা বাংলা সাহিত্য জগতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন, সেই দেবেশ রায়ের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর, পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। সাত-আট বছর বয়সে ১৯৪৩ সালে সপরিবারে পূর্ববাংলা থেকে তাঁরা জলপাইগুড়িতে চলে আসেন। লেখক কৈশোর এবং বড়ো হওয়া, পড়াশোনা, রাজনীতি এবং

সাহিত্যচর্চা, কর্মক্ষেত্রও ছিল উত্তরবঙ্গের এই জলপাইগুড়ি শহরে। জলপাইগুড়ির গ্রাম, তার রাজবংশী মানুষজন, সেই মানুষজনের প্রকৃতি, রাজবংশী বাচন, তিস্তা নদী, চা বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্সের লোকজন, ফরেস্টের গাছপালা-জঙ্গল-পশুপাখির ভুবনের সঙ্গে লেখকের যেন আত্মার টান, নাড়ির টান।

দেবেশ রায়ের দাদা দীনেশচন্দ্র রায়, কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদে ছাত্রাবস্থা থেকেই দেবেশ রায়ও সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। যুক্তফ্রন্টের নেতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে তিনি কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন দীর্ঘদিন। রাজনীতি করতে গিয়েই প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাপনকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছিল ভারতবর্ষের মানচিত্র। সেই জীবনই বারংবার প্রতিফলিত তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

দেবেশ রায়ের বিপুল ছোটগল্পের সমাহার থেকে আমাদের গবেষণাপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে *রাখি পূর্ণিমার রাত* এবং *মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট* গল্পগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। লেখকের *গল্পসমগ্র* দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৬২-১৯৬৭ সময়পর্বের কাহিনি স্থানলাভ করেছে, এই গল্পসমগ্রের অন্তর্গত *মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট* এবং ১৯৬৭-১৯৭৭ সালের মধ্যে লেখা গল্পগুলি প্রকাশিত *গল্পসমগ্র* তৃতীয় খণ্ডে, *রাখি পূর্ণিমার রাত* গল্পটি এই তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত। এই গল্পগুলি আলোচনায় দেখা যায় মানুষের আচরণে, দৈনন্দিন জীবনচর্যায় ইতিহাস কেমন অনুপ্রবিষ্ট, ইতিহাসের ব্যক্তিকতাই এখানে মূলকথা। ঐ ইতিহাস কেমন তাকে ভাঙে-গড়ে, আলো ছায়ায় গেঁথে যায় লেখক তাই এঁকেছেন। কখনো বা ইতিহাস তার মাধ্যম হিসাবে যেমন কোনো ব্যক্তিকে বেছে নেয় তেমনই কোনো ব্যক্তি কখনও ইতিহাস হয়ে ওঠে। 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পে তিস্তার বারমাস্যার সঙ্গে ভাদুইয়ে জীবনও যেন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। সমাজ-সংসার, অতীত-বর্তমানকে স্পর্শ করে তিনি এক বিশাল ভবিষ্যতের আভাস দেন। পাশাপাশি স্বাধীনতা উত্তর, বিশেষত বিশ দশকের শেষ দশকগুলিতে পুঁজির নতুনত্ব, প্রভুত্ব কর্তৃত্বের নবনকশা, রাষ্ট্র ক্ষমতার নিষ্পেষণ, জীবন বাস্তবতার স্বরূপ পরিস্ফুট দেবেশের সাহিত্যে।

অভিজিৎ সেন(১৯৪৫-২০২২): সত্তর-আশির দশকে নতুন ধারার প্রতিস্রোতপন্থী গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম অভিজিৎ সেন। বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ঝালকাঠি মহকুমার কেওড়া গ্রামে ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে পরিবারের সাথে এপার বাংলায় চলে আসেন।

নকশাল কর্মী হিসাবে এবং পরবর্তীতে চাকরি সূত্রে, প্রথমে সমবায় ব্যাঙ্ককর্মী, তারপরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ফিল্ড অফিসার পদে কর্মরত অবস্থায় লেখকের দুই দিনাজপুর এবং মালদা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ও গ্রামের মানুষদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ ঘটে। আর এই সূত্রেই তাঁর গল্পে উঠে আসে বরেন্দ্রভূমির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কথা, অন্ত্যজ, প্রান্তিক জনজাতির জনজীবন। চাকরি জীবনে গ্রামজীবনের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার কথা অভিজিৎ বাবু এক সাক্ষাৎকারে বলেন-

> 'গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরির সূত্রে পশ্চিম দিনাজপুরের কয়েকশো গ্রাম আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, গ্রামের মানুষের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছনি, রাত্রি বাস করেছি এবং ক্যাম্প কারেও থেকেছি। গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে এমন ওতঃপ্রোতভাবে মেলামেশা আমার রাজনৈতিক জীবনেও সম্ভব হয়নি। এইসব গ্রামের মানুষ শ্রেণি বিশেষে আমার বন্ধ হয়েছে, শত্রু হয়েছে, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও পড়তে হয়েছে দু'একবার। এইবসব অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি নিয়েই আমার লেখালেখি'। [১১]

সত্তর দশকে মহাশ্বেতা দেবীর অনুসারী গল্পকাররা যে সময় লেখালিখি করছিলেন, সেসময় ভূমিসংস্কার অপারেশন বর্গা বেনামি জমি উদ্ধার ও বন্টন ইত্যাদি বিষয় গ্রামীণ অর্থনীতিকে আমূল বদলে দিয়েছিল, বদলে দিয়েছিল ভূমিজীবী মানুষদের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো চিত্র, সত্তর দশকের গল্পকাররা তাঁদের লেখনিতে ভূমিকেন্দ্রিক এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকেই অবলম্বন করেন। গ্রামজীবনের নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছাড়াও অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে সাহিত্যে নিম্নবর্গীয়, প্রান্তিকতা তুলে আনা এবং শ্রেণিসংগ্রামের আবহকে জমাটরূপ দেবার প্রবণতা ছিল।

এই দিনাজপুর ও মালদার জল-মটির গন্ধ মিশে আছে অভিজিৎ সেনের গল্পে। মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখ বিলাসের চিত্র, নগরকেন্দ্রিক আধিপত্য বাদ যখন বাংলা কথাসাহিত্যের মূলকেন্দ্রে, সেই গতানুগতিকতার অচলায়তন ভেঙে অভিজিৎ সেন দুই দিনাজপুর ও মালদার বিস্তৃত অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের কথা, তাদের রীতি-নীতি, সংস্কার-কুসংস্কার, নানান আচার-প্রথা, বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাসকে গল্পের বিষয় করেছেন। রাজনীতি, জীবন ও জীবিকার জন্য গ্রামের সংস্পর্শে আসায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ

আঞ্চলিক লোকবৃত্তের আত্মানুসন্ধানে অভিজিৎ সেন আদিবাসী মানুষদের লৌকিক সংস্কারকে তাঁর গল্পে উন্মোচন করেছেন। প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষদের লৌকিক সংস্কার, তাদের লোকায়তজীবনকে তুলে ধরতে, আদিবাসী অন্ত্যেবাসী মানুষদের জীবনচর্যা আলোচনায়, এই গবেষণাকার্যে অভিজিৎ সেনের *দেবাংশী* ('বর্তিকা', ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), *প্রাকৃতিক, জেহাঙ্গী* (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), *মাটির বাড়ি* ('শারদীয়া এক্ষণ', ১৩৯০ বঙ্গাব্দ), *ডাইনি* (নীরাজুন', ১৯৮৭/১৯৮৮), *পাথরে জলের বিন্দু* ('মহানগর', ১৩৯১) গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রান্তিকজীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে অভিজিৎ সেন খুব সচেতনভাবে লোকবৃত্তের অন্দরে প্রবেশ করেছেন। তিনি *মিথ ও লোককথা সম্ভাবনা* প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "কল্পকথা, অন্ধবিশ্বাসের জগতে মিথের বসতি। লোককথার জগতে লোকায়ত মানুষ এইসব কল্পকথা, অলৌকিক বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনায় প্রত্যক্ষব হাবে নিত্য যাতায়াত করে। সেখানকার ঘটনা, চিন্তা এবং বিশ্বাস, সেখানকার মানুষের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ, খুবই বাস্তব। এই বাস্তবতাকে কিভাবে ধরবে লেখক? কিভাবে এই লোকায়ত মানুষের প্রাকৃতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনাকে দেখাবে লেখক?"[১২]

হাজার হাজার বছর ধরে যে আদিম লোকবিশ্বাস-সংস্কার বহমান, যেখানে সংস্কারের আধিক্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত হয়ে যায়, বিশ্বাসের যুক্তিগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, মানুষের অবচেতনে-চেতনে কীভাবে অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার জড়িত, জনজাতি প্রান্তিক গোষ্ঠী জীবনের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার অন্তর্স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত অভিজিৎ সেনের গল্পে।

ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭): বিশ শতকের সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যজগতে ক্ষুরধার কলমের অধিকারী ভগীরথ মিশ্রের জন্ম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ির সাঁত্রাপুর গ্রামে ১৯৪৭ সালে। গ্রামেই জন্ম এবং বেড়ে ওঠার ফলে গ্রামজীবনের সঙ্গে এক আত্মিক নিবিড় যোগ লেখকের শিল্পসৃষ্টির মূলে। তাই তাঁর গল্পে বারংবার উঠে আসে আমাদের চেনাজানা জগতের থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থিত প্রান্তিক গ্রাম ও সেখানকার প্রান্তবর্গীয় আদিবাসী জনসমাজের কথা। প্রত্যক্ষ জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতা থেকেই ভগীরথের গল্পে উঠে আসে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী অন্ত্যেবাসীদের সমস্যা ও সংকট,

তাদের জীবনচর্যার টুকরো চিত্র। ভগীরথ মিশ্রের গল্পে অভিজিৎ সেন, অমর মিত্রের তুলনায় অনেকবেশি লোকবৃত্তের অধিষ্ঠান নির্মাণচিত্র প্রাপ্ত। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘটা, হাট-বাজার ভগীরথের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের গবেষণাকার্যের আলোচনায় লেখকের– *দৃষ্টি, নেশা, সন্তান ও সন্ততি, প্রয়াগবেজের হাই, পৌষ-পরবের কুশীলব, বনমহোৎসব, একদিনের বিকিকিনি* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

১৯৭৮ সালে *মধুপর্ণী* পত্রিকায় লেখকের প্রথম প্রকাশিত *কদমডালির সাধু* গল্পটি। সমীর ঘোষের নেওয়া ভগীরথ মিশ্রের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় ১৯৬৬ সালে আশুতোষ বা লেজে পড়াকালীন *মূলধন* নামক একটি গল্প *নবকল্লোল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালে লেখক বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয় এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত কোনো লেখালিখি তিনি করেননি। এই উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন '*মধুপর্ণী* পত্রিকার সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের উৎসাহেই *কদমডালির সাধু* গল্পটি লেখা।

বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ লেখকের কলম। শৈশবের স্মৃতি, চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতা, সমাজের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে থাকা অজস্র কাহিনি, সংস্কার-কুসংস্কারের ধারা লেখক একটা ক্যানভাসে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭): সত্তর দশকের ব্যাতিক্রমী কলমের অধিকারী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ৭ই জুন ১৯৪৭, অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার কলারোয়া থানার চাঁদ গ্রামে। তিনি ১৯৬৯ সালে লন্ডন মিশনারি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করার পাশাপাশি এই স্কুলের অনিয়মিত বেতন ও পরিবারের দারিদ্রর কারণে অন্যান্য চাকরির পরীক্ষা দিতে থাকেন। 'ওয়ার্ড ইউনাইটেড ব্যাংক'-এ ১৯৭০-৭২ সাল নাগাদ করনিকের পদে চাকরি পান এবং পরবর্তীতে ডব্ল্যু. বি. সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুরে কালেক্টরে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন ১৯৭২-এ। এরপরে পদোত্তীর্ণ হয়ে নানান দায়িত্ব পালন করেন। এই চাকরির সুবাদেই লেখককে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। এছাড়াও তিনি সরকারী কর্মচারী হিসাবে যে যে পদে বহাল ছিলেন, সেই দীর্ঘ কর্মজীবন সূত্রে অন্ত্যজ, প্রান্তিক মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, সরকারি আইন ও প্রকল্পের ফাঁক তিনি চাক্ষুষ করেন। তাঁর এই আজীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতাই গল্পের 'আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটি ঝকঝকে মুক্তো'।

১৯৬৬ সালে প্রথম *আমি* কবিতা প্রকাশিত। ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রথম গল্প *ব্যভিচারিণী* প্রকাশিত। মনুষ্যেতর প্রাণীর সাথে মানুষের এমন সম্পর্ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেই পাওয়া যায়। 'পশুকামিতার' উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই গল্প, যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। চারশোটির বেশি ছোটগল্প, পঞ্চাশটির বেশি উপন্যাস, ন-টি কবিতার বই- এই অজস্র লেখনী থেকে অবগত হওয়া যায় লেখকের ধ্যানধারণা, জীবনদর্শন সমন্ধে। মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলে নানান অসংখ্য ঘটনা, সেই ঘটনা থেকেই সৃষ্ট চেতনাই লেখকের অন্তর্নিহিত প্রেরণা।

আমাদের গবেষণাকার্যের আলোচনায় লেখকের *ব্যভিচারিণী, বিষয় যখন গল্প, হাঁড়িয়ার দেশের কবিতা, আলোচনাচক্র* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় লেখক রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এর পিছনে তাঁর কর্মজীবন অনেকাংশে জড়িত। তৎকালীন সময়ের গ্রামবাংলার প্রান্তিক জীবন, জনজাতি মানুষদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাজনীতির মেরুকরণ ঘটেছে, রাজনীতির সেই মেরুকরণ, প্রশাসনের দায়সারা কাজ, প্রান্তিক মানুষদের অবস্থান এছাড়া সরকারী প্রকল্পগুলি যে আদিবাসী জীবন ও তাদের প্রাতিস্বিক মূল্যবোধের কথা ভেবে তৈরি হয়নি সেই বাস্তবিক রূপ পরিস্ফুট গল্পগুলিতে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮): দক্ষিণবাংলার নিম্নবর্গীয় সমাজজীবনের সফল রূপকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৮ সালে ২৬শে নভেম্বর দক্ষিণ ২৪-পরগনার ডায়মন্ড হারবারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলাবিভাগে স্নাতক পাশ করার পরে দক্ষিণ ২৪-পরগনা কালেক্টরেটেই কর্মজীবন শুরু। লেখকের জন্ম এবং কর্মসূত্রে দক্ষিণ ২৪-পরগনার সাথে এক নারীর টান। ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের কর্মসূত্রে তাঁকে ২৪-পরগনা জেলার প্রান্তীয় অঞ্চলে যেতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। 'মানবজমিনের খেতমজুর' ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সংখ্যা প্রায় দুশোরও বেশি। লেখকের গল্পগুলি রচিত পশ্চিবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলেরে নদী নির্ভর পটভূমিতে। তাঁর গল্পের উপজীব্য- সুন্দরবনের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক, জনজাতি মানুষদের, 'ছোটমানুষ'দের অনাগরিকজীবন, নদ-নদী-পলিমাটি-নোনামাটি-নোনাজল অধ্যুষিত প্রত্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ।

আমাদের গবেষণাকার্যের আলোচনার প্রেক্ষিতে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের *পাতালের মুখ* গল্পটি নির্বাচন করা হয়েছে। লেখকের আরও বহু গল্প জনজাতি জীবনকেন্দ্রিক হলেও গবেষণার নির্দিষ্ট

সময়সীমার কারণে সেই সমস্ত গল্প তালিকাভুক্ত করা গেল না। সৃষ্টিশীল জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই লেখক তাঁর চোখে দেখা নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনালেখ্য লিখে চলেছে। জন্মসূত্রে পাওয়া গাঙ্গেয়বঙ্গ, তাঁর বেড়ে ওঠা, চোখে দেখা নদী, নোনাভূমি দ্বীপ, মানুষ সমাজ রাষ্ট্রের ভাঙাগড়া এবং তাদের জীবনজিজ্ঞাসা নিয়েই লেখকের গল্পভুবন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১): লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৫২ সালে। তিনি স্কুল এবং কলেজ জীবনে বিজ্ঞান বিভাগের রসায়নের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেন। লেখকের কর্মজীবনের বিচিত্রতা সাহিত্যে প্রতিফলিত। প্রথম চাকরি করেন বিহারে, দেশলাই কোম্পানীতে সেলস্‌ম্যান হিসাবে। দ্বিতীয় চাকরি গ্রামে, নানান কারণে তা ছাড়তে হয়। দ্বিতীয় চাকরি লেখক ভূমি রাজস্ব দপ্তরে চাকরি নেন। এই ভূমি রাজস্ব দপ্তরে কাজ করার সুবাদেই লেখক গ্রামকে, গ্রামের মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেন, জানেন, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তী চাকরি আবহাওয়া দপ্তরে, আকাশবাণীতে। এই চাকরিতে তিনবার বদলি হন এবং এক্ষেত্রে লেখক নিজের স্ব-ইচ্ছায় প্রত্যন্ত গ্রাম, আদিবাসী অঞ্চলে নিজের পোস্টিং নেন।

আমার এম.ফিলে গবেষণার সময় লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। লেখকের জীবনদর্শন, তাঁর গল্পের অনুপ্রেরণা, অভিপ্রায়, ভাবনা-চিন্তা বিষয়ক কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান-

> 'গল্পের গ্রিনরুম কী বা কেন এটা যদি বলিতে চাই সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা গল্পের ক্ষেত্রে তা আলাদা। একেকটা গল্প এক একভাবে আসে। কোনো গল্প হয়ত খবরের কাগজের খবর পড়লাম বা হয়তো কোনো কিছু একটা দেখলাম, সেটাকে দেখে বা পড়ে ভাবলাম এরকম কেন হয় বা কেন হচ্ছে, এই মনোভাব থেকে একটা গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে।
>
> কালকেই যেমন টিভিতে দেখলাম, আই.পি.এল. এর একটা বাজি নিয়ে বারো বছরের একটা ছেলে, দশ বছরের একটা ছেলেকে মেরে ফেলেছে। এই যে একটা খেলা, তাকে ঘিরে যে বাণিজ্যিকরণ করা, এরকম যে ঘটনাগুলো ঘটছে, এই যে বাণিজ্যিকরণগুলো এত পাগলামো, এগুলো আসলে একটা *Mass Hysteria,* এর পিছনে যে কী রহস্যায়ণ- এটাকে লেখার মধ্যে দিয়ে খোঁজার একটা চেষ্টা। সবসময় এর উত্তর পাই আবার পাই না-ও, কখনও খুঁজি।

আমার লেখার প্রেরণা বলতে যেটা বোঝা যায়, প্রথমদিকের লেখার ক্ষেত্রে একটা ইম্পালসিভ লেখা ছিল, যাকে বলে না লিখে পারছি না, আমাকে জোড় করে লিখিয়ে নিচ্ছে কোনো একটা অভিঘাত বা একটা ঘটনা। যেমন কোথাও একটা গেলাম, সেখানে গিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল বা অভিজ্ঞতা হল। আবার ধরো, মেঘ-বৃষ্টি, এক-একজনের কাছে এক-একভাবে ধরা পড়ছে। আসলে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। একজন ইতালীয় লেখক বলেছিলেন যে, একটা ঘটনা তুমি যেভাবে দেখবে সেভাবে আসে, সত্যটা খুব দৃষ্টিভঙ্গি উপর নির্ভর করে। সত্যটা আপেক্ষিক।

লেখার সময় আমার একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে বটে, কিন্তু যে কোন লেখকের কাজে, এমন একটা পক্ষপাত থাকে যা অনেক শিল্পসম্মত হয়, অনেকটা নিরপেক্ষ হয়, আমি আমার লেখার বৈশিষ্ট্য আমি আমার লেখায় পক্ষপাতটাকে গোপন করার চেষ্টা করি। পক্ষপাতহীন লিখি এমনটা নয়, একটা পক্ষ তো থাকেই, কিন্তু সেই পক্ষটাকে গোপন করার চেষ্টাও থেকে যায়। কখনও সেটা গোপন হয়, আবার কখনও কখনও সেটা হয় না।'[১৩]

লেখকেরা তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই কখনও সমাজতাত্ত্বিকের কাজ করেন, কখনো সাইকোলজিস্টের আবার কখনও ইতিহাসবিদের কাজ করেন। সাহিত্য থেকেই সময়ের ইতিহাসকে আমরা জানতে পারি। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখালিখির শুরু। লেখকের প্রথম গল্প *অমৃত* পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তিনি পত্র-পত্রিকাতেই লিখেছেন বেশি। লেখকের প্রথম গল্পসংকলন *ভূমিসূত্র* প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। প্রথম উপন্যাস *চতুষ্পাঠী* প্রকাশিত হয় *আনন্দবাজার* পূজা সংখ্যায়। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসিক জনের কাছে সমাদৃত হয়। *অবন্তীনগর* উপন্যাসের জন্য পান 'বঙ্কিম পুরস্কার' (২০০৫), লেখক তাঁর *হলদে গোলাপ* উপন্যাসটির জন্য 'আনন্দ পুরস্কার' (২০১৫) পেয়েছেন। সত্তরের দশকে লেখক যখন গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তখন বাংলা ছোটগল্পে রাজনৈতিক ইস্যুই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। সেইসময় এক নতুন স্বাদের গল্পের সাথে পাঠককে পরিচয় করান স্বপ্নময় চক্রবর্তী। মানুষ কতটা যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে, প্রযুক্তিকরণ, প্রান্তিকজীবনে বাণিজ্যিকিকরণের প্রভাব, মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব, চোখের সামনে ঘটে যাওয়া, বদলে যাওয়া ঘটনাগুলো লেখক নির্ভেজালভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। মাস হিস্টিরিয়ার পিছনের রহস্যকরণ, সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যেভাবে

বাণিজ্যিকিকরণ প্রবেশ করেছে, গ্রাম-শহরের বৈপরীত্য, জীবনের অভিঘাত এই সবকিছু মিলেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যজগতের স্রোতধারার ঊর্মিমুখর পথে জলসিঞ্চন। প্রান্তিক বন ও জনজাতি সমাজচিত্র আলোচনায় স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *মানুষ ও বেগুন* (শারদীয়া 'আনন্দবাজার', ১৯৯০) *রেখে আসা, কল* ('ভূমিসূত্র', ১৯৮১), *ঝড়ে কাক মরে* ('আনন্দবাজার রবিবাসরীয়', ১৯৮৯)গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের ধারাকে লেখক তাঁর বিচিত্র ভাবনার মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। সেখানে রোজকার জীবন থেকে শুরু করে আছে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীন কিছু কাহিনি একেবারের নতুন দৃষ্টিতে দেখা, পাশাপাশি আছে সমাজের সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় থেকে শুরু করে আবার প্রেমেরও আভাস। জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় গুলিকে অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করেছেন তিনি, এমনকি প্রাণহীনের মধ্যেও যেন তাঁর গল্পে প্রাণসঞ্চার ঘটেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কাছে তাঁর গল্প- 'কোনো ঘটনার ধারাবিবরণী নয়'।

অমর মিত্র (১৯৫১): সত্তরের দশকের কথাশিল্পী অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ সালের ৩০শে মে আগস্ট, বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা শহরের সন্নিকটে ধুলিহর গ্রামে। লেখক আজীবন নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন গল্প হিন্দি, ইংরাজি, মালয়ালম, তামিল, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

১৯৭৪ সালে লেখকের প্রথম ছোটগল্প *মেলার ঘরের দিকে* প্রকাশিত। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্মসূত্রে লেখক মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার এক দুর্গম এলাকায় বদলি হন। সে সময় ভারতে চলছে 'জরুরি অবস্থা।' উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হাতে ছিল তখন প্রভূত ক্ষমতা। এই বংশধরপুরে থাকাকালীন অভিজ্ঞতা লেখকের লেখায় বারংবার ফিরে এসেছে। আমাদের গবেষণাপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে নির্বাচিত ১৯৮০ সালে লেখা *দানপত্র ১, ভারতবর্ষ,* (নামান্তর *আত্মাপাথর*) গল্পদ্বয়ে ভূমিহীন আদিবাসীদের অসহায়তার কথা, আবহমানকাল ধরে চলে আসা আদিবাসী বঞ্চনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ, যা সময় থেকে সময়ান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। কল্পনা এবং বাস্তবতা এই দুইয়ের ভেতরেই লেখকের যাওয়া-আসা। লেখক মানুষের মনের রহস্য উদ্ধারের পাশাপাশি সমাজের একেবারে শিকড়ে পৌঁছতেও চেয়েছেন।

নলিনী বেরা (১৯৫২): প্রান্তজনের সহমর্মী, অন্ত্যজ পরিবারের সন্তান নলিনী বেরার জন্ম ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই আদিবাসী অধ্যুষিত বাঁছুর খোঁয়াড় গ্রামে। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও কলকাতায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা শেষ করে ডব্লু.বি.সি.এস পরীক্ষায় পাশ করে রাজ্য সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন। প্রথম গল্প ১৯৮০ সালে *বাবার স্মৃতি* সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় ১৯৯৭-তে প্রকাশিত। তাঁর লেখায় আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকে গ্রামগঞ্জের থিম, পুরাণকথা, আখ্যান-উপাখ্যান যার পরতে পরতে জড়িয়ে ভারতীয় বাস্তবতা জাদুবাস্তবতার মিশেল।

লেখক জন্মসূত্রে অন্ত্যজ, দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়ায় এবং তাঁর শৈশব, কৈশোরকাল প্রান্তিক মানুষদের সহাবস্থানে কাটায় তাঁর লেখা হয়ে ওঠে প্রান্তজনের যাপিত দলিল। লেখকের কিশোর বয়সে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে যেদিন তাঁর তথাকথিত এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার পর তাঁর উচ্চবর্ণের বন্ধুর মা লেখককে এঁটো থালাটি ধুয়ে রাখতে বলে। সেইদিন তিনি বাস্তবতার মুখোমুখি হন। এই অপমানের যন্ত্রণা-কষ্ট-দুঃখই লেখকের আত্মবীক্ষণের পথ খুলে দেয়। এই অভিঘাতই লেখককে উপলব্ধি করায় ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামো, উচ্চবর্গীয় মানুষদের নিম্নবর্গীয়দের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব।

লেখক নিজেও প্রান্তিক পরিবারে জন্মান এবং জন্মানোর পর থেকে যে মানুষদের সাথে বড়ো হয়েছেন তারাও সমাজে অন্ত্যজ, নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষ। লেখকের কথায়-

> "আমার তাবৎ গল্পের যে উত্থান তার যে প্রেক্ষাপট এবং তার মধ্যে যে চরিত্রগুলো আছে তাদের আদিমতা এবং অধুনা আধুনিকতা এখনও পর্যন্ত তারা বহমান। সেই সুর তো এখনও নেভে না। সুতরাং এই যে একটা অনন্ত প্রবাহ, অনন্ত প্রবাহেই অনন্ত কথাবার্তা, আমি তাদেরই একজন। সামান্য কথকমাত্র। আমার সমস্ত গল্পের প্রেক্ষিত তথা রাঢ়ের প্রেক্ষাপট হল এটাই।"[১৪]

নলিনী বেরার থেকে একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, লেখকের ছোটগল্পের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে, সেই সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন –

> "আমি যে অঞ্চলে বসবাস করতাম সেই রোহিনী, সুবর্ণরেখা অঞ্চলে পঠন-পাঠন করা কালে দেখতাম একটু নিচুতলার মানুষদের তথা অন্ত্যেবাসী মানুষদের প্রতি একটা ঘৃণার চোখ ছিলই।

আর অন্তবাসী মানুষদের না পাওয়ার তালিকাটি ছিল অতি দীর্ঘ। আর আমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে আমার কলমকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছি। এটা কিন্তু বাস্তব, একেবারেই বাস্তব। সুতরাং শুধুমাত্র যে সারস্বত সাধনার জন্য এই লেখা-লিখি তা একদমই নয়। কারণ আমি মনে করি নির্যাতিত, নিপীড়িত-লাঞ্ছিত এবং নানাবনভাব এ অবহেলিত এই আমি তাদের কাছ থেকে উঠে এসেছি- এই সমস্ত মানুষজন কিন্তু আমারই আত্মীয়, আমারই পরিজন। সুতরাং এদেরই দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হয়ে তাদের জন্যই কিছু কথা বলা।"[১৫]

নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে একটি অনগ্রসর গ্রামের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতাই নলিনী বেরার সাহিত্য সৃষ্টির মূলে। আমাদের গবেষণার নিমিত্তে নলিনী বেরার *ঝাঁটার কাঠি, খোরপোষ, ঝরাপালকের জাদু, টি.আই.প্যারেড, নুয়াসাহীর বটতলা, চারআনা আট আনার প্রেম, বাঘাতঙ্ক* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। গল্পের লিখন প্রক্রিয়ায় খননকার্যে প্রত্নতত্ত্বের মতো বেরিয়ে আসে মানবিক সত্তা, সম্পর্কের আখ্যান, থিম-পুরাণকথা, গ্রামীণ মানুষদের লোকায়ত জীবনচর্যার উপাখ্যান।

সৈকত রক্ষিত (১৯৫৪): সত্তর দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চর্চার যে নবযাত্রা শুরু হয়েছিল তার অন্যতম পথপ্রদর্শক সৈকত রক্ষিত। এই সময় গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তারই ফলপ্রসূ স্বরূপ বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রাম্যজীবন, প্রান্তিক মানুষদের জীবনচর্যা জায়গা নেয়।

স্কুলজীবনে রবীন্দ্রনাথের লেখায় অনুপ্রানিত হয়ে ভবিষ্যতে লেখক হওয়ার স্বপ্ন বাসা বাঁধে মনের গহনে। ১৯৫৪ সালে পুরুলিয়াতে জন্ম সৈকত রক্ষিতের। পুরুলিয়ার সন্তান, তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এসে দেখলেন পুরুলিয়া, পুরুলিয়ার প্রান্তিক জনপদ বাংলা সাহিত্যে প্রায় ব্রাত্যই বলা চলে। লেখক যখন ক্লাস সেভেন-এইটে পড়েন, তখনই সাহিত্যের প্রতি লেখকের আগ্রহ। এই সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার পাশাপাশি লেখকের বক্সিং এর প্রতি ঝোঁক ছিল।

পুরুলিয়ার প্রতি আত্মিক টান, পুরুলিয়ার নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে জনসম্মুখে তুলে ধরতে লেখক সত্যজিত রায়কে অনুরোধ করেন তাঁর চলচ্চিত্রে পুরুলিয়াকে পটভূমি হিসাবে দেখাতে। সেই অনুরোধ যে সত্যজিত বাবু রাখেন তা আমরা *হীরকরাজার দেশে* চলচ্চিত্রেই দেখতে পাই। বৃহত্তর সমাজের কাছে আদিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়ার প্রান্তিক জনপদের লোকায়তজীবন, তাদের সংস্কার, সংস্কৃতির নানান

রূপ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রান্তিক মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা তুলে ধরতে লেখক সাহিত্যরচনা করেছেন। *Art for Art's Sake*- কেবল এই মতবাদে বিশ্বাসী কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত কোনো লেখাই অর্থ উপার্জনের তাগিদ বা যশ-পিপাষা হেতু কিংবা সম্পাদকের অনুরোধে লেখেননি। তিনি লিখেছেন-

> "একজন আত্মমগ্ন সংগীত সংগীত শিল্পী যেভাবে নিজেকে সুরের মধ্যে বিলীন রাখেন, আমিও সেভাবেই আমার এই সাহিত্য প্রণয়নের মধ্যে অভিনিবিষ্ট রাখি নিজেকে।"[১৬]

পুরুলিয়ার সামগ্রিক লোকায়তিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর গল্পরচনার মাধ্যমে। তিনি কোনোভাবে কোনো বানিয়ে বা কাল্পনিক কিছু লিখতে চাননি, এমন বিষয়কে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করে গেছেন নিরন্তরভাবে, যা আগে লেখা হয়নি, যার সাথে মানুষ নিজেকে সংযুক্ত করতে পারে। কোনো কাহিনিবিন্যাসে জোড় করে কোনো ঘটিয়ে দেবার প্রয়াস লেখক করেননি। ১৯২৩-১৯৯০ কালপর্বে বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র কীভাবে রূপায়িত, এই বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে সৈকত রক্ষিতের *আঁকশি, পাঘা, মাড়াই কল, পট, মূলুন, রাঙামাটি, শবরচরিত, উঠো রে পুতা জাগোরে পুতা, উৎখাতের পটভূমি, বশীকরণ, ছল, বয়ার কাড়া, যশোমণি মুর্মু* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। গল্পগুলিতে প্রতিবিম্বিত রাঢ়বঙ্গে বসবাসকারী মানুষদের জীবনযাপন, আচার-আচরণের পাশাপাশি, এই প্রান্তিক মানুষগুলোর উপর পুঁজির যে আগ্রাসন, সময় ও রাজনীতির প্রভাব, তা যেন কেবল রাঢ়বঙ্গ নয়, এক অখন্ড দেশের চালচিত্র। সৈকত রক্ষিতের সাহিত্যে দেশকাল অতিক্রম করে চিরকালীন নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর মূর্ত।

অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪): অন্ত্যজ জীবনের রূপকার, সত্তর দশকের কথাকার অনিল ঘড়াইয়ের জন্ম ১৯৫৭ সালের ১লা নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রুক্মিণীপুর গ্রামে। নদিয়া জেলার কালিগঞ্জে লেখকের কৈশোর ও যৌবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত। তিনি চাকরি সূত্রে প্রথমে চক্রধরপুর এবং পরবর্তীতে খড়গপুরে বাস করেছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি পঞ্চাশেরও বেশি। মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে ২০১৪ সালে কথাসাহিত্যিকের প্রয়াণে কলম স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রতিনিয়ত লড়াই করে বেঁচে থাকা শ্রমজীবী, প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষদের নিয়েই লেখকের সাহিত্য সৃষ্টি। নদিয়া এবং মেদিনীপুরের গ্রামীণ জনজীবন মাটির মানুষেরা তাঁর রচনায় যেমন উঠে এসেছে,

তেমনই চক্রধরপুরে বসবাসের সুবাদে সিংভূম অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্যার চিত্র প্রতিফলিত লেখকের কলমে। প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র বাংলা ছোটগল্পে কীভাবে রূপায়িত, এই আলোচনায় অনিল ঘড়াইয়ের *বীজ, নুনা সামাডের গল্প, উরাংগাড়া, হাতিছাপ, খরার আকাশ, অরণ্যের জীবন, পুনশ্চ পরশুরাম* গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। গল্পগুলিতে আমাদের পারিপার্শ্বিকে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা ঘটনা, চরিত্র, মানুষ-প্রকৃতি, নারী জীবনের চলমান ছবি গল্পগুলিতে পরিস্ফুট। এব্যতীত প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যারা শোষিত, বৈষম্যের বাঘনখে ক্ষতবিক্ষত তাদের জীবনযাপন, তাদের প্রতিবাদ, ঘুরে দাঁড়ানোর কথা গল্পে চিত্রিত। অনিল ঘড়াইয়ের বেশিরভাগ চরিত্র অন্যায়ের সাথে আপোষ করে নেয়নি, তারা প্রতিবাদী। লেখকের মেদিনীপুর, নদিয়া, চক্রধরপুরের অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষদর্শন, স্মৃতির পলি কলমে ফুটে উঠেছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় পঁচিশজন বাংলা ছোটগল্পকারের জীবন-পরিচয়, জীবনদর্শন পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁদের আদিবাসীচর্চার কেন্দ্র এবং আদিবাসী জীবনবীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, চতুর্দশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৩

২. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯ পৃ. ১১

৩. বসু, জ্যোতিপ্রসাদ, *গল্প-লেখার গল্প,* কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃ. ৫৪

৪. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪২১, পৃ. ৭

৫. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র ৩,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪২৪, পৃ. ১০

৬. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪২১, পৃ. ৮

৭. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র ৩,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪২৪, পৃ. ১০

৮. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *নিজের কথা,* লাল নক্ষত্র, আশ্বিন ১৩৯৩, পৃ.১৮৯

৯. রায়, অসীম, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ১৬

১০. রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৭

১১. অভিজিৎ সেন, *সাক্ষাৎকার,* লাল নক্ষত্র পত্রিকা

১২. সেন, অভিজিৎ, *মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা,* নিসর্গ পত্রিকা, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৮৮

১৩. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকার, তারিখ- ২৪/৪/১০১৬, সময়- বিকেল ৫ টা

১৪. অমর আদিকারী, *নলিনী বেরার সাক্ষাৎকার,* পৃ. ২৮০ (http://inet.vidyasagar.ac.in.8080)

১৫. http://inet.vidyasagar.ac.in.8080

১৬. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ৭

পঞ্চম অধ্যায়

প্রান্তিক ও জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পের (নির্বাচিত) পটভূমি-বৈচিত্র্য

ও

বিষয়-বৈচিত্র্য

৫. ক। গল্পের পটভূমি-বৈচিত্র্য

ছোটগল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুনিপুণ পটভূমি নির্মাণ সাহিত্যিকদের সৃজন দক্ষতাকে অবিসংবাদিতভাবে উন্মোচিত করে। গল্পের শিল্পসার্থকতার ক্ষেত্রে পটভূমি, পরিবেশ ও বিষয়বস্তু পরস্পরের এককেন্দ্রিকতা গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিবেশ অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ- গল্পের পটভূমির প্রেক্ষিতেই ঘটনার বক্তব্য, সত্যতা মাত্রা পায়। মানুষ কী করছে, কেন করছে, তার বিচার করতে গেলে আগে দেখতে হবে কোন 'অ্যাম্বিয়েন্স' বা 'এনভাইরনমেন্ট' বা পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে, কোন পটভূমিতে, কোন অবস্থায় করছে। ছোটগল্পে পটভূমি কখনো এসেছে চরিত্রের সামগ্রিক প্রকাশের উদ্দীপক রূপে, কখনো মানব মনস্তত্ত্বের উদ্বোধক রূপে, আবার কখনো পটভূমি হয়ে উঠেছে মানুষের প্রতিরূপ, কোথাও যেন প্রকৃতি-পটভূমি মানবচরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাংলা প্রান্তিক, জনজাতি জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলির ক্ষেত্রেও গল্পকাররা গল্পের বিষয় নির্মাণের পাশাপাশি পটভূমি রচনাতে যে সবিশেষ নৈপুণ্যর পরিচয় দিয়েছেন তা পরবর্তী আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হবে।

একটা গল্পের আঙ্গিক নির্মাণ, শিল্প সফলতায় এবং জনজাতি সমাজের রূপচিত্রণের ক্ষেত্রে, বিষয় নির্মাণে এই পটভূমির গুরুত্ব কম নয়। প্রান্তিক, জনজাতিকেন্দ্রিক বাংলা ছোটগল্পগুলির ক্ষেত্রে আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, এমনকি বহির্বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশও গল্পের পটভূমি হয়েছে। গল্পে কোথাও গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি, আবার কোথাও নগর বা মফঃস্বল-কেন্দ্রিক পটভূমি, কোথাও কোলিয়ারি অঞ্চলকেন্দ্রিক পটভূমি, কোথাও অরণ্যকেন্দ্রিক পটভূমি এছাড়াও আরও বিচিত্র পটভূমির সমন্বয়ে প্রান্তিক জনজাতি জীবন আবর্তিত। আমাদের নির্বাচিত জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলির পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বহু বৈচিত্র্যমণ্ডিত পটভূমির স্বরূপকে ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করা হল-

৫.ক|১- গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি:

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ' গল্পের পটভূমি দক্ষিণ নিম্নবঙ্গের মালিপোতা গ্রাম। এই গ্রাম সিঁদুরচরণ ও কাতু'র নিজের দেশের বাড়ি নয়, তারা এখানে মজুরি করতে এসে থেকে গেছে। এখন এটাই তাদের বাড়ি, এই গ্রাম্য পরিবেশের সাথে তাদের অন্তরের টান। গল্পে দেখা যায়- সিঁদুরচরণ দেশভ্রমণে বেড়িয়েছে, যদিও এই দেশভ্রমণ অর্থাৎ রানাঘাট, নদিয়া এইসব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এবং

তাতে সে আনন্দ পেলেও তার মন পড়ে থাকে মালিপোতায়, কাতুর কাছে। এই দুই সহজসরল আদিবাসী মানুষের ভালোবাসা, অন্তরের টান তাদের অনাবিল আনন্দ বৈচিত্র্যহীন সাধারণ গ্রাম্য পটভূমিতে মানানসই। গল্পের বিষয় ও পটভূমি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিকারী' গল্পে ঝাঁপড়িশোল নামক গ্রাম্য পটভূমিতে মাগনিরামের কাহিনি শিল্পসার্থকতা পেয়েছে-

'বনকাটি গ্রামের পরে মাঙ্গনবেড়ার পরে ঝাঁপড়িশোল।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঝাঁপড়িশোল গ্রাম যে রিজার্ভ ফরেস্টের ছায়াময় নিবিড়তার কোথায় কতদূর লুকোনো, সেটা বোঝা যাবে।

এই গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইলে দেখা যাবে, চক্রাকারে নীল শৈলমালা, মহাডাল, কাঠচুরি, নানবকাসবাহাল, সয়ছুরি ও চুকুরদি পাহাড় (যেটার উচ্চতা আগেই বলা হয়েছে) এ ক্ষুদ্র গ্রামকে ঘিরে রেখেছে জারুল ফুল ফোটে বর্ষাকালে, করমগাছের হলদে ফুল ঝরে পড়ে থাকে বনতল বিছিয়ে, ধনেশ পাখি ডাকে, কেকারব করে বনশীর্ষে ময়ুরের দল'।[১]

এরকম এক পটভূমিতে অসুস্থ, অসহায় মাগনিরাম নামক ষোলো বছরের আদিবাসী ছেলের ভাবনাচিন্তা, সরল স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, তার বাবার প্রতি ভালবাসা ও তার মর্মান্তিক পরিণতি গল্পে এক বিষাদময় আবহ সৃষ্টি করে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালচিতি' গল্পের পটভূমি একেবারে যেন ছবির মতো আঁকা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত কালচিতি গ্রাম। যেন রূপকথার গ্রাম –

'রূপকথার গাঁয়ে / জোনাকি–জ্বলা বনের ছায়ে / দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি / তাহারি মাঝগে বাসা'।[২]

শহর থেকে অনেক দূরে, শাল-মহুল গাছের ছায়ায় লুকানো পাহাড়ি বনের ধারে রূপকথার মতো গ্রাম। গল্পের মূল কাহিনিই এখানে গল্পের পটভূমি। গল্পে শান্ত-স্নিগ্ধ, অকৃত্রিম আদিবাসী জীবনের টুকরো ছবি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই মূল উপজীব্য।

বনফুলের ‘মণিকাঞ্চন’ গল্পের মূল পটভূমি সাপড়া গ্রাম। সভ্যসমাজের সঙ্গে এই সাপড়া গ্রামের কোনো যোগাযোগ সেভাবে নেই। পাহাড়ের কোল ঘেষা এই গ্রাম্য পটভূমিতেই লেখক অতিমানবীয় ধরনের কল্পকথা ধরনের কাহিনি রচনা করেছেন। অতিমানবীয় রূপকথার কাহিনির মতো মানুষের সাপ হয়ে যাওয়া এক অবিশ্বাস্য কাহিনি নির্মাণে গল্পের পটভূমি নির্মাণ সার্থক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বেদেনী’ গল্পের পটভূমি গ্রামের মেলা। কঙ্কালীতলার মেলায় শম্ভু বাজিকর ও রাধিকা বেদেনী সার্কাস খেলা দেখাতে এসে রাধিকার স্বামীকে পরিত্যাগ করে নতুন মানুষ কিষ্টোর সাথে পালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি গল্পে বেদিয়া জনজাতির জীবনচর্যার নানান তথ্য লিপিবদ্ধ। গল্পে গ্রামের এই মেলার সাথে বেদিয়াদের জীবন এক পারম্পর্যে আঁকা। মেলার ক্ষণিকের সুখ, ক্ষণিকের আনন্দের মতোই যেন বেদিয়াদের জীবন, এক্ষেত্রে গল্পের পটভূমি মানব মনস্তত্ত্বের, চরিত্রের সামগ্রিক প্রকাশের উদ্বোধকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শম্ভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, উন্মত্ত যৌবনের আবেগে রাধিকার বিশ্বাসঘাতকতা মেলাকেন্দ্রিক গ্রাম্য পটভূমিতে গল্প বিষয়ের সঙ্গে এক পারম্পর্যে সুঅন্বিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যাদুকরী’ গল্পে বাজিকরদের জাদুমন্ত্র, নানা সংস্কার, তাদের জীবনাচরণের চিত্র, গল্পে চিত্রিত গ্রাম্য পটভূমিতেই মানানসই। বীরভূমের গ্রাম্য পরিবেশে বাজীকর ও ডোমদের প্রান্তিকজীবন, তাদের নানান লোকগান, ছড়া এবং গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পটভূমির এই মেলবন্ধনের অন্বয় সুপ্রযুক্ত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পের পটভূমি গ্রাম্য। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় ইঁটের পাজাতে খোঁড়া শেখ মজুর খাটছে। ইটের পাঁজা গল্পে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ এই পটভূমি থেকেই একটি সর্পশিশুকে খোঁড়া শেখ পায়। এই সর্পশিশুকে ঘিরেই গল্পের কাহিনির আবর্তন ও চরিত্রের পরিণতি। জঙ্গলাকীর্ণ, গ্রাম্য পরিবেশ, পটভূমি যেন এই সম্পর্কের পরিণতি রচনা করেছে। বাসস্থান পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে, ঠিক যেন খোঁড়া ও জোবেদার দাম্পত্যের ন্যায়। গল্পের বিষয়ের সঙ্গে, চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণতি, পটভূমি নির্মাণ– এই সবকিছুর অনবদ্য মেলবন্ধনে গল্পকার পটভূমিকে এক সামঞ্জস্যে গেঁথেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বেদের মেয়ে’ গল্পটি গ্রাম্য পটভূমিকেন্দ্রিক। গল্পের মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবি বেদেনী। বেদিয়া জনজাতিদের যাযাবর হিসেবেই ধরা হয়। ধীরে ধীরে তারা যাযাবর জীবন ছেড়ে

কীভাবে গ্রামে উঠে আসছে, তাদেরও একটি গোষ্ঠী স্থাপন হচ্ছে এবং তারাও কীভাবে বাঙালিদের জীবনযাপন, আদবকায়দা রপ্ত করছে, সেই বিষয়টি গল্পকার দেখিয়েছেন কাহিনিতে। গল্পে আদিবাসী ও বাঙালি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বা 'অ্যাকালচারেশন', নতুন-পুরাতন সংস্কৃতির মেলবন্ধনে ঘটেছে 'কালচার-কমপ্লেক্স', এছাড়াও গল্পে মূলত চিত্রিত বেদের মেয়ে শিবির মনের গভীরে গুপ্তবাড়ির সন্তান প্রভাতবাবুর প্রতি ভালোবাসা, এক অন্য অনুভূতি এবং গল্পের পরিণতিতে শিবির হাতে প্রভাতবাবুর মৃত্যু, ট্র্যাজিক পরিণাম। গল্পে এই গ্রাম্য পটভূমি না থাকলে '১৯৪২ সাল' এই সময়ের পটভূমি এবং গল্প বিষয়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়, গল্পে পরিবেশিত প্রেক্ষাপট, কাহিনি বিন্যাস সবকিছু যেন বেমানান হয়ে যেত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কমল মাঝির গল্প'— এই গল্পের পটভূমি গ্রাম্য পরিবেশ। গ্রামের নাম কালকেপুরের ডাঙ্গা-

> 'শান্তিনিকেতনের আশেপাশের লাল কাঁকড়ের টিলা খোয়াই ছিল কালকেপুরের ডাঙ্গা। আজ সত্তর বছর ওখানে ওরা বাস করেছে। দেখলাম শস্য শ্যামল প্রান্তর হয়েছে আজ কালকেপুরের ডাঙ্গা। ওরাই কেটে কেটে করেছে। চাষ করে করে উর্বর করে তুলেছে।'[৩]

গল্পে দেখা যায়, কমল মাঝি কালকেপুর ডাঙ্গা গ্রামের সাঁওতাল সমাজের সমাজপতি। সেই কমলমাঝির মুখের শোনা গল্প, আদিবাসী সমাজের লোককাহিনি, তার বর্ণনা, সাঁওতাল গোষ্ঠীর জীবনযাপন, এর পাশাপাশি সোনাই চরিত্রটি, যে কমলকে গুরু মানত সেই সোনাই যখন তার গুরুর জায়গা, সমাজপতির জায়গা নিতে চায় তা যেন কমল মাঝি মেনে নিতে পারে না। অধিকারের-ক্ষমতার লড়াইয়ে গুরু-শিষ্যের দ্বন্দ্বের পরিণতিতে কমল মাঝির মর্মান্তিক মৃত্যু। গল্পের বিষয়বস্তু, বক্তব্য, ব্যঞ্জনা, চরিত্রচিত্রণ অর্থাৎ গল্পে কমল মাঝির ট্র্যাজিক পরিনাম, সাঁওতালদের জীবনযাপন চিত্র, কাহিনিবিন্যাসের ক্ষেত্রে বীরভূমের এই গ্রাম্য পরিবেশই উপযুক্ত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাপুড়ের গল্প'— এই গল্পটিতে সাপুড়েদের জীবনযাপন, বেদে জাতির জীবনযাপনের কিছু চিত্র, কালী চরিত্র পরবর্তীতে ভৈরবের প্রতি ভৈরবীর প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাব এবং ভৈরবকে হত্যা, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসই গল্পের বিষয়বস্তু। গল্পে প্রথমে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে এক গ্রাম্য পটভূমি চিত্রিত, যেখানে বেদিয়াদের বাস। পরবর্তীতে গল্পের কাহিনি ও বিষয়ের সামঞ্জস্যে ভুবনেশ্বরের পথের ধারে গাছের তলায় রাস্তায় ভৈরব-ভৈরবীর জীবনযাপন। বেদিয়ারা যাযাবর

জীবনযাপন করে। গল্পের মূল বিষয়, কেন্দ্রীয় কাহিনি, চরিত্রের আবর্তন– তা সবকিছুই সাপকে ঘিরে। গল্পের চরিত্রের যে মনস্তত্ত্ব চিত্র পাই, যে কোমলতা, কঠোরতা, যে প্রতিশোধ স্পৃহা, সাপুড়েদের যাযাবর জীবনযাত্রাকে সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে গ্রাম্য পরিবেশ এবং পথের ধারে গাছের তলা এই দ্বৈত পটভূমি সু-অন্বয়ে চিত্রিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অক্ষয়বটোপাখ্যানম্’ গল্পের পটভূমি আমদপুর স্টেশন ও স্টেশনের ওয়েটিং রুম। বীরভূমের এক গ্রাম। সময় ১৩৭৬ সালের ৪-ঠা বৈশাখ, দুপুর গড়িয়ে বিকেলের সময়। গল্পের মূল বিষয়ে কৌতুকের মধ্যে থাকে তীব্র বাস্তব। ভূতের কথায়, কিছুটা কৌতুকের মধ্যে দিয়ে লেখক আমাদের সমাজের কিছু বাস্তব দিককে তুলে ধরেছেন। এই আমদপুর গ্রামেই স্টেশনের পূর্ব দিকে মাঠ ও আগেয়া নদীর ধারে জঙ্গল, রেলব্রিজ। এখানে প্রাচীন বটগাছ ও তাকে ঘিরেই কাহিনি এগিয়ে চলে। এই গাছকে ঘিরেই নানান লোককথা। গল্পে দেখি আদিবাসীদের দেবতা, সংস্কৃতির চিত্র। পাশাপাশি আদিবাসীরা যে অচ্ছুত, তাও গল্পে উল্লিখিত। সময়ের সঙ্গে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে অক্ষয় বটগাছও ধরাশায়ী হয়, যেন একটা সময়-একটা যুগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কালের গর্ভে। গল্পের মূল কেন্দ্রে বটগাছ, তাকে কেন্দ্র করে কাহিনি ও গল্পকথার আবর্তন। গল্পে যে যে বিষয়-বক্তব্য লেখক উপস্থাপনা করতে চেয়েছেন, সেই প্রেক্ষিতে গল্পে এই পটভূমি রচনা শিল্প তাৎপর্যে গ্রথিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিলাসন’ গল্পের বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গল্পের পটভূমি আদিবাসী গ্রাম। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের নতুন ভারতবর্ষের যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রজেক্ট হচ্ছে সেই কাহিনি প্রসঙ্গে আদিবাসী গ্রামাঞ্চল পটভূমির অবতারণা। অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ি জায়গা, সেখানকার আদিবাসী মানুষদের জীবন জীবিকা গল্পে বর্ণিত। আদিবাসী মানুষদের বিশ্বাস, তাদের জীবন সত্য, সংস্কার-সংস্কৃতি, অরণ্যের উপর বুর্জোয়া সমাজের অত্যাচার ও তার ফলস্বরূপ ধস নামে প্রকৃতির বুকে। এই সবকিছুর রূপায়ণে আদিবাসী অরণ্যে ঘেরা আদিম গ্রাম্য-বন্য পটভূমিই সার্থক। গল্পের পটভূমিতে এই আদিম অরণ্য না থাকলে গল্প বিষয়ের সঙ্গে একাত্মীভূত হওয়া যেত না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বরমলাগের মাঠ’ গল্পের পটভূমি- গ্রাম্য পটভূমি লাটকাস্টগড়ার মৌজা, গোপের গ্রামের বরমলাগের মাঠ। এই মাঠকে কেন্দ্র করেই গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে ব্রহ্মনাগের বাসস্থান ও তার গল্পকথা গড়ে উঠেছে। বাউরি জীবনে ব্রহ্মনাগের ও বরমলাগের মাঠ তাদের বিশ্বাস

সংস্কারের জায়গা থেকে জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নটবর বাউরী ওরফে ডাকিনী বাউরীর সাথে এক বেদের মেয়ের প্রেম ও তাকে ঘিরে বাউরি সমাজে প্রচলিত নানা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, এই আদিম মানুষদের ধ্যান-ধারণা ফুটিয়ে তুলতে গ্রাম্য পটভূমির প্রভাব ব্যাপক। গল্পের পটভূমিকে কেন্দ্র করে নয় কেবল, গল্পের পটভূমিই আসলে এই গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুকু ও ভুকু' গল্পটির পটভূমির পরিবেশ গ্রাম্য বাড়ি। সুকুদের বাড়িতে শীতের রাত্রে মা মরা কুকুরের বাচ্চা ভুকু এসে আশ্রয় নেয়, সেখানে তার কিছুদিন বেড়ে ওঠা, পরে সুকুর দ্বারা প্রহারিত হয়ে বাড়ি থেকে আহত অবস্থায় বিতাড়িত হয় ভুকু। তাকে এক সাঁওতাল জোয়ান আহত অবস্থায় তুলে নিয়ে শুশ্রুষা করে বড়ো করে তোলে। সেই কাহিনিকে আবর্ত করেই গল্পের পটভূমির অবতারণা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের গল্প' গল্পে প্রথম অংশে সাঁওতালপল্লী এবং ১৯৫৬ সাল ও তার পরবর্তী কয়েক বছর গল্পের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট। ফুলমণি ও তার জীবন, আদিবাসী জীবন চিত্র, ফুলমণির সারল্য-প্রেম, বুধনের সাথে সংঘাত এই সবকিছুর ক্ষেত্রে ফুলমণির ট্র্যাজিক পরিণামের সঙ্গে বিষয়ভাবনার সঙ্গে পটভূমির মেলবন্ধন অনবদ্য। আদিবাসী জীবনচর্যা এবং সাঁওতাল পরগনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এরপরে ফুলমণির জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমোদপুর, ফুলমণির ভাইয়ের বাড়ির পটভূমি চিত্রিত। সেখানেই ফুলমণির বুধনকে হত্যার চেষ্টা, আত্মসংবরণ ও আত্মহত্যার চেষ্টা এবং শেষে তার পরিণতি জেল। ফুলমণির জীবনের তৃতীয় পর্যায় দেওঘরের হসপিটাল চত্বরের কোয়ার্টারে আবর্তিত। ফুলমণির নবজীবন এই পটভূমিতেই। গল্পে এই তিন পটভূমি এবং কাহিনির মেলবন্ধনে গল্পরস শিল্পোত্তীর্ণ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেহের প্রদীপে রূপের শিখা' গল্পের পটভূমিতে কায়স্থ জমিদার বাড়ি। গ্রামজীবনের প্রেক্ষিতেই কৃষ্ণকিশোর, চারু, ভামিনী ও রাধাবিনোদ গোস্বামীর জীবন-প্রেম-দাম্পত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, পরকীয়া, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব এই সবকিছুই জমিদার বাড়ি, বনগোপালপুর এই গ্রাম্য পরিবেশেই আবর্তিত। জমিদারদের চরিত্র, প্রান্তিক নারী চারুর মনোভাব, ভামিনীর ও গোস্বামীর মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস, কাহিনির বিষয়বস্তু, পটভূমি এই সবকিছুকে লেখক এক সামঞ্জস্যে গেঁথেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পের পটভূমিও গ্রাম্য পরিবেশ, এখানেই নাদের শেখ, ডাক্তার ও বেদেনীকে ঘিরে গল্পের কাহিনি। গ্রামেই এই আদিবাসী মেয়ে, নাদের শেখদের মতো

মানুষদের দেখা মেলে, তার জীবন-জীবিকার সাথে পরিচয় হওয়া যায়। সহজ-সরল বেদেনী মেয়ের ও নাদের শেখের খেলা, মন্ত্র এসবকিছুই অন্ত্যজসমাজের অংশ। বেদেনীর উপর হওয়া লাঞ্ছনা-অত্যাচার এই সবকিছু, তাদের জীবনচর্যার কিছু অংশ, অন্ত্যজ নাদের শেখের জীবনবিশ্বাস এইসব কিছু এই গ্রাম্য পটভূমির সাথে সঙ্গত রূপে চিত্রিত। গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাস, কু-সংস্কার এবং গল্পের শেষে আজীবন মনের গভীরে লালিত বিশ্বাস যখন ভেঙে যায়, মিথ্যে হয়ে যায়, যেন সেই মানুষটার অস্তিত্বই হারিয়ে যায়। গল্পের নাদের শেখ, ডাক্তারবাবু ও বেদেনী চরিত্রটির আবর্তন ঘটেছে গ্রামের রাস্তায় ও ডাক্তারবাবুর বাড়ির উঠোনে। গল্পে বেদেনী এবং নাদের শেখের মত মানুষের মনের রূপ, এই সত্যকে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে গ্রাম্য পটভূমিই সঙ্গত।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'বন্যা' গল্পের পটভূমি বিহারে কুশী নদীর বান। এই বন্যায় আদিবাসী, অচ্ছুৎ মানুষদের প্রতি উচ্চবর্গের মানুষদের মনের জাতিগত সংকীর্ণতা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর এই বন্যাই মানুষের আদিম স্বার্থপর চুরি প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছিল। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেই বোঝা যায় কেউ উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করলেই সে উচ্চ মানসিকতার হয় না, আর কেউ প্রান্তিক জাতিতে জন্মগ্রহণ করলেই সে চোর, নিচু মানসিকতার হয় না। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমাজের সব দোষ যে নিম্নজাতির মাথায় চাপে, তারাই এক্ষেত্রে প্রতিবাদে মুখর। গল্পের ভাববস্তুর সত্য উদ্‌ঘাটনে গল্পে বন্যার পটভূমি একেবারে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রযোজ্য।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আন্টাবাংলা' গল্পের পটভূমি আন্টাবাংলা নামক নীলকুঠি। গল্পের পটভূমির কেন্দ্র যে আন্টাবাংলা তা লেখকের স্কুলজীবনে দেখা প্লান্টারস্ ক্লাবের অনুপ্রেরণায় লেখা। কাহিনিকাল তিনপুরুষ পর্যন্ত ব্যপ্ত। গল্পে নীলকর সাহেবদের আদিবাসী মানুষের উপর অত্যাচারের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। যে আন্টাবাংলাতে বিরসার মৃত্যু, বোটরার মা রক্ষিতা, সেই আন্টাবাংলাই কীভাবে বোটরার জীবনের অংশ হয়ে উঠল তা চিত্রিত। নীলকরদের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের রূপ নয় কেবল, নীলকরদের অবস্থার পরিবর্তনের তথ্য গল্পে লিপিবদ্ধ, পাশাপাশি বোটরার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে গল্পে রচিত হয়েছে একটি যুগের অবসান। এই সময়কালের আবহমানতা, ইতিহাসকে তুলে ধরতে আন্টাবংলা বা নীলকুঠির পটভূমি সুপ্রযুক্ত।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'অভিজ্ঞতা' গল্পের পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহারের গ্রামাঞ্চল। থানার দারোগা রামভরোসা প্রসাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপলব্ধির মাধ্যমে এক দরিদ্র আদিবাসী দম্পতির পরকীয়া, রিরংসা, হিংসা, সন্দেহ ও খুনের আসল কারণ খুঁজে পায়। আদিবাসী পিতার দ্বারা তিনমাসের পুত্রের অনিচ্ছাকৃত হত্যা, গল্পের এই বর্বরতার অন্তরালে থাকা কারণ তুলে ধরতে, এই তদন্ত ও কাহিনির আবর্ত রচনায় বিহারের ভোখরাহা গ্রাম্য পটভূমি একেবারে উপযুক্ত।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম সাঁওতাল পরগনায় হলেও ছোটগল্পে আদিবাসীজীবন সেভাবে পাওয়াই যায় না। কেবল সাঁওতাল' নামক ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতাল শ্রমিকদের জীবনচর্চার কিছুচিত্র বর্ণিত। গল্পের পটভূমি ঝুমুরিয়ার থেকে ক্রোশ দুই দূরে শালবন। গল্পে বনকাটার শ্রমিক হিসাবে সাঁওতালরা কাজ করতে এসেছে, সেই সাঁওতাল শ্রমিকদের কষ্টকর তাদের হিংসা-দ্বেষহীন, সহজসরল, স্বাধীন, নির্লোভ, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের চিত্র লিপিবদ্ধ। পাশাপাশি গল্পে সভ্যসমাজের চিত্র ও সিন্ডিকেটের তথ্যও আদিবাসী সমাজ ও এক বাঙালী মানুষের ভাবনার নানা স্তর, সভ্য ও আদিবাসী মানুষদের বৈপরীত্য ভাবনার বিন্যাস গল্পে গ্রাম্য অরণ্যকেন্দ্রিক পটভূমিতে চিত্রিত। গল্প বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গল্প পটভূমি চিত্রিত।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের পটভূমি সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল আয়তনের নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়, শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসা গাছের ছাওয়া আর রুক্ষ কাঁকরে মাটি আর নেড়া-নেড়া পাহাড়। এই অঞ্জনগড়ের গ্রানাইট পাথরের নীচে যে অভ্র খনিজ আছে তাকে ঘিরে সিন্ডিকেট সাহেবদের সঙ্গে সামন্তবাদী মহাজনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে লাঞ্ছিত হয় কুর্মী প্রজারা। এই অত্যাচারে ভীলরা দেশান্তরিত হলেও কুর্মিরা এই মাটি আঁকড়ে থাকে। সিন্ডিকেট ও সামন্তবাদীদের স্বার্থলোলুপতায় আদিবাসী মানুষগুলির প্রাণ যায়, কেবল থাকে ফসিল। এই পাথর, কাঁকড়যুক্ত, রুক্ষ মাটির ন্যায়ই আদিবাসীদের জীবন রুক্ষ। গল্পের বিষয়বস্তু, গল্পের পরিণতির প্রতীতি গল্প পটভূমির সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা, একাত্মীভূত।

সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পের পটভূমি স্কুলকেন্দ্রিক এবং গ্রামের অরণ্য পটভূমি। একটি স্কুলে বাঙালি, বিহারী ও আদিবাসী ছাত্রদের সহাবস্থান এবং স্টিফান হোরো, ফাদার লিন্ডন ও বুড়ো সোখার সম্পর্কের মধ্যে এক আশ্চর্য লড়াইয়ের কাহিনি এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনটি পানিপথের যুদ্ধের ন্যায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতার কারণে বৈদেশিক শক্তির হাতে অনার্য দেশীয় শক্তির পরাজয়তা গল্পের পরিণতির সঙ্গে, হোরোর মানসিকতার সঙ্গে গল্পের পটভূমি পরিপূরক সম্পর্কে আবদ্ধ ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সৈনিক’ গল্পের পটভূমিও গ্রাম—

> “আশ্চর্য দেশ। বাংলা দেশই বটে, কিন্তু বর্তমানের নয়। মৃত বাংলার অস্থি কঙ্কাল রাশি রাশি ইট–কাঁকড়ে ভাঙা জঙ্গল আর মজা দিঘীতে ছড়িয়ে রয়েছে, একটা মহাশ্মশান যেন। চারদিকে ধু-ধু করছে অনুর্বর মাঠ, বিরল বসতি গ্রামগুলোর উপর দারিদ্র্যের নগ্নতা, মাথার ওপর ক্ষুধার্ত চিল চিৎকার করে উড়ে যায়, আর লাল মাটির ‘ছোট বড় অসংখ্য টিলার এখানে ওখানে বিরাটকায় শঙ্কিনী সাপ পেট টেনে টেনে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে’।’[৪]

কুমারদহ গ্রাম এবং পালগ্রাম এই গল্পের মূল পটভূমি। পালগ্রামে সাঁওতাল স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে, তারা অনুর্বর জমিতেও ফসল ফলায়। জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর বংশধর ইন্দ্র চৌধুরী সাঁওতালদের উৎখাত করে টিলাগুলোকে খোঁড়াতে চায় অর্থের লোভে, ইতিহাসের লোভে। গল্পের শেষে হাতি নীলবাহাদুরের মৃত্যু হয় সৈনিকের মতো। এছাড়াও সাঁওতালরাও তাদের তীর ও ধনুক নিয়ে তৈরি তাদের পালগ্রাম বাঁচাতে। গল্পের যে মূল বার্তা সেই বিষয়কে আভাসিত করতেই এই পটভূমির অবতারণা। গল্পে যে কাহিনি, বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে, গল্পের যে মূল বার্তা, সেই বিষয়কে আভাসিত করতেই এই পটভূমি চিত্রণ শিল্পসার্থক রূপ পেয়েছে। গল্পের বিষয় ও পটভূমি এই গল্পে যেন পরস্পরের পরিপূরক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ভোগবতী’ গল্পের পটভূমি- রাঢ়ভূমি, রাঢ়ের পাহাড়ি গ্রামাঞ্চল-

> ‘এপারে বাঙলা, ওপারে মানভূম। পাথর মেশানো রাঢ়ের অনুর্বর কঠিন বিস্তারের ওপর দিয়ে রাঙা সুরকির পথ। মাঝে মাঝে শালের ঘন বিন্যাস, হিমালয়ের বুকে শালবীথির যে সমুন্নত উদ্ধত মহিমা- এরা যেন তাদের সংক্ষিপ্ত হাস্যকর সংস্করণ...
>
> ...নদী আছে কিন্তু মোটা মোটা বালির দানা আর ছোট বড় পাথরের টুকরোর ভেতর দিয়ে তাদের জলের ধারাটা একফালি অভ্রের পাত বলে ভুল হতে পারে। আর আছে পাহাড়ে শুধু রাত্রির অন্ধকারে যেখানে বার্ণপুরের চিমনির আভায় কালো দিগন্তটা লাল হয়ে থাকে, সেদিকটা ছাড়া আর তিনদিকেই চলেছে পাহাড়ের অনন্ত শ্রেণী।
>
> একদিকের দূরান্ত রেখায় পঞ্চকোট, অন্যদিকের চক্রবালে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোনো সীমাসংখ্যাই নেই। কোনটায় পলাশের জঙ্গল, কোনটায় একেবারে ন্যাড়া। কোনটাই নিতান্তই

জংলা-শতমূলী সহস্রমূলী থেকে শুরু করে দুহাত উঁচু আবলুশগাছ আর নলবনের মতো সরু সরু পাহাড়ি বাঁশ অথবা বাঁশের ক্যারিকেচার'।[৫]

গল্পে দেখি শুশুনিয়া পাহাড়ে ও তার কোলে ছোট এক ঝর্ণা ভোগবতী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় ট্র্যাজিক পরিণামে পাহাড়ি ঝর্ণা ভোগবতী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সাঁওতালদের জীবনযাপনের চিত্র, তাদের দেবতা, তাদের বনজঙ্গলের প্রতি অধিকার, এর পাশাপাশি সাহেবদের অন্যায়-অত্যাচার শোষণ এবং বনভূমি করায়ত্ত করার বিষয়গুলো গল্পে দেখানো হয়েছে। এই গল্পের পটভূমি এ পাহাড়ি রাঢ়গ্রামাঞ্চল না হলে লেখক আদিবাসীদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার, আদিবাসীদের জীবনচিত্র এই বিষয়গুলি এত সুন্দর করে দেখাতে পারতেন না। পটভূমি ও গল্পের পরিণতি একসূত্রে গাঁথা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনতুলসী' গল্পের পটভূমিতে শহর ও শহরের মানুষের মনোভাব রয়েছে। কিন্তু গল্পের মূল কাহিনি ও নামকরণের সঙ্গে সঙ্গতভাবে চিত্রিত গ্রামবাংলার জঙ্গল, বনতুলসীর জঙ্গল। কথকের জীবনে প্রকৃতির প্রেম যে কতটা সর্বনাশা এবং কথকের জীবনে আদিবাসী নারীর প্রতি প্রেম, বনতুলসীর প্রতি কথক প্রেমে কতটা মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল, তা এই ভয়াল উত্তরবাংলায় অবস্থিত গ্রাম্য অরণ্য প্রকৃতির পটভূমিতেই মানানসই। শহর মানুষদের মনোভাব, মোহ, প্রকৃতির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বোঝাতে গল্পকার অনবদ্য সঙ্গতি রক্ষা করেই গল্প পটভূমি নির্মাণ করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস' গল্পের পটভূমি সাঁওতাল পরগনার গ্রাম্য পরিবেশ। গল্পে সুন্দরলাল সহজ-সরল আদিবাসী মানুষগুলোকে নিজের ফাঁদে ফেলে তাদের আসামের চা-শ্রমিক হিসাবে নিয়ে যায়। পুঁজিবাদের কাছে অরণ্যসন্তানদের প্রতারিত হওয়ার গল্প। গল্পে সুন্দরলালদের মতো আড়কাঠিরা গ্রামের এই সহজ-সরল আদিবাসী মানুষগুলোকে খুব সহজেই ঠকিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে। শিক্ষাহীনতা, উপস্থিত বুদ্ধির অভাব এবং সরলতাই আদিবাসী মানুষগুলোর ঠকে যাবার মূল কারণ। এক্ষেত্রে গ্রাম্য পটভূমিই সুপ্রযুক্ত।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুলারহিনদের উপকথা' গল্পের পটভূমি পাহাড় ও শাল-মহুয়ার বন পরিবৃত্ত, সভ্যতার আলো থেকে বহু ক্রোশ দূরে মকাই-জোয়ারের দেশ। এই গ্রাম্য পটভূমিতেই ভুখন ও দুলারহিনের জীবন, তাদের উপকথ চিত্রিত। গল্পের প্রধান দুই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রকাশে সহায়তা করেছে

গল্পের পটভূমি। দুই চরিত্রের আত্মদানেচ্ছা, মানসিক ব্যাকুলতা, সহমর্মী মনোভাব এবং তাদের সরলতার প্রকাশ তা এই গ্রাম্য পটভূমিতে মানানসই।

রমাপদ চৌধুরীর 'বনবাতাস' গল্পের পটভূমি পাহাড়ি দেহাতী গ্রাম, ঘন বন-বনানী—

> 'একটা লম্বা পাহাড়ের রেঞ্জ চলে গেছে রাঁচি থেকে রামগড়। পাহাড়। কালো কালো পাহাড় আর এক পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট উপত্যকা। দেশী-বিদেশী মানুষের বসতি সেখানে। দেহাতী গাঁও। ডেরা আর ডিহি। রেলপথের রাস্তাটা নয়। রাঁচি থেকে পালামৌ হয়ে ঘুরে এসেছে সড়কটা। মহুয়ামিলন, লাপরা, রায় হয়ে। পাহাড় ডিঙিয়ে, পাহাড় কেটে, পাহাড়ের গায়ে চক্র দিয়ে'।[৬]

এই গ্রাম্য পটভূমি গল্পের মূল ভাব-বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চিত্রিত। গ্রামের সন্ধ্যায় আদিবাসী এলাকার চিত্র চিত্রিত হয়েছে— 'হঠাৎ ভেঁপু আর ঢোলক বেজে উঠল উদ্দাম হয়ে। আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বালিয়ে জলসা জমাচ্ছে ওঁরাও আর মুণ্ডার দল। ওরা নাচবে গাইবে। মনমাতালের মহুয়া রসের দেহাতী হাঁড়িয়া খেয়ে নেশায় চুর হয়ে থাকবে। মাতলামি করবে'।[৭]

এই গ্রাম্য পটভূমি যেমন একধারে গল্পের শিল্পরস ও বিষয় বৈচিত্র্যে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়, তেমনই গল্পের এই অংশের পটভূমি চিত্রণকে আমরা অন্য মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও দেখতে পাই। যেন আদিবাসী উল্লাস, আনন্দ আরতীদেবীদের একাকীত্বকে আরও প্রকট করে তুলছে, তাদের জ্বালানো আগুন যেন আরতীদেবীর হৃদয়ের আগুন। আমরা গল্পের পটভূমিতে টুংরি নদীর ওপর কংক্রিটের সাঁকো স্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি আরতিদেবীর সৎসন্তান ও পুত্রবধূ অনু-সুস্মিতাও অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয় আরতীদেবীর কাছে। গল্পের পটভূমির বুননের পাশাপাশি গল্পের কাহিনি বিন্যাস, মনস্তত্ত্ব যেন একসূত্রে গাঁথা। গল্পে আদিবাসী জীবনের কোন নিবিড় রূপ নেই, বরং কাহিনির পটভূমি এখানে কাহিনি, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিন্যাসের আবহ তৈরি করেছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'তিনতারা' গল্পের কাহিনির পটভূমি পাহাড়ি গ্রাম্য এলাকা-

'লাতেহারের পশ্চিমে বনের পাহাড়ের রেঞ্জ। দীর্ঘ শীর্ষ একক পালামৌ পাহাড়কে ঘিরে অজস্র পাহাড়ীর হাট। নৃমুণ্ডমালিনীর কণ্ঠমালার মতো শ্যামলিমায় ঢাকা দূরের দিকচক্রাবাল টেনেছে শাল-শিরীষের ঘন বন ঘনিষ্ঠতা,পাহাড়ে পাহাড়ে'।[৮]

এই পাহাড়ি গ্রাম্য পটভূমিতেই, পাহাড়ি আদিবাসী কুলিকামিন বা শ্রমিকদের জীবনযাপনের কিছু অংশ চিত্রিত। মাঝাং পাহাড়ের সবুজ অরণ্যের পাকা পাহাড়িকার হাটের চিত্র চিত্রিত করেছেন লেখক অসাধারণ বর্ণনায়—

'সুকেশী তরুণীর সুস্পষ্ট ছবিটিতে দেখায় যেন কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক ঐরাবতের আশ্লেষে ঘুমন্ত অজগরের কঙ্কাল। ঝিরঝির শব্দের নূপুর বাজিয়ে জলের স্রোত নেমে আসছে। ঘুঙুরের কোলের মতো বেদনাবাদন বেজে ওঠে নুড়িতে নুড়িতে ঠোকা খেয়ে। জলতরঙ্গের চূর্ণ শব্দের নিক্কণ শোনা যায়, পাথরের গায়ে জলের ঘা বাজে। অনেক দূর থেকে কলহাস্যে ভেসে আসা মুখর কাকলির মতো কলধ্বনি তুলে নেচে নেচে আসে রূপঝিলের স্রোত। শৃঙ্গারনটীর ভীতচকিত কৌতুকের লাস্য ফুটিয়ে'।[৯]

লেখক গল্পের অনবদ্য উপমার মধ্যে প্রকৃতির পটভূমির বর্ণনা করেছেন। এই বলার, বর্ণনের ভঙ্গিমায় গল্পে বর্ণিত পটভূমি যেন এক অন্য মাত্রা নেয়। এই পটভূমিকে কেন্দ্র করেই ইজারাদার ও আদিবাসী উপজাতির কিছু শ্রমিকদের জীবনের রাজনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে। পটভূমির কঠোরতা ও কোমলতার মতই যেন প্রত্যেকটা চরিত্রের জীবনেও রয়েছে কঠোরতা ও কোমলতার প্রকাশ। গল্প চরিত্রগুলিকে বর্ণনার ক্ষেত্রে পটভূমি রচনা গল্পের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'দরবারী' গল্পের পটভূমি পাহাড় ঘেরা অজ সাঁওতালি গ্রাম লাপরা স্টেশন। এই পাহাড়ের কোল ঘেঁষা সাঁওতালী গ্রাম, এখানকার মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ, অ্যাংলো অফিসার, এছাড়া গল্পের অন্য চরিত্রদের জীবন আবর্তিত হয়েছে এই পটভূমিকে কেন্দ্র করে। জোনাথনের এই সাঁওতাল গ্রামে আসা, এখানকার মেয়েকে বিয়ে করা, মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা, একটা গ্রামে এসে সেখানকার অনেককিছু বদল— এই সবকিছু এই সাঁওতাল গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই চিত্রিত। গল্পের মূলভাব উন্মোচনে গল্প পটভূমি সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' গল্পের পটভূমি—

> 'বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ হেঁটে যখন ভুরকুণ্ডার সারনা পার হয়ে লাটুয়া ওঝার বাড়ির সামনে পৌঁছলাম, তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।'[১০]

প্রকৃতির পাশাপাশি লাটুয়া ওঝার মাটির বাড়ির বর্ণনা পাই। গল্পে লাটুয়া ও সুরমণি, কথকের চরিত্র এবং বিষয়বস্তু– সবকিছুই গল্পের পটভূমিতে এক অন্যমাত্রা এনে দেয়। আদিবাসীদের কুসংস্কার, সততা, সরলতা সুরমণির চরিত্রে প্রকাশিত। শহুরে কৃত্রিমতা, ভণ্ডামি তাদের মধ্যে নেই। তারা শহুরে আদবকায়দা থেকে অনেক দূরে পাহাড়ি জঙ্গলে বাস করে। তাই সুরমণির মধ্যে সেই সৎ সাহস, সরলতা আছে মিথ্যেটাকে স্বীকার করে নেওয়ার। গল্পের পটভূমি পাহাড়ি বনপ্রান্তর। গল্পের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চিত্রিত পটভূমি শিল্পোত্তীর্ণ।

রমাপদ চৌধুরীর নারী মনস্তত্ত্বের গল্প 'নারীরত্ন'- এর পটভূমি সোনাতুলসী নদীর পাড়ে সোনাডি গ্রাম। এর আগে আমরা বেশির ভাগ গল্পেই দেখি আদিবাসী মানুষগুলি সবাই সৎ, সহজ-সরল। আদিবাসী নারীর উদগ্র কামনা-বাসনার ভয়াবহ চরিত্র লেখকের অন্য নারী চরিত্রে পাই না, যা এই গল্পে ময়নার মধ্যে পাই। গল্পে ময়না আদিবাসী নারী হলেও তার মধ্যে যে হিংস্রতা, ক্রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতার চিত্র পাই, তা কেবলমাত্র সে 'জংলা মেয়ের কীর্তি' এমনটা কখনই নয়, শহুরে আধুনিকা হলেও সে এরকমটা করতেও পারে। পটভূমি গ্রাম, শহর– যে কোন কিছুই হতে পারতো এক্ষেত্রে। তবে এই গল্পের পটভূমি খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি, গুরুত্ব পেয়েছে নারীচরিত্র।

রমাপদ চৌধুরীর 'মানুষ অমানুষের গল্প' গল্পে কোটালপাড়া, শাঁখভাঙা নামক গ্রাম্য পটভূমি চিত্রিত। যেখানে যাযাবর 'বুনো' বাঁদর মারার দল তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য, তাদের সারা বছরের পেটের টানে রুজি-রোজগারের আশায় এই গ্রামে আসে। গল্পের যা বিষয় তা একান্তভাবেই গ্রাম্য পটভূমিতেই মানানসই। গল্পের বক্তব্যের সঙ্গে এই পটভূমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সমরেশ বসুর 'আইন নেই' গল্পের পটভূমি গ্রাম্য পরিবেশ-

'বাসকের ঝাড়টা যেখানে সুনিবিড় হয়ে ঘন অরণ্যের রূপ ধরেছে, যেখানে বড় বড় গাম্বিল আর মুচকুন্দ চাঁপা গাছ কয়েকটার কোমর ধরা ধুতরার বন বিস্তৃত'।[১১]

জায়গাটা একটা মাঠের শুরু এবং গ্রামের শেষ প্রান্ত। গল্পে দেখি কুতুবলাল চরিত্রটি বাঁদর মারার কাজ করে এবং সেই জীবিকা যাপন করে সেই উপার্জনেই তার সংসার চলে। গল্পের এই বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সঙ্গতভাবে গল্পের শুরুর থেকে এক আদিবাসী যুবতীর কথা পাই এবং গল্পের আদিবাসীদের কথা পাই। মৃত বাঁদরদের পেলে হয়তো আদিবাসীরা নিয়ে যেত, এই ভাবনা থেকে আদিবাসীদের খাদ্যাভাসের কথা বোঝা যায়। গল্পের যে সাঁইপাড়ার জঙ্গল, জনা গ্রাম, ওম্‌রাহপুর গ্রাম, জঙ্গল— এই পটভূমিগুলো পাই, এই গ্রাম্য পটভূমিতেই প্রান্তিক জীবন ও আদিবাসীদের খাদ্যাভাসের পরিচয় এবং বাঁদর মারা, এই প্রসঙ্গগুলো সঙ্গত। এই গল্প আদিবাসীকেন্দ্রিক বলা চলে না, নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা বলে। কিন্তু এই গল্পটিতে আমরা যে দু'বার আদিবাসী নারী ও আদিবাসী জাতির উল্লেখ পাই, সেক্ষেত্রে এই গ্রাম্য পটভূমি ভীষণ সঙ্গত। গল্পের এই পটভূমি চিত্রণ যেমন গল্পের বিষয়, চরিত্রচিত্রণে সার্থক।

সমরেশ বসুর 'উত্তাপ' গল্পের পটভূমি- বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনার সীমানা, স্টেশন ও গ্রাম্য রাস্তা। আষাঢ় মাসের একটি বর্ষার দিন। গল্পে এক সাঁওতাল যুবতী তার বুকের উত্তাপ দিয়ে শহরের যুবক হরেনকে সুস্থ করে তোলে, কিন্তু হরেনের মধ্যে কামোদ্দীপনা থাকে কেবল, কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ তার মধ্যে দেখা যায়না। গল্পের পটভূমিই এখানে গল্পের বিষয়বস্তুকে আলোকিত করেছে। চরিত্রচিত্রণ, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, গল্পের শিল্প সার্থকতায়, গল্পের মূলভাবের ক্ষেত্রে পটভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গল্পের পটভূমি নির্মাণই যেন গল্পের পরিণতির প্রতীক।

সমরেশ বসু'র 'গুণিন' গল্পের পটভূমি গ্রাম্য পটভূমি, বেনাহাটি গ্রাম, গল্পের পরিণতি পেয়েছে অদূরে মস্ত দীঘিকে কেন্দ্র করে। গুণিনের আদিম হিংস্র মনোভাবের সাথে, তার মন্ত্র ক্রিয়াকর্মের সাথে গোরস্থানের পটভূমি বীভৎসতা ও ভয়ঙ্করতাকে ফুটিয়ে তোলে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গুণিনের মর্মান্তিক পরিণতির ক্ষেত্রে এই পটভূমি এক দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

সমরেশ বসু'র 'শানবাউরীর কথকতা' গল্পের পটভূমি রাঢ়বাংলার বীরভূমের কাছাকাছি সাঁওতাল পরগনার একটি গ্রাম। যেখানে বাউরি, সাঁওতাল আদিবাসীদের পাশাপাশি বসতি, তাদের সহাবস্থান

চিত্রিত। আদিবাসীদের আদিম উৎসব, বাউরিদের জীবনযাপন তাদের আদিমতার মূলভাব উন্মোচনে, গল্পের সমস্ত পটজুড়ে যে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথের কথা পাওয়া যায় তা শানার জীবনের সাথে মিলে যায়। এই প্রান্তিক, আদিবাসীদের জনজীবনের ক্ষেত্রে এই গ্রাম্য পরিবেশই মানানসই।

সমরেশ বসু'র 'জীবিকা' গল্পের পটভূমি মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির প্রাঙ্গণ। একদিকে গঙ্গা আর একদিকে ইতিহাসের পটভূমি। এই পটভূমিতেই দুলাল আলির মতো মানুষদের জীবিকা। এই ইতিহাস দেখতে আসা মানুষদের কাছে ভূমিহীন কৃষকের পেট চালানোর দায়ে তাদের মিথ্যা বলে সামান্য আয়ের জন্য। কথার জাদুকরীতেই তাদের পেট চলে। এরকম ট্যুরিস্টদের উপর নির্ভর করেই গ্রামবাংলার বহু মানুষের পেট চলে। এদের বানিয়ে বলা মিথ্যার কারণ তাদের পেটের দায়ে। গল্পের যে সারকথা- আমাদের দেশের সংকট বাইরে নয়, দেশের অভ্যন্তরে। এই সারমর্ম উপলব্ধিতে, কাহিনির পটভূমি এখানে গল্প বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্পোত্তীর্ণতায় উদ্ভাসিত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' গল্পসংকলনের 'জল' গল্পের পটভূমি গ্রাম্যপটভূমি, চরসা ব্লক ও চরসা নদীকেন্দ্রিক। এই নদীকে ঘিরে গ্রামের আদিবাসী, নিম্নবিত্ত প্রান্তবাসী মানুষদের জীবন আবর্তিত। তাদের জীবনের নানান গুরুতর সমস্যা, জলের সমস্যা যা গুরুতর হলেও কেবল একটি 'ইস্যুমাত্র' বলে উর্ধ্বতন বাবুরা কোনো দায় নেয় না। গল্পে প্রান্তিক জনজাতি জীবনের এই চিরকালীন সমস্যার রূপায়ণ এই গ্রাম্য পটভূমিতেই প্রযোজ্য।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন বসাই টুডু' এবং 'এম.ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ' গল্পদুটির পটভূমি আসলে নকশালবাড়ির ঘটনাবলী, নানান আন্দোলন ও তার প্রেক্ষাপট। সবটাই গ্রামকেন্দ্রিক হলেও গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে তৎকালীন ও পূর্ববর্তী সময়ের প্রেক্ষাপট। রাজনীতি মানুষের স্বার্থে হওয়ার বদলে গল্পে দেখি রাজনীতির দ্বারা আদিবাসী, সমাজের প্রান্তবাসী মানুষগুলো বঞ্চিত, শোষিত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'নৈঋতে মেঘ' গল্পসংকলনের অন্তর্গত 'জগমোহনের মৃত্যু', 'শিকার', 'শিশু', 'নুন', 'বিছন', 'ধৌলী', 'রুদালী' এবং 'ডাইনি' এই সকল গল্পের পটভূমি গ্রামকন্দ্রিক হলেও প্রেক্ষিত ভিন্ন। 'জগমোহনের মৃত্যু' গল্পের শুরু জগমোহন, সোমরা, গঞ্জু ও বুলাকির মৃত্যুসংবাদ দিয়ে। গল্পের পটভূমি বুরুডিহা গ্রাম প্রেক্ষাপট ঊনিশশো সাতাত্তর সালের অক্টোবর। গল্পে দরিদ্র, শোষিত, অত্যাচারিত, সর্বহারা

আদিবাসীদের সংগ্রাম এর সাথে হাতি জগমোহনের সংগ্রাম, বঞ্চনার গল্প লেখিকা একই সূত্রে গেঁথেছেন। চরণদাসদের মতো মানুষদের জন্যই অরণ্যবাসীরা, সে মানুষই হোক কিংবা প্রাণী সকলেই বঞ্চিত। তারা নিজেদের প্রাপ্যটুকু পায়না, বঞ্চিত প্রকৃতির সন্তানরা। আদিম সন্তানদের জীবন অনাহারে-বঞ্চনায় জ্বলছে, স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও সংবিধানে উপজাতিদের জন্য নানান আইন থাকলেও তা আসলে কোনো কার্যকরী নয়– এই সত্য উন্মোচনে লেখিকা গল্পে রাঁচি, পালামৌ, সিংভূমের গ্রাম্য পটভূমির অবতারণা করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' গল্পের পটভূমি গোমো ডালটনগঞ্জ লাইনের কুরুডা গ্রাম। গল্পের মূল চরিত্র মেরী ওঁরাও তার চরিত্রে একদিকে আছে কোমলতা আর একদিকে কঠোর বন্য হিংস্রতা। আদিম হিংস্রতা, জেদ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও প্রতিবাদী সত্তার মেরী শিকার উৎসবের দিন তসিলদারকে হত্যা করে নিজের ভালোবাসার মানুষের সাথে অজানার উদ্দেশ্যে, নতুনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। গল্পে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী আগ্রাসনের পাশাপাশি আদিবাসী জনজীবন ও মেরীর মতো প্রতিবাদী নারীসত্তাকে ফুটিয়ে তুলতে শিকার উৎসবের পটভূমি সঙ্গতরূপে চিত্রিত।

মহাশ্বেতার অন্যান্য জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পের ন্যায় 'শিশু', 'নুন', 'ধৌলী', 'রুদালী', 'ডাইনি', এই সমস্ত গল্পের পটভূমিই গ্রাম্য পটভূমি। প্রতিটি গল্পই আদিবাসীকেন্দ্রিক এবং ১৯৭৭ এর জরুরি অবস্থার ঠিক পরবর্তী সময়ের গল্প। 'শিশু' গল্পের পটভূমি রাঁচি-সরগুজা ও পালামৌ এই তিন জেলার সীমারেখার মিটিং পয়েন্টে অবস্থিত লোহ্‌রি, যা একটি দগ্ধ প্রান্তর বিশেষ। এই জায়গায় লোহার জাতির অন্তর্গত আগরিয়া জনজাতির বাস। কুভা গ্রামের আগরিয়া জনজাতির মানুষ সরকার কর্তৃক কতটা অত্যাচারিত তা এই গল্পে বর্ণিত। লোহরি তে আসা এক রিলিফ অফিসার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয় কীভাবে তারা চূড়ান্ত অনাহারে বছরের পর বছর অতিবাহিত করতে করতে আগরিয়া নারী-পুরুষরা শিশু শরীরের ন্যায় খর্বাকৃতি, কঙ্কাল ন্যায় শরীরে পরিণত হয়েছে। শহরের মানুষদের আদিবাসী নারী ও পুরুষ নিয়ে যা ধারণা তা গ্রামে এসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারের, ত্রাণকর্তাদের নিষ্ঠুরতা, আদিবাসীদের জীবনসত্যের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে এই গ্রাম্য, জঙ্গল এবং প্রান্তর পটভূমিই উপযুক্ত। এই গল্পের পটভূমিই এই গল্পের প্রাণকেন্দ্র।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘নুন’ গল্পটিও ষষ্ঠ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে লেখা, গল্পের পটভূমি- পালামৌ অভয়ারণ্যের কোলে বুঝার গ্রাম। ১৯২৪ সালে ইংরেজ সরকার সার্কুলার জারি করেন ‘বেগারপ্রথা’ উচ্ছেদে, কিন্তু স্বাধীনতার কুড়ি- তিরিশ বছর পরেও আদিবাসীদের জন্য এই চিত্র খুব একটা বদলায় না। বেঠবেগারি বেআইনি এবং আরও নানান আইন, অধিকারের ন্যূনতম খবর যখন আদিবাসীরা পায় তারা প্রতিবাদ করে, তখন তাদের দমনে উচ্চবিত্ত দল নানা কৌশল অবলম্বন করে, আদিবাসীদের নুনে মারা হয়। হাতি যেমন পিঁপড়েদের পদদলিত করে পিষ্ট করে তেমনই এই জোতদারদের হাতে, শোষকশ্রেণির হাতে তাদের জীবন বিপন্ন হয়। সামান্য নুনের জন্য হাহাকার স্বাধীন ভারতের এক গ্রামে। গল্পের এই হাহাকার, নিদারুণ বাস্তবতার সুনিপুণ নগ্নতা তুলে ধরতে গ্রাম্য পটভূমিই শিল্পসার্থক।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘বিছন’ গল্পের পটভূমি কুরুডা গ্রাম, গ্রামের খেত। গল্পের কাহিনি যেন পাঠককে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেয়। আদিবাসী, হরিজনদের মেরে মাটিতে পুঁতে দিয়ে তার উপরেই চলে চাষাবাদ। জীবনের উপর যেন জীবন রোপন। সরকার-প্রশাসন কেবল প্রতিশ্রুতি দেয় আইনের কিন্তু অত্যাচার, সঠিক তদন্ত বাস্তবে হয় না। যখন আদিবাসীদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তারা আর সহ্য করতে পারে না তখনই দুলন গঞ্জুর মতো প্রতিবাদী হতে হয়। শাসককে তারই মতো করে একেবারে বিনাশ ঘটাতে হয়। এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পের ৭৭’র জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট, পটভূমি যথাযথ।

মহাশ্বেতার দেবীর ‘ধৌলী’ ও ‘রুদালী’ গল্পের পটভূমি টাহাড়। ‘রুদালী’ ও ‘ধৌলী’ গল্পে অন্ত্যজ আদিবাসীদের উপর রাজপুতদের, জমিদারদের নিপীড়নের চিত্র বর্ণিত। ‘ধৌলী’ গল্পে দেখা যায় উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ রাজপুত ঘরানার হাতে গঞ্জু নারীরা কতটা লাঞ্ছিত। রমাপদ চৌধুরীর ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ গল্পে যেমন রেবেকা তার স্বামীর জন্য সন্তানসহ অপেক্ষা করেছিল ‘ধৌলী’ গল্পেও ধৌলী তার ভালবাসার মানুষের জন্য, তার সন্তানের পিতার জন্য অপেক্ষার চিত্র পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ধৌলীকে তার পুত্রকে বাঁচাতে সমাজের চাপে তাকে দেহব্যবসা করতে হয়। ‘ধৌলী’ ও ‘রুদালি’ গল্পদ্বয়ে মেয়েরা গ্রাম থেকে কীভাবে শহরে আসে সমাজের চাপে নানা কারণে তা এই দুটো গল্পে চিত্রিত।

লেখিকার ‘ডাইনি’ গল্পের পটভূমি টুরায় আষাঢ় মাসের পটভূমি। সত্তরের শেষার্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা গল্প। আদিবাসীদের মধ্যে যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ডাইনিকেন্দ্রিক, নানা অযৌক্তিক সংস্কার তা

গ্রামাঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। শিক্ষার অভাব মানুষের মনকে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন করে, অন্ধবিশ্বাসের দিকে যুক্তিহীনতার দিকে নিয়ে যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘রাবণবধ’ গল্পের অসহায়, শোষণ জর্জরিত শবর জনজাতির চিত্র এবং তার পাশাপাশি অত্যাচারিত শবরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে প্রতিশোধের কাহিনি জারাংডি নামক গ্রাম্য পটভূমিতে চিত্রিত। শবর জনজাতির বাস মূলত গ্রামেই এবং মূল লোকালয় থেকে দূরেই। সেই হিসাবে শবর জনজাতির শোষণ জর্জরিত জীবন ও তাদের প্রতিবাদকে তুলে ধরতে গ্রাম্য পটভূমিই বাঞ্ছনীয়।

‘জঙ্গল’ ও ‘অর্জুন’ গল্পেও মহাশ্বেতা দেবী পুরুলিয়ার শবর ও খেড়িয়াদের জীবনযন্ত্রণা, অসহায়তা ও প্রতিরোধের কাহিনি পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম্যপটভূমির নিরিখেই তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য আদিবাসীকেন্দ্রিক গল্পের গ্রাম্য পটভূমির ন্যায় ‘ঘন্টা বাজে’ গল্পের পটভূমি বিরহা গ্রামকেন্দ্রিক, আবার ‘প্রেতোৎসব’ গল্পের পটভূমি রাজাপুর গ্রামকেন্দ্রিক। আদিবাসীদের জীবনের নানান শোষণের ভিন্ন চিত্র ভিন্ন পটভূমিতে চিত্রিত। ‘সমাজবাদ ববুয়া’ গল্পের পটভূমি কখনও আসানসোল আবার কখনও ধানবাদ। ‘লাইফার’ গল্পের পটভূমি গ্রাম আবার জেলও। মহাশ্বেতার গল্পে আদিবাসীদের জীবন কাহিনি বৈচিত্র্যময় পটভূমিতে চিত্রিত।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘সাগোয়ানা’ গল্পের পটভূমি- ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের পটভূমি। তিতাহাতু গ্রাম, চাইবাসা-গোইলকেরা জঙ্গল রাস্তার মাঝামাঝি তিতাহাতু- পাহাড় জঙ্গলের দেশ, ছোট আদিবাসী গ্রাম। এই গ্রামের দরিদ্র আদিবাসী মানুষদের ভরসা জঙ্গলের কন্দমূল-ফল-শালপাতা, মহুয়া, শুকনো কাঠ। জীবন ও জীবিকা নির্বাহের এই সামান্য জিনিসগুলির প্রতি অধিকার প্রশাসন-সরকার তাদের থেকে কেড়ে নিতে চায়। প্রশাসনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, এই পটভূমিতেই মানানসই। লেখিকার কাহিনি কাল্পনিক নয়, বাস্তবিক ১৯৭৮ এর ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের পটভূমিতেই কাহিনির বিন্যাস।

অসীম রায়ের ‘শৈলেনবাবু সমাচার’ গল্পে শৈলেনবাবু কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা হলেও তাঁর ভালোলাগা, ভালোবাসা, শান্তির জায়গা সাঁওতাল পরগনা। গল্পে শৈলেনবাবুর চাকরিজীবন থেকে বার্দ্ধক্য

বয়স অবধি সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতির উপর টান, ভালোবাসা, গাছের প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা, এই সবকিছুর ক্ষেত্রে সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতি পটভূমি হিসাবে গল্পে এসেছে। শৈলেনবাবু তাঁর চাকরি জীবনে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ড্রাফ্টস্‌ম্যান হিসাবে কাজ করতেন, তখন তাঁর কাজের জায়গা ছিল এই সাঁওতাল পরগনা। দুমকা রোডের ধারের জঙ্গল, গিরিখাত, মহুয়ার বন, পলাশ, ঝর্ণা, সাঁওতাল পরগনার এই পটভূমি শৈলেনবাবুর শান্তি-ভালোবাসার জায়গা। তাঁর মৃত্যুও তাঁর ভালোবাসার জায়গাতেই। গল্পে শৈলেনবাবুর মুখে শহর ও গ্রামের মানুষদের মনোভাবের পার্থক্য, তার বাগান প্রেম, গাছের প্রতি ভালোবাসা, সরল আদিম মানুষদের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাঁওতাল পরগনার পটভূমি সবিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। একজন কলকাতার শহুরে মানুষের সাঁওতাল পরগনার প্রতি নিখাদ ভালোবাসার ভাব উন্মোচনে গল্প পটভূমি এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়।

অসীম রায়ের 'তাড়ি' গল্পের পটভূমি সাঁওতাল পরগনার গ্রাম্য পটভূমি। সোমেন মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতার বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সাঁওতাল পরগনার পটভূমি রচিত গল্পে। গ্রাম্য পরিবেশ, আদিবাসী মানুষের জীবনের কিছু চিত্র, কবি শহুরে মানুষদের মনোভাব এই গ্রামের মানুষগুলোর প্রতি এছাড়াও কলকাতার বাইরেও যে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র আছে তা বোঝাতে এই সাঁওতাল পরগনার মানুষদের জীববনযাপনের চিত্র গল্পে চিত্রিত। শহরের চারপাশে মাইলের পর মাইল গ্রামের একটাই জীবন, শহরের ফেরিওয়ালার অস্তিত্ব কেবল কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলার সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামো, মানুষের মনোভাব এই সবকিছুর ক্ষেত্রে গল্পের পটভূমি হিসাবে সাঁওতাল পরগনা সুপ্রযুক্ত। লেখকের এই গল্পের কাহিনি বিন্যাস ও পটভূমি নির্মাণে সত্তর-আশির দশকে কলকাতার বাইরে যে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার প্রবণতা স্পষ্ট।

অসীম রায়ের 'দুই বৃদ্ধের কাহিনি' গল্পে পটভূমি গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে সাঁওতালদের বাস এবং সাঁওতাল পাড়ার শেষে হাড়িপাড়া। সাঁওতাল পাড়ার শম্ভু হেমব্রম ও তার ছেলে শিবুর কাহিনি এবং হাড়িপাড়ার অনাদি সরকার এই দুই বৃদ্ধের যৌবন ও বর্তমান রণক্লান্ত বৃদ্ধ বয়সের চিত্র রচিত। আদিবাসী সমাজের প্রবীণ শম্ভু হেমব্রমের রাজনীতি সচেতনতা, তাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এই গ্রাম্য পটভূমি যুক্তিসঙ্গত।

অসীম রায় তাঁর ‘সুন্দর’ গল্পের গল্পবিষয়কে সার্থকতা দান করতে সাঁওতাল পরগনার এক পোড়োবাড়িকে লেখক গল্পের পটভূমি হিসবে নির্মাণ করেছেন। সুন্দরের অদ্ভুত রহস্যময় আচরণ, চরিত্রদের মনন, কথাবার্তা, এই পরিত্যক্ত বাড়ির আবহে এক বিশিষ্টতা এনেছে। এই গল্পের পটভূমিই গল্প বিষয়ের সঙ্গে গভীর একাত্মতায় আবদ্ধ।

প্রফুল্ল রায়ের ‘কার্তিকের ঝড়, বন্যা এবং চুনাও’ গল্পের পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহারের গ্রামাঞ্চল। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে আদিবাসী সহজসরল মানুষদের বোকা বানিয়ে কীভাবে রাজনীতিবিদরা তাদের ক্ষতি করে, হাজারো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভুল বুঝিয়ে, ইচ্ছাকৃত সংকট সৃষ্টি করে আবার মুখোশ ধারণ করে নিজেরাই সাহায্যের নাটক করে আস্থা অর্জন করে প্রান্তিক, জনজাতির মানুষদের। গ্রামের মানুষদের ভোটের জন্যই যে চক্রান্ত রাজনীতিবিদদের, ‘রক্ষকই যে ভক্ষক’ একথার সারমর্ম উদ্‌ঘাটনে এই গ্রাম্য পটভূমিই উপযুক্ত। গ্রামের আদিবাসী মানুষদের জীবন তুচ্ছ, কিন্তু তাদের ভোট দামী- এই চিরন্তন সত্য, গল্পবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রাম্য পরিবেশ, বন্যার পটভূমি চিত্রিত।

প্রফুল্ল রায়ের ‘সাতঘরিয়া’ গল্পের পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে মনপথল গ্রামাঞ্চল-

> ‘মনপথল জল - অচল অচ্ছুৎদের গাঁ। এর উত্তর দিকে থাকে ধাঙড়েরা, দক্ষিণে গুঞ্জরা, পশ্চিম দোসাদরা’।[১২]

এই মনপথল গ্রামাঞ্চল ও সুরথপুরের হাটকে কেন্দ্র করে চাঁপিয়া দোসাদের জীবন-নিয়তি আবর্তিত। তার বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সুরথপুর হাট বড় ভূমিকাপালন করেছে। সুরথপুর হাটেই চাপিয়া শেষমেষ গৈবীনাথকে বিবাহ করে তার মনপথল গ্রামে নিজের বাড়িতে আসে। সমাজে দুটো বাতিল মানুষের জীবন আবর্তিত এই গ্রাম্য পরিবেশে। গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পটভূমি চিত্রণ স্বার্থক।

প্রফুল্ল রায়ের ‘ধুন্নিলালের দুইসঙ্গী’ গল্পের পটভূমি পশ্চিমবাংলার বাইরে। উনিশশো ছেচল্লিশ সালের হেকমপুরা অঞ্চল। হেকমপুরার উত্তরের যে অংশে অচ্ছুৎদের বাস সেখানে ধুন্নিলালের বাড়ি। উনিশশো ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই গল্পের পটভূমি। দাঙ্গা সাধারণ মানুষকে কতটা হিংস্র করে তোলে, এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে শত্রু বানিয়ে ফেলে, দাঙ্গার ভয়াবহতা গল্পে চিত্রিত। পাশাপাশি

দাঙ্গার সাম্প্রদায়িকতা, ভয়াবহতাকে ছাপিয়েও সমাজে ধুন্নিলালদের মতো উদার, নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্য মানুষকে বাঁচানো মহানুভব ব্যক্তিত্বও রয়েছে। গল্পে এই মহানুভব সত্যকে, বাস্তবকে তুলে ধরতে গল্পে দাঙ্গার পটভূমি সময়োপযোগী।

অভিজিৎ সেনের 'জেহাঙ্গী' গল্পের জেহাঙ্গীর ডাইনি সাব্যস্ত হওয়ায় তার ভাসুরের ছেলে রেংটা তাকে তার বাড়িতে টাঙি দিয়ে কোপ মারে। বাড়ির সকলের মনেও জেহাঙ্গীর ডাইনি সত্তা নিয়ে দ্বিধা এবং শেষ পর্যন্ত জেহাঙ্গীর কোর্টে রেংটাকে দোষী সাব্যস্ত না করার পেছনে একটা কেন'র প্রশ্নচিহ্ন রয়ে যায়। গল্পের কাহিনি বিন্যাস গ্রামাঞ্চলেই ঘটে ঠিকই কিন্তু এক্ষেত্রে হাসপাতাল ও জেল গল্পের পটভূমি হিসাবে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতভাবে চিত্রিত। গল্পের প্রথমে সার্কিট হাউসের কম্পাউন্ড এবং হাসপাতালে আহত জেহাঙ্গীর জবানবন্দী, পরবর্তী কাহিনি বর্ণনায় এবং অনিমেষ ও অনিন্দ্যর আদিবাসী গ্রামে যাওয়া সত্যসন্ধানের উদ্দেশ্যে, গল্পের কাহিনি বিন্যাসে পটভূমির পরিবর্তন যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গল্পের শেষ পরিণতিতে আদালতের পটভূমি, এই বিচিত্র পটভূমি বিন্যাস গল্প কাহিনির সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে চিত্রিত।

অভিজিৎ সেনের 'পাথরে জলের বিন্দু' গল্পের পটভূমি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত জলাগ্রাম। এই গ্রাম্য পটভূমিতে জনজাতি গোষ্ঠীর ডাইনি সংস্কারের চিত্র এবং আদিবাসী সমাজে ডাইনি সংস্কারের শিকড় কত গভীরে প্রোথিত তা চিত্রিত। একইভাবে 'ডাইনি' গল্পেও এই জনজাতি সমাজের ডাইনি সংস্কারের আদিম অন্ধতা গ্রাম্যপটভূমিতে চিত্রিত।

অভিজিৎ সেনের 'মাটির বাড়ি' গল্পের শুরু- 'অন্ধকার এবং অপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ একটি মাত্র দরজা। জানালার মতো একটা ফোকর আছে উপরের দিকে। সেই ফোকর দিয়েই সামান্য আলো আসছে'।[১৩] গল্পের শুরুর যে আলো-আঁধারী পরিবেশ তা আদিবাসী সংস্কারের সংহত শিল্পরূপকে ফুটিয়ে তোলে। জমি ও সম্পত্তি রক্ষায় গোহিলালের যে কুসংস্কার, আদিবাসীদের আধাদৈবিক-আধাভৌতিক সংস্কারের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার আদিমতা বাতাবরণে গল্পের গ্রাম্য পটভূমিই সুপ্রযুক্ত। 'দেবাংশী' গল্পেও গ্রাম্য পটভূমিতে লোহার ও আদিবাসী জনজাতির সংস্কার চিত্র প্রস্ফুটিত।

ভগীরথ মিশ্রের ‘দৃষ্টি’ গল্পে গ্রাম্য পটভূমিতে কৈলাশ শিকারী, ঝাড়েশ্বর লুহার অর্থাৎ লোহার জনজাতি মানুষদের ব্যক্তিজীবন, মনস্তত্ত্ব, তাদের জনজীবন, সংস্কার চিত্রিত। লেখকের ‘নেশা’ গল্পেও গ্রাম্য পটভূমিতে মাহাতো, সাঁওতাল জনজাতির জীবনচর্যার চিত্র চিত্রিত। লেখকের ‘প্রয়াগ বেজের হাই’ গল্পে কুশবসান গ্রামের লোধা জনজাতির উপর অত্যাচারের চিত্র গ্রাম্য পটভূমিতে চিত্রিত। লেখকের ‘পৌষ পরবের কুশীলব’ গল্পে লোহার জনজাতির জীবনচিত্র বাঁকুড়ার গোবিন্দপুরের পটভূমিতে চিত্রিত। ‘হুলমারার ভোমরা মাঝি’ গল্পের হুলমারা গ্রামে ভোমরা মাঝি, সংস্কৃতি চিত্র, তাদের জীবনচর্যা উদ্ভাসিত। ‘বাঘের ডাক’, ‘পাখি ধরাখেলা’, ‘একদিনের বিকিকিনি’ গল্পগুলি প্রত্যেকটি গ্রাম্য পটভূমিতে রচিত। ভগীরথ মিশ্রের আমাদের গবেষণায় আলোচিত সমস্ত গল্পের পটভূমিই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল।

ভগীরথ মিশ্রের ‘সন্তান ও সন্ততি’ গল্পে মুকুটমণিপুরের ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রান্তিকজীবন ও আদিবাসী জীবন ফুটে উঠেছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। গল্পের কাহিনি বিন্যাসে এবং ‘অ্যাম্বিয়েন্স’ সৃষ্টি করতেই পটভূমি বিন্যাসে আদিবাসী গ্রামের প্রসঙ্গ এসেছে। আদিবাসীদের সহজাত আদিম সুরের ছন্দে গাওয়া উচ্ছ্বল গান, প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার, গল্পের পটভূমিই যেন মানবচরিত্রের মনোজগতের অপার রহস্যের সন্ধান দিয়েছে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিষয় যখন ‘গনা’’ গল্পের পটভূমি সুন্দরপুর। সুন্দুরপুর থেকে বদরগঞ্জ টানা আট মাইল রাস্তা মোরাম বানাতে গিয়ে গনা মুর্মুর সামান্য চাষের জমিও সেই রাস্তার আওতায় চলে আসে। গল্পে গনা মুর্মুর করুণ নির্মম পরিণতি, প্রশাসনের উদাসীনতা ও অমিয়দের মতো কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষদের ক্রূঢ়তা, রাজনৈতিক স্বার্থপরতা চিত্রিত। গল্পে রাস্তা তৈরির ঘটনাকে ঘিরেই গনা ও তার পরিবারের সংকটময় অবস্থা, আদিবাসী মিছিলে গনার মৃত্যু এবং আদিবাসীর মৃত্যুতে রাজনৈতিক লাভ, নেতাদের স্বার্থ, যে পটভূমিতে সাধিত হয়েছে তা গল্প বিষয়ের সঙ্গে এক পারম্পর্যে অন্বিত।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ব্যভিচারিণী’ গল্পটি তারাশঙ্করের ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পের খোঁড়া শেখ ও তার বিবি সর্পশিশুর কথা মনে করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে, ছোটগল্পে পশুর সাথে মানুষের সখ্যতা থাকলেও এমন মনস্তত্ত্বের গল্প বিরল। লখিন্দরের পিতা ছিল জেলে, পরে গুণিন হয়, মা ছিল বেদিয়া। তার শরীরে বেদের রক্ত, সে সাপ নিয়ে যে বিদ্যা শিখেছিল তাও ভীমরাজ বেদের কাছে থেকে। লখিন্দরের

স্ত্রী গোলাপী তকে ছেড়ে বেদিয়াদের সাথে চলে যায়। গল্পের পটভূমি মূলত গাঁয়ের একধারে, কালনাগিনী নদীর তীরে লখিন্দরদের ঘর। লখিন্দরের প্রিয়সাপ পদ্মগোখরোকে খুঁজে পায় পোড়োবাড়ি থেকে। গোলাপী বিশ্বাসঘাতকতা করার পর লখিন্দর পদ্মকে তার স্ত্রীর জায়গা দেয় কিন্তু গল্পের শেষে পদ্মর ও বিশ্বাসঘাতকতা লখিন্দরকে মনে আঘাত দেয়, যে কারণে সে দুই পদ্মগোখরোকেই হত্যা করে। গল্পের বর্ণনা, পটভূমি নির্মাণ, গল্পের পরিণতির সঙ্গে অনবদ্য মেলবন্ধনে গল্পরস শিল্পোত্তীর্ণ মাত্রা পেয়েছে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁড়িয়ার দেশের কবিতা' গল্পের পটভূমি পুরুলিয়ার রুক্ষভূমি -

> "যেখানে সভ্যতার আলোক পৌঁছতে আরও কয়েক আলোকবর্ষ সময় নেবে। পুরুলিয়ার এইসব এলাকা টাঁড় রুক্ষভূমি নামে পরিচিত। পাথুরে মাটি বলে ফসলের চাষ তেমনভাবে হয় না। পানীয় জলেরও তীব্র অনটন। এলাকার একটা বড়ো অংশে দরিদ্র আদিবাসীদের বাস- যারা কলকাতার শহুরে বাবুদের কখনও দেখতে পেলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দু-দন্ড নিরিখ করে, হয়তো ভাবে অন্য গ্রহের জীব এসে পৌঁছল কি না। কৌতূহল ফুরুতে না ফুরুতে চলে যায় নিজের কাজে। ক্ষুধার অন্ন আর তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে সারাক্ষণ এতই ব্যস্ত, শ্রান্ত আর শঙ্কিত কত থাকতে হয় যে, কৌতূহল দীর্ঘায়িত করারও সময় থাকে না তাদের'।[১৪]

এই রুক্ষ পাথুরে টাঁড়ভূমিতে জলের, খাদ্যের তীব্র অনটনে আদিবাসী মানুষদের বেঁচে থাকার মূল যেন হাঁড়িয়া। তিন-চার কিলোমিটার পথ হেঁটে প্রচন্ড গরমের দাবদাহে আদিবাসীদের পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। প্রশাসনের উদাসীনতা, অগ্রাহ্যতা, গ্রামের উচ্চবর্গীয় মানুষদের দ্বারা বঞ্চনার শিকার এই আদিবাসী মানুষগুলো। গল্পের এই রুক্ষ টাঁড় বাংলার পটভূমির মধ্যে দিয়ে আদিবাসী জনজীবনের রুক্ষ নির্মম বাস্তব এবং সমাজ-প্রশাসনের ভাবসত্য উন্মোচিত। গল্পের এই রুক্ষ পটভূমিতেই প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের কঠোর জীবনসত্য উদ্ভাসিত।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলোচনাচক্র' গল্পের পটভূমি কুসুমডিহি গ্রামের একটি আদিবাসী সমাজকেন্দ্রিক আলোচনা সভা। যে সভায় শহর থেকে নামকরা লেখক, আদিবাসী বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, জেলা অফিসার আরও নানান নামী ব্যক্তিরা আসে এবং ভুরিভোজ করে ও আদিবাসীদের দুর্দশা দূর করার নানা মিথ্যে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় কিন্তু পরিণাম শূন্য। গল্পের শেষে এই লোক দেখানো

সভ্যসমাজের, প্রসাশনের দরদ আদিবাসীদের প্রতি, এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ঈশানচন্দ্র দিগারের প্রতিবাদ যেন গোটা আদিবাসী সমাজের প্রতিবাদ। এই আলোচনাচক্রের মাধ্যমেই একদিন যেমন মিথ্যে প্রতিশ্রুতির চিত্র উপস্থাপিত তেমনি আদিবাসীদের ঘুরে দাঁড়ানো, তারাও যে মিথ্যেটা উপলব্ধি করতে পারছে, তদের দমিয়ে রাখা যাবে না তা স্পষ্ট। এই গল্পের পটভূমি কাহিনি বিন্যাসে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'পাতালের মুখ' গল্পের পটভূমি শুকনো ক্যানেল ও তার দুপাশে সবুজ ধানের গাছ। গল্পে অর্জুনের মতো আদিবাসীদের প্রখর দাবদাহে জলের সংকট, যা এর আগে তপন বন্দোপাধ্যায়ের 'হাঁড়িয়ার দেশের কবিতা' গল্পেও পাওয়া যায়। এক ফোঁটা জলের জন্য তীব্র হাহাকার, পিপাসার তীব্রতা পরিস্ফুট করতে গল্পে উপযুক্ত পটভূমি রচনা করা হয়েছে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'রেখে আসা' গল্পের পটভূমি পুরুলিয়া এবং বাঘমুন্ডি ও পুরুলিয়ার গ্রাম্য পটভূমি। গল্পে কলকাতা থেকে শহুরে মানুষদের পুরুলিয়ায় আসা এবং অযোধ্যা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামে ভ্রমণের কাহিনি বর্ণিত। শহুরে মানুষদের ক্ষণিকের জন্য গ্রামে আসা ও আদিবাসী মানুষদের প্রতি নকল দরদ, তাদের সংস্কৃতি জানার শহুরে আধুনিক মানুষদের মনোভাব। কথক ও কথকের স্ত্রী মনোভাব, মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক গল্প বিষয়ের সঙ্গে গল্পের পটভূমি নির্মাণ এ গল্পে শিল্পসার্থক।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কল' গল্পে আদিবাসী জনসমাজ, তাদের জীবনযপন, সংস্কার, খাদ্যাভাস, নিয়ম-কানুন এই সবকিছুর গ্রাম্য পটভূমিতে আবর্তিত। কোড়া জনজাতির জীবনযাপন, খাদ্যাভাস, তাদের সংস্কার এবং শেষ পর্যন্ত এই খাদ্যাভাসের কারণে জীবনবিপন্নতা ও সুবলের বিপদের কথা গল্পে বর্ণিত, এই সবকিছু গ্রাম্যপরিবেশে, আদিবাসী গ্রামেই হয়ে থাকে। অন্য পটভূমি হলে গল্পের শিল্পরস বেমানান হত।

অমর মিত্রের 'ভারতবর্ষ' গল্প (নামান্তর 'আত্মাপাথর) এবং 'দানপত্র ১' গল্প দুটিতে ভূমিহীন আদিবাসী মেহনতি মানুষগুলির অসহায়তার কথা, বঞ্চনা-শোষণ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা ভিন্ন ভঙ্গিতে ভারতের আবহমানকালের চালচিত্রের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়েছে গ্রাম্য পটভূমিতে। আদিবাসীদের বসতি মূলত বনাঞ্চলে, গ্রাম্য পরিবেশে। ফলত তাদের বেশিরভাগ গল্পের কাহিনি ভিন্ন হলেও পটভূমি গ্রামকেন্দ্রিকই। 'ভারতবর্ষ' গল্পের পটভূমি গোপীবল্লভপুর থানার মহুলবনি অঞ্চলে দুটি গল্পেই

আদিবাসীদের বাস্তুহারা হবার কাহিনি, পাশাপাশি 'দানপত্র'-তে দানপত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধের কাহিনি গ্রাম্য অরণ্য পটভূমিতে চিত্রিত।

নলিনী বেরার 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পের পটভূমি গ্রাম এবং শহর দুই-ই আছে। কিন্তু গল্পের মূল কাহিনি আবর্তিত গ্রামকেন্দ্রিক আদিবাসী মানুষদের কুসংস্কারকেন্দ্রিক ও অ-আদিবাসী যুবকের আদিবাসী এক নারী সুনির প্রতি মনোভাব ও তার পরিণতি ঘিরে। আদিবাসী নারীরা তাদের সমাজের মানুষ দ্বারা কতটা লাঞ্ছনার শিকার তা বর্ণিত শহুরে ডাক্তারি পড়তে আসা কথকের কথায়।

নলিনী বেরার 'খোরপোষ' গল্পের কাহিনিও গ্রাম্য পটভূমি ও আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতিকেন্দ্রিক। গল্পের কথক অ-আদিবাসী, তাদের বাড়িতে সুনা এবং তার পরিবার বংশপরম্পরায় চাষের কাজ করে। গল্পের শেষে কথক শহরে চলে আসার পর হঠাৎ যখন জানতে পারে সুনা সাঁওতাল অসুস্থ, কথক তার বাড়ি গিয়ে তার অসহায়তা দেখে সুনাকে মালিকপক্ষের বাড়ি থেকে খোরপোষ দাবি করতে বলায় সুনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। গল্পে গ্রাম্যপটভূমিতেই আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী মানুষদের সহাবস্থান এবং সুন্দর সহানুভূতির সম্পর্ক, তাদের লোকসংস্কৃতি, সুনার মনস্তত্ত্বের বিন্যাস সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত।

নলিনী বেরার 'ঝরাপালকের জাদু' গল্পের পটভূমি ডাঙাসাহি গ্রামের বুধন মুর্মুর বাড়ি। গল্পে বুধন মুর্মু মিলিটারি, তাই তার কথকের কাকা পুলিশ অথবা মিলিটারি বা হোমগার্ডের চাকরির টিপস্ নিতে বুধন মুর্মুর বাড়িতে আসে। সেখানেই শহর থেকে বুধনের আনা লাল-নীল-হলুদ রঙের বোঁদে বুধনের মা সানন্দে গ্রামবাসীদের খাওয়াচ্ছে। সেখানেই বুধনের মা'র ঝরাপালকের গল্পকথা ছোট কথকের মনে নানারকম কল্পকাহিনির উদয় ঘটায়। গল্পে আদিবাসীদের লোককথার পাশাপাশি সময়ের বদলের ছবি মূর্ত।

নলিনী বেরার 'টি.আই. প্যারেড' গল্পের কথক এবং তার স্ত্রী কলকাতা থেকে সপরিবারে তার গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রামে আসে, তার জেঠতুতো দাদা সতীশচন্দ্রের শ্রাদ্ধের জন্য। কথকের এবং কথকের স্ত্রীর চোখে ঝাড়গ্রাম, জঙ্গলমহল ও আদিবাসী জনজীবন এর চিত্র প্রস্ফুটিত। গল্পে এই গ্রাম্য পটভূমিতে আদিবাসী মানুষদের লোকসংস্কৃতি, উৎসব, বেদিয়াদের জনজীবনের টুকরো চিত্র এবং শহুরে মানুষরা আদিবাসী গ্রাম সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে তা সুবর্ণিত।

নলিনী বেরার ‘চারআনা আটআনার প্রেম’ গল্পে লোধা সাঁওতাল মেয়েদের নিয়ে কৈশোর বয়সে কথক ও তার বন্ধুদের মনের রোম্যান্টিসিজম এবং এর পাশাপাশি আদিবাসীদের উৎসবের চিত্রও গ্রামপটভূমিতে বর্ণিত।

সৈকত রক্ষিতের ‘আঁকশি’, ‘পাঘা’, ‘মাড়াই কল’ গল্পগুলির প্রতিটি গ্রাম্য পটভূমিতেই লেখা। আঁকাশি গল্পের পটভূমি অরণ্যে ঘেরা গ্রাম। লোকালয় থেকে দূরে প্রায় মাঝজঙ্গলে আদিবাসী সাঁওতালদের বাস। এই জঙ্গলে বাস হলেও আদিবাসীরা তাদের জীবিকা বির্বাহ করতে গ্রামে গ্রামে যায়। গল্পে আদিবাসী জনজীবনের পাশাপাশি রাতারাতি জঙ্গল সাফ হয়ে যাওয়ার চিত্র গল্পে লিপিবদ্ধ। মাগাঁরাম, তার স্ত্রী, ছেলেদের নিয়ে জীবিকার জন্য অবস্থাপন্ন ঘরে গিয়ে সেখান থেকে শিমুল ফল নিয়ে আসা, তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী অনাহার এবং এত কষ্টের মধ্যেও ক্ষুদ্রতম বিষয়েও তাদের আনন্দ। এইসব কিছু একেবারে সুন্দরভাবে গল্পের পটভূমির বিন্যাসে বর্ণিত। গল্পে গ্রাম্য লোকালয় ও অরণ্যের মাঝে আদিবাসীদের জীবনচর্যা এই দুই পটভূমি বিন্যাসে গল্পের বিষয় শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে।

সৈকত রক্ষিতের ‘মাড়াই কল’ গল্পের পটভূমি পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেকে কুঞ্জ এবং চেপুলালদের গরুর গাড়িতে করে বাড়িতে ফেরার পথ ও কুঞ্জর গুড় তৈরির জায়গা আঁখশাল। এখানে কুঞ্জ ও জঙ্গলে থেকে ‘জংলী’র মতো হলেও কুঞ্জ তা হতে পারে নি। গল্পে কৃষিভিত্তিক আদিবাসী জীবন ও তাদের জীবনের মন্ত্রই যেন কষ্ট সহ্য করে জীবনযাপন। চেপুলালের ট্র্যাজিক পরিণাম, পাহাড়ি গ্রাম্য পটভূমিতে আদিবাসী নির্বিবাদী-অসহায় জনজীবন সুসংগতভাবে চিত্রিত।

সৈকত রক্ষিতের ‘পট’ গল্পে গুহিরাম পাইট্‌করের জীবনচর্যার চিত্র চিত্রিত। আদিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরবর্তী পটচিত্র নিয়ে লোকসংস্কার আছে। সে লোকসংস্কার ও পটকার বৃত্তির যে শিল্প নৈপুণ্য তা দারিদ্র্য ও অনটনে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এই পটকার বৃত্তি যারা করে তারা তাদের বাসস্থান কাউকে বলে না, এছাড়াও গল্পে আরও আদিবাসীদের নানান লোকসংস্কারের কথা পাওয়া যায়। গ্রাম্য পটভূমিতে ভ্রাম্যমান পটকর জীবন বৃত্তির চিত্র পরিস্ফুট করতে এই পটভূমি সঙ্গত।

আদিবাসী জনজীবন তাদের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে গ্রাম্যপটভূমিই সৈকত রক্ষিতের ‘মূলুন’ গল্পের শুরু মানবাজার শহুরে পটভূমি দিয়ে কিন্তু গল্পের কাহিনি বিন্যাস মূলত গ্রাম্য পটভূমিকেন্দ্রিক।

দুয়ারা মাঝির মানবাজারের শহরের 'মটর গাড়ি'র সফর করার ইচ্ছা, শহরের পাকা রাস্তা, দোকানপাট দিয়ে গল্পের শুরু। এই শহরেই গ্রামের অধিবাসীরা গোরু-ছাগল বাঁধার দড়ি, পদ্মমূলের আঁটি কিংবা কুসুমের বিচি–ঋতুভেদে যখন যা পায় তাই বিক্রি করতে যায়। দুয়ারা মাঝির স্ত্রী আদরিও সেইভাবেই সংসার চালানোর চেষ্টা করে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে প্রকৃতি যখন তার সন্তানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় দুয়ারার ন্যায় অন্য আদিবাসী মানুষদেরও অনাহারে দিন কাটে। পুকুরের মূলুন রসালো পদ্মমূল, যা খেয়ে ও হাটে বিক্রি করে তাদের দিন চলে, তাও যখন না পাওয়া যায় সেই নিদারুণ অসহায়তার, অনাহারের গল্প চিত্রিত গ্রাম্য পটভূমিতে। গল্পের পটভূমি যদি গোবিন্দপুর মাঝি সাঁওতালদের গ্রাম না দেখানো হত তবে গল্পবিষয়ের সঙ্গে মানানসই হতনা।

সৈকত রক্ষিতের 'রাঙামাটি' গল্পে আদ্যপান্ত আদিবাসী মানুষদের অশিক্ষা, অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বর্ণিত। এই কুসংস্কার, অশিক্ষার কারণে, সামান্য সন্দেহের বশে বনমালী ও সঞ্চারিনীর মতো মানুষদের বারবার সমাজ নিঃস্ব করে তার বিষদাঁত দিয়ে।

> 'সামনে টিলা আর পিছনে পাহাড়- এই দুইয়ের মাঝে সাঁওতালদের গ্রাম রাঙামাটি। ... এই কুড়ি-বাইশ ঘরের শ-দেড়েক উপজাতি যেন অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব জীবনের জন্য লোকালয় থেকে সরতে সরতে এই দূরে এসে তাদের বসতি গড়েছে'।[১৫]

শিক্ষাহীনতার কারণে আদিবাসীদের এই সমস্ত অযৌক্তিক সংস্কার, ডাইনি সম্পর্কিত নানা অন্ধবিশ্বাস, মানুষের মনে অজ্ঞতার যে বীজ গভীরে প্রোথিত হয়েছে সেক্ষেত্রে এই লোকালয় থেকে দূরে অর্থাৎ সভ্যতার আলো থেকে যোজন দূরত্ব পটভূমি সুসঙ্গত।

সৈকত রক্ষিতের 'শবরচরিত, গল্পের পটভূমি–

> 'ভেলাই ডাঙা আসলে কালাপতি গ্রামেরই একটি টোলা। বোরো-র দিক থেকে এই গ্রামে আসার পাকাপাকি কোনো পথ নেই। ... তারা নিজেরাই যাতায়াতের সুবিধামতো একটা দুর্গম সড়ক বানিয়ে নিয়েছে। বর্ষার খালডোবা আর জোড়ের জলে তা-ও হারিয়ে যায়।

... পাশাপাশি বড়োজোর দুটো মানুষ হাঁটতে পারে, শহরে 'জিপগাড়ি' জঙ্গল পরিবৃত সাঁওতাল শবরদের গ্রামগুলোতে ঢুকত পারে না'।[১৬]

গল্পে উক্ত গ্রাম মূল লোকালয় থেকে দূরে জঙ্গলের পাশে নির্জন আদিম ভূখন্ডের ন্যায়, এই গ্রাম্য পটভূমিতে সাঁওতাল, শবর আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনযাপন, তাদের অসহায় চিত্র গল্পে বর্ণিত।

সৈকত রক্ষিতের 'উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা' গল্পে গ্রাম্য পটভূমিতে আদিবাসীদের নানান সংস্কৃতি, সংস্কারের চিত্র লিপিবপদ্ধ। গল্পে আদিবাসীদের নানান উৎসব-পরবের মধ্যে দিয়ে, নানান আদিবাসীদের জীবনচর্যার দিক, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান ফুটে উঠেছে। গ্রাম্য পটভূমি ব্যতীত অন্য কোনো পটভূমিতে গল্পে আদিবাসী সংস্কৃতি যে রূপায়ণ ঘটেছে তা সার্থকতা পেত না।

সৈকত রক্ষিতের 'উৎখাতের পটভূমি' গল্পের নামকরণেই গল্পের প্রেক্ষিত ও পটভূমি বর্ণিত। এই গল্পে প্রথমাংশের পটভূমি জঙ্গলের মধ্যে এবং দ্বিতীয়াংশের পটভূমি গ্রাম্য পটভূমি। সিমতি বেসরা নামক আদিবাসী মেয়ে যে তার গ্রাম থেকে অভিশপ্ত ও ডাইনি সাব্যস্ত হওয়ায় সে গ্রাম থেকে জঙ্গলে পালিয়ে এসে একাকী বাস করতে থাকে। পরে সেই গ্রামেরই ছেলে মাড়োয়া গোপনে তার সাথে সম্পর্ক রাখলে গ্রামবাসীরা জেনে গেলে তদের দুজনকে বিপুল পরিমান অর্থ জরিমানা করে। কিন্তু জরিমানার কথা মেনে নিলেও গ্রামবাসীরা মাড়োয়া ও সিমতিকে বিয়ে করে এই গ্রামে একসাথে থাকতে দিতে চায় না তাদের ভুল বিশ্বাস ও সংস্কারের কারণে এবং কিছুটা ইচ্ছাকৃত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া। সমাজের এই অন্যায় মেনে না নিয়ে রাতের অন্ধকারে মাড়োয়া তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে, সিমতিকে নিয়ে এই আদিম ভুখন্ড ছেড়ে অন্য আর এক অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। এক্ষেত্রে মাড়োয়া ও সিমতির উৎখাতের পটভূমি নিরীখে এই গ্রাম্যপটভূমি চিত্রণ অনিবার্য।

সৈকত রক্ষিতের 'বশীকরণ' গল্পের পটভূমি কুটনী নামক সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম। মানবাজারের পশ্চিমে কুমারী নদীর পরে মাহাত, ভূমিজ, লোধা, শবর, সাঁওতালদের গ্রাম। গল্পে হংসর দুটি স্ত্রী, যা আদিবাসী সমাজে সচরাচর দেখা যায় না। এই দুই স্ত্রীর বিবাদ, তা থেকে অচলার মানসিক রোগ ও হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়া। কিন্তু সমাজের প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষগুলোর মধ্যে শিক্ষার আলো না থাকায় তারা কোনো কিছু খারাপ বা অসংগতির অর্থই ডাইনি, এছাড়াও আরও নানান অন্ধবিশ্বাস ও

কুসংস্কারকে মনে স্থান দেয়। এদের মনের এই অন্ধবিশ্বাস থেকেই অচলার হিস্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা না করিয়ে তারা ভেবে নেয় তার দেবীর ভর হয়েছে। গ্রাম্য পটভূমি বলেই তারা এতটা অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এক্ষেত্রে গল্পকার সঙ্গতিরক্ষা করেই পটভূমি নির্মাণ করেছেন। একইভাবে 'ছল' গল্পের পটভূমি পাহাড়ি গ্রামে আদিবাসীদের প্রচলিত 'ডাইনি' বিষয়ক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, অযৌক্তিকতার, অশিক্ষার বেড়াজালে আদিবাসী নারীদের জীবন যে কতটা অসহনীয় তা চিত্রিত। এই মনোভাবপোষণ সভ্যতার আলো থেকে দূরে অবস্থিত, বলা চলে শিক্ষার আলো থেকে বিচ্ছিন্ন জগৎ, এমন পটভূমি নির্মাণই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গল্পের পরিণতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।

সৈকত রক্ষিতের 'বয়ার কাড়া' গল্পে আদিবাসীদের 'কাড়া লড়াই', মোষে-মোষে লড়াই এর খেলা এবং অনাহারে থাকা আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি ও এই কাড়া লড়াই এর উৎসবের আনন্দ, একদিন ভরপেট খাবার খেতে পাওয়া, তাদের জীবনাচরণের কথা গল্পে বর্ণিত। গল্পের বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই গল্পের যে পাথুরে পিয়ারশোল গ্রামের পটভূমি সুচিত্রিত।

সৈকত রক্ষিত 'যশোমণি মুর্মু' গল্পের পটভূমি সভ্য জগত থেকে বহু ক্রোশ দূরে-

> 'গভীর জঙ্গল আরও গভীরে। সেদিকে যাওয়ার কোনো পাকা সড়ক নেই। শহরে মানুষদের কাছে সে যেন এক দুর্ভেদ্য রহস্যময় ভূমি। সেখানে যত আদিবাসীর বসবাস। সাঁওতাল শবর, মুন্ডা, ভূমিজ। সভ্যতার আলো থেকে তাদের জীবন শত ঢের দূরে। তারা গতর খাটানো জংলি মানুষ। প্রকৃতি নির্ভর তাদের বেঁচে থাকা বড়োই নির্মম'।[১৭]

আদিবাসীদের বাস মূলত সভ্যসমাজের থেকে দূরে জঙ্গলে কাছাকাছি অঞ্চলে বা গভীর অরণ্যেই। বেশীরভাগ গল্পেই আদিবাসীদের বাসস্থান, তাদের জীবনসংগ্রামের চিত্র পরিস্ফুট। গল্পের এই পটভূমির মধ্যে দিয়ে যশোমণি মুর্মু ও আদিবাসী মানুষদের জীবনের কঠিন সংগ্রাম বর্ণিত।

অনিল ঘড়াই এর 'বীজ' গল্পের পটভূমি পাহাড়ি এলাকার গ্রাম। পাথুরে মাটিতে বছরে সময়মতো বৃষ্টি না হলে তারা বীজ রোপন করে মাঠে সোনার ফসল ফলাতে পারে না। এই গল্পের গমিয়া ও সামারু বুড়া অশিক্ষা, হিংসা-দ্বেষ, আদিবাসী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। গমিয়া আদিবাসী হয়েও সে

তার মননে কুসংস্কারকে জায়গা না দিয়ে সরকারী বীজ দিয়ে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের জমিতে ধানরোপন বীজবপন করে। গ্রামের মুখিয়া তাকে মেরে ফেলতে চাইলে সামারুবুড়া তার প্রতিবাদ করে। গল্পের পটভূমি সঙ্গে গল্প বিষয়ের বুনন অটুট ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অনিল ঘড়াই এর 'উরাংগাড়া' গল্পের পটভূমি নদীকেন্দ্রিক গ্রাম্য পটভূমি। গল্পের শহুরে আধুনিক মানুষ স্নেহময়ের সাথে আদিবাসী মেয়ে বুদ্‌নীর এবং স্নেহময়ের স্ত্রী সায়ন্তনীর মনস্তত্ত্ব কেন্দ্রিক কাহিনি বর্ণিত। গল্পে স্নেহময়, সায়ন্তনী, ভাকুয়া ও বুদ্‌নীর এবং বুদ্‌নীর স্বামীর মনস্তাত্ত্বিক স্তরীয় বিন্যাস প্রাধান্য পেয়েছে। নদীর ন্যায় মানুষের জীবনও আপন ধারায় বহমান, গল্প বিষয়ের সঙ্গে গল্পে নদীকেন্দ্রিক পটভূমি যেন একই স্রোতে মিশে গেছে।

অনিল ঘড়াই এর 'হাতিছাপ' গল্পের পটভূমি পাহাড়ি গ্রাম-

> 'নদী পেরিয়ে এলেই হেলে সাপের মত রোগা একটা গ্রাম, গ্রাম যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হয়েছে আমুনী ধানের মাঠ। বুক চিতানো মাঠের শেষে সার সার পাহাড়, পাহাড়ের পাদদেশে শাল, মহুয়া, ঘোড়ানিম আর কুসুম করণের জঙ্গল'।[১৮]

এই গ্রাম্য পটভূমিতে আদিবাসী মানুষদের জীবনচর্যা, তাদের লোকসংস্কৃতি ও পেশার কথা বর্ণিত। আদিবাসী গোষ্ঠীর বয়স্ক মানুষ ভীমা সর্দার, যে হাতির পায়ের ছাপ নকল করে আঁকতে পারায় বহু গ্রামের মানুষের কাছে সে সমাদৃত। গল্পে দেখা যায় আদিবাসীরা সময়ের সাথে সাথে তাদের অধিকার, প্রাপ্যটুকু বুঝে নিতে চাইছে, সরকারের থেকে আদায় করে নিতে চাইছে। আদিবাসীদের ধীরে ধীরে আদিমতার গহ্বর থেকে আলোর পথে উত্তরিত হওয়ার ইঙ্গিত লভ্য।

অনিল ঘড়াই এর 'পুনশ্চ পরশুরাম' গল্পের পটভূমি গ্রাম্য পটভূমি। আদিবাসীদের অশিক্ষা, কুসংস্কার এর বেড়াজাল কতটা প্রাণঘাতী এই গল্পে বর্ণিত। গল্পের শেষে ভীষণনাথ এর মঙ্গলা গুণিনকে হত্যা করার মধ্যে যে প্রতিবাদ, যে ঘুরে দাঁড়ানো, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের মোহভঙ্গ তা গ্রাম্য পটভূমিতে সুরচিত।

অনিল ঘড়াই এর 'নুনা সামাডের গল্প' এর পটভূমি সিংভূমের চাঁইবাসা ও আদিবাসী গ্রাম কুজু। গল্পে শাসকশ্রেণি ও অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত আদিবাসীদের উপর হওয়া শোষণের গল্প চিত্র বর্ণিত। অ-আদিবাসীদের মানুষদের মনে আদিবাসীদের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করে, তারা কীভাবে এই অসহায় মানুষগুলোকে ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করে, তাদের পৈশাচিক উন্নাসিকতার প্রমাণ এই গল্প। গল্পের পরিণতিতে আদিবাসীদের মনে অ-আদিবাসীদের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত তাতে সভ্য ক্ষমতালোলুপ মানুষদের বুকে বিষাক্ত জ্বালা ধরিয়ে দেয়। গল্পে গ্রামের শোভার পাশাপাশি আদিবাসী মানুষদের জীবনাচরণের যে সরলতা বর্ণিত, তা গল্প পটভূমি সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নুনা সামাডের মতো মানুষরা, আদিবাসীরা গ্রামের বলেই তারা শহরের লোকদের ধূর্তামিগুলো বুঝে উঠতে পারে না। প্রকৃতির সরলতার ন্যায় তারা সহজ সরল, তারা গ্রামের বলেই তাদের কথকের কাকা-বাবার মতো লোকেরা অনায়াসে ঠকিয়ে নেয়।

অনিল ঘড়াই এর 'টিকলি' গল্পের পটভূমি বিহারের আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়ী জায়গা সেখানকার রেলের কোয়ার্টার। টিকলির এবং চাঁদমনির জীবনের নিষ্ঠুরতার রূপায়ণের ক্ষেত্রে আদিবাসী গ্রাম ও আদিবাসী মানুষদের সংস্কার, নিষ্ঠুরতা, এক পিতার বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতাকে ফুটিয়ে তুলতে পটভূমি উপযুক্ত। টিকলির জন্ম যে গ্রামে, সেই গ্রামেই তার প্রতিবাদ এবং মৃত্যু, কিন্তু কথক ও কথকের স্ত্রী পরমার কাছে তার বেড়ে ওঠা, তার প্রতিবাদী সত্তা গঠনে, এই দুই পটভূমি বৈচিত্র্যে টিকলি চরিত্রটি গভীরতা পেয়েছে।

অনিল ঘড়াই এর 'আকাশ মাটির খেলা' গল্পের পটভূমি- রাঁচির চাইবাসার অনতিদূরের পাহাড়ের কোল ঘেষে, জঙ্গলে ঢাকা, বুনো নদীর তীরের গ্রাম। পাথুরে রুক্ষ্ম মাটিতে চাষাবাদ হয় না, পেটের দায়ে সুদামার মতো মানুষদের গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হয়। গল্পে প্রান্তিক জনজীবনের কথা, কাজের জন্য গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি দেওয়া এই সহজসরল মানুষদের জীবন বর্ণিত। গল্পের সুদামা গ্রাম ছেড়ে মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে জীবিকার তাগিদে পাড়ি দেয়। সুদামা, কুনু ও বাসমতির ত্রিকোণ প্রেমের ও কুনুর পরিণতি চিত্র এই ইটভাঁটায় চিত্রিত। গল্প বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গল্পের বিচিত্র পটভূমি পারম্পর্যে সুঅন্বিত।

৫.ক|২- কোলিয়ারি অঞ্চল কেন্দ্রিক পটভূমি:

বিভূতিভূষণের 'কয়লাভাঁটা' গল্পের পটভূমি পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে ঘেরা কয়লাভাঁটা। মাঠাবুরু পাহাড় ও তার অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এই গল্পে কয়লাভাঁটিতে কাজ করা আদিবাসী মেয়েদের কিছু টুকরো

চিত্র, তাদের কর্মজীবনে কঠোর পরিশ্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই পার্বত্য অঞ্চলে সরলা অরণ্যবালাদের জীবনযাপন, তাদের পেশা এই পটভূমির সাথে নিবিড়সূত্রে আবদ্ধ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাসের ফুল' গল্পের পটভূমি রানীগঞ্জের কয়লা খাদান। কয়লাখাদানে কাজ করা আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন কতটা বিপর্যস্ত, কতটা মূল্যহীন, অনিশ্চিত তা গল্পে বর্ণিত। কোলিয়ারির মালিকদের নিজেদের স্বার্থে, অবহেলায়, অযত্নে অভ্যস্ত ঘাসফুলের ন্যায় সহজসরল মানুষগুলোর জীবন শুকিয়ে যায়, অকালেই ঝড়ে পড়ে। গল্পে চুড়কীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকদের ট্র্যাজিক পরিণতি, বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গল্পের এই কয়লাখাদান পটভূমির রূপায়ণ সার্থক।

রমাপদ চৌধুরীর 'ঝুমরাবিবির মেলা' গল্পের পটভূমি কোলিয়ারি অঞ্চল। শানাশালাই, মহুয়া ও আমলকির গভীর জঙ্গলে ঘেরা ছোট সাঁওতালি গ্রাম। ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি অঞ্চল অবধি। মাঝে আছে সোনাতুলসী নামক নদী। ঘন জঙ্গল ও ছোট ছোট টিলার কোলে অবস্থিত 'সোনাডি' নামক তুড়ুক সাঁওতালদের গ্রাম। গল্পে যে অরণ্য ও পাহাড় ঘেরা গ্রাম্য কোলিয়ারি অঞ্চলের পটভূমি বর্ণিত, তা গল্পের বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই চিত্রিত। সোনাতুলসী নামক নদীটিও গল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাহাড় ও জঙ্গলে বসবাসকারী উপজাতি কিছু মানুষের জীবনচিত্র বর্ণিত। তারা কতটা সংস্কারাচ্ছন্ন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও এই মানুষগুলোর জীবন সভ্যতার আলো থেকে দূরে, এখনো কতটা পিছিয়ে, তাদের জীবনবীক্ষা রূপায়ণে ময়নাগড়-বরকাডিহি এলাকা অঞ্চলের এই পটভূমি গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিঃসন্দেহে মানানসই বলা যায়।

রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'উত্তরা' কেন্দ্রিক লেখকরা বাংলাসাহিত্যে এক নতুন জীবনদর্শন, নবধারার সমাজজীবন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্য সৃজনে উদ্যোগী হন। এই নব্য সাহিত্যচেতনার অন্যতম পুরোধা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। আগেই বলা হয়েছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পেই প্রথম ভারতের, পশ্চিমবাংলার আদিবাসী মানুষ, তাদের নিবিড় জীবনচর্যা গল্পের মূল বিষয় হয়েছে। বলা যায় আদিবাসীদের বাংলা মূল সাহিত্যে প্রবেশ করানোর পথিকৃৎ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি', 'রাঙাশাড়ি', 'পৌষ-পার্বণ', 'সব ভুতুড়ে', 'মা', 'ঝুমরু', 'রেজিং রিপোর্ট', 'বলিদান', 'প্রতিবন্ধক' গল্পগুলির মূল পটভূমি কয়লাকুঠি। কয়লাখাদের আদিবাসী শ্রমিকদের

জীবনযাপন, প্রেম-ভালোবাসা, ক্ষোভ-হিংসা, লোভ-লালসা, শ্রমের রাজনীতি এই সবকিছুই এই গল্পগুলির মূল উপজীব্য বিষয়।

লেখকের ‘রাঙাশাড়ি’ গল্পের পটভূমি মজরো কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলিধাওড়া। এই পটভূমিকে ঘিরে লুটন-লুটনীর প্রেম, লুটনের কয়লাচুরি করতে গিয়ে দুটো হাত অকেজো হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার লুটনীর জীবন থেকেও বাতিল হয়ে যাওয়া চিত্রিত। প্রেমিকাকে তার মনের মতো রাঙাশাড়ি কিনে দেবার জন্য বেশি পয়সা উপার্জনের জন্য কয়লাচুরি করতে গিয়েই লুটনের বিপদ। কয়লাখাদানে সর্বত্র বিপদ যেন ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে, মুহূর্তের অসাবধানতাতেই ঘটে যায় বিপদ। লুটনের জীবনের এই বিপর্যয় কেবল তা যেন লুটনের একার নয়, এরকম বহু আদিবাসী যুবকের সাথে ঘটে চলা ঘটনা। সামান্য বাড়তি উপার্জনের আশায় হতদরিদ্র মানুষরা এরকম ঝুঁকি নেয়, কিন্তু ভাগ্যের নিদারুন পরিহাসে তাদের জীবনে আলোর উদয় হয়না। এইক্ষেত্রে গল্পের পটভূমি কয়লাকুঠি সার্থকভাবে চিত্রিত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘পৌষ-পার্বণ’ গল্পের পটভূমি কয়লাকুঠির পৌষপার্বণ। পৌষসংক্রান্তি সাঁওতাল, বাউরিদের জীবনে অত্যন্ত আনন্দের দিন, তাদের পরবের দিন, উৎসবের দিন। এই পৌষপার্বণ ঘিরেই আদিবাসীদের ‘বাঁদনা পরব’ তিনদিন ধরে চলছে। সমাজের প্রান্তিক জাতি বাউরি ও আদিবাসীদের পাশাপাশি সহাবস্থানের চিত্র, আদিবাসীদের উৎসব, তাদের জীবনযাপনকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে কয়লাকুঠির এই পটভূমি সুপ্রযুক্ত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘সব ভূতুড়ে’ গল্পের পটভূমিও কোলিয়ারি অঞ্চল, কয়লাকুঠির ডাক্তারের ভূমিকায় কথক কোলিয়ারিতে কাজ করা আদিবাসী মানুষগুলোর ট্র্যাজিক জীবন পরিণতি দেখাতে ভৌতিক কাহিনির অবতারণা করেছেন। কয়লাখাদে সবসময় কোন না কোন কুলি-মজুর আহত হয়, মারা যায়। এই আদিবাসী, হতদরিদ্র মানুষদের জীবন কতটা বিপন্ন, তাদের জীবনের ট্র্যাজেডির পরিণতির ক্ষেত্রে গল্পের এই পটভূমি তা এই সূত্রে চরম পারম্পর্যে শিল্পসার্থক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘মা’ গল্পের পটভূমি কুলি ধাওড়ার কুঁড়ে। এই গল্পে দেখা যায় দুখনের পুত্র, ভাই সকল কয়লাকুঠিতে কাজ করতে গিয়ে মারা যায়। তার সংসারে কেবল বেঁচে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী পরী। দুখন ভুলবশত তার মেয়েকে লম্পট ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়ায় সেও আত্মহত্যা করে। এই কষ্টে-

দুঃখে-অপরাধবোধে দুখন তার মেয়ের সমতুল্য পরীকে কোনোদিন বিয়ে না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরপর পরীর জীবনকাহিনি সবকিছু আবর্ত এই কুলিধাওড়ার কুঁড়ে ঘরে। দুখনের মনস্তত্ত্ব আবর্ত যে ঘটনার প্রেক্ষিতে তার সাথে কয়লাকুঠির যোগ নিবিড়। দুখন, পরী ও টুরার জীবনের এই স্তরগুলো ফুটিয়ে তোলার জন্য এরকম গ্রাম্য পটভূমিই সুপ্রযোজ্য।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ঝুমরু' গল্পের পটভূমি- রূপসা কয়লাকুঠি, ফরিদপুর জঙ্গল ও লছি সর্দারের বাড়ি। রূপসা কয়লাকুঠির শ্রমিক ঝুমরু, যার প্রেম মতির সাথে। তাদের প্রেমের ঘনিষ্ঠতা হয় ফরিদপুর জঙ্গলে। দুই অরণ্যের মানুষের ভালোবাসায় গভীরতা পায় অরণ্যেই। আবার এখান থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত। ঝুমরু লছি সর্দার ও দাসীর দ্বারা পালিত, দাসী তাকে নিজ সন্তানসম ভালবাসলেও সর্দার কখনও তা ভাবে না। ঝুমরুর অভিমান করে গৃহত্যাগ, দাসীর বিষাদময়তা এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গত রেখে পটভূমি সার্থকতা পেয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পের পটভূমিও কয়লা খাদ, কোলিয়ারি অঞ্চল-

> 'পৌষমাস-পৌষমাসের সন্ধ্যা দূরে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপরে, শালবনের মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল, কিন্তু বড় বড় পত্রহীন দু'একটা গাছের শীরর্ণ ডালপালার মধ্যে অর্ধেকের বেশি দেখা যাইতেছিল না, তথাপি কাটা ধানের মাঠগুলোর উপর কুয়াশার মতো ধূমে আচ্ছন্ন আধ-ফুটন্ত জ্যোৎস্নার হর্ষ-হিল্লোল বেশ একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।
>
> উপরে যখন এই আনন্দ সুন্দরের খেলা, খাদের নিচে তখন কোন এক নিবিড় আঁধার ঘন গুহার মৃত্যুর নগ্ন বীভৎসতা!'[১৯]

কয়লাখাদানের বীভৎসতা, টুইলার মৃত্যু, সোহাগীর বিষাদময় জীবন, চঞ্চলাকুমারের অপরাধবোধ, সাহেবদের বেশি মুনাফালাভের চিত্র- এই সবকিছু, গল্পের সত্যভাব উন্মোচনে, কয়লাখাদানের ষড়যন্ত্রের নগ্ন রূপকে ফুটিয়ে তুলতে গল্প পটভূমি সবিশেষ ও সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বলিদান' গল্পের পটভূমি কোলিয়ারি অঞ্চল। লাকুমাঝি, টগরীর পুত্রসন্তানের মৃত্যু, পরে সাহেবদের চক্রান্তে লাকুর মৃত্যু। স্বামী-পুত্রহারা টগরীর জীবন বিপর্যস্ত কোলিয়ারির

উর্দ্ধতন সাহেবদের জন্য। চরম অমানবিক নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও সাহেবদের লোভ-লালসার শিকার এই মানুষগুলি। আদিবাসী যে মানুষগুলি কয়লাখাদানে কাজ করে তাদের যেন উর্দ্ধতন বাবুরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। তাদের লক্ষ্য একমাত্র মুনাফা, লাভ। গল্পে যে পাশবিক নিষ্ঠুর বর্বরতার চিত্র চিত্রিত তার সাথে গল্পের পটভূমি একাত্মীভূত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'রহস্যময়ী' গল্পের পটভূমিও কয়লাকুঠি। গল্পের শেষাংশের পটভূমি পিয়ারশোল কয়লাকুঠি। এই পটভূমিতেই মইনু'র জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটিত। কয়লাকুঠিকে ঘিরেই মইনু'র জীবন আবর্তিত এবং শেষে তার চরিত্রের রহস্যময়তার উদ্‌ঘাটন। তার চরিত্রও যেন কয়লাখাদানের মতো অতল রহস্যে আবৃত। মইনু চরিত্রের প্রেক্ষিত ও বিষয়বস্তুর ভাবসত্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে গল্পের কয়লাকুঠি পটভূমিই প্রযোজ্য।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিবন্ধক' গল্পের পটভূমি ময়নাবুনি কয়লাকুঠি, সাঁওতাল ধাওড়া। আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন পরিণতি- 'মরিয়াছিল একজন সাঁওতাল যুবক। স্বাস্থ্যবান সুন্দর হইলে কি হইবে, কয়লার খনিতে কাজ করিতে আসিয়া এমন তাহারা প্রায়ই মরে।'[২০] তাদের জীবন কতটা নগণ্য উর্দ্ধতন বাবুদের কাছে এটাই চিত্রিত। কয়লাখাদের শ্রমিকদের জীবনের প্রেম-ভালোবাসা, ক্ষোভ-হিংসা, ত্যাগের কথা লিপিবদ্ধ এই গল্পে। লেখক দেখিয়েছেন ত্রিকোণ প্রেম-ভালোবাসার জন্য দ্বন্দ্ব, স্বেচ্ছামৃত্যু এসবই কয়লাখনির শ্রমিকজীবনের অন্যতম অঙ্গ, এই সত্যকে তুলে ধরতে কোলিয়ারির পটভূমি সার্থকভাবে চিত্রিত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' গল্পের পটভূমি কোলিয়ারি অঞ্চল এবং কয়লার খাদান। এই কোলিয়ারিতেই নান্‌কু ও বিলাসীর দাম্পত্য, প্রেম-সন্দেহ, নান্‌কুর প্রতারণা এবং নান্‌কু ও বিলাসীর জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি, তাদের ভালোবাসা সবকিছুই আবর্তিত। তাদের প্রেমের উন্মাদনা, বিলাসীর নান্‌কুর প্রতি তীব্র ভালোবাসা, জীবনের কঠিন সংগ্রাম ও ট্র্যাজিক পরিণতি কয়লাখাদানের মতোই গভীর, অন্ধকারাচ্ছন্ন। গল্পের পটভূমি জীবনের পরিণতির সাথে মিলেমিশে একাকার।

শৈলজানন্দের 'নারীর মন' গল্পের পটভূমিও কয়লাকুঠি। এই কয়লাখাদানে পীরু, ভুলি ও টুরনীর ত্রিকোণ প্রেম, মান-অভিমান, ঈর্ষা, তাদের জীবনযাপন আবর্তিত। গল্পে টুরনী ও ভুলির একে অপরের

প্রতি গভীর ভালোবাসা, বোনের কথা ভেবে ভুলির আত্মত্যাগ, গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই গল্প পটভূমি চিত্রিত।

রমাপদ চৌধুরীর 'জলরঙ' গল্পের পটভূমিও শালশালাইয়ের বন, পাহাড়ি ঝর্ণা, হরিতকীর বনবেষ্টিত কোলিয়ারি অঞ্চল। কোলিয়ারি অঞ্চলের মাঝে বেনিয়া সিণ্ডিকেটদের চিৎকার, হাজারো শাবল এবং গাঁইতির কোলাহল, আমলকি, মহুয়ার বন। গল্পের মূল পাত্র-পাত্রী, কাহিনির উত্থান-নির্মাণ এই পটভূমিতেই। লেখক গল্পে যে কোলিয়ারি অঞ্চলের পটভূমি রচনা করেছেন সেই কোলিয়ারি অঞ্চল ও সেখানে কাজ করা নারী-পুরুষদের সম্পর্ক, আদিবাসী মানুষদের উপর হয়ে চলা শোষণ, রাজনীতি, শ্রমের ষড়যন্ত্র এই সবকিছুই এই পটভূমিতে আবর্তিত। গল্পের পটভূমি কোলিয়ারি অঞ্চল, কয়লাখাদানকে কেন্দ্র করেই কোলিয়ারির আদিবাসী শ্রমিকদের বিপন্ন জীবন চিত্রিত, জলরঙে আঁকা ছবি যেমন সামান্য অসাবধানতায় নষ্ট হয়ে যায়, তেমনই কোলিয়ারিতে কাজ করা আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনও সামান্য ভুলেই শেষ হয়ে যায়। গল্পের বিষয়ের সঙ্গে পটভূমির এই ওতপ্রোত মেলবন্ধনে লেখকের সুনিপুণ পটভূমি রচনা শিল্পসার্থক।

রমাপদ চৌধুরীর 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পটির পটভূমি 'কারানপুরা, যার আদি নাম কর্ণপুর', কোলিয়ারি গ্রামাঞ্চল। কারানপুরার রামলীলার মাঠ এখানে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গল্পে এই মাঠেই অনুষ্ঠিত হয় আদিবাসীদের উৎসব 'ভিখারিয়ার নাচ'। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই গল্পের কাহিনি আবর্ত। আদিবাসীদের কুসংস্কার, তাদের নিজস্ব আইন-কানুন, অন্যায়-নারী লাঞ্ছনা, সব কিছুই এই পটভূমি কেন্দ্রিক। কেন্দ্রীয় চরিত্রে মন-মনন-মানসিকতা-ক্রিয়াকলাপ সবকিছুর অন্তরালে গল্পের পটভূমি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে।

৫.ক|৩- নগরকেন্দ্রিক পটভূমি:

রমাপদ চৌধুরীর 'ইম্‌লী' গল্পের পটভূমি শহরের ফুটপাত ও স্টেশন চত্বর। গল্পের মূল চরিত্র ইমলী, জাতে বেদিয়া। তাদের বাস ছিল সুন্দরবন, কিন্তু ইজারাদাররা তাদের বাসস্থান-জমি কেড়ে নেওয়ায় উদ্বাস্তু ইমলী ও তাদের পুরো দলের সকলকে শহরে চলে আসতে হয় পেটের টানে। গল্পে শহর ও গ্রাম– এই দুই পটভূমিই পাওয়া যায়। শহরে রাতের অন্ধকারের কালো দিক, ফুটপাথে বসবাসকারী মানুষদের দুর্দশার কথা, যারা গ্রাম থেকে শহরে আসে জীবিকা নির্ধারণের জন্য, তাদের জীবনযাপন, শহরের ভদ্রলোকের

মুখোশধারী মানুষের কদর্য রূপ– গল্পে চিত্রিত শহরের ফুটপাথেই দেখা যায়। বাস্তব তো তখনই প্রকাশ পায় যখন মানুষ রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। লেখক সেই বাস্তবতাকে গল্পে তুলে ধরার জন্যই গল্পে যে পটভূমি রচনা করেছেন, তা সুসঙ্গত।

অসীম রায়ের 'আরম্ভের রাত' গল্পের পটভূমি ১৯৬৭ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারীর ভোট গণনার দিন, গল্পের পটভূমি হিসেবে চিত্রিত। কমিউনিস্ট পার্টির জয় পশ্চিমবঙ্গে। দিনাজপুরে কম্যুনিস্ট পার্টির জয়ে মানুষের উন্মাদনা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গল্পের কাহিনি রচিত। রাজনীতির গভীর ভাবাদর্শ, ত্রুটি এবং এই রাজনীতির জন্য আদিবাসী সহজ মানুষদের প্রাণের বলি এই গল্পে চিত্রিত।

দেবেশ রায়ের 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পের পটভূমি জলপাইগুড়ি সংলগ্ন তিস্তা নদীর উপর বার্নেশ ঘাট ওরফে বার্নেশ শহর। গল্পে উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে তিস্তা নদীর ভয়ঙ্করতার সঙ্গে আদিবাসী রাজবংশী মাঝিরা জীবনসংগ্রাম করে চলে। গল্প বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে চরিত্রদের আভ্যন্তর উন্মোচনে গল্প-পটভূমি গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'মেয়ে ও বেগুন' গল্পে একজন শহুরে মানুষের একটা আদিবাসী মেয়েকে এবং অন্য নারীকে সামান্য বেগুনের সাথে সমগোত্রীয় মনোভাবনা পোষণ, এবং 'প্যারাফিলিক' মনোভাব চিত্রিত। গল্পে বিকৃতি কামমনস্ক ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে প্রথমে দুর্গাপুর থেকে কলকাতা ফেরার পথের রাস্তা এবং কলকাতা শহরের বাড়ির পটভূমিই সার্থক।

অনিল ঘড়াইয়ের 'খরার আকাশ' গল্পের পটভূমি নগরকেন্দ্রিক কলোনির, কলকারখানার বস্তির পটভূমি নুনা মান্ডি ও শঙ্খীর দাম্পত্যজীবন, নুনা মান্ডি যে কলকারখানায় কাজ করত তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের দরিদ্রাবস্থা আর এই দারিদ্রর কবলে পড়েই নুনা মান্ডির কুকুরে কামড়ানো মৃত একটি শুয়োরের মাংস খেয়ে অসুস্থ হয়ে যাওয়া, দারিদ্রে দাম্পত্যে যে খরা এসেছিল, অসুস্থতায় সেই দাম্পত্যে আবার বৃষ্টি নামে, ভালবাসা নতুন করে প্রাণ পায়। গল্পে পটভূমি খুব একটা প্রাধান্য পায়নি। যদি অন্য পটভূমিও রচিত হত তা গল্পের শিল্পসার্থকতায় হানি ঘটাত না।

৫.ঘ|৪- রেলের কামরা ও রেলস্টেশন কেন্দ্রিক পটভূমি

সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পে বিষয়বৈচিত্র্যের ন্যায় পটভূমি বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। 'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পের পটভূমি ট্রেনের কামরা। যে ট্রেনে অসম থেকে সাঁওতাল কুলিরা বাড়ি ফিরছে। এই ট্রেনেই কথকের পূর্বপরিচিত নাটোয়ারলালের সাথে দেখা ও তার বিষয়ে স্মৃতিচারণা করেছে। নাটোয়ার ছিল পূর্বে কোনো রাজনীতির পার্টির মহিলা ইনচার্জ। সেই স্মৃতিচারণা থেকে গল্পের কাহিনি আবর্তিত। এই হঠাৎ সাক্ষাৎ পূর্ব-পরিচিত মানুষের সাথে, স্মৃতিচারণা এই সবকিছুর ক্ষেত্রে রেলের কামরা- এই পটভূমি রচনা সুপ্রযুক্ত।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'রথের তলে' গল্পের পটভূমি ট্রেনের কামরা, বিহারের কাটিহার জংশন, বেবুদপুর গ্রাম। নাট সমাজের সর্দার ভৈরো নাটের নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসা, গৌরব আর এই গৌরব বজায় রাখতেই জমিদার শকুর খাঁকে খুন করে ভৈরো সর্দার। তাঁর চোদ্দো বছর জেল হয়, কিন্তু সে খুশি এই ভেবে যে সে তার জাতের মান-সম্মান, গৌরব রক্ষা করেছে। তাঁর জাত্যাভিমানে, তাঁর স্বপ্নে আঘাত লাগে গল্পের শেষাংশে। নাট সমাজের ভাঙন, ভৈরো সর্দারের জীবনেও বিষাদের ট্র্যাজেডি আনে। চরিত্রের ট্র্যাজেডির সাথে গল্পের পটভূমি চিত্রণ সার্থক ও রসোত্তীর্ণ।

সমরেশ বসু'র 'সহযাত্রী' গল্পের পটভূমি রেলস্টেশন ও রেলের কামরা। শহুরে, চতুর লোকের ট্রেনের সহযাত্রী বেরেলা গাঁর অধিবাসী ছিচরন দিগর। ট্রেনে যাত্রার নানা কাহিনি ও ওই দরিদ্র মানুষটির ভুলবশত ভুল বই কিনে ফেলা এবং অনুশোচনা ও ইতস্তত‌বোধ এই সবকিছু ট্রেনেই সংঘটিত। ট্রেনযাত্রা আমাদের বিচিত্র মানুষেরে সাথে পরিচয় ঘটায়, বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় এক্ষেত্রেও তাই। পটভূমি যদি রেলযাত্রা, রেলেরকামরা না হত তাহলে বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণ ও কথকের অভিজ্ঞতা এরূপ ফুটে উঠত না।

৫.ঙ|৫- পাহাড় ও অরণ্যকেন্দ্রিক পটভূমি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে' গল্পটির পটভূমি ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাস। কথকের ছোটনাগপুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং গল্পে আদিবাসীদের কিছু টুকরো চিত্র পাওয়া যায়। ছোটনাগপুর ঘুরতে এসে কথক চাইবাসা হ্রদের পাশে ছোট্ট গ্রাম বাকৈলায় থাকে এবং সেখানকার প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করে। ছোটনাগপুরের বহু জঙ্গল কথক দেখে থাকলেও গৈলকেরার মতো গভীর জঙ্গল দেখেননি।

প্রকৃতির বিশাল রহস্যময় রূপচিত্র ফুটিয়ে তুলতেই অরণ্য পটভূমির অবতারণা গল্পে। গল্পের বিষয়বস্তুও পটভূমি এক্ষেত্রে মেলেমিশে একাকার।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোতাম' গল্পের পটভূমি ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস, আন্দোলনের সময়, বিহারের পালামৌ জেলার লোহারডগা, দাশপুর, বলিবা প্রভৃতি পাথুরে জঙ্গল এলাকা। বিহারের এই পাথুরে রুক্ষতার সাথে বলিবা গ্রামের পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে যে কোমলতার মিশ্রণ, এই দ্বিবিধ মিশ্রণ এলিশাবা কুই চরিত্রেও প্রকাশিত। রাজনৈতিক জীবনের কঠোরতা যেমন এলিশাবার চরিত্রে পাওয়া যায়, তেমনি বলিবা গ্রামের কোমলতাও চম্পুর চরিত্রের অন্যতম দিক। গল্পের চরিত্রের মেজাজে পুষ্টতা দান করেছে গল্পের স্বতন্ত্র পটভূমি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কয়লাভাঁটা' গল্পের পটভূমি পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে ঘেরা কয়লাভাঁটা। মাঠাবুরু পাহাড় ও তার অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক নৈসর্গ। এই কয়লাভাঁটিতেই আদিবাসী মেয়েদের কিছু টুকরো চিত্র তাদের কর্মজীবনের ছবি পাওয়া যায়। এই পার্বত্য অঞ্চলে সরলা অরণ্যবালাদের জীবনযাপন, তাদের পেশা এই সত্য পটভূমির সাথে নিবিড়সূত্রে আবদ্ধ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' গল্পের পটভূমি পশ্চিমবাংলার বাইরে সিংভূম জেলার পাহাড় জঙ্গলময় স্থান। জঙ্গলে ঘেরা বন্যদেশে রঘুনাথ দাস সাঁওতালী কবির সাথে গল্প কথকের সাক্ষাৎ। এই আদিবাসী কবি, তিনি সংসারের কোলাহল থেকে দূরে বসে নিজের সাহিত্যসাধনা করেন। কবির এমন অনাড়ম্বর, সহজসরল জীবনের সাথে গল্পে প্রাচীন সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গ এসেছে। গল্প পটভূমির সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক একসূত্রে আবদ্ধ। এই পটভূমিতেই কবিসত্তা বিকশিত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যে' গল্পের পটভূমি সিংভূম জেলার বন্য সাঁওতাল গ্রাম মাইনস্-

> 'বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষীণকায়া পার্বত্য নদী হয়তো হাঁটু খানেক জল ঝির ঝির করে বইচে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে। দুধারেই জনহীন বনভূমি, কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল, ঘন ও প্রস্তরকীর্ণ। কত বিচিত্র বন্যপুরূপ, বন্য শেফালির বন। বারবার যাতায়াত করতে করতে ভয় ভেঙে গেল। যখন নিজের চোখে কখনও ভাল্লুক দেখলাম না, বুনো হাতির তাড়া সহ্য করতে হল

না, তখন মনে হল অনর্থক কেন একজন গাইড্ নিয়ে গিয়ে পয়সা খরচ করা! যেতে হয় একাই যাব'।[২১]

অরণ্যের অবর্ণনীয় শোভার মাঝেই লুকিয়ে থাকে বিপদ। গল্পের পটভূমি ও বিষয়বস্তু এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বনফুলের 'তবে কি?' গল্পের পটভূমি দুমকা, দুমকার মান্দার পাহাড়কে কেন্দ্র করে। গল্পে হরিসেবক ও বিলাসের বন্ধুত্ব বিলাসের মনোভাব, মনস্তত্ত্ব, এক প্রতিবাদ চিত্রিত। গল্পে এক আদিবাসী বালকের সাথে হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের রূপের মিলন, ছুত-অচ্ছুতের ভেদাভেদ, সমাজের বিভেদকে মুছে দিয়েছেন লেখক এমনভাবে যা প্রশংসনীয়। গল্পের মূল ভাবসত্য উন্মোচনে, আবহ নির্মাণে গল্পের পটভূমি উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করেছে।

বনফুলের 'বুধনী' গল্পের পটভূমি হাজারিবাগের পাহাড়ি অরণ্যময় অঞ্চল। গল্পে বিল্টুর আদিমতা, তার উদগ্র প্রেম ও ক্রূঢ় জীবন বর্ণনায় এই ভয়ঙ্কর আদিম পাহাড়ি অরণ্য পটভূমি একেবারেই সঙ্গত। গল্পের বিষয়বস্তু এবং চরিত্রের স্বভাব প্রকাশে এই পটভূমি নির্মাণ অনিবার্য।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'সাঁওতাল' গল্পের পটভূমি গ্রাম থেকে কিছু দূরে অরণ্য। এই অরণ্যেই আদিবাসী মানুষগুলোর বসতি। তাদের সেই বসতির উপর জমিদারের নজর। আদিবাসী সাঁওতালদের উপর জমিদারের অত্যাচার, ষড়যন্ত্র করে তাদের ভূমিহীন করা, অরণ্যবাসীদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র, তা এই গ্রাম্য অরণ্যময় পটভূমিতেই সুসংগত।

সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িনু' গল্পের পটভূমি তেঁতুলিয়া মাঠ এবং জঙ্গল ও পাথরের চাটানের গভীর অভ্র খনিজ। তেঁতুলিয়া মাঠের সবুজদের ন্যায় ইরানী বেদেনী রমনীরাও চিরযৌবনা আর জঙ্গল ও পাথরের ন্যায় দিনেশের অন্তরাত্মা। গল্পের পটভূমি শিল্পের দাবি মেনেই এসেছে। গল্পে সারার জন্য দিনেশের বিলাসীর প্রতি নিষ্ঠুরতা যার পরিণামে বিলাসীর আহত হওয়া এবং পরিণামে দিনেশেরও ঠকে যাওয়া- গল্পের এই কাহিনি বিন্যাসে, চরিত্রের স্বরূপ নির্মাণের সঙ্গে একদিকে সবুজ প্রান্তর ও অন্যদিকে পাহাড়, খনিজ রুক্ষতা না থাকলে গল্পের পরিণতি সার্থকতা পেত না।

সুবোধ ঘোষের 'লঘু আরণ্যক' গল্পের পটভূমি দানুয়া ভালুয়া নামক জঙ্গল। গল্পে একাকী আদিবাসী নারীর মধ্যে প্রসাদবাবুর মতো বিত্তশালী মানুষদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস, ভয়ংকরতা চিত্রিত। গল্পে গভীর অরণ্যের পটভূমি চিত্রিত না হলে, গল্পের বিষয়-চরিত্রের এমন আদিমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য হত না।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'সাদা মাকড়সা' গল্পে পাহাড়ী পরিবেশ, চা-বাগানের পটভূমি চিত্রিত। গল্পে চিঠিতে স্মৃতিচারণে এক ইংরেজ ব্যালেন্টাইন, হ্যারল্ড এছাড়াও নাগা, মুন্ডা ও নানান উপজাতিদের কথা গল্প প্রসঙ্গে এসেছে। লেখকের 'তুলাই পাঞ্জার রোয়া' গল্পের পটভূমিও উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জা নামক পাহাড়ি গ্রাম। গল্পে মুসলমান রাভা ও সাঁওতাল জনজাতির কথা চিত্রিত।

সমরেশ বসু'র 'অরণ্যনিশি' গল্পে চিত্রকরের আঠারো দিনের স্বপ্নবিহার। প্রবাসী ব্যবসায়ী মনোমোহনের অতিথি হিসাবে সারেন্ডার অরণ্যে আদিবাসীদের নিকট কথকের থাকার সুযোগ হয়েছিল। গল্পের পটভূমি- 'ভারতবর্ষের অন্যতম সুগভীর বৃহৎ প্রাচীন অরণ্য সারন্দা বিভাগ'।[২২] পাহাড়ে ঘেরা অরণ্য, কোয়েনা নদীর ধার, সভ্যজগৎ থেকে প্রায় বাইশমাইল দূরে গল্পের পটভূমি। কথকের মাঞ্জারীর সাথে প্রেম, আদিবাসী মানুষদের জীবনযাপন, তাদের ব্যবহার এসবকিছু সঞ্জীবিত হয়েছে এই পটভূমিকে কেন্দ্র করে। গল্পটির প্রাণ পেয়েছে সারেন্ডা অরণ্যের পটভূমিতে।

সমরেশ বসু'র 'নির্বাসিতা' গল্পের পটভূমি সমুদ্র সমতল থেকে আড়াই হাজার ফুট ওপরে, সারান্দার বিশাল অরণ্যে। গল্পে কথকের এই গভীর অরণ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়া, এই বিপদে ফরেস্ট বাংলোয় গভীর অরণ্যে বাঙালি মেয়ে যে হেলথ্ সেন্টারের নার্স তার সাথে পরিচয় হয়। এই পার্বত্য অঞ্চল, আদিবাসীদের জীবন এছাড়া রঞ্জনার কথানুযায়ী সভ্যজগতের আগুনে দগ্ধ হওয়ার থেকে এই নিবিড় অরণ্যের শীতলতা অনেক সুন্দর। সভ্যতা একটি মেয়েকে তার যোগ্য সম্মান, ভালো থাকা দিতে পারেনি বদলে এই বনবাসী মানুষগুলো, এই পার্বত্য অরণ্য অঞ্চল রঞ্জনাকে অনেক লাঞ্ছনা-অপমান থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার ভালো থাকা এখন এই অরণ্যকে ঘিরে। এই গভীর অরণ্য, যা সভ্যসমাজ থেকে বহু যোজন দূরে, সভ্যসমাজের সভ্যতা-জটিলতা থেকে দূরে যেখানে রঞ্জনা জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে, পেয়েছে শান্তি। সহজ-সরল আদিবাসী মানুষদের সাথে, রঞ্জনার নির্বাসিত জীবনের সাথে এই পটভূমি একাত্মীভূত।

সমরেশ বসুর 'অস্তিত্ব' গল্পের পটভূমি পশ্চিবঙ্গের বাইরে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল-

> 'নামেই পার্বত্য, এই উত্তর ত্রিপুরার টিলা থেকে পৃথিবীকে একান্ত নবীনা দেখায়।... রক্তান্ত টিলার বুকে অসামান্য রূপসী নানা রঙে শাল, সেগুন ছাতিম মেহগনি, নাগেশ্বর চাম্বুল শিমুল গর্জন, বাঁশবেত সুপারি। উত্তর পুবে চা-কফি বাগান। আনারস-বন এখন বর্ষার মুখ চেয়ে তৃষ্ণার্ত। দূরের আকাশে বড় মুড়া আঠারো মুড়ার ঢেউ। নদীগুলো বহে আসে আসাম, উত্তর ব্রহ্মা থেকে'।[২৩]

এই পাহাড় অরণ্যের মেহেরেশ্বরী দেবতা, দেবতার থান, সন্ন্যাসীকে ঘিরে গল্প, এছাড়া দিবাকর ঘোষের সাথে ত্রিপুরার আদিবাসী রিয়াং মেয়ে মুসোর প্রেম কাহিনি আবর্তিত। গল্পের মূল বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে পটভূমি পরিপূরক সম্পর্কে আবদ্ধ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পের পটভূমি বাঁকড়াঝাড় থানার আন্ডারে অবস্থিত ঝাড়খানি জঙ্গলের আশেপাশের অঞ্চল এবং পুলিশের ক্যাম্প। দ্রৌপদী নকশাল আন্দোলনের গেরিলা যোদ্ধা, সে প্রতিবাদী নারী। সে আদিবাসী হয়ে আদিবাসীর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তার উপর হয়ে চলা অত্যাচার ও দ্রৌপদীর প্রতিবাদ যার সাক্ষী এই অরণ্য। এক আদিম অরণ্যানীর প্রতিবাদের চিত্র, গল্পের মূল ভাবসত্যকে তুলে ধরতে গল্পের অরণ্যকেন্দ্রিক পটভূমি সুপ্রযুক্ত।

প্রফুল্ল রায়ের 'চারদিকে কুয়াশা' গল্পের পটভূমি সাঁওতাল পরগনা, শাল-মহুয়ার ঘন অরণ্য, যেখানে সর্বদাই কুয়াশাচ্ছন্ন আলো-আঁধারী রহস্যময় পরিবেশ-

> 'ভাদ্রমাস হলেও এখানে মেঘটেঘ নেই, তবে কুয়াশা আছে গাঢ় কুয়াশা।... ছোটনাগপুরের এদিকটায় সময়-অসময় নেই, বছরের বারমাসই এখানে কুয়াশা। আজ হয়তো পূর্ণিমা, রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ আকাশের মাঝ-মধ্যিখানে উঠে এসেছে। কিন্তু সেটা স্পষ্ট নয়। চাঁদের আলোর সঙ্গে কুয়াশা মিশে চারদিক ঝাপসা আর রহস্যময় করে রেখেছে'।[২৪]

শহুরে মানুষদের আদিম অরণ্যে ঘুরতে এসে আদিমতার মাঝে হারিয়ে যাওয়া। শহুরে মানুষদের রহস্যময়, আদিমতায় হারিয়ে যাওয়ার যে ভয়, উন্মাদনা সেই মানসিক অবস্থানের সাথে সাদৃশ্য রেখে এই সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ি অরণ্যে ঘেরা অঞ্চলের পটভূমি সুপ্রযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত।

নলিনী বেরার 'বাঘাতঙ্ক' গল্পের পটভূমি আষাঢ়মাসের মাঝুডুবকার জঙ্গল। গল্পে জঙ্গলকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের জনজীবন, জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়, আদিবাসীদের বিপন্ন জীবন এবং প্রতিনিয়ত জীবিকার জন্য তাদের বাঘের সাথে লড়াই ও ত্রিলোচনদের মতো মানুষদের ট্র্যাজিক পরিণতি ফুটিয়ে তুলতে এই পটভূমিই উপযুক্ত।

অনিল ঘড়াই এর 'অরণ্যের জীবন' গল্পের পটভূমি অরণ্যকেন্দ্রিক। লোকালয় থেকে দূরে গভীর অরণ্যের আদিবাসী মানুষদের জনজীবন, মানুষ এবং বুনো পশুদের সহাবস্থান, তাদের জীবনের বিপন্নতা, ভালো-মন্দ মেশানো বিপদসঙ্কুল জীবনযাপন গল্পে বর্ণিত। সোমরা ও গুরুবারির সন্তান মনুয়ার মৃত্যু বুনো হাতির পদদলিত হয়ে, এই ট্র্যাজিক বিষয় এবং গল্পের পরিণতিতে আদিবাসী মানুষ ও পশুর মধ্যেকার যে আত্মিক যোগ দেখানো হয়েছে, অরণ্যের জীবনকে তুলে ধরতে এই পটভূমিই একমাত্র প্রযোজ্য।

৫.খ। গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য

উচ্চবিত্ত সমাজের চাপে গ্রামের চির অবহেলিত, শোষিত-বঞ্চিত আদিবাসী সমাজ, ভূমিদল মানুষ যারা পুরুষানুক্রমে অবহেলিত-নির্যাতিত, রক্তের ঘামে মহাজনের ঋণ শোধ করতে নিঃস্ব সেই চিরবঞ্চিত আদিবাসী মানুষদের আর্তনাদ, তাদের জীবনবীক্ষা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই লেখকদের কলম ধারণ। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে কমবেশী নানারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তেমনই বাংলা ছোটগল্পের জগতেও বিভিন্ন ছোটগল্পকারদের লেখায় চিরবঞ্চিত আদিবাসী সমাজ, সহজসরল আদিবাসী মানুষ, সমাজব্যবস্থা-প্রসাশনের বাস্তব নগ্ন স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে গল্পের বিষয়বৈচিত্র্যে। ১৯২৩-১৯৯০ সময়কালে সময়ের যে অস্থিরতা, যুগযন্ত্রণা, কালান্তরে পরিবর্তিত রূপের চেতনার প্রতিফলন এবং প্রকাশ ঘটেছে বহুমাত্রিক প্রান্তিক জনজাতি জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলিতে। ছোটগল্পের সংজ্ঞাকাররা ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ছোটগল্প 'জীবনের টুকরো।' জীবনের খন্ডচিত্র বা টুকরোচিত্র হলেও এতে আছে বিচিত্র বিষয়ের উদার দাক্ষিণ্যের ধারাস্নান।

সীমিত পরিসরের মাঝে জীবনের নাভিমূল থেকে উঠে আসা গল্পগুলি অভ্যস্ত জীবন আর ভাবনা থেকে পাঠককে এক বিশাল ব্যাপক জীবনের সম্মুখে এনে দাঁড় করায়, যার বেশিরভাগই আমাদের অজানা, অচেনা। যন্ত্রণা জর্জরিত, ক্লান্ত-রিক্ত মানুষের মুখ, রক্তাক্ত মাটি, তুচ্ছ মানুষের জীবন, বিবস্ত্রা রমনী সর্বোপরি অপরিজেয় বিদ্রোহী অগণিত জীবনের প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত গল্পগুলিতে। আমাদের গবেষণাকার্যে নির্বাচিত জনজাতি জীবনাশ্রয়ী বাংলা ছোটগল্পগুলির পর্যালোচনায় দেখা যায় বিভিন্ন লেখকের লেখায় আদিবাসীচেতনার স্বরূপ ও আদিবাসী বিশ্বনির্মাণে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ, কালান্তরে আদিবাসী ভাবনার সামগ্রিক পরিবর্তন এবং ভিন্ন আদিবাসীবীক্ষা। গল্পগুলিতে আদিবাসী মানুষদের ব্যক্তিজীবন, ব্যক্তিসংশয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, তাদের দাম্পত্য-প্রেম-পরকীয়া-মনস্তত্ত্বের নানান দিক এছাড়াও ধর্মীয়ভাবনা, অন্ধবিশ্বাস, প্রকৃতিচেতনা, জীবিকা, তাদের বিরুদ্ধে হয়ে চলা অত্যাচার এবং তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস, এই সমস্ত বিচিত্রমুখী বিষয় পরিবেশিত।

আমাদের আলোচনায় নির্বাচিত আদিবাসী জীবনশ্রয়ী ছোটগল্পগুলির বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব আদিবাসীজীবনের সত্য, বাস্তবের স্বরূপ। ছোটগল্পগুলির বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় সমাজের প্রান্তিক, জনজাতি বিবিধ শ্রেণির মানুষের জীবনবৈচিত্র্য। কোনো গল্পে মনস্তত্ত্বের সূক্ষাতিসূক্ষ স্তরীয় বিন্যাস, প্রেম-দাম্পত্য, পরকীয়া, লোভ-হিংসা চিত্রিত, কোনো গল্পে সাঁওতাল পরগনা ও আদিবাসী মানুষদের উপর শহুরে মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি, কোনো গল্পে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়, কোনো গল্পে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট, কোনো গল্পে অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক বিষয়ের মধ্যে দিয়ে গল্পের ভাবসত্য উন্মোচিত, আবার কোনো গল্পে প্রতিবাদী সত্তাকে কেন্দ্র করে গল্পের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময়। বিচিত্রমুখী এইসব বিষয় বৈচিত্র্য আলোচনার সুবিধার্থে গল্পগুলিকে বিষয়কেন্দ্রিক ভাগে ভাগ করা হল:

(১) ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়বৈচিত্র্য, (২) প্রেম-দাম্পত্য-পরকীয়া, মনস্তত্ত্ব কেন্দ্রিক বিষয়বৈচিত্র্য, (৩) রাজনীতিকেন্দ্রিক বিষয়বৈচিত্র্য, (৪) অতিলৌকিক-অতিপ্রাকৃতকেন্দ্রিক বিষয়বৈচিত্র্য, (৫) প্রকৃতিপ্রেম নির্ভর ও শহুরে দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিবাসী মানুষ, (৬) আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সঙ্কট-সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয়বৈচিত্র্য।

১৯২৩-১৯৯০ সময়পর্বের পঁচিশজন বাংলা ছোটগল্পকারদের বৈচিত্র্যমন্ডিত জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি বিষয়ভিত্তিকভাবে পর্যালোচনা করা হল।

৫.খ|১- ব্যক্তিকন্দ্রিক বিষয়:

১৯২৩-১৯৯০ এর বাংলা ছোটগল্পকারদের ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক বিষয়বৈচিত্র্যমন্ডিত জনজাতি জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলিতে আদিবাসী মানুষের ব্যক্তিজীবন, তাদের সততা–মহানুভবতা, স্নেহ-বাৎসল্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অত্যাচারিত–লাঞ্ছিত, প্রতিবাদী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন চিত্র গল্পে প্রতিফলিত। ব্যক্তিমানুষকে ঘিরে গল্পের বিষয় আবর্ত হয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়নির্ভর গল্পগুলি– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের- 'শিকারী', 'কবি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের- 'কমলমাঝির গল্প', 'সাপুড়ের গল্প', 'সুকু ও ভুকু', 'যাদুকরী', 'যাদুকরের মৃত্যু', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের- 'মা', 'রহস্যময়ী', 'ঝুমরু', 'পলহানের বিহা', সতীনাথ ভাদুড়ীর- 'মহিলা-ইন চার্জ', 'অভিজ্ঞতা', 'রথের তলে', সুবোধ ঘোষের- 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ', 'লঘু আরণ্যক', অমিয়ভূষণ মজুমদারের- 'দুলারহিনদের উপকথা', রমাপদ চৌধুরীর– 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', 'ইম্‌লী', 'দরবারী', সমরেশ বসুর- 'নির্বাসিতা', 'সহযাত্রী', মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার', 'ধৌলী', 'রুদালী', 'লাইফার', 'সমাজবাদ ববুয়া', অসীম রায়ের 'সুন্দর', প্রফুল্ল রায়ের 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী', 'সাতঘরিয়া', নলিনী বেরার 'ঝাঁটার কাঠি', 'খোরপোষ', সৈকত রক্ষিতের 'যশোমণি মুর্মু', অনিল ঘড়াইয়ের 'বীজ', 'টিকলি', 'হাতিছাপ' গল্পগুলি আলোচনা করা হল।

বিভূতিভূষণের 'শিকারী' গল্পে ষোলো বছরের আদিবাসী যুবক মাগনিরামের ট্র্যাজিক কাহিনি লিপিকৃত। ম্যালেরিয়া জীর্ণ মাগনিরাম গ্রামের ছেলে-মেয়েদের কাছে অবহেলিত, উপেক্ষিত ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র। সে পাহাড়ের চূড়া থেকে কান্দালতার নীল ফুল সংগ্রহ করতে চায় আর নিজের বাবার যোগ্য পুত্র হবার আকাঙ্ক্ষায় এবং তার বাবার মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য সে বুনো পাগল হাতি একাই শিকার করতে গিয়ে নিজেই হাতির শিকার হয়ে যায়। মাগনিরামের মৃত্যুর পরে সরকারের তরফ থেকে তার বাবা একশো টাকা পায় ও সবাই তার বাবাকে এমন সাহসী ছেলের বাবা হবার জন্য বাহবা দেয়। মাগনিরামের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সমাজের কাছে এক প্রশ্ন থেকে যায়- জীবনের মূল্য কি টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যায়? টাকা দিয়েই কি কেবল প্রশাসন নিজে দায়ভারমুক্ত হতে পারে? এই সব প্রশ্নের

উত্তর পাওয়া যায়, কেবল একশো টাকার প্রলোভন দেখিয়ে পাগলা হাতি মারবার মতো বিপজ্জনক কাজের মুখে ঠেলে দেওয়ার মানসিকতায়। এরকম মাগনিরাম তার হীনমন্যতাবোধ থেকে জীবনে এমন এক আশ্চর্য কাজ করতে চায় যাতে সে তার বাবা ও সমাজের চোখে বিশেষ মর্যাদা পায়। মাগনিরামের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এক সহজ-সরল, কিশোরমনস্ক আদিবাসী যুবকের ট্র্যাজিক পরিণতি ও বাবার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, গল্পের মাগনিরাম চরিত্র ও কাহিনিকে অনন্য করে তোলে।

বিভূতিভূষণের 'কবি' গল্পে সিংভূম জেলার পাহাড় জঙ্গলময় পরিবেশে এক সাঁওতাল কবি রঘুনাথ দাসের শহুরে কোলাহল, সাংসারিক কোলাহল থেকে দূরে অরণ্যের আদিমতায় সাহিত্য সাধনার চিত্র, অনাড়ম্বর সাধারণ জীবনযাপনের কাহিনি বর্ণিত। পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গলে ঘেরা এমন বন্যদেশে রঘুনাথ দাসের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব বিরল। শহুরে মানুষদের আদিবাসীদের প্রতি যে একটা তাচ্ছিল্য মনোভাব, তা যেন রঘুনাথ দাসের ক্ষেত্রে অসঙ্গত। রঘুনাথ দাসের স্ত্রীর সাথে সহজ-সরল দাম্পত্য, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, বিভিন্ন সাহিত্যের প্রতি জ্ঞান, উদার-বিনয়ী মনোভাব রঘুনাথ কবির সাথে লেখক প্রাচীন কবিদের তুলনা করেছেন। বিভূতিভূষণ নগরবিমুখ মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি এই গ্রাম্য মানুষদের খাঁটি মানুষ মনে করতেন। 'কবি' গল্পের কাহিনিবিন্যাস ও রঘুনাথ আদিবাসী চরিত্রচিত্রণে, বিষয়বস্তু নির্মাণে বিভূতিভূষণের গ্রাম্য সহজ সরল মানুষদের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত। রঘুনাথের কবি সত্তার বিকশিত হয় তার একান্ত নিজের সাহচর্য ও এই প্রকৃতির সাহচর্যে এবং তিনি প্রাচীন ভারতীর কবিদের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছেন। গল্পে আদিবাসী মানুষের এই সাহিত্যসাধনা, অনাড়ম্বর জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন রূপ, ঐতিহ্য একাত্মীভূত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কমল মাঝির গল্প' গল্পের মূল বিষয়বস্তু কালকেপুর ডাঙ্গার সাঁওতাল গোষ্ঠীর সমাজপতি কমল মাঝির চারিত্রিক পরিচয় ও পরিণতি। নব্বই উর্দ্ধ কমল মাঝির মৃত্যু সংবাদ দিয়ে গল্পের শুরু। কমল মাঝি এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর সাঁওতাল সমাজের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বা লোককথার মাধ্যমে, সমাজে মানুষের পরস্পরের প্রতি মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে কোনো ঝামেলার মিটমাট করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আদিমযুগের 'হাড়াম' এবং 'আয়ো' নামক দুটি মানুষই মানুষের বাবা-মা এবং তাদের ছেলে-মেয়ে থেকেই আস্তে আস্তে এই জগৎসংসার সৃষ্টি। গল্পে আদিবাসী সমাজের 'সৃষ্টিরহস্য' লোককথা লিপিবদ্ধ। রাঢ়বাংলার এই মাটির মানুষের মন ও ছিল দৃঢ়, সৎ, তিনি জ্ঞানীও ছিলেন। কমল

মাঝি আজীবন সমাজ-সংসারের হিংসা, মানবমনের অন্তরের হিংসা–ক্ষোভকে আদিপুরাকথার মাধ্যমে এবং নিজের উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা দমনের চেষ্টা করে, কিন্তু কমল মাঝি তার নিজ জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে সারাজীবন ধরে সমাজকে বলে যাওয়া অহিংসার বার্তা, নিজের জীবনে মানতে পারেনি। মানবমনের অন্তরালে যে জটিল স্তর থাকে তা কমল মাঝি চরিত্রে স্পষ্ট। সে নিজের সমাজপতির অধিকার অবলীলায় সোনাইকে দিয়ে দিতে পারেনি, সে তার অধিকার ছেড়ে দিতে পারেনি। তার কাছে বড়ো পরিচয় ‘কমল মাঝি’, সমাজপতি। এই অধিকারবোধ হারিয়ে যাওয়ার ভয় থেকে কমল মাঝির মধ্যে গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাবোধ, অস্তিত্ব সংকটবোধ তৈরি হয় এবং তা থেকেই দ্বন্দ্ব ও সোনাইয়ের হাতে কমল মাঝির মৃত্যু, ট্র্যাজিক পরিণাম চিত্রিত। গল্পের পরিণতিতে পুরানোর অবসান ও নতুনের জোড়পূর্বক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবণতার আভাস চিত্রিত।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘সাপুড়ের গল্প’ সাপ ও আদিবাসী বেদিয়া জনজাতিকেন্দ্রিক গল্প। এর আগেও লেখকের সাপ, সাপুড়ে, বেদিয়াদের নিয়ে লেখা গল্প থাকলেও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অতীতের পুনরাবর্তন হলেও কাহিনির চমকে গল্পটি অন্য গল্পের থেকে স্বতন্ত্র। তারাশঙ্করের লেখা বেদিয়া জনজাতি বিষয়কেন্দ্রিক গল্পগুলিতে বেদিয়া জনজাতির জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায়। এই গল্পেও সেরকমই বেশ কিছু তথ্য বেদিয়াদের নিয়ে পরিবেশিত –

(ক) বামুন, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ্ প্রভৃতি অনেক জাতিই সাপ নিয়ে কারবার অর্থাৎ সাপুড়ে জীবনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

(খ) বেদিয়া জনজাতির যারা, খাস সাপুড়ে জগতের যারা তাদের খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, নাচ-গান মনের ও দেহের বাইরে ও ভিতরে আদিমতা ও অরণ্যের ভাব থাকে। এমনকি দৈহিক চেহারাতেও সেই আদিম আরণ্যক ছাপ বর্তমান। বয়সের সঙ্গে মানুষ দেহ-মন-রূপ-যৌবন পরিবর্তিত হলেও ওদের জাতের মানুষদের মধ্যে সেই পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তাদের গায়ের রঙ কালো, ঘন কোকড়ানো কালো চুল। এরা যাযাবর হয়।

(গ) তারা পেশা হিসাবে গ্রামে ভিক্ষা করে, সাপ নাচায়। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের চরিত্রে অনেক পার্থক্য থাকে যা আশ্চর্যজনক এবং মেয়েরা স্বেচ্ছাচারি হয়।

এই বিশিষ্ট আদিবাসী জনজাতির মেয়ে কালী বেদেনীকে নিয়েই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। বেদিয়া রমণী কালী স্বেচ্ছাচারী, প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল এক নারী চরিত্র। যে তিন তিনবার বিয়ে করে স্বামী পরিত্যাগ করেছে। ষোল–সতেরো বছরের এই নারীর একটি পোষা সাপকে এক সন্ন্যাসী ধুলোপোড়া দিয়ে কোনো বিনা কারণবশত হত্যা করে। ফলত প্রতিশোধস্পৃহা কালীর মনে প্রবল হতে থাকে। সে সন্ন্যাসীর সাথে পাঁচমাস থাকার পরে কালী ভৈরবের প্রিয় শঙ্খচূড় সাপটাকে ওই একই ধুলোপোড়া দিয়ে মেরে ফেলে এবং তার কিছুক্ষণ পর ওই সাপের বিষই ভৈরবের মুখেও ঢেলে দেয়। বেদিয়া নারী কালী চরিত্রের আক্রমণাত্মক, ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, প্রতিশোধ স্পৃহার পরিচয়ই এই গল্পে চিত্রিত।

তারাশঙ্করের ‘সুকু ও ভুকু’ গল্পের কাহিনি একটি কুকুরকে ঘিরে। গল্পটিতে শেষ পর্যায়ে আদিবাসী সাঁওতাল জোয়ানের উপস্থিতি ও একটি পরিত্যক্ত, রক্তাক্ত, আহত বাচ্চা কুকুরকে শুশ্রুষার মাধ্যমে বড়ো করে তোলার কাহিনি গল্পটিতে এক অন্যমাত্রা আনে। সুকু প্রথমে ভুকু কুকুরকে আশ্রয় দিলেও পরে হঠাৎই তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। আদিবাসী সাঁওতাল ছেলেটি রাস্তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রুষা করে ভালোবাসা দিয়ে বড়ো করে তোলে। কালক্রমে দু’বছর পরে সুকু হঠাৎ ভুকুকে দেখতে পেয়ে, কাছে পেয়ে তাকে নিজের করতে চায় কিন্তু আদিবাসী সাঁওটাল যুবকটি তাতে রাজী হয় না। সুকুই ভুকুকে অকারণে মেরে রক্তাক্ত অবস্থায় যখন পরিত্যাগ করেছিল, কোনো মায়া-মমতা দেখায়নি. এখন কুকুরটি যখন তেজী, ভালো হয়ে গেছে সুকু নিতে চাইলে আদিবাসী যুবকটি রাজি হয়না। সে পরদিনই ভুকুকে নিয়ে নিজের বাড়ি চলে যায়। গল্পে ভুকুকে যে প্রহার করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তার প্রতি ভুকু’র দু’বছর পরও ভালোবাসা রয়ে গেছে আবার অন্যদিকে তার নতুন আশ্রয়দাতার প্রতিও ভালোবাসা রয়েছে। লেখকের ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পেও মনুষ্যেতর প্রাণীর সাথে মানুষের সম্পর্ক, তার প্রতি অনুভূতির কথা পাওয়া যায়। তেমনই ‘সুকু ও ভুকু’ গল্পেও কুকুর ও মানুষের অনুভূতি, নিখাদ ভালোবাসার সহজসরল এক চিত্র গল্পের মূল উপজীব্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যাদুকরী’ গল্পে এক যাযাবর বাজিকর তরুণীর মানবিক সহানুভূতি মহানুভবতা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও গল্পে লেখক এই বাজিকর জাতির ইতিহাস ও এই সম্প্রদায় সৃষ্টির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্ততি নিয়ে এই সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল এবং এই সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষ উভয়েই গুপ্তচরের কাজ করে। এই সম্প্রদায়ের নারীরা নৃত্য-গীতে পারদর্শী

ছিল এবং এরা তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্রও জানত। এরা যাযাবরের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি করে দেশ দেশান্তরের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে আনত। আসলে এই বাজিকর, জাদুকরীদের পেশা ভিক্ষাবৃত্তি বা কেবল তুকতাক বা ভোজবিদ্যা নয়, এদের আসল পেশা গুপ্তচরবৃত্তি। বিলাসিনীর ছদ্মবেশে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারা চতুর্দিকের খবর রাখে। এভাবেই একদিন জাদুকরী রমণী গ্রামের পুলিশের প্রবেশে বুঝতে পারে শশী ডোমের বাড়িতে বিপদ আসন্ন। এই বিপদের হাত থেকে নিতান্ত মানবিক কারণে পুলিশের থেকে শশী ডোমের জামাইকে জাদুকরী বাঁচিয়েছে। কেবল সে খবর দিয়ে সাবধান করেছে তা নয়, তার সাথে সাথে তাকে অব্যহতির উপায়ও দেয়। শশীর জামাইকে নকল বাজিকর বেশের গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে সে মিলিয়ে যায়। কোনকিছু প্রত্যাশা না করে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকারে জাদুকরী নারীর মহানুভবতা প্রকাশিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে ঝাড়ফুক, তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী, 'কাউরে বিদ্যা'য় বিশ্বাসী, ওঝার বিশ্বাসী এরকম আদিমসংস্কারে বিশ্বস্ত মানুষদের কথা পাওয়া যায়। গল্পে গ্রামের ডাক্তার ও এক আদিবাসী বেদিয়া রমণীর কথোপকথন থেকে সাপের বিষ যে কবিরাজরা কেনে এবং বেদিয়ারা তাদের পেটের দায়ে বহু দূর দুরান্তে ঘুরে বেড়ায়, তার নানা তথ্য পাওয়া যায়। গল্পে উচ্চবিত্ত মানুষরা আদিবাসী দরিদ্র মানুষদের প্রতি কীরকম মনোভাব পোষণ করে তার উদাহরণ গল্পে চিত্রিত। হঠাৎই গ্রামের জমিদার অভিযোগ করে বেদেনী তার ছেলেকে বাণ মেরেছ এবং অতর্কিতে, আচম্বিতে বেদেনীকে প্রহার করে, অপমান করে। দরিদ্র এক নারীকে বিনা কারণে অত্যাচার-অপমান করায় নাদের শেখ তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা জমিদারকে সায়েস্তা করতে চায়, কিন্তু সে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তার তাকে ওষুধের মাধ্যমে সুস্থ করে বোঝায় এই তন্ত্রমন্ত্র যুক্তিনির্ভর সারসত্য নেই। গল্পে বেদেনী নারীর অপমানের পাশাপাশি নাদেরের অস্তিত্ব-সংকটবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সে যখন বুঝতে পারে তার শেখা তন্ত্র-মন্ত্র মিথ্যা তার যেন 'সব হারিয়ে গেল' বোধ হয়। উচ্চবিত্ত মানুষদের কাছে চিরকালই প্রান্তিক, জনজাতির মানুষদের অপমানিত-লাঞ্ছিত হতে হয়, তার প্রতিবাদ-প্রতিশোধ কোনভাবেই নেওয়া সম্ভবপর হয়না, নাদেরের আর্তনাদ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অন্তিম দীর্ঘশ্বাস যেন এক পরাজয়ের কাহিনি বলে।

শৈলজানন্দের 'মা' গল্পে পরীর চরিত্রের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মাতৃত্বে উত্তরণের কাহিনি বিষয়বস্তু হয়েছে। আদিবাসী সাঁওতাল জাতির মেয়ে পরী, যে দুখনের ভ্রাতুষ্পুত্র। কোলিয়ারিতে কাজ করতে গিয়ে কয়ালখাদানে তার ভাই ও দুই পুত্র মারা যায়, সেই শোকে তার স্ত্রীও মারা যায়। দুখন নিজের অজান্তে

ভুলবশত একটা লম্পট ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয় এবং বিয়ের কয়েকবছরের মধ্যে দুখনের মেয়ে আত্মহত্যা করে। দুখন এই দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, ক্ষোভ, আত্মগ্লানির জায়গা থেকে পরীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করায় যে সে কখনও বিয়ে করবে না। দুখন মারা যাওয়ার পরও পিতৃসম দুখনের কথা পরী ফেলতে পারেনি। সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে কুমারী অবস্থায় তাও সে তার প্রেমিক টুরাকে মেনে নেয় না, বিয়ে করতে চায় না। নানারকম দ্বিধা, মানসিক জটিলতার মধ্যে পরী হঠাৎ এক সকালে সন্তানের জন্ম দেয়। সন্তান জন্মই যেন পরীর জীবনের সমস্ত আঁধার কাটিয়ে এক নব সূর্যোদয় ঘটায়। গল্পে পরী অবিবাহিত অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে কোথাও পরী সম্পর্কে লেখকের কোনো অবমাননাকর মনোভাব প্রকাশ পায়নি, বরং সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে ব্যক্তি উত্তরণের কাহিনি বর্ণিত অর্থাৎ মাতৃত্ব, স্নেহ- বাৎসল্য বোধ পরী চরিত্রটির উত্তরণ ঘটায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘রহস্যময়ী’ গল্পে আদিবাসী মইনু’র রহস্যময় বিষাদগ্রস্ত কাহিনি চিত্রিত। এক আদিবাসী নারীর রহস্যময় মনের হদিশ, তার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েনের কাহিনিতে গল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত। মইনুর মা সাহেবকে ভালোবেসে বিয়ে করে কিন্তু সে প্রতারিত হয়, এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মইনুর মা মইনুকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করায় যেন সে কখনো ‘সাদা চামড়ার’ কাউকে বিয়ে না করে। ‘মা’ গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এখানে একই সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। পরীও যেমন দুখনের কারণে মানসিক দ্বন্দ্বে ছিল, কষ্টে ছিল এক্ষেত্রে মইনু’রও মানসিক ক্ষেত্রে ও জীবনে একই পরিণতি হয়েছে। মইনু এক সাহেবকে ভালোবাসে এবং সাহেবও মইনুকে প্রবলভাবে ভালোবাসে কিন্তু মইনু তার মাকে কথা দেওয়ায় সে না পারে সাহেবকে ভুলতে, না পারে সাহেবের ভালোবাসার প্রস্তাব গ্রহণ করতে। এই দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা মইনু চরিত্রটিকে রহস্যময়ী করে তোলে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘ঝুমরু’ গল্পে মাতৃ-পিতৃহীন ঝুমরুর ব্যর্থ প্রেমের বিষাদগ্রস্থ, অভিমানী কাহিনি বর্ণিত। ঝুমরু অনাথ হলেও দাসী তাকে মাতৃস্নেহে বড় করে কিন্তু দাসীর স্বামী লছি সর্দারের অপমান, লাঞ্ছনা ঝুমরু মেনে নিতে না পেরে সে দাসীর মাতৃস্নেহের মায়া ত্যাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়। ঝুমরু একদিকে যেমন কখনই তার পালিতা মা দাসীর অপমান মেনে নিতে পারেনা এবং তেমনি ঝুমরুর ভালোবাসা পূর্ণতা না পাওয়ার গভীর বেদনায় মর্মাহত হয়ে ঝুমরু দাসী ও লছির বাড়ি ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘পলহানের বিহা’ গল্পে দেখা যায় কয়লাখাদানে কাজ করতে গিয়ে পলহানের পা নষ্ট হয়ে যায়, সে বাধ্য হয়ে এক দুশ্চরিত্রা নারীকে বিবাহ করে কিন্তু নিজের অক্ষমতার কারণে স্ত্রীর কাছে পলহানকে প্রতি পদে অপমানিত-লাঞ্ছিত হতে হয়। অসুখী দাম্পত্য এবং অক্ষম-বেকার জীবন থেকে মুক্তি পেতে পলহান হীনমন্যতা বোধ থেকে আত্মহত্যা করে। ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব, অস্তিত্ব সংকটবোধে পলহানের পরিণতি, কিন্তু এই সবকিছুর অন্তরালে মূল ভূমিকা কয়লাখাদানের, যেখানে পলহানের জীবনে বিপত্তি ঘটে, তার জীবনটাই বদলে যায়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘মহিলা-ইন-চার্জ’ গল্পে সাঁওতাল গোষ্ঠীর না হয়েও সাঁওতাল দলের একজন নাটোয়ারলাল। এই নাটোয়ারলালের সাথে আদিবাসী মানুষগুলোর অন্তরঙ্গতা ভীষণই। এই নাটোয়ারলাল চা-বাগানের মজদুর মোর্চার মহিলা-ইন-চার্জ। কথকের সাথে নাটোয়ারের পূর্বপরিচয় ছিল, সেখানেও সে স্থানীয় পার্টির মহিলা-ইন-চার্জ পদে আসীন ছিল এবং সে স্ত্রীলোক ঘটিত কেস নিষ্পত্তি করত। নাটোয়ার অন্য স্ত্রীলোকদের সমস্যার সমাধান করলেও নিজের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। নাটোয়ার-এর জীবন সুখের হয়নি। নাটোয়ারের জন্য আদিবাসী সাঁওতাল মেয়েরা কাঁদলেও, তার স্ত্রীর মন সে কোনোদিনও পায়নি। বাইরে থেকে হাসি-খুশি, অন্তরঙ্গতায় উদারমনস্ক নাটোয়ারলালের জীবনের এই হাজারো প্রাপ্তির মধ্যে এই বড়ো অপ্রাপ্তিকে ঘিরেই কাহিনির, চরিত্রের বিন্যাস।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘অভিজ্ঞতা’ গল্পটিতে দারোগা রামভরোসা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আদিবাসী বিরসার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য কলহ, স্ত্রীর পরকীয়া এবং সেই ক্ষোভ থেকে আকস্মিকভাবে বিরসার আঘাতে তিনমাসের পুত্রের খুন। কিন্তু এক্ষেত্রে বিরসা তার ছেলেকে স্ত্রীর প্রতি রাগ থেকে খুন করবে ভাবলেও সে ইচ্ছা করে শিশুটিকে হত্যা করে না। তার মনের ইচ্ছা, অন্তর্দৃষ্টি শক্তিই (*Intution Power)* যেন নিয়তির মাধ্যমে বাস্তব রূপ নিয়েছে। দারোগা রামভরোসার নিজের জীবনেও পূরণ সিং এর উপর রাগ, ক্ষোভ থেকে তাকে আঘাত করার মনোবাসনা জন্মায়। রামভরোসার ক্ষেত্রেও তার মনের ইচ্ছা নিয়তির দ্বারা পূর্ণ হয়। এই বাস্তব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে রামভরোসা নিজের জীবনে অমীমাংসিত তদন্তে কাজে লাগায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এই গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, একটা অন্য চমকের সৃষ্টি করে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'রথের তলে' গল্পে নাট জাতির পতনের মর্মান্তিক কাহিনি গল্পে চিত্রিত। ভৈরো নাট তাদের নাট সমাজের সর্দার এবং তার জাতির প্রতি নিজের গৌরববোধ আছে। নাটজাতির সম্মান গৌরব রক্ষার্থে ভৈরো নাট শকুর খাঁ, গ্রামের জমিদারকে হঠাৎ রেগে গিয়ে খুন করে ফেলে এবং তার চোদ্দ বছর জেল হয়। ভৈরো নাট তার জাতের মেয়ের সম্মান রক্ষার্থে, জাতের গৌরব রক্ষার্থে এই কাজ করে বলে তার মনে একটা শান্তি থাকে। সে জেলে বসেও তার জাতির গৌরবের কথা, জাতের মানুষের কথা ভেবেই দিন কাটায়। কিন্তু দীর্ঘ চোদ্দবছর জেল থেকে মুক্ত হয়ে সে জানতে পারে ভুটনী, যার জন্য ভৈরো জেলে গিয়েছিল সে মুসলমানকে বিয়ে করেছে। আর্থিক অনটনের কারণে নাটজাতের গৌরব নষ্ট হয়ে গেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার ভৈরোর গৌরবের নাটজাতি। ছন্নছাড়া নাটজাতির, এই খবর শুনে ভৈরো নাট হতাশায় ভেঙে পড়ে। যে গৌরব, মর্যাদা রক্ষার্থে সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিল, তা কোনোভাবেই রক্ষা হয় না। তার বানানো সাম্রাজ্যের পতনে ভৈরোর ট্র্যাজিক হতাশাগ্রস্থ, সর্বহারা মনোভাব, কালের গর্ভে কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়, এই ভাবসত্যই গল্পে মূর্ত।

সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পে স্টিফান হোরোর কাহিনি বর্ণিত। আদিবাসী মুন্ডা জাতি থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়ে স্টিফান হোরো ফাদার লিন্ডনের স্কুলের ছাত্র। স্টিফান হোরোর মেধা, আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে স্কুলের নানা ঘটনায়। ফাদার লিন্ডন তার ধর্মীয় উন্মাদনার জন্য স্টিফানকে খ্রিস্টান ধর্মের কাছাকাছি রাখতে সবরকম প্রয়াস করে। কিন্তু স্টিফান তার জংলী আদিবাসী সত্তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। স্টিফানকে কেন্দ্র করে বুড়ো সোখা ও ফাদার লিন্ডনের মধ্যে যেন এক অদৃশ্য লড়াই শুরু হয়। স্টিফানের চিরকীর সাথে ভালোবাসা স্থাপন, অরণ্য জীবনের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ায় এক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। ফাদার লিন্ডন ও অরণ্যের জীবন এই দুই টানা পোড়েনই যেন চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ। তিন পানিপথের যুদ্ধে যেমন প্রতিবারই ভারতীয় শক্তির পরাজয় ঘটে বিদেশী শক্তির নিকট, এই গল্পে যেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। আদিবাসীদের সাথে খ্রিস্টানদের সংঘর্ষে আদিবাসীরা গির্জা ভাঙলে বুড়ো সোখার জেল হয়। এরপর স্টিফানও বিরসাইট আন্দোলনে যোগ দিলে, তার জেল হয়। কারণ আইনের চোখে বিরসাইটরা অপরাধপ্রবন মানুষ। স্টিফানের জেল হয়, চিড়কীর সাথেও বিচ্ছেদ ঘটে।

লেখক এই গল্পের এই টানাপোড়েন আবহসৃষ্টির মধ্যে যে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, স্টিফানের ক্লাসের সহপাঠীরা প্রত্যেকেই ভারতীয় হলেও তাদের সাথে স্টিফানের একটা বিচ্ছিন্নবোধ সম্পর্ক ছিল। ভারতবাসী হয়েও তারা স্টিফানের পক্ষ অবলম্বন না করে নিরপেক্ষ থাকায় এই যুদ্ধে স্টিফান বর্হিদেশের শক্তির কাছে হেরে যায়। গল্পের প্রথমেও স্টিফান মুন্ডা ছিল এবং স্কুলজীবন শেষেও সে হয়ে উঠেছে মুন্ডা। হয়ত সে হেরেছে তার ভালোবাসার কাছে, কিন্তু হোরো জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের ‘লঘু আরণ্যক’ গল্পে এক আদিবাসী নারীর নিজেকে রক্ষার তাগিদে গড়ে তোলা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চিত্রিত। শিকারের সখে প্রসাদবাবু দানুয়া-ভালুয়ার জঙ্গলে ডেরা বাঁধে। প্রসাদবাবুর জমিদারিতে ভিখন ও মিঠি খোঁজীর কাজ করে। ঘুমন্ত অথবা জাগন্ত জানোয়ারের ডেরার কাছাকাছি যাবার পথ খুঁজে দেওয়ার কাজ করে এই খোঁজীরা। অরণ্যের প্রতিটা রন্ধ্র আদিবাসীদের নখদর্পণে। ভিখন মারা যাবার পর মিঠি প্রসাদবাবুর হয়ে খোঁজীর কাজ করে। একরাতে মিঠির একাকী হওয়ার সুযোগে প্রসাদবাবু তাকে বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে ভোগ করতে চাইলে হিংস্রভাবে মিঠি প্রসাদবাবুর গলা কামড়ে হত্যা করে। মিঠি দরিদ্র, একাকী নারী হলেও সে দুর্বল নয়, সে নারীর অবমাননার প্রতিশোধ নেয় বাঘিনীর মতো। মিঠি যেমন বাঘের খোঁজ এনে দিতে পারে, একাকী সন্তান লালনপালন করতে পারে, তেমনি নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে-প্রতিরোধে বাঘিনীর ন্যায় হিংস্র রূপ ধারণও করতে পারে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘দুলারহিনদের উপকথা’ গল্পে ভুখন ও দুলারহিনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক অসহায়ত্ব, বিপর্যয়কর অবস্থাচিত্র চিত্রিত হয়েছে। ভুখন ও দুলারহিন পিতা-মাতাহীন সৎ ভাইবোন। গল্পে দুলারহিন ও ভুখন ভাইবোন হিসাবেই নিজেদের ভাবে, কিন্তু দুলারহিন ভুখনের বাবার ওপক্ষের মেয়ে না ছেলের বউ তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। ভুখনের থেকে দুলারহিন বয়সে দু’বছরের বড়ো, কিন্তু সম্পর্ক সম্বন্ধে রহস্যের একটা জট রয়ে গেলেও তার একে অপরকে ভাইবোন হিসাবেই জানে ও মানে। তারা একে অপরের অবলম্বন, তাদের সংসার এই দুজনেরই। দুলারহিন ভুখনের বিয়ে দিতে চেয়েছে এবং ভুখনও নিজে চায় বিয়ে করতে, তাই সে কন্যাপণের টাকা জোগাড় করে বিয়ের জন্য। কিন্তু এই জমানো কন্যাপণের টাকা দিয়েই দুলারহিন অসুস্থ হলে তাকে বাঁচাতে গিয়ে ভুখনকে খরচ করতে হয়। ভুখন দুলারহিনকে সুস্থ করে তুলতে কোনো ত্রুটি রাখে না, কারণ দুলারহিন ছাড়া তার আর দ্বিতীয় নিজের কেউ নেই। নিদারুণ দারিদ্রে ভুখন তার বিয়ের কামনা-বাসনার সাধকে দমিয়ে ফেলে টাকার অভাবে,

দুলারহিন মনে মনে কষ্ট পায় এই কারণে, সে ভাবে নিজে বিয়ে করে তার কন্যাপণের টাকা দিয়ে সে ভুখনের বিবাহ দেবে। সেই কারণে দুলারহিন ঘর ছাড়ে এবং বিয়ের পাত্র পেয়েও যায়। কিন্তু ভুখনও দুলারহিনের উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়ে, তাকে খুঁজতে। দুলারহিনের সাথে আর ভুখনের দেখা হয় না। দুলারহিন সংসারধর্ম পালন করলেও ভুখনের আর তা করা হয় না, সে আর বাড়িও ফেরে না, এক হতাশাগ্রস্থ পথিকের ন্যায় সে জীবনপথে ঘুরে বেড়ায় অজানা উদ্দেশ্যে। দারিদ্র, অর্থহীনতার কারণেই ভুখনের জীবনের এই বিপর্যয়, প্রান্তিক মানুষদের অপূর্ণ জীবনের কাহিনি উপকথায় পর্যবসিত হয়।

রমাপদ চৌধুরীর ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনি’ গল্পে অর্থলাঞ্ছিত সাঁওতাল পরিবারের চরম অসহায়ত্ব ও বিপর্যয়ের কাহিনি বিষয়বস্তু হলেও গল্পটিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে কারণ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লাটুয়ার অস্তিত্বসংকটের ইতিহাস গল্পের অন্তর্নিহিত মূল বিষয়সত্য। গল্পে ওঁরাও, মুন্ডা, ভুমিজ, খেড়িয়া ও সাঁওতাল জনজাতি মানুষদের বিশ্বাস লাটুয়া ওঝার ওষুধে এবং মন্ত্রের কারণে সাপ-কাঁকড়াবিছের দারুণ বিষও নিস্প্রভ হয়ে যায়। মৃত মানুষও প্রাণ ফিরে পায়, প্রান্তিক আদিবাসী মানুষদের জীবন এরকম অযৌক্তিক নানান অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

এই লাটুয়া ওঝার কন্যা সুরমণি তার অন্ধ বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। শহুরে মানুষ হয়েও কথক নিজে কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসার জন্য লাটুয়া ওঝার শরণাপন্ন হলে, সুরমনি তাকে কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক হিসাবে কিছু শেকড়বাটা, জড়িবুটি দেয়। এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয়- শহরের শিক্ষিত মানুষ হয়েও কথক কুসংস্কারে বিশ্বাস করে, এক্ষেত্রে একটা বিষয় স্পষ্ট মানুষ বিপদে পড়লে, পরিস্থিতির চাপে বুদ্ধি-বিবেচনার উর্দ্ধে গিয়ে অনেক অযৌক্তিক কাজেও জড়িয়ে পড়ে। আমাদের মনে একটা বদ্ধ ধারণা যে কেবল গ্রামের মানুষেরাই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, কিন্তু শহরের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও যে বহু কুসংস্কার লালিত এই বাস্তব সত্যটি এগল্পে প্রকট। কথক ওষুধের টাকা দিলে সুরমণি তার মিথ্যা এবং তার অন্ধ পিতা লাটুয়ার সত্য কথকের সামনে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে। গল্পে সুরমণি চরিত্রের সৎ-সাহসী, নির্লোভ, আত্মসম্মানে পৃথক এক নারী মনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পের যে মূল ভাবসত্য তা লাটুয়া কেন্দ্রিক। গুণিনবৃত্তি করে যে একসময় জীবিকা নির্বাহ করত এবং এক্ষেত্রে এককালে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু নিয়তির আঘাতে বৃদ্ধ লাটুয়া আজ অন্ধ, সর্বস্বান্ত, সর্বহারা। গল্পের শেষবাক্যের চমক– লাটুয়া কি আদৌ সত্যি বেঁচে আছে? কথকের মনের এই প্রশ্ন লাটুয়া চরিত্রের

মূল ভাবসত্য উন্মোচিত করে। গল্পে সর্বহারা আদিবাসী পরিবারের বিপর্যস্ত চিত্রের পাশাপাশি লাটুয়ার অস্তিত্ব সংকটের চিত্রও পরিস্ফুট।

রমাপদ চৌধুরীর ‘দরবারী’ গল্পে ধর্মের রাজনীতির পাশাপাশি জোনাথন সাহেবের লাপড়ায় এক আদিবাসী গ্রামে আগমন ও মুন্ডা জাতিকে ভালোবেসে আপন করে নেওয়ার প্রচেষ্টা, ব্যর্থতা এবং জোনাথন ও শোনিয়ার ট্র্যাজিক পরিণতির কাহিনি গল্পে চিত্রিত। জোনাথন সাহেব হলেও তার আদিবাসী মানুষদের প্রতি ভালোবাসা, আদিবাসী জায়গার প্রতি ভালোবাসা যা নিখাদ। সে শোনিয়া অর্থাৎ মুন্ডাজাতির মেয়ে শনিচরীকে ভালোবেসে বিয়ে করে এবং জোনাথন তার ধর্ম বদলে মুন্ডা হতে চেয়েছিল, মুণ্ডাদের জন্য গঠনমূলক উন্নয়ন করতে চেয়েছিল। গল্পে দেখা যায়, খ্রিস্টান মিশনারিরা আদিবাসীদের জন্য একেবারে অজ গ্রাম্য জায়গায় গির্জা স্থাপন করে, মিশনারি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করে। মিশনারিরা আদিবাসীদের মধ্যে যে শিক্ষা ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রসার ও প্রচার করেছিল তার তথ্য এই গল্পে লিপিবদ্ধ। মিশনারিদের দ্বারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ফলে বহু আদিবাসী তাদের নিজ ধর্ম বদলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু তারপর ও একটা ভেদাভেদ থেকেই যায়। যা এই গল্পে লেখক সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। গল্পে দেখা যায় মুন্ডারা সকলে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করলেও সাহেবরা কখনই মন থেকে তাদের নিজ ধর্মের মনে করে না। সাহেব খ্রিস্টানদের মধ্যে আদিবাসীদের নিয়ে একটা ঘৃণ্য মনোভাব থেকেই যায়। এই ঘৃণ্য মনোভাবের শিকার হয় শনিচারী ওরফে শোনিয়া এবং জোনাথনের ছেলে ম্যাক। ম্যাক মুন্ডা হওয়ায় সে মিস্টার হাগিন্সের মেয়ে ইভাকে ভালোবাসলেও তার মা যেহেতু মুন্ডা তাই তাকে অপমানিত হতে হয়। মুন্ডা ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দু’তরফের মধ্যেই একটা উত্তপ্ততা তৈরী হয়।

গল্পের বিষয়বস্তুতে মুন্ডা সমাজের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় মনোভাব চিত্রিত, তারপরেও গল্পের বিষয়বস্তুর বিভাগভিত্তিক আলোচনায় ‘দরবারী’ গল্পটিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর পর্যায়ে রাখার কারণ গল্পে জোনাথনের ভালোবাসা মুন্ডাদের প্রতি ও তার ব্যর্থতা এবং জীবনের ট্র্যাজিক পরিণাম গল্পটিতে এক অন্যরূপ দেয়। একটা ব্যক্তির সৎ চেষ্টা, সদিচ্ছা, সততা হেরে যায় ধর্মীয় রাজনীতির ষড়যন্ত্রের কাছে। এক ব্যক্তির লড়াই ছিল কিন্তু সে পরাজিত। জোনাথন নিজেই লাপড়ার মানুষ, আদিবাসী মুন্ডা হতে চেয়েছিল কিন্তু তা হল না, বদলে সাধারণ মানুষদের সাথে চলল ধর্মীয় রাজনীতির খেলা। মানুষ বারবার ধর্মের কাছে, রাজনীতির কাছে পরাজিত। যে মানুষ সত্যিকারের উপকার করতে চেয়েছিল আদিবাসী

সহজসরল মানুষদের, তাকেই শেষমেষ খুন হতে হয়। অনেক গল্পের প্রেক্ষাপটেই খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা ধর্মপ্রচার আদিবাসীদের শিক্ষাদান এবং ঔপনিবেশিক কালপর্বে আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা পাওয়া যায়। এই ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের ক্ষেত্রে দুরকম অবস্থাচিত্র দেখা যায়- ইতিবাচক, নেতিবাচক। ইতিবাচক রূপটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোতাম' গল্পে দেখা যায়, নেতিবাচক রূপটি 'দরবারী' গল্পে প্রকট। আদিবাসীরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও সাহেবরা কোনোভাবেই তাদের মেনে নিতে পারেনা, সাহেবরা মনে করে-' দি মুণ্ডাজ্ আর ক্রিশ্চানস্ অনলি ইন নেম্'।[২৫] আদিবাসীদের গায়ের রং, সংস্কার-সংস্কৃতির পার্থক্য বিশাল কেবল ধর্ম এক হলেও আদিবাসীদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়না, তারা সমানভাবে নিপীড়িত। মুণ্ডা আদিবাসীরা ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান আদিবাসী হলেও, ইংরেজ সাহেবদের মধ্যে তাদের ধর্ম এক হলেও একটা সামাজিক দুরত্ব বা 'মানসিক ব্যবধান' থেকেই যায়। জাতিগত, বর্ণগত ও সম্প্রদায়গত নানান সংস্কারের কুয়াশা বিভিন্ন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবহমানকাল ধরে পরস্পরের মধ্যে অনেক দুরত্ব সৃষ্টি করেছে, এই গল্পে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্থানিক দূরত্ব না থাকলেও মানসিক ব্যবধানের কারণেই গল্পে জোনাথন ও শনিচরীর ট্র্যাজিক পরিণতি, যা কূটনৈতিক চক্রান্ত, ধর্মীয় হিংস্রতা, বর্বরতার নগ্নতাকে উন্মোচন করে।

রমাপদ চৌধুরীর 'ইম্‌লী' গল্পে বেদিয়া নারী ইমলীর ভাগ্যবিপর্যয়, ট্র্যাজিক পরিণতি মূর্ত। জীবিকার সন্ধানে, পেটের দায়ে আদিবাসী মানুষগুলোর শহরে মধু বিক্রি করতে আসা। সেখানেই ইমলীর তার নিজের জাতের লোক ফালসার সাথে দেখা ও প্রেম, কিন্তু ইমলীর লজ্জা ও সংকোচের কারণে তার ভালোবাসা পরিণতি পায় না। সে ভালোবাসা হারানোর যন্ত্রণায় কাতর হলেও পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে রাতের অন্ধকারে দেহব্যবসা করতে হয়। সে কলকাতা শহরের বুকে কোনো কাজ না পেয়ে অন্ধকারের পথ বেছে নেয় কিন্তু তার দৈহিক সৌন্দর্যতা না থাকায়, কুৎসিৎ-রুগ্ন, অপুষ্ট শরীরের জন্য সেই অন্ধকারের পথও বন্ধ হয়ে যায়। ভিক্ষাও না মেলায়, সে উদ্বাস্তুদের দলে খাবার নিয়ে গেলে সেখানেও সে লাঞ্ছিত হয়ে সর্বশূন্য হয়ে পড়ে। জীবন সর্বশূন্যতাবোধ, ভাগ্যবিপর্যয় আদিবাসী নারীর মর্মান্তিক চিত্র গল্পের উপজীব্য।

সমরেশ বসু'র 'নির্বাসিতা' গল্পে সভ্যজগৎ থেকে পঁচিশ মাইল দূরে, সমুদ্রতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে, সারন্দার বিশাল ঘন অরণ্যে এক হেলথসেন্টারের নার্স রঞ্জনা দাশ সভ্য সমাজ থেকে

নির্বাসিত। সমরেশের নিজের জীবনকালে সুদূর সারাণ্ডায় এক দরিদ্র পীড়িতা মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল। সেই মেয়েটির নানারূপ, বাস্তব অভিজ্ঞতা সমরেশের গল্পে বারবার ফিরে আসে তার গল্পের প্রাণ হয়ে। এক অবিবাহিতা বাঙালি মেয়ের এই ঘন অরণ্যে অরণ্যবাসী হওয়ার প্রশ্নের উত্তরে বোঝা যায় সভ্যজগতের আগুন একটি মেয়েকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। সেই অত্যাচারিত মেয়েটি এই গভীর অরণ্যে, আদিবাসী মানুষদের সাহচর্যে শীতলতা, মানসিক শান্তি পায়। সভ্যতার নাগরিক কৃত্তিমতার আলো থেকে বহু যোজন দূরে নিবিড় অরণ্যে বন্য পশু ও সহজসরল খাঁটি মনের অধিকারী আন্তরিক আদিবাসী মানুষদের সান্নিধ্যে রঞ্জনার নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয়, অনেক সম্মানের, শান্তির নির্বাসন।

সমরেশ বসু'র 'সহযাত্রী' গল্পে গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে শহুরে যাত্রী যিনি গল্পের কথক তার সহযাত্রী গাংটাং রোডের পশ্চিমে ছিচরণ দিগর নামক আদিবাসী মানুষটি। গল্পে চতুর মনোভাবাপন্ন, গ্রাম্য মানুষ ছিচরনের বারবার ট্রেনে সব হকারদের সাথে দর কষাকষির পরও জিনিস না কেনা এবং শেষমেষ তার পরিণতি 'অতি চালাকের গলায় দড়ি'র মতো। ছিচরণ এত চতুরতা সত্ত্বেও ভুল বই কিনে ফেলে, যা তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ট্রেনে জানলা দিয়ে ফেলে দিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে ছিচরণের আচরণ দৃষ্টিসংগত না হলেও গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে তার বারবার দর কষাকষির মধ্যে তার আর্থিক অনটনই স্পষ্ট। গল্পে এই আদিবাসী মানুষটাকে কেন্দ্র করে গল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' গল্পের কাহিনি আদিবাসী মেয়েদের শিকার উৎসব কেন্দ্রিক ও মেরী ওঁরাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই গল্পের কাহিনি সত্য ঘটনা অবলম্বনে। **১৯৯১** খ্রিস্টাব্দে গায়ত্রী দেবীকে একটি সাক্ষাৎকারে 'শিকার' গল্প প্রসঙ্গে লেখিকা বলেন- 'এলাকাটা আমি যেন দেখতে পাই, এতই চিনি। গল্পে যাকে মেরি ওঁরাও বলেছি, তাকে দেখেছি'।[২৬] এছাড়াও বিহারের যে শিকার উৎসব, তা আদিবাসীদের ন্যায় বিচার উৎসব। শিকারের পর সমাজপতিরা অপরাধীর বিচার করতেন আদিবাসী সমাজের নিজস্ব আইনানুযায়ী। বিহারে বারোবছর ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় মেয়েদের শিকার উৎসব- 'জানী পরব'। আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণ, নারীদের অবমাননা করা অপরাধ। মেরির দ্বারা তসিলদারের হত্যা সমগ্র আদিবাসী সমাজের কাছে যা পাপ, তার বিচার করে বাৎসরিক শিকার উৎসবের সত্য অর্থকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

গল্পে মেরী ওঁরাও নারীচরিত্রটি দ্রৌপদীর ন্যায় দৃঢ়, প্রতিবাদী নারী চরিত্র। মেরীর ওঁরাও এর মা আদিবাসী এবং পিতা সাহেব। ফলে মেরীর গায়ের রং ফর্সা এবং তার রক্তে অস্ট্রেলিয়ান রক্তের তেজের কারণে সে আদিবাসী, তার স্বজাতির মানুষদের কাছে বিস্ময়ের পাত্রী। মেরীর অন্তরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ওঁরাও সমাজের একজন মানুষ হয় ওঠার। সে মুসলিম যুবকের সাথে প্রেম করলেও তার সমাজ আপত্তি করে না, কারণ তার স্বজাতি সমাজ তাকে নিজেদের অংশ বলে গ্রাহ্য করে না। বিপত্তি নামে যখন ঠিকাদার তসিলদার সিং আদিবাসীদের দিয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে অরণ্য নিধন অর্থাৎ গাছ কাটানোর পাশাপাশি মেরীকেও করায়ত্ত করতে চায়। বারংবার মেরীকে উত্ত্যক্ত করায়, তসিলদারের লোলুপতা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে মেয়েদের শিকার উৎসবের দিন মেরী তাকে হত্যা করে। গল্পের কাহিনিবিন্যাসের যে হিংসাত্মক, আক্রমণাত্মক বিষয় দেখানো হয়েছে, এটা কতটা সমর্থনযোগ্য, এ বিষয়ে লেখিকা বলেন-

> ‘১৮৫৫-৫৬ সালের মহান সাঁওতাল গণবিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল আদিবাসী মেয়েদের ধর্ষণ করা। পাঠক বলেন, গল্পে আমি বড় বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছি রক্তপাতকরণে। আমি মনে করি, যখন আদিবাসী বা অত্যাচারিত মানুষদের কথা বলছি এ হিংসা সমর্থনযোগ্য। রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ, হিংসা, যুক্তিসহ, জনগণ যখন কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ায়, রাষ্ট্রব্যবস্থা তো হিংসার আশ্রয়ই নেয়’।[২৭]

এই গল্পের মেরী ওঁরাও তার অভিনব শিকারের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজে সমগ্র নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, পাপের যোগ্য জবাব দিয়েছে তার অনমনীয় জেদ, হিংস্রতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘ধৌলী’ গল্পের মূলবিষয়- ধৌলীর ট্র্যাজিক জীবনকাহিনি, ব্রাহ্মণ মিশ্রিলাল ও ধৌলীর প্রেম ও মিশ্রিলাল দ্বারা প্রতারণা-পরিত্যাগ এবং ধৌলীর বঞ্চিত জীবনচিত্র। সহজসরল আদিবাসী বিধবা মেয়ে ধৌলী, মিশ্রিলালের আন্তরিকতায়, ভালোবাসায় ধৌলী তার প্রেমে সাড়া দেয়। কিন্তু তার এই সুখস্বপ্নের সময়কাল অত্যন্ত কম স্থায়ী হয়, বাস্তবতার আঘাতে তা ভেঙে যায়। মিশ্রিলালের পরিবারের চাপে অন্তঃসত্ত্বা ধৌলীকে ছেড়ে মিশ্রিলাল অন্যত্র বিবাহ করে। তাদের সন্তানের এবং ধৌলীর সামান্য খোরপোষের দায়টুকুও মিশ্রিলাল ও তার পরিবারের থেকে ধৌলী পায় না। নারী বলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরাচরিত নিয়মে সমাজের চোখেও ধৌলীই দোষী হয়। ধৌলী জীবনের বেঁচে থাকার তাগিদে,

সন্তানের জন্য বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তি করে এবং গল্পের পরিণতিতে তার শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ধৌলী মিশ্রিলালের থেকে কোনো সামাজিক স্বীকৃতি চায়নি, কারণ সে বাস্তবটা জানত, কিন্তু সে তার সন্তানের জন্য খোরপোষের দাবিটুকু করে, তাও সে পায় না। জীবনযুদ্ধে নিজের ও সন্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে ধৌলীকে যে পথ বেছে নিতে হয় তার জন্য দায়ী মিশ্রিলাল এবং তার থেকেও বেশি দায়ী এই সমাজব্যবস্থা। লেখিকা ধৌলীর সর্বনাশের জন্য দায়ী যে সমাজব্যবস্থা, তাকেই তুলে ধরেছেন। যে সমাজব্যবস্থায় উচ্চবর্ণ, অর্থ প্রতিপত্তির বলে অন্ত্যজদের সাথে অপরাধ করেও শাস্তি পায় না, বরং তারাই সমজের মাথা হয় ওঠে, অত্যাচারিত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের জীবন নরক করে তোলে, তার প্রতিভূ ধৌলী। ধৌলী অনুভব করে ব্যক্তির চেয়ে সমাজের শক্তি বেশি, কারণ যারা তার জীবনের নষ্টের মূল কারণ, তারাই সমাজের মাথা। ধৌলীর এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভব সমাজব্যবস্থার রূঢ় সত্যকে প্রকট করে।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘রুদালী’ গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য একেবারেই স্বতন্ত্র। রুদালী একটি পেশা, রাজস্থানের দিকে এই পেশার চল আছে। চলচ্চিত্র, সিরিয়ালে এই রুদালী চরিত্র পাওয়া যায়। রুদালী শব্দের অর্থ- পেশাদার কাঁদিয়ে। টাহার গ্রামের শনিচরীর রুদালী হয়ে ওঠার কাহিনিই এই গল্পের বিষয়বস্তু। স্বামী, শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্তকর প্রয়াসে শনিচরী কাঁদার, শোকের সময়টাও পায় না। এরপর ছেলে বধুয়া মারা গেলে, পুত্রবধু তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেলে নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রবল শোকেও শনিচরী কাঁদতে পারে না। রূঢ় বাস্তবতার কাছে শনিচরী যেন শোক করতে ভুলে যায়, কাঁদতে ভুলে যায়। নাতি হারোয়াকে অবলম্বন করে, নিঃস্ব জীবনে শনিচরী বেঁচে থাকে। কিন্তু তার শেষ অবলম্বন হারোয়া পালিয়ে গেলেও সে আর কাঁদতে পারেনি, কেবল তার চোখ জ্বলছিল, তার সব আবেগ-অনুভুতি যেন নিষ্ঠুর বাস্তবতায় হারিয়ে যায়। এহেন শনিচরীকেই পেট নামক জঠরাগ্নি থেকে রক্ষা পেতে তাকে শেষমেষ কাঁদতে হয়। এই কান্না পেশাদারিত্বের কান্না, এই কান্না কোনো প্রিয়জনকে হারানোর শোক, দুঃখ বা বেদনার অন্তর্ভেদী কান্না নয়, কেবল রুজির কান্না। রুদালী হল সেইসব নারীর মর্মস্পর্শী জীবনগাথা। কান্নার ধরণের উপর পারিশ্রমিক নির্ভর করে। উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষরা তাদের পরিবারের কেউ মারা গেলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাঁদার জন্য লোক ভাড়া করে, এখানেই সমাজের মুখোশধারী মানবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'সমাজবাদ ববুয়া' গল্পে সাঁওতাল গোষ্ঠীর জংলী বেরসার জীবনের অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত, না প্রাপ্তি এবং এই অত্যাচার-বঞ্চনা প্রাপ্তির সূত্রে এটি তার শ্রেণি চেতনায় উত্তরণের কাহিনি। নিতান্ত সহজসরল খেটে খাওয়া মানুষ বেরসা এবং জীবিকার সন্ধানে সে সাঁওতাল পরগনা, আসানসোল বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। বেরসা তার গ্রামে সুরেন সিং-এর কাছে সমাজবাদের গান শুনলেও, সেই মুহূর্তে গানের অর্থ তার বোধগম্য হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সে কয়লাখাদানে কাজ করে সেখানে মারপিট হলে দোষ হয় জংলীর সমাজবাদের গান গাওয়ার। সকলে ভাবে সে সমাজবাদের গান গেয়ে শ্রমিকদের খেপিয়ে তুলছে, এই কারণে তার জেল হয় এবং ভীষণ অত্যাচার করা হয়। কিছু না করেও কেবল গান গাওয়ায় তার শাস্তি হয়। এরপরও সে তার গানকে ছাড়তে পারে না। মাটি চাপা পড়ে শ্রমিকরা মারা গেলে, তার মধ্যে যেন এক প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। সে যেন সমাজবাদের অর্থ বুঝতে পারে। তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগ্রামের উত্তরণ ঘটে তা পরিণত হয় শ্রেণি সংগ্রামে। সে বারবার অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হয়েছে, তারই মতো আঠারো জন শ্রমিক তাদের জীবন দিয়েছে, বঞ্চনার শিকার হয়েছে, তার মূল কারণ মুকুটলালদের মতো মানুষেরা। তাই বেরসার মধ্যে বাবুশ্রেণির উপর প্রতিবাদ, প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। এই প্রতিবাদ, প্রতিশোধ কেবল তার ব্যক্তিগত কারণে তা নয়, এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গোটা অত্যাচারিত মানুষদের হয়ে বেরসার প্রতিবাদ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'লাইফার' গল্পে মাগন সাঁওতালের ব্যক্তিকন্দ্রিক জীবন গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় মাগন সহজ, সরল, নির্বিবাদী মানুষ হলেও রাগের বশবর্তী হয়ে তার স্ত্রী দনিকে হত্যা করে এবং থানায় আত্মসমর্পণ করে ও তার জেল হয়। জেল থেকে ফিরে সে পেশায় লাইফার হয়। কিন্তু জেল থেকে ফিরে সে তার সাঁওতাল পল্লী, স্বজাতিদের খুঁজে পায় না। ফলে মাগন নিঃসঙ্গ জীবনে শূন্যতা অনুভব করে। মাগন উৎকণ্ঠিত ও অনুসন্ধানী হৃদয় নিয়ে সে তার স্বজাতির মানুষদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত সে নিজের পরিচিত পরিজনদের খুঁজে না পেলেও অন্য দলের সাঁওতাল মানুষদের খুঁজে পেয়ে তাদের সাথে পাড়ি দেয়। গল্পে এক শিকড়হীন মানুষের শিকড় সন্ধানের গভীর আকুতি, আর্তি প্রকাশিত।

অসীম রায়ের 'সুন্দর' গল্পে সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষ সুন্দরের রহস্যময় আচরণ চিত্রিত। সাঁওতাল পরগণার একটি কলকাতায় বসবাসকারী বাবুর বাড়ির মালির কাজ করে সুন্দর। সেই বাড়িতে

কয়েকদিনের জন্য অতিথি এলে সে কোনো এক অজানা কারণে-উদ্দেশ্যে, হয়তো বা অধিকারবোধ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে সে রহস্যময় আচরণ করতে থাকে। বাড়িতে আসা সুধীর ও তার পরিবারকে আপ্যায়নের বদলে সে বিরক্তিভাব প্রকাশ করে ও নানাভাবে ভয় দেখায় যাতে তারা সেই বাড়ি থেকে চলে যায় এবং ক্রমাগত সুন্দর সেই চেষ্টা করতে থাকে। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ইট পড়ে, সকালে সুন্দরের আচরণ, যা তার মনের অতলে থাকে অব্যক্ত রহস্যের পরিচয় দেয়। গল্পের মূল বিষয়বস্তু এবং নামকরণ সুন্দর কেন্দ্রিক, তার রহস্যময় আচরণকেন্দ্রিক।

প্রফুল্ল রায়ের 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী' গল্পে দাঙ্গার ভয়াবহতা, স্বাধীনতার সময়ের উত্তাল জোয়ার-ভাটাময় পরিস্থিতি গল্পে বর্ণিত। দাঙ্গা মানুষকে কতটা হিংস্র করে তোলে, চেনা মানুষও কীভাবে সমাজের উস্কানিতে অচেনা হয়ে যায়, তা পরিস্ফুট। দাঙ্গার এই ভয়াবহতাতেও ধুন্নিলালদের মতো কিছু মানবিক, উদার হৃদয়ের মানুষও থাকে। যারা নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রতিবেশীর প্রাণ বাঁচায়। গল্পে দাঙ্গার ভয়বহতাকে অতিক্রম করে ধুন্নিলালের মহানুভবতা, এই মহানুভবতাকে ঘিরেই গল্পের কাহিনি আবর্ত।

প্রফুল্ল রায়ের 'সাতঘরিয়া' গল্পে চিত্রিত এক দোসাদ রমণী চাঁপিয়া দোসাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের পাশাপাশি তার মানবিক সমমর্মিতা ও উদারতা অন্বিত। চাঁপিয়ার বিবাহসংক্রান্ত বিপর্যয়কে ঘিরেই গল্পের বিষয়বস্তু। চাঁপিয়ার ছয়বার বিবাহ হয় কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তার প্রতিটা বিবাহ ভেঙে যায় এবং দু'বার গর্ভপাত হয়। সপ্তমবারে বিবাহের ক্ষেত্রে চাঁপিয়ার মনের আশা হঠাৎ নিভে যায়, নাটোয়ারের সাথে সংসার করার স্বপ্ন চাঁপিয়ার পূরণ হয় না। সুরথপুরার হাট যেখান থেকে আগেও চাঁপিয়ার বিবাহ হয়েছে, সেখানেই নাটোয়ারের সাথে তার আবার বিবাহের স্বপ্নভঙ্গ হয়। হাটে জিনিস কেনাবেচার মতো, একটা মানুষকে কেনাবেচার পদ্ধতি, দোসাদ নারীর সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। এই সুরথপুরার হাটেই গৈবীনাথের সাথে চাঁপিয়ার দেখা হয়। চাঁপিয়ার মতোই গৈবীনাথও ভাগ্য নির্যাতিত, বিপর্যস্ত। গৈবীনাথ গৃহহীন, সেও চাঁপিয়ার মতো সমাজের চোখে বাতিলের দলে। গৈবীনাথকে চাঁপিয়া নিজগৃহে আশ্রয় দেয়, বিয়ে করে। চাঁপিয়ার জীবনের সাতবার বিবাহকে কেন্দ্র করে, দোসাদ ও আদিবাসী সমাজের কিছু চিত্র, সামাজিক অবস্থান লেখক তুলে ধরেন। গল্পে সমাজের দুই বাতিল মানুষের একত্রে বাস, চাঁপিয়ার মানবিক উত্তরণের পরিচয় বহন করে।

নলিনী বেরার 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পের সূচনাতে দেখা যায় কথকের বাড়িতে সুনি সাঁওতাল ও তার বাড়ির লোকজনেরা কাজ করে। কথকের মনে সুনির প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। সুনি ও কথক সমবয়সী হওয়ায় ছোটবেলায় সুনি ঝাঁটা, সাঁওতাল ভাষায় 'বাড়ুন' এনে দেওয়ার কথা বলে কথককে। কিন্তু কথক সেই ঝাঁটা খুঁজে না পাওয়ার কথা শুনে সুনি কথকের হাত ধরে অন্ধকার স্কুলে নিয়ে গিয়ে ঝাঁটা খুঁজে দেখায়। এখানে দেখা যায় কথকের সুনির প্রতি দুর্বলতা, তার চোখের প্রতি ভালো লাগার অনুভব। কথক সুনির সাথে একলা ওই মুহূর্তটা ফিরে পেতে চায়। গল্পের প্রথম অংশে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে প্রথম ভালোলাগার আবেশের পরশ পাওয়া যায়।

এরপরে নানারকম আদিবাসী সংস্কার চিত্র দেখা যায়। এই কুসংস্কার, আদিবাসী মানুষদের অন্ধবিশ্বাসের বলি সুনি। যে সুন্দর চোখের মোহে কথক তার প্রতি দুর্বল হয়েছিল সেই চোখেই সুনির শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে চিড়কিন ভূত সন্দেহে ঝাঁটাকাঠি বিদ্ধ করে। কথকই বড়ো ডাক্তার হয়ে, তার কৈশোরের ভালোলাগার পাত্রী সুনির চোখের চিকিৎসা করেছে। সুনির অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত জীবন বর্ণনার পাশাপাশি আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান গল্পে প্রতীয়মান। আদিবাসীদের মনের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার কতটা ভয়ানক ও বিপজ্জনক হতে পারে তা সুনিকে দেখলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। গল্পে সুনির উপর অত্যাচারের কথা পাওয়া গেলেও তার প্রতিবাদের কোনো কথা পাওয়া যায় না। সে যেন ভাগ্য বিপর্যস্ত এক নারী, যে সুনি কথককে ঝাঁটা চেনালো, সেই সুনির পিঠেই ঝাঁটার দ্বারা প্রহার করা হল আবার তার মোহময়ী চোখে ঝাঁটা কাঠি বিঁধিয়ে দেওয়া হল। সুনির চোখের চিকিৎসার পর প্রথম চোখের ব্যান্ডেজ খোলা হলে তখনও সে ডাক্তারের উত্তরে বলে- "এক জোড়া ঝাঁটার কাঠি, গরম!"[২৮] গল্পে সুনির জীবনের বৃত্ত যেন ঝাঁটার কাঠিতেই আবর্ত।

নলিনী বেরার 'খোরপোষ' গল্পে সুনা সাঁওতালের বিপর্যস্ত, ভাগ্য দ্বারা লাঞ্ছিত জীবনকাহিনি বর্ণিত। সুনা সাঁওতাল সারা বছর পরিশ্রম করে তার জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু এই সুনার জীবনে আচমকাই ঘটে দুর্ঘটনা। সুনার ধান তুলতে গিয়ে পায়ের নীচে পচা খিল ঢুকে গিয়ে সেপটিক হয়ে তার পা নষ্ট হয়ে যায়। সে অক্ষম, পঙ্গু হয়ে পড়ায় মালিকের বাড়িতেও সে ব্রাত্য হয়ে যায়। কথকের বাড়িতে সুনা কাজ করত, সহানুভূতি ও মানবিকতার খাতিরে কথক সুনার সাথে দেখা করতে সুনার বাড়ি গিয়ে নানা পুরানো স্মৃতিরোমন্থন করে, ছোটবেলার কথা বলে, ফেরার সময় কথক সুনাকে তার বাড়ি থেকে অর্থাৎ

মালিকপক্ষের কাছে খোরপোষের দাবি জানাতে বলে, কারণ এত বছর সে শ্রম দিয়েছে, এই খোরপোষ তার প্রাপ্য। কিন্তু একথা সুনার প্রবল আত্মসম্মানে আঘাত হানে। যে বাড়িতে সুনা সততা-আনুগত্যের সাথে শ্রম দিয়েছে, বাড়ির মানুষদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, সেখান থেকে খোরপোষের দাবির কথা সুনা মেনে নিতে পারে না। গল্পের শেষে কথক 'ভুঙ্‌ চুঙ্‌ সারেঙা!' অর্থাৎ ভুল-চুক-সেরে নাও কথার তাৎপর্য জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করে।

সৈকত রক্ষিতের 'যশোমণি মুর্মু' গল্পে বিধবা এক আদিবাসী নারীর মৃত্যুর আকাঙ্খা এবং মৃত্যু পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বিচলিত নারীর আকুতি চিত্রিত। যশোমণির পুত্র জাগরণ তার মায়ের কোনো দায়ভার নেয় না, মায়ের সাথে ঝগড়া হলেই সে বলে তার মায়ের মৃতদেহ শিয়াল, শকুনকে খাওয়াবে। আদিবাসীরা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী হওয়ায় যশোমণির মনে একটা ভয় কাজ করে। সে ভাবে তার এই জীবনের দারিদ্র-কষ্ট এই সবকিছুর অবসান হবে মৃত্যুতে এবং মৃত্যু পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম সঠিকভাবে পালন করলে তার মৃত্যু পরবর্তী জীবন ভালো হবে, এই সংস্কার বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে এক গুণিনের কাছে গেলে গুণিনও তাকে বলে তার মৃত্যু আসন্ন এবং মৃত্যুর তারিখও বলে দেয়। গুণিনের কথায় বিশ্বাস করে যশোমণি গ্রামবাসীকে ডেকে আগাম তার শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্ম করে। কিন্তু গুণিনের বলা ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী যশোমণির মৃত্যুদিন এগিয়ে আসলেও যশোমণির শরীরে মৃত্যুর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না বা তার কোনো শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায় না। এই ভেবে যশোমণি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ও তার মধ্যে মৃত্যুর আকাঙ্খা প্রবলভাবে দেখা যায়। কিন্তু গুণিনের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী মৃত্যু দিনের পরের দিন সকালে গ্রামবাসীরা যশোমণির বাড়ির সামনে মৃত্যু সংবাদ পেতে ও মৃত্যু পরবর্তী দৃশ্য দেখতে উপস্থিত হলে তারা জীবিত যশোমণিকে দেখে ভূত ভেবে ভয়ে পালিয়ে যায়। যশোমণির আকাঙ্খা পূরণ না হওয়ায় এবং আদিবাসী গ্রামবাসীদের মনে কুসংস্কার থাকায় তারা ভবিষ্যতেও যে যশোমণিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখবে না তা স্পষ্ট। যশোমণির জীবনের আকাঙ্ক্ষার কারণে, তার ভুল বিশ্বাসের কারণে তার জীবন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

সৈকত রক্ষিতের 'মাড়াইকল' গল্পে বিদ্রোহের বদলে চেপুলাল চরিত্রের অসহায় আত্মসমর্পন চিত্রিত। লেখক নিজেই এই গল্প এবং চেপুলাল চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন "তাকে দেখে মনে হবে সারা অঙ্গে শিকলের চিহ্ন নিয়েও সে দিব্যি আছে। কিন্তু পাঠক তাকে দেখে স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। সে

যখন তার জীর্ণদেহে বাঁশপাতার মতো বেরিয়ে থাকে পাঁজরগুলি দেখিয়ে তার মনিবকেই প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ কুঞ্জখুড়া, হামি আর কৎদিন বাঁচব? বাঁচব হামি?'[২৯] লেখক চেপুলালকে যেন তার ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বস্ত অস্তিত্ব ও নিঃস্বতার গৌরব নিয়ে এই কৃষিপ্রধান উপমহাদেশের ক্ষেতমজুর তথা শ্রমদাসের আদর্শ প্রতিনিধি রূপে দাঁড় করায়। গল্পে চেপুলাল চরিত্রের অবস্থান এমন জায়গায় পৌঁছায়, যেখানে বিদ্রোহের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর গড়ে উঠলেও, চেপুলালের মধ্যে কিন্তু শ্রেণি সচেতনতাবোধ গড়ে ওঠেনি, বিদ্রোহের বদলে সে ক্রীতদাসের ন্যায় কুঞ্জের অধীনে আত্মসমর্পন করেছে। সে তার মনিবের জন্য আখ চাষ করেছে, গুড় করেছে, সবসময় মুনিশের জীবন অতিবাহিত করলেও, কুঞ্জ কিন্তু তার প্রতি সদয় হয়নি, চেপুলালের আনুগত্যের মূল্য সে পায়নি। বরং শীতের রাতে আঁখশাল পাহারায় থাকাকালীন অবস্থায় কেবল সাঁওতাল হওয়ায় তার কপালে একটা বাড়তি কম্বল জোটেনি, জোটেনি তার আনুগত্যের মূল্য। ঠান্ডায় কুন্ডলী পাকিয়ে চট জড়িয়ে নিভৃতে মরে পরে থাকে চেপুলাল। গল্পে দেশের বিত্তশীল মানুষদের কাছে বারবারই নির্বল-অসহায় মানুষদের জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়ার সারস্বত কাহিনি চিত্রিত। লেখক এই গল্পের মাধ্যমে মূলত দেখিয়েছেন-

> 'মানবমনের পরিবর্তন, চেতনা আসা আবশ্যক, কিন্তু এই আবশ্যকতা যেন কোনভাবেই কৃত্রিমভাবে না ঘটে। কোনো বিদ্রোহ দিয়েই মানবজাতির এই পরিবর্তন আসতে পারে না। তা নিজের মধ্যে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় ঘটতে পারে।"[৩০]

আদিবাসী সমাজের প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে যে বিদ্রোহের আভাস দরকার, তা আদতে হঠাৎ করে আসে না। বাস্তবিকভাবে তারা পরিস্থিতির কাছে চেপুলালের ন্যায় আত্মসমর্পন করে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'বীজ' গল্পে গমিয়ার জীবনযুদ্ধ জয়ী হবার কাহিনি বর্ণিত। চরম খরার কবলে কৃষিজীবী সাঁওতালগোষ্ঠীর মানুষদের জীবনে সঙ্কট নেমে আসে। এরপর বৃষ্টি হলে বিডিও অফিস থেকে সরকারী ধানের বীজ অর্থাৎ বীজধান দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে। কিন্তু গ্রামের মুখিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গ্রামবাসীদের মনে নানান কুসংস্কারের বীজ বপন করে। শিক্ষাহীনতার কারণে গ্রামবাসী মুখিয়ার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে, মুখিয়ার গোলার বীজধান নেয়। কিন্তু গমিয়া একমাত্র যে মুখিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং সম্পূর্ণ একা গ্রামবাসীর মতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ধানচাষের পর দেখা যায়,

গমিয়ার ক্ষেতের ধানের ফলন সব থেকে ভালো এবং সেইজন্য সরকার থেকে পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় মুখিয়ার স্বার্থে ঘা লাগে, তার সম্মানহানি হওয়ায় সে গমিয়াকে খুন করার চক্রান্ত করে। কিন্তু পরিণতিতে গ্রামের সামারু বুড়ো মদের নেশায় মত্ত মুখিয়াকে হত্যা করে গমিয়াকে বাঁচাতে। এই হত্যায় কেবল গমিয়া বাঁচে তা নয়, বাঁচে ফসলের সম্মান, বাঁচে শোষকশ্রেণীর হাত থেকে সহজসরল আদিবাসী মানুষগুলো। গমিয়ার জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার পাশাপাশি যেন একটা জাতির জয়ী হওয়ার কাহিনি, একটা নতুন শুভারম্ভের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অনিল ঘড়াইয়ের 'টিকলি' গল্পে টিকলি ওরফে পালোর অত্যাচারিত হবার পাশাপাশি তার প্রতিবাদের, প্রতিশোধের কাহিনী বর্ণিত। টিকলির মা চাঁদমণিকে গ্রামের মুখিয়া, তার কু-প্রস্তাব না মানায় ডাইনি অপবাদ দেয় এবং রাতের অন্ধকারে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। এরপর পালো ওরফে টিকলির পিতা ছোট পালোকে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বড়ো করার জন্য দেয়। পালোর পালিত বাবা-মা তার নাম রাখে টিকলি। এই টিকলি যখন বড়ো হয়, তার জন্মদাতা পিতা তাকে পুনরায় গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাকে হাঁড়িয়া খাওয়াতে চায়, তার সাথে টাকার লোভে মুখিয়ার ছেলের বিয়ে দিতে চায়। এমনকি তার পিতার প্রশ্রয়েই টিকলি ধর্ষণের শিকার হয়। এই ঘটনায় টিকলি চুপ থাকেনি, সে তার মাকে যারা পুড়িয়ে মেরেছে সেই মানুষগুলোর বিরুদ্ধে, তার জন্মদাতা পিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু আইনের জন্য তাকে তার জন্মদাতা পিতার কাছে ফিরে যেতে হলেও সে মুখ বুজে অন্যায় মেনে নেয়নি, সে তার মায়ের সাথে হওয়া অন্যায়ের, তার নিজের সাথে হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। সে শোষকদের খুন করে, নিজে আত্মহত্যা করেছে। টিকলি তার শত্রুদের মেরে মরেছে, তার মৃত্যু পরাজয় নয়। টিকলির দৃঢ় প্রতিবাদী, প্রতিশোধী, প্রতিরোধী সত্তার জয় হয়েছে, সে অন্যায়ের প্রতিকার করেছে। সংসারে অন্যায়-অনাচার হলে, পাপের বিনাশ ঘটাতে মা দুর্গার আবির্ভাব ঘটে, তেমনই মা দুর্গার ন্যায় টিকলি অসুর নিধন করেছে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'হাতিছাপ' গল্পের বিষয় হয়েছে- গ্রামে গ্রামে হাতিতে নষ্ট করে যাওয়া ধানখেতে হাতির পায়ের ছাপ নকল করে আঁকা ভীমাবুড়োর পেশা এবং তার বিনিময়ে সরকার কর্তৃক জমির মালিকরা ক্ষতিপূরণ পায়, ভীমাবুড়োরও রোজগার হয়। ভীমাবুড়োর এই বিদ্যার অপব্যবহার করতে চায় সমাজের লোভী কিছু মানুষ। ভীমাবুড়ো এর প্রতিবাদ করলেও তা খুব একটা কার্যকরী হয় না। এর

পাশাপাশি গল্পে ভীমাবুড়োর উপলব্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বাস্তবের সত্যতা, ঠিকাদার দ্বারা বনভূমি এবং বনের মানুষদের অস্তিত্ব বিপন্ন তা প্রতীয়মান। চিহড়লতা, শালপাতা, তৈলবীজ অরণ্যের সবকিছুই ঠিকাদারদের থাবা থেকে বাদ যায়নি। তাই আদিবাসী দরিদ্র মানুষদের সবকিছু এখন বাজার থেকে কিনে আনতে হয়। পুঁজিবাদের আগ্রাসনে অরণ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন। ভীমাবুড়োর মনে হয় ঠিকাদাররা অরণ্যচ্ছেদন করে না কেবল, তারা এখানকার শান্তিপ্রিয় মানুষদের মুন্ডছেদন করে।

এই ঠিকাদারদের মতো লোভী শ্রেনির মানুষ জটামোড়ল, যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভের কারণে ভীমাবুড়োর বিদ্যাকে ব্যবহার করতে চায়, টাকার জোড়ে কিনে নিতে চায়। হাতি যখন কৃষকদের ধান নষ্ট করে সেই জমিতে হাতির পায়ের ছাপ দেখিয়ে গ্রামবাসীরা ক্ষতিপূরণ পায়। ভীমাবুড়ো এতই নিখুঁত এই হাতির পায়ের ছাপ আঁকে যে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মীরা আসল-নকলের পার্থক্য করতে পারে না। কিছু লোভী মানুষ এই সুযোগটা নিতে চায় এবং জটামোড়ল ও এই সুবিধাভোগের উদ্দেশ্যে ভীমাবুড়োকে তার এই বিদ্যা পরবর্তী প্রজন্ম রাখাল বিষহরিকে দিয়ে যেতে বলে। প্রথমে ভীমাবুড়ো রাজি না হলেও বিষহরি বালকের জীবনযন্ত্রণার কথা শুনে ও তার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে ভীমাবুড়ো তাকে এই শিক্ষা শেখালেও বিষহরির হাতে হাতির পায়ের ছাপের বদলে ফুটে মানুষের পায়ের ছাপ, জটামোড়লের পায়ের ছাপ। এখানে জটামোড়লের পায়ের ছাপ লোভী, স্বার্থপর, পুঁজিবাদী, মুখোশধারী সমাজের প্রতিভূ। যারা নিজের জমির ধান নিজেরাই লুটে নেয় আবার হাতির পায়ের ছাপ জমিতে এঁকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে উদরপূর্তি করতে চায়। এই স্বার্থপর শ্রেণির লোভের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আসল অসহায় মানুষগুলো। ভীমাবুড়ো দারিদ্র ও অসহায়তার কারণেই সে এই কাজ করতে বাধ্য হয়, তার এই কাজের পিছনে মূল কারণ তার আর্থিক দুরাবস্থা। সে প্রতিবাদ করলেও সে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। বিষহরির হাতেই যেন ফুটে ওঠে বাস্তবের সত্য প্রতিচ্ছবি। যে প্রতিবাদ করতে ভীমা পারেনি, তা যেন সঞ্চারিত হয়েছে বিষহরির হাতে।

আদিবাসী জীবনশ্রয়ী গল্পগুলিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে সমস্ত গল্প বিষয়ের আলোচনা করা হল, সেক্ষেত্রে বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিজীবনের কাহিনি গল্পের বিষয় হয়েছে। গল্পকারের প্রত্যক্ষ দর্শন, জীবনগত অভিজ্ঞতার ফসল এই গল্পগুলি। বিচিত্র মানুষের মনের অন্তরের হদিশ এবং গল্পে ব্যক্তি কতটা কেন্দ্রীয়

চরিত্র ও ব্যক্তিবোধ কীভাবে গল্পের কাহিনির উত্তরণ ঘটিয়েছে, জীবনের নানা প্রেক্ষিত থেকে গল্পের ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে।

৫.খ|২- প্রেম-দাম্পত্য-পরকীয়া ও মনস্তত্ত্ব কেন্দ্রিক বিষয়:

আমাদের গবেষণাপত্রে নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে অনেক গল্পের বিষয় প্রান্তিক, জনজাতি মানুষের প্রেম-দাম্পত্য, পরকীয়া সম্পর্কিত, এব্যাতীত গল্পগুলিতে চরিত্রের নানান মনস্তাত্ত্বিক স্তরীয় বিন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রেম-দাম্পত্য-পরকীয়া ও মনস্তত্ত্ব বিষয়কেন্দ্রিক গল্পগুলি হল- বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ', তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী', 'একটি প্রেমের গল্প', 'বেদের মেয়ে', 'শঙ্করীতলার জঙ্গলে', 'দেহের প্রদীপে রূপের শিখা', 'বেদেনী', বনফুলের 'বুধনী', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'রাঙাশাড়ি', 'প্রতিবন্ধক', 'নারীর মন', 'কয়লাকুঠি', সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িনু', রমাপদ চৌধুরীর 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'নারীরত্ন', 'তিনতারা', সমরেশ বসু'র 'উত্তাপ', 'গুণিন', 'অরণ্যনিশি', 'অস্তিত্ব', ভগীরথ মিশ্রের 'দৃষ্টি', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যাভিচারিণী', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'মানুষ ও বেগুন', নলিনী বেরার 'চার আনা আট আনার প্রেম', সৈকত রক্ষিতের 'উৎখাতের পটভূমি', অনিল ঘড়াইয়ের 'উরাংগাড়া', 'আকাশ মাটির খেলা', 'বনের মানুষ বনে', 'খরার আকাশ'।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ' গল্পে সিঁদুরচরণ ও এক আদিবাসী নারী কাতু'র অন্যরকম প্রেমমনস্ক সুন্দর, সহজ প্রেমের কাহিনি চিত্রিত। কাতু, সিঁদুরচরণের থেকে বয়সে বড়ো এবং তারা অবিবাহিত, তাও তারা একসাথে স্বামী-স্ত্রী'র মতো থাকে। বর্তমান সময়ে এটাকে 'লিভ ইন' বলা হয়। তৎকালীন সমাজে লেখকের এই আধুনিক ও সাহসী মনোভাব গল্পের বিষয়বস্তুতে স্বাতন্ত্র্যতা, নতুনত্ব আনে। সিঁদুরচরণ বেশ কয়েক মাসের জন্য ভ্রমণে বেরোয়। এই দূরত্ব কাতু ও সিঁদুরচরণের সম্পর্কে গভীরতা, টান, প্রেমে এক নতুন মাত্রা সংযোগ করে। দূরত্ব তাদের ভালোবাসাকে বাড়ায়, দিনের শেষে তারা একে-অপরের থেকে দূরে থেকেও সর্বক্ষণ একে অপরের কথা ভেবেছে। 'সিঁদুরচরণ' গল্পটি দুটো মানুষের সহজসরল-নিখাদ, আড়ম্বরহীন এক ভালোবাসার গল্প।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী' গল্পের মূল বিষয়বস্তু এক সাপুড়ে পরিবারের দাম্পত্য প্রেম ও সাপুড়ের সাপিনীর প্রতি ভালোবাসা এবং নারী ও নাগিনীর মধ্যেকার ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব চিত্রিত। গল্পে দেখা যায় খোঁড়া শেখের স্ত্রী জোবেদার প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা এবং তার পাশাপাশি এক উদয়নাগ সাপিনীর প্রতি ভালোবাসা-মমতার সম্পৃক্তি। খোঁড়া ও জোবেদার দাম্পত্য জীবনে মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ভূমিকা পালন করেছে উদয়নাগ সর্প শিশুটি, খোঁড়া যার নামকরণ করেছে বিবি। খোঁড়া এই সর্পশিশুটিকে সিঁদুর পরিয়ে, নাকে মিনি পরিয়ে বিয়ে করার রীতি পালন করে জোবেদাকে বলেছে এটা তার সতীন, যেন এখানেই তাদের নিয়তি, পরিণতি রচিত হয়েছে। সাপের প্রতি খোঁড়ার টান, ভালোবাসা জোবেদা মেনে নিতে পারেনি, ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে সে সাপটিকে তাড়িয়ে দেয়। জোবেদা ও খোঁড়ার মধ্যে যেন এক ব্যবধান আসে। সেইদিন রাত্রেই কিন্তু সাপটি জোবেদাকে ঘুমের মধ্যে দংশন করে এবং জোবেদার মৃত্যু হয়। কিন্তু বিবির প্রতি এক অদ্ভুত মমতায় খোঁড়া সাপটিকে মারতে পারে না, খোঁড়া উপলব্ধি করে জোবেদা ও বিবি দুজনেই সত্যিই সতীনের ন্যায় মনোভাব পোষণ করেছে, তাই জোবেদা ও সাপটি একে অপরকে সহ্য করতে পারেনি, ঈর্ষান্বিত হয়ে দুজনেই দুজনের জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। নারী ও নাগিনীর দ্বন্দ্বে জয় হয়েছে নাগিনীর। সাপিনীর প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ, মোহেই ইতি ঘটে খোঁড়া ও জোবেদার দাম্পত্য এবং খোঁড়া ফকিরি গ্রহণ করে। গল্পের অভিনব বিষয়বস্তু, মানুষের মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ, মনস্তত্ত্ব ও পরিণতি তারাশঙ্করের কলমে সুদক্ষ কৌশলে ফুটে উঠেছে। বাংলা ছোটগল্পের জগতে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের স্নেহ-মমতা-ভালবাসার চিত্র থাকলেও 'নারী ও নাগিনী' গল্পে চিত্রিত মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের এমন মোহ-আকর্ষণ, মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস প্রথম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পেই দেখা যায় এবং পরবর্তীতে আশির দশকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের যৌন আকর্ষণ কেন্দ্রিক কাহিনি পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের গল্প' গল্পে সাঁওতাল মেয়ে ফুলমণির সহজসরল মন তার প্রেম-প্রেমভঙ্গ, হতাশা বোধ, আত্মগ্লানি, আত্মহত্যার চেষ্টা এবং শেষে ফুলমণির জীবনের উত্তরণের কাহিনি গল্পে চিত্রিত। গল্পটি তিনটি অংশে ভাগ করলে দেখা যায় প্রথমাংশে ফুলমণি কথকের বাড়িতে কাজের সূত্রে আসে এবং সেখানে ফুলমণির সাথে শকুন্তলা ও তার দাদার সাথে সখ্যতা তৈরি হয়। এক অপরূপ সুন্দরী সহজসরল, প্রাণবন্ত মিশুকে আদিবাসী নারীকে পাই। দ্বিতীয়াংশে ফুলমণির সাথে বুধনের

প্রেম ও প্রেমে প্রতারণার শিকার হয় ফুলমণি। বুধনের সাথে ফুলমণির বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুধন তাকে ঠকিয়ে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে। এই মানসিক আঘাত ও বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ফুলমণি সহ্য করতে না পেরে সে ঘুমন্ত অবস্থায় বুধনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু সে বুধনকে হত্যা করতে গিয়েও আঁটকে যায়। সে বুধন ও তার স্ত্রীকে দেখে তাদের মাঝে নিজেকে প্রতিবন্ধক মনে করে এবং মনে মনে তাদের সুখ কামনা করে। সে আত্মসংবরণ করে বুধনকে হত্যা করার পরিবর্তে নিজেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এই খুনের চেষ্টা ও আত্মহত্যার চেষ্টায় সুরমণির দু'বছর জেল হয়। তৃতীয় অংশে দেখা যায় সংশোধনাগারে থেকে ফুলমণির চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হয়। যেন সে গোত্রান্তরিত হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফুলমণি দেওঘরের হাসপাতালে নার্সরূপে যোগ দেয়, তার আচার-ব্যবহারে শিক্ষিত মার্জিতের ছাপ লক্ষ্যনীয়। গল্পের শেষে কথকের নাতি মিতের প্রতি ফুলমণির একটা অন্যরকম মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। ভালোবাসার বিশ্বাসঘাতকতায় সুরমণি নিজেকে এক অন্য নতুন মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তার দৃঢ়, সাহসী, সহজ-সরল মনোভাব, আদিম সমাজস্তরের আত্মরতিপরায়না ফুলমণি অন্ধকারে হারিয়ে না গিয়ে, নিজেকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে সকলের শুভৈষিণী সেবিকারূপে মানবিক স্তরে উন্নীত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদের মেয়ে' গল্পে বেদেনী শিবি, শিবির প্রেম-ভালোবাসার কাহিনিকে ঘিরেই গল্পের বিষয়বস্তু। শিবির পনেরো-ষোলো বছর বয়সে প্রথম গুপ্ত মহাশয়ের দৌহিত্র্য প্রভাতের প্রত্যাখ্যান শিবির আত্মভিমানে লাগে। এরপর আর প্রভাতের সাথে শিবির দেখা হয় না। সাত-আট বছর পর শিবির ভোলার সাথে বিয়ে হয়ে যায়। আরও কয়েক বছর পর বিয়াল্লিশের পটভূমিতে প্রভাতের সাথে শিবির দেখা। প্রভাতকে দেখে একটু হলেও শিবির মনে তার সেই প্রথম প্রেম জেগে ওঠে। সে প্রভাতকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে চাইলেও সে পারে না আবার প্রভাত শিবির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রভাত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

এরও কয়েকবছর পর প্রভাতের সাথে আবার শিবির সাক্ষাৎ কিন্তু অন্য নাটকীয়ভাবে। শিবির স্বামী ভোলা ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে, পুলিশের হাত থেকে ভোলাকে বাঁচাতে শিবি নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করলেও সেক্ষেত্রে ভোলা ধরা পড়ে যায়। কারণ এই একইভাবে কয়েকবছর আগে শিবি প্রভাতকে বাঁচাতে চেয়েছিল, তাই প্রভাতের শিবির পদ্ধতি জানা ছিল। শিবি তার স্বামীকে

বাঁচাতে কালী নাগিনীর ন্যায় ছোঁড়ার আঘাত হানে পুলিশের বুকে, সেই পুলিশই ছিল স্বয়ং প্রভাতবাবু। প্রভাতের রক্ত শিবির ঠোঁটে-গালে লেগে। বেদের মেয়ে স্বৈরিণী শিবির প্রেমের এই সর্পকুটিল স্বরূপ রচনায় লেখক ছোটগল্পের সার্থক শিল্পরীতির মাধ্যমে বেদিয়া জনজাতির জীবনচর্যা এবং নারীমনের যে জটিল মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, তা অভিশপ্ত প্রেমের ট্র্যাজেডিকে মূর্ত করে তুলেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্করীতলার জঙ্গলে' গল্পে আদিমজাতির পুরুষ ঘনশ্যাম দাসের আদিম হিংস্র-বর্বর, প্রেমোন্মত্ত, রাক্ষুসে প্রবৃত্তির কথা চিত্রিত। গল্পের পরিণতি থেকে গল্পের সূচনা ও কাহিনির উদ্‌ঘাটন। গল্পে পশুপতি দাসের মেয়ে গীতা দাসীর প্রথম বিয়ের পর স্বামী মারা গেলে সে তার কন্যাসন্তানকে নিয়ে ঘনশ্যামকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। ঘনশ্যাম প্রথমে টুলু অর্থাৎ গীতার চার বছরের শিশুকন্যাকে ভালোবাসলেও পরে বোঝা যায় সে টুলুকে মন থেকে মানতে পারেনি। সে কেবল গীতাকে চেয়েছে। টুলুও প্রথমে তাকে বাবা বলতে রাজি ছিল না, সেও খুব একটা ঘনশ্যামকে পছন্দ করত না। শিশুরা ভীষণই অনুভূতিপ্রবণ হয়, হয়ত বুঝত ঘনশ্যাম তাকে পছন্দ করে না। গীতা মা হওয়ায় জাগতিক নিয়মে সন্তান মায়ের অনেকখানি জায়গা, মনোযোগ ও সময় দখল করে থাকে। ঘনশ্যাম এবং গীতার ঘনিষ্ঠ মূহুর্তে টুলু তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ঘনশ্যাম এখানেই যেন হিংস্র হয়ে ওঠে, তার মধ্যে আদিমতার রাক্ষস জেগে ওঠে। সে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে টুলুকে হত্যা করে। সেই অপরাধে ঘনশ্যামের ফাঁসি হয় ও গীতার মনের অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্র গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। ঘনশ্যাম চরিত্রে বনফুলের 'বুধনী' গল্পের বিল্টু চরিত্রের ছায়া পরিলক্ষিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেহের প্রদীপে রূপের শিখা' গল্পে মানবমনের বক্রকুটিল অলিগলি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। গল্পের শেষাংশে ভামিনী চরিত্রের অন্য স্বরূপ উন্মোচিত, গল্পে চমকের পর চমক মেলে। জমিদার বাড়ির ছেলে কৃষ্ণকিশোর লম্পট চরিত্রের কারণে প্রথমা স্ত্রী মারা যায়। এছাড়াও আরও একটা বড়ো কারণ কৃষ্ণকিশোর ও প্রান্তিক অচ্ছুৎ মেয়ে চারুর প্রেম। সামাজিক বর্ণবৈষম্যের কারণে কৃষ্ণকিশোরের পরিবার চারু ও কৃষ্ণকিশোরের প্রেম মেনে নেয়না। চারু সমাজে অস্পৃশ্য, তাই তার সাথে কৃষ্ণকিশোরের বিবাহ হয় না কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের শেষ সময় অবধি চারুর সাথে তার সম্পর্ক ছিল, ভালোবাসা ছিল। কৃষ্ণকিশোরের রূপে মোহিত হয়ে ভামিনী তার সতী পরিচয়, দেখতে অসুন্দর স্বামী রাধাবিনোদ-কে বিশ্বাসঘাতকতা করে ছেড়ে আসে। অন্যদিকে হাজারো বাঁধা-বিপত্তি সত্ত্বেও চারু কৃষ্ণ

কিশোরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সতী, ভামিনী পরিচয় নিয়ে কৃষ্ণকিশোরের দ্বিতীয় স্ত্রী রূপে তাদের বাড়িতে থাকে এবং নিজের করা ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে সারাজীবন ঠাকুরের সেবা করে। কৃষ্ণকিশোর ও চারুর প্রেম, ভামিনী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন মুখ বুজে মেনে নেয়, কৃষ্ণকিশোরের প্রতি কর্তব্য করে তার উত্তর গল্পের শেষাংশে মেলে। গল্পে একদিকে চারুর কৃষ্ণকিশোরের প্রতি ভালোবাসা, সতীর প্রতি রাধাবিনোদের ভালোবাসা অন্যদিকে ভামিনীর ভালবাসার ভিন্ন রূপ পরিস্ফুট। কৃষ্ণকিশোর-চারু-ভামিনী ওরফে সতী-গোস্বামীর দাম্পত্য এবং জীবনবৃত্তান্ত, রূপের কাছে ভালোবাসার জয়-পরাজয় এই গল্পের উপজীব্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বেদেনী’ গল্পের বিষয়বস্তু রাধিকা বেদেনীর জীবনপিপাসা, তাদের যাযাবর জীবন ও মানসিকতা এবং তার দাম্পত্যজীবন, পরকীয়া। রূপে-যৌবনে ভরপুর রাধিকা বেদেনীর এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে আসক্তিতে স্পষ্ট বেদিয়াদের যাযাবর জীবনের ন্যায় মননে মানসিকতাতেও যাযাবর জীবনের প্রভাব বর্তমান। আদিম জীবনের গতিময়তার সাথে তাল মিলিয়ে বারংবার রাধিকা বারংবার সঙ্গী বদল করেছে। এই অনুরূপ যাযাবর, সঙ্গী বদলের মানসিকতা ‘সাপুড়ের গল্প’ গল্পের কালি বেদেনী, ‘বেদের মেয়ে’ গল্পে শিবি বেদেনীর মধ্যে পরিলক্ষিত, এছাড়া আরও অনেক গল্পে আদিবাসী বিশেষত বেদিয়া নারীদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। রাধিকার প্রথম জীবনে শিবপদ বেদের সাথে বিবাহ হয়। শিবপদ বেতের কাজ করত, শান্তশিষ্ট, কোমল স্বভাবের এবং রাধিকাকে স্বচ্ছলজীবনে ভালোভাবে রাখত। কিন্তু রাধিকা সার্কাসের মালিক পৌরুষদীপ্ত শম্ভুর বলিষ্ঠদেহের প্রেমে পড়ে এবং শিবপদর সাথে সুখী দাম্পত্য পরিত্যাগ করে শম্ভুর সাথে পালিয়ে যায়। শম্ভুর সাথেও তার দাম্পত্য ভালোভাবে চললেও কঙ্কালিতলার মেলায় কিস্টো নামক অন্য এক সার্কাসের মালিকের প্রতি রাধিকা মোহিত হয়। তখন তার চোখে শম্ভুর এবং তার দলের দৈন্যতা চোখে পড়ে, সে হীনমন্যতা বোধ করে। সে আবারো শম্ভুকে ত্যাগ করে এবং বিশ্বাসঘাতকর করে, তার কামনা-বাসনার মোহে রাতের আঁধারে কিস্টোর সাথে পালিয়ে যায়। আদিম জীবন পিপাসায় ভরপুর রাধিকার জীবন এবং তার স্বেচ্ছাচারিতা ও আদিম উন্মত্ততার কারণে তার একাধিকবার সঙ্গীবদল ও তার দাম্পত্যজীবন ব্যাহত। গল্পে মূলত বেদিয়া নারীর আদিম উন্মত্ততা ও তাদের জীবন ও মনন মানসিকতার যাযাবরী রূপচিত্র প্রতীয়মান।

বনফুলের ‘বুধনী’ গল্পে আদিমজাতির যুবক বিল্টু ও বুধনীর প্রেম, দাম্পত্য ও বুধনীর প্রতি বিল্টুর প্রেমোন্মাদ আদিম প্রেম-পিপাসার কথা চিত্রিত। গুহাবাসী নারী বুধনীকে দেখে বিল্টুর প্রেমে পড়ে এবং তাদের আদিবাসী রীতি অনুয়ায়ী বিবাহ হয় এবং একটি পুত্রসন্তানও হয়। ফলত জাগতিক নিয়মানুসারে বুধনীর জীবনের মনোযোগ, ভালোবাসা ও সময় কেবল বিল্টুর প্রতি থাকে না, তার সন্তান ও বুধনীর জীবনের অনেকটা জায়গা দখল করে নেয়। বিল্টু বুধনীর পরিবর্তন কখনই মেনে নিতে পারে না এবং সে হিংস্র হয়ে ওঠে। বিল্টু তার এবং বুধনীর মাঝে, তাদের ভালোবাসার প্রতিবন্ধক হিসাবে তাদের শিশুসন্তানটিকে হত্যা করে কেবল বুধনীকে সম্পূর্ণভাবে একার করে পাবার আকাঙ্খায়। বিল্টুর এই ঘৃণ্য অপরাধে তার শাস্তি হয় মৃত্যুদন্ড। ফাঁসির সময়েও বিল্টুর মুখে কেবল উচ্চারিত হয় বুধনীর নাম। বুধনীর প্রতি বিল্টুর আদিম প্রেম, উন্মত্ত সর্বগ্রাসী ভালোবাসা এবং হিংসা, অধিকারবোধের কারণে তাদের দাম্পত্যজীবন বিপন্ন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘রাঙাশাড়ি’ গল্পে সাঁওতাল যুবক লুটন মাঝি ও লুটনীর প্রেম ও তাদের ট্র্যাজিক পরিণতি গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। এই গল্পে আদিবাসী রীতিতে লুটন লুটনীকে তার পরিবারের মতে বিয়ে করতে সম্মতি পায়। লুটন লুটনীকে ‘রাঙাশাড়ি’ পুজোর সময় কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। একটু বাড়তি উপার্জনের আশায় সে ঝোলা কয়লাখাদান থেকে কয়লা চুরি করতে গিয়ে কয়লার চাঙড় ভেঙে পড়ে বিপত্তি ঘটে, লুটনের দুটো হাত অকেজো হয়ে যায়। লুটনের হাত অকেজো হয়ে যাওয়ায়, লুটনীর দাদা বেশী কন্যাপণ পাবার লোভে অন্যত্র বিয়ে ঠিক করে লুটনীর। লুটনীর মুখে একথা শুনে লুটন এক অব্যক্ত বেদনার জ্বালায় গুমড়ে মরে একাকী অসহায়ভাবে। লুটন-লুটনীর প্রেমের বেদনাকাতর মর্মান্তিক পরিণতি, লুটন-লুটনীর ভালোবাসার ঘর-সংসারের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। লুটনের মতো আজ তার স্বপ্নগুলোও অসহায়, অকেজো, বেদনার ভারে গুমড়ে মরে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রতিবন্ধক’ গল্পে কথক ময়নাবুনি কয়লাকুঠির ম্যানেজার হিসাবে তার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কয়লাখাদের আদিবাসী শ্রমিক পল্টু–কিন্নি–ঝুমনের ত্রিকোণ প্রেম, ক্ষোভ-হিংসা, ত্যাগের চিত্র চিত্রিত। পল্টুর স্ত্রী কিন্নিকে ঝুমন ভালোবাসে, এই নিয়ে পল্টু ও ঝুমনের বিবাদ, তাতে ঝুমন হেরে গেলে শর্তানুযায়ী সে চলে যায় কিন্নির থেকে দূরে। কিন্তু কিছুদিন পরে ঝুমন ফিরে আসে কিন্নিকে শেষ দেখা দেখতে। এরপরেই ঝুমন আত্মহত্যার জন্য কয়লাখাদের মধ্যে চলে যায়।

পল্টুও ঝুমনের ফেরার খবর পেয়ে রাগে ঝুমনকে খুন করতে ওই খাদে যায়, কিন্নিও যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে ভুলবশত তিনজনই খাদে আটকে পড়ে। এখানে একজনকে মরতেই হত, সেক্ষেত্রে পল্টু ঝুমনকে মারতে গিয়েও সে ঝুমন ও কিন্নির পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা দেখে নিজেকে তাদের ভালোবাসার প্রতিবন্ধক মনে করে। সে নিজেই ডিনামাইট ফাটিয়ে আত্মহত্যা করে ঝুমন ও কিন্নির ভালোবাসার প্রতিবন্ধকতা নিজেকে তাদের জীবন থেকে মুছে ফেলে। পল্টু চরিত্রে ক্ষোভ, হিংসা, হীনমন্যতা ও শেষে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে পল্টু চরিত্রের উত্তরণ ঘটে। ভালোবাসার দ্বন্দ্বে কয়লা শ্রমিকের তার স্ত্রীর জন্য স্বেচ্ছামৃত্যু, গল্পে আদিবাসী মানুষদের ভালোবাসার এক অন্য রূপ চিত্রায়িত। বলপূর্বক অধিকারে নয় বরং ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত প্রকৃত ভালবাসার স্বরূপ, এই সারসত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেমের এই দর্শন শৈলজানন্দের বহু গল্পে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘নারীর মন’ গল্পে কয়লাখনির কুলি-কামিন, শ্রমিক মানুষদের দাম্পত্য প্রেম, পরকীয়া, প্রেমের জন্য ত্যাগের মহিমা গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। গল্পে দেখা যায় ভুলি ও পীরু ভালোবেসে বিয়ে করে, তাদের দাম্পত্যজীবন ভালোই ছিল কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন হয়। ভুলির বোন টুরনীর সাথে পীরু পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ভুলি এর প্রতিবাদে টুরনীকে থাপ্পড় মারলে পীরু ভুলিকে উল্টে মারে ও অপমান করে সর্বসম্মুখে। ভুলি অবসাদে-অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে প্রতিবেশী ভোলার কাছে যায়। ভোলার সাথে ভুলির প্রথম বিয়ের দেখাশোনা হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণবশত তা পরিণতি পায়নি। ভোলার মনে ভুলির বিবাহের পরও ভুলির প্রতি দুর্বলতা থাকার সুযোগ নিতে চায় ভুলি। ভুলি ভোলার মনের খবর জানে, তাই সে ভোলাকে বলে যদি পীরুকে গায়ের জোড়ে হারাতে পারে তাহলে সে তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু ভোলা পরাজিত হয়। এরপরই সে জানতে পারে তার বোন টুরনী আসামে চা-বাগানে ঠিকাদারের সাথে শ্রমিকের কাজ করতে চলে আছে, সে আর কোনদিনও ফিরে আসবে না, তখনই প্রেমাভিমানিনী ভুলি সব ছেড়ে বোনের বদলে নিজে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ভুলি নিজের ভালোবাসাকে, স্বামীকে এবং নিজের ভালোথাকাকে আত্মত্যাগ করে, বোনের হাতে সব সঁপে দিয়ে ভুলি যাত্রা করে অজানার উদ্দেশ্যে। মন ত্যাগী হলেও চোখের জলেই তার মনোভাব প্রকাশিত। প্রেম-দাম্পত্য ও পরকীয়া এবং গল্পে মানবমনের জটিল রহস্যের বিচিত্র কাহিনি চিত্রিত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' গল্পেও বিলাসী নান্‌কুর প্রেম-দাম্পত্য, পরকীয়া ও বিলাসীর হৃদয়সর্বস্ব ভালোবাসা চিত্রিত। নান্‌কু ও বিলাসী কয়লাখাদানের শ্রমিক, তারা ভালোবেসে বিয়ে করলেও কয়েকবছর পর হঠাৎই বিলাসী একদিন জানতে পারে নান্‌কু খাদানেরই অন্য এক নারী মাহনুকে নিয়ে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকরা করে পালিয়ে গেছে। বিলাসী নান্‌কুর এই বিশ্বাসঘাতকতায় প্রচন্ড মানসিক আঘাতে সাময়িকভাবে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সে মুখে প্রকাশ না করলেও তার অন্তরে নান্‌কুর প্রতি গভীর ভালোবাসা, অভিমান প্রকাশ পায় তার গানের মাধ্যমে, তার চোখের জলে। বিলাসী নান্‌কু চলে যাওয়ার পর রমনার সাথে থাকলেও সে রমনাকে কোনোদিনই নান্‌কুর স্থান দিতে পারেনি। তার ভালোবাসার, বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে পারেনি রমনা। তাই বিলাসী যখন নান্‌কুর ফিরে আসার এবং নান্‌কুর মৃত্যুসংবাদ পায় সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে যায় নান্‌কুকে শেষ দেখা দেখার জন্য। সে নিজের জীবনও বিপন্ন করে নান্‌কুর ভালোবাসায়। গল্পের পরিণতিতে নান্‌কুর বিশ্বাসঘাতকতার পরেও বিলাসীর নান্‌কুর প্রতি ভালোবাসা, টান, প্রেমের তীব্র উন্মাদনায় স্বেচ্ছায় নিজের বলিদান গভীর প্রেমাস্পদের পরিচয় বহন করে। ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বিশুদ্ধ প্রেম দুঃখ-ত্যাগকে স্বীকার করে নেয়, এই দর্শনই গল্পের মূল উপজীব্য।

সমরেশ বসু'র 'অস্তিত্ব' গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে দিবাকরের ও মুসোইয়ের প্রেম ও তাদের পারিবারিক চিত্র। গল্পে এক সাধুর কারণে দিবাকর তার বাবা-মা, ভাইবোন সকলকে হারায়। সাধু তাকেও হত্যা করতে চায় কিন্তু সে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। দিবাকর প্রাণে বাঁচতে পাহাড়ের নীচে ঝর্ণায় পড়ে গেলে সেখানেই তার সাথে ত্রিপুরার আদিবাসী রিয়াং জনজাতির মেয়ে মুসোর সাথে তার পরিচয় ও প্রেম। দিবাকরের সমস্ত ক্ষতে প্রলেপ দেয় মুসো। ক্ষণিক পরিচয়ে মুসো ও দিবাকরের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা হয়, একথা মুসো তার বাবা-মাকেও নির্দ্বিধায় অকপটে বলে এবং সে তার বাবা-মা'র সাথে দিবাকরের পরিচয় করিয়ে দেয়। মুসোর ভালোবাসায়, প্রেমে দিবাকর তার অস্তিত্ব ফিরে পায়। গল্পে একদিকে যেমন দিবাকরের পারিবারিক জীবন, মুসোর সাথে প্রেম, অতি অল্প সময়েই তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চিত্রিত, তেমনই অন্যদিকে মুসোর তার পরিবারের সাথে এত খোলামেলা সম্পর্ক বেশ চমক দেয়।

সমরেশ বসু'র 'উত্তাপ' গল্পের এক সাঁওতাল নারীর নগ্ন বুকের উত্তাপে অসুস্থ শহুরে মানুষ হরেনকে সুস্থ করে তোলার পর হরেনের বিকৃত কাম-বাসনা তাকে আঘাত করে। সাঁওতাল রমণীর প্রতি

প্রথম থেকেই হরেনের একটা লোভ-কাম, লালসা ছিল। প্রবল বৃষ্টিতে অনেক পথ হাঁটতে গিয়ে হরেন অসুস্থ হয়ে গেলে, সাঁওতাল নারীটি সে তার ছয়মাসের ছেলেকে হারিয়েছিল কিছুদিন পূর্বেই, সেই মাতৃস্নেহ জাগরিত হয় হরেনের প্রতি। পরম মমতায় নিজের নগ্ন বুকের উত্তাপে হরেনকে সুস্থ করার পর হরেনের হিংস্র-লোভী, কামনা-বাসনার রূপ তাকে প্রবলভাবে আঘাত করে। সহজসরল গ্রাম্য মেয়ের নিখাদ মানবিক সত্তার পাশাপাশি শহুরে আধুনিক মানুষের বিকৃত কামমনস্কতার পরিচয় মেলে এই গল্পে।

সমরেশ বসু'র 'অরণ্যনিশি' গল্পে এক চিত্রকরের আঠারো দিনের স্বপ্নবিহার এর কাহিনি বিষয়বস্তু হয়েছে। এই আঠারো দিনে প্রবাসী বন্ধু মনমোহনের অতিথি হিসাবে চিত্রকর সারেন্ডার জঙ্গলে বেড়াতে এসে সেখানেই তার সাথে আদিবাসী মেয়ে মাঞ্জারীর সাথে পরিচয় ও প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক। গল্পে মাঞ্জারী চারিত্রটি ভীষণই বাস্তববাদী, দৃঢ়চরিত্রের নারী হিসাবে চিত্রিত। সভ্যতার আলো থেকে বহুক্রোশ দূরে থেকেও মাঞ্জারীর মধ্যে বাস্তবজ্ঞান প্রবল, যে কারণেই সে বোঝে এই অরণ্যে তার মতো মুন্ডা মেয়ের সাথে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত পুরুষ কখনই সংসার করতে পারবে না। সে তার ভালোবাসার প্রতিদানে কিছু চায়নি, কেবল নিঃশর্ত-নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে। সমরেশ নিজের জীবনে বিশ্বাস করতেন এই গ্রাম্য আদিবাসীদের ভালোবাসা নিখাদ, এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটে এই গল্পে ও তাঁর সাহিত্যে। চিত্রকর ও মাঞ্জারীর ভালোবাসার সম্পর্কের বিচ্ছেদের চিত্রে ভারাক্রান্ত গল্পের বিষয়।

সমরেশ বসু'র গুণিন' গল্পে প্রেমোন্মত্ত নকুড় গুণীনের ট্র্যাজিক পরিণতি ও হরিমতির বিষাদময়তা গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। বিধবা হরিমতি নকুড় একে অপরকে ভালোবাসলেও তারা একে অপরকে বলতে পারে না। হরিমতি একদিন মজার ছলে নকুড়কে বলে সে একজনকে ভালোবাসে কিন্তু তাকে বশ করতে পারছে না, হরিমতি তাকে বশ করতে চায়। নকুড় হরিমতির মজা বুঝতে না পেরে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তুকতাক করতে গিয়ে, হরিমতিকে নিজের করতে গিয়ে তার মর্মান্তিক পরিণতি হয়। নকুড়ের মৃত্যুতে বিধবা হরিমতির জীবনেও আবারও অন্ধকার নেমে আসে। তারা জীবনে সুন্দর করে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি ও হঠকারিতার ফল নকুড়ের মর্মান্তিক পরিণতি।

সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িনু' গল্পে ত্রিকোন প্রেম, বিশ্বাঘাতকতা, ভাগ্যের পরিহাস চিত্রিত। অভ্রখনিতে শ্রমিকের কাজ করে দীনেশ ও বিলাসী। দীনেশের মনে বিয়ের ইচ্ছা, বিলাসীর পাশে দাঁড়িয়ে

আত্মনাশের প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়। এই খনির পাশে তেঁতুলিয়া গ্রামের মাঠে বেদেদের বসতি। সেখান থেকেই খনিতে বেদিয়া রমনী সারা চুরি করতে গিয়ে দীনেশের কাছে ধরা পড়ে। এই সারাই দীনেশকে ভালোবেসে ফেলে আর অন্যদিকে বিলাসীর মনেও দীনেশের প্রতি দুর্বলতা দেখা যায়। সারার ভালোবাসা যেন দীনেশের বহুদিনের মনের আকাঙ্খাকে পূরণ করে। সারাকে জীবনসঙ্গী পেতে দীনেশ বিলাসীর মনের দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। কন্যাপণের টাকা জোগাড়ের জন্য দীনেশ বিলাসীকে মৃত্যুগহ্বরে ফেলে যায়। যে সারার জন্য দীনেশ বিলাসীর নির্মল ভালোবাসাকে পদদলিত করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেই সারাও দিনের শেষে রাতের আঁধারে দীনেশের সাথে প্রতারণা করে। যে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা দীনেশের মধ্যে প্রবলভাবে ছিল, সেই ভালোবাসা যখন সে বিলাসীর মধ্যে পেল তা নিজের লোভের কারণে সে হারায়। দীনেশের জীবনে কর্মফল, ভাগ্যের পরিহাস ঘটে।

রমাপদ চৌধুরীর 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে সাঁওতাল মেয়ে রূপমতী ওরফে রেবেকা সোরেনের একনিষ্ঠ প্রেম তার জীবনে ট্র্যাজিক মাহাত্ম্যে বাণীমূর্ত হয়েছে। রূপমতীর জীবনে দু'বার প্রেম আসে। প্রথম প্রেম লালোয়ার জন্য সে সাঁওতাল সমাজে 'বিট্‌লা'-র শিকার হতে যায়। সেক্ষেত্রে ম্যাকুসাহেব রূপমতীকে বিবাহ করে এই বিট্‌লা প্রথা থেকে রক্ষা করে। সাঁওতাল সমাজে এক নারীকে দেওয়া বড়ো শাস্তি এই বিট্‌লা, সেক্ষেত্রে ম্যাকু রূপমতীকে বাঁচালে সেই অপমানের হাত থেকে রূপমতি ধর্ম বদলে রেবেকায় পরিণত হয়। হঠাৎ কিছু কারণবশত পিতার আদেশে ম্যাকু দেশ ছেড়ে, রূপমতীকে ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় সে ফিরবে। রূপমতী আজীবন তার সন্তানকে নিয়ে, ম্যাকুর প্রতি ভালোবাসায়-বিশ্বাসে অপেক্ষা করে গেছে। ম্যাকুর ভালোবাসার জন্য, সম্মান রক্ষার্থে রেবেকা লালোয়াকে, সমাজকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই অপেক্ষাতেই রূপমতির সন্তান ও রূপমতী ওরফে রেবেকার মৃত্যু হয়। রেবেকার পাশে লালোয়া প্রত্যহ প্রদীপ জ্বালায়, যে প্রেমের প্রদীপ সে রূপমতীর জীবনে জ্বালাতে পারেনি। প্রেমের একনিষ্ঠতায়, ত্যাগে, গভীরতায়, আত্মসম্মানে মহত্বে রূপমতী ওরফে রেবেকার কাহিনি ট্র্যাজিক বিষণ্ণতায় মহিমান্বিত, এর পাশাপাশি গল্পে আদিবাসী সমাজের নানান কুপ্রথা, সমাজব্যবস্থার চিত্রও লিপিবদ্ধ।

রমাপদ চৌধুরীর 'নারীরত্ন' গল্পে রুপমতীর একদম বিপরীত মনস্ক চরিত্র ময়না কিস্কু। ময়নার স্বৈরিণী চরিত্রের কথা ভুখন জেনে যাওয়ায় ময়না নিজের স্বামীকে খুন করে, সেই খুনের দায় তার প্রেমিক

ধুলন টুডুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার জটিল মনোবৃত্তি উদ্ভাসিত। নারী মনের জটিল, স্বার্থপর মনস্তত্ত্ব ময়না চরিত্রে চিত্রিত। কেবল আদিবাসী, জংলা মেয়ে ময়নার মধ্যেই যে এমন হিংস্র-ক্রূঢ় মনোভাব আছে তা নয়, এরকম ক্রূঢ়, স্বার্থপর মনোভাব পৃথিবীর অনেক নারীর মধ্যেই বর্তমান। এক জটিল হিংসা-চতুর মনস্তত্ত্বের গল্প। ময়না ধুলনকে বলে সে ধুলনকে ভালোবাসে, তাই সে তার স্বামী ভুখনকে খুন করেছে কিন্তু যখনই ধুলন তার অপরাধে সাথ দেয় না, তখন ময়না হিংস্র হয়ে ওঠে ও মিথ্যা খুনের দায়ে ধুলনকে ফাঁসির শাস্তি দেওয়ায়। ধুলন তার ভালোবাসার মানুষের এই অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে মানসিক অবসাদে নিঃশব্দতায় সব মিথ্যা দায় মেনে নেয়। ময়নার মেয়ের কারণে ময়নার সত্যি সবার সামনে আসে। আদিবাসী এক নারীর হিংস্র-ক্রূঢ়তার পাশাপাশি ধুলনের নিঃশব্দতা, তার ত্যাগ গল্পের বিষয়ে অন্য মাত্রা আনে।

রমাপদ চৌধুরীর 'তিনতারা' গল্পে একদিকে আদিবাসীদের আর্থসামাজিক অবস্থান ফুটে উঠেছে, আর একদিকে অনুপম-কাবেরী ও আদিবাসী নারী শ্রমিক লখিয়ার প্রেমের সম্পর্ক, মনস্তত্ত্ব প্রতীয়মান। আদিবাসীদের দিয়ে টাকার লোভে ঠিকাদাররা গাছ কাটায় অথচ এই অরণ্যের আদিবাসীদের কোনো অধিকার নেই। কেবল ব্রিজলালদের মতো মানুষরা প্রকৃতির সন্তানদের প্রকৃতি থেকে বঞ্চিত করে তাদের দ্বারাই তাদের জন্মভূমিকে নিশ্চিহ্ন করে মুনাফা লাভ করে। গল্পের দ্বিতীয় অংশে কোলিয়ারি অফিসের ম্যানেজার বাঙালীবাবু অনুপম, এখানকার শ্রমিক লখিয়া। অনুপমের বাগদত্তা কাবেরীর নির্মল ভালোবাসা লখিয়ার যৌবনের হাতছানির কাছে হেরে যায়। এক অদ্ভুত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, প্রেম-মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাস এবং আদিবাসীদের আর্থসামাজিক অবস্থানের স্বরূপ গল্পে উন্মোচিত।

ভগীরথ মিশ্রের 'দৃষ্টি' গল্পটি মনস্তত্ত্ব বিষয়ক। গল্পে দেখা যায় কৈলাস দৃষ্টিহীন, তার দৃষ্টিহীনতার সুযোগ নিয়ে পাড়ার বিকৃতমনস্ক ছেলেরা তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। এই উত্যক্ত, অত্যাচারের মাত্রা এতটাই প্রবল হয়ে যায় যা কৈলাসের মনে ভীতির সঞ্চার করে। কৈলাসকে এই সঙ্কট থেকে ঝড়েশ্বর লুহারের স্ত্রী লৈতন বাঁচায়। ঝড়েশ্বরের সাথে লৈতনের দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো না, ঝড়েশ্বর প্রবলভাবে বিনা কারণে লৈতনকে সন্দেহ করে। কৈলাস এবং লৈতন ভালো বন্ধু, একে অপরের সহায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু কৈলাসের দৃষ্টিহীনতার সুযোগে লৈতন কৈলাসকে বাঁচানোর পর রোজই কৈলাসের ভিক্ষা করা চাল থেকে চুরি করে। কৈলাস অতঃপর একদিন লৈতনকে বিবাহ প্রস্তাব দেয় এবং তার চুরির কথা সে বুঝতে

পারে, সেই সত্যিটা লৈতনের সামনে তুলে ধরে। সত্য প্রকাশিত হওয়ায় লৈতন কৈলাসের সামনে অপদস্ত বোধ করে। লৈতন ভাবে ঝড়েশ্বর দৃষ্টি নিয়েই লৈতনকে সন্দেহ করে, কিন্তু কৈলাস দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও তার প্রবল অনুভূতি প্রখরতা শত দৃষ্টির সমান। এই দৃষ্টির ভয়ে কৈলাসের প্রস্তাব লৈতন গ্রহণ করে না। গল্পে ঝড়েশ্বর ও লৈতনের সন্দেহমূলক দাম্পত্য এবং সেই বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার মূলে লৈতনের মনের ভয় ও আশঙ্কা। লৈতন ভাবে সে কিছু না করেও ঝড়েশ্বর তাকে সবসময় সন্দেহ করে আর কৈলাস তো লৈতনের চুরি ধরেই ফেলেছে, তাকে সন্দেহ করেছে, পরবর্তীতে এই সন্দেহ আরও উত্তরোত্তর বাড়বে। কৈলাস তার দৃষ্টিহীনতার দৃষ্টি দিয়ে সর্বদা লৈতনকে দেখবে, তা লৈতন মেনে নিতে পারে না। মূলত চরিত্রদের মনস্তত্ত্বই এই গল্পের মুখ্যবিষয়।

তপন বন্দোপাধ্যায়ের ‘ব্যভিচারিণী’ গল্পের বিষয় হয়েছে এক সাপুড়ের স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং সাপুড়ের পদ্মগোখরো সাপের প্রতি যৌন আকর্ষণ এবং পরিণতি। লখিন্দরের স্ত্রী গোলাপী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য ছেলের সাথে পালিয়ে যাওয়ার পর, লখিন্দর তার নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে পদ্মগোখরো সাপটিকে তার সঙ্গিনীর স্থান দেয়। লখিন্দরের সাপটির প্রতি যৌন অনুভূতি, যৌন আকর্ষণ যা থেকে পশুকামিতা[৩১] *(zoophilia)* মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লখিন্দরের অন্তঃসার শূন্য দাম্পত্য জীবন, একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে পদ্মগোখরো সাপটি যেন তার ক্ষতে প্রলেপ দেয়, তার বাঁচার অবলম্বন হয়ে ওঠে। লখিন্দর পরে আরও একটি পদ্মগোখরো সাপ আনে এবং লখিন্দরের অনুপস্থিতিতে দুটি সাপ মিলিত হলে, লখিন্দর সেই দৃশ্য দেখে ফেলায় লখিন্দরের মনে গোলাপীর দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত পুনরায় জেগে ওঠে এবং সে মনে করে পদ্মগোখরো সাপটিও গোলাপীর ন্যায় ব্যাভিচারিণী, দুজনে একই দোষে দুষ্ট। রাগের মাথায় হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে লখিন্দর দুটি সাপকেই হত্যা করে। ব্যাভিচারিণী হওয়ার শাস্তি দেয় সে। প্রবল ভালোবাসার পরেও গোলাপী ও পদ্ম, নারী ও নাগিনী উভয়েই লখিন্দরের ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি, উভয়েই ব্যাভিচারিণী।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘মানুষ ও বেগুন’ গল্পটি এক ফ্যান্টাসি আশ্রিত মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গল্প। গল্পে দেখা যায় ড. প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, মেটালার্জির প্রফেসর, দুর্গাপুরে স্টিলের ব্রাইটনেস বিষয়ক সেমিনার শেষ করে দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় ফিরছে। এই ফেরার পথে রাস্তায় একটি বাজারে একটি আদিবাসী মেয়েকে প্রফুল্লবাবু বেগুন বিক্রি করতে দেখেন। মেয়েটির গায়ের সাথে মনে মনে বেগুনের তুলনা করেছেন প্রফুল্ল

বাবু। মেয়েটির ‘শাইনিং’ অর্থাৎ চকচকে মসৃণ ত্বক, যা দেখলে মনে হয় বার্ণিশ মাখা ত্বক। পরে বেগুনের নরম, মসৃণ ত্বকের সাথে মেয়েটির তুলনা, কল্পনা প্রফুল্লবাবুর মধ্যে পাওয়া যায়, যা মনোবিজ্ঞানীরা ‘প্যারাফিলিক’ মনস্তত্ত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। একটি বেগুনের সাথে মানুষের তুলনা, হ্যালুসিনেশান, কল্পনাপ্রবণ বিকৃত মনস্তত্ত্ব গল্পে মূর্ত।

সৈকত রক্ষিতের ‘বশীকরণ’ গল্পে একদিকে লোধা, শবর, সাঁওতাল, মাহাত, ভূমিজ ও ময়রা জাতির লোকেদের নানান বিশ্বাস, সংস্কার চিত্রিত, তেমনি এর পাশাপাশি গল্পের মূল বিষয় প্রেম, দাম্পত্য ও মনস্তত্ত্বমূলক। দাম্পত্য ঈর্ষা ও হিংসা থেকে অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে অচলা হিস্টিরিয়া রোগের শিকার হয়। গল্পে গ্রামের প্রান্তিক ও জনজাতি মানুষদের একত্রে বাস, তাদের বিশ্বাস সংস্কার চিত্রিত। হংসের মেয়ে যক্ষায় মারা যেতে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস তাকে ডাইনিতে খেয়েছে। আবার যখন হংস করুণ অচলার দাম্পত্যের মধ্যে দুই স্ত্রীয়ের রেষারেষিতে এবং প্রবল ঈর্ষাও মানসিক অবসাদ ও চাপে অচলা যখন হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় তখন গ্রামের লোক ভাবে তকে ডাইনিতে ধরেছে, এই বিশ্বাসই তাদের বদ্ধমূল ধারণায় রূপান্তরিত হয় যখন অচলার মধ্যে হিস্টিরিয়া রোগের লক্ষণ হিসাবে প্রলাপ বকা শুরু হয়, গ্রামবাসী, হংস ও করুণা সকলেই ভাবে অচলার মধ্যে মা কালী ভর করেছেন। জনজাতি ও প্রান্তিক মানুষরা তাদের শিক্ষাহীনতার কারণে, জ্ঞানের অভাবে নানান সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত, দিনের পর দিন মানসিক অবসাদ, প্রবল মানসিক চাপের কারণে মানসিক রোগীতে পরিণত হওয়ার দৃশ্য বর্ণিত গল্পে, তা থেকে পারিপার্শ্বিকে প্রান্তিক মানুষদের বিশ্বাস, জনজীবনও পরিস্ফুট।

সৈকত রক্ষিতের ‘উৎখাতের পটভূমি’ গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে এক আদিবাসী নারী সামাজিক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কারণেও সমাজ থেকে বহিঃষ্কৃত হওয়ার পরও তার সাথে গ্রামের এক যুবকের সম্পর্ক থাকায় গ্রামবাসী তাদের শাস্তির বিধান দেয় এবং সমাজকে উপেক্ষা করে আদিবাসী নারী-পুরুষ রাতের আঁধারে একে অপরের হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। সিমতি বেসরা যার স্বামী মারা যাওয়ায়, সন্তান না হওয়ার তাকে গ্রামবাসী ডাইনি সাব্যস্ত করে। গ্রামবাসীর, সমাজের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে সিমতি একাকী গভীর অরণ্যে বাস করে। সিমতির সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানার পরেও মড়েয়া সিমতিকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়, সমাজের আড়ালে সম্পর্ক রাখে। গ্রামবাসী তা জেনে যাওয়ায় তাদের দুজনকেই শাস্তির বিধান দেওয়া হয় এবং অনেক টাকা জরিমানা করা হয়। এত কিছুর পরেও সমাজ

কোনোভাবেই সিমতি ও মড়েয়া ভালোবাসাকে মেনে নিতে চায় না এবং সমাজ স্বীকৃতি দিতে চায় না। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে সিমতি ও মড়েয়া গ্রামবাসীর অন্যায় মেনে না নিয়ে তারা রাতের অন্ধকারে এই আঁধারের পটভূমি পরিত্যাগ করে তাদের জীবনের নতুন আলোর উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। সিমতি ও মড়েয়া পরিস্থিতির চাপে, সমাজের কাছে নত হয়নি বরং তারা নিজেদের নতুন জগতের সন্ধানে যাত্রা করে।

নলিনী বেরার 'চার আনা আট আনার প্রেম' গল্পে স্কুল পড়ুয়া কিশোর বয়সের ছেলেদের ভালোলাগার আবেশের শুরু, বয়ঃসন্ধিক্ষণে মিষ্টি প্রেমের আভাস চিত্রিত। কথকদের স্কুল বোর্ডিংয়ের কাছে শুক্রবারে আদিবাসীদের হাট, সেই হাটে লোধা-সাঁওতাল মেয়েরা জিনিস কেনাবেচা করত আসে। সেখানেই কথক ও তার বন্ধুদের আদিবাসী মেয়েদের প্রতি ভালোলাগা বয়ঃসন্ধিক্ষণের ভাবাবেগ প্রকাশিত। পাশাপাশি গল্পে প্রান্তিক জীবনের লোকসংস্কৃতিরও পরিচয় লভ্য।

অনিল ঘড়াইয়ের 'উরাংগাড়া' গল্পেও বুদ্‌নী, স্নেহময় ও সায়ন্তনীর দাম্পত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, পরকীয়ার সম্পর্ক চিত্রিত। শহুরে বাবু স্নেহময়ের বাংলোয় ভাকুয়া তার মেয়েকে কাজে রাখে। স্নেহময় শান্ত স্বভাবের বুদ্‌নীর প্রতি প্রথম থেকেই আকর্ষণ অনুভব করে। স্নেহময়ের বাগদত্তা সায়ন্তনীকে সে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা নদীর সাথে তুলনা করে এবং বুদ্‌নীকে সুবর্ণরেখার শাখানদী শান্ত উরাংগাড়ার সাথে তুলনা করে। বুদ্‌নীর শিক্ষা, জাতি এইসব কিছু স্নেহময়ের স্ট্যাটাসের সাথে না যাওয়া বুদ্‌নীকে স্ত্রী মর্যাদা দেওয়ার কথা স্নেহময় ভাবতে চায়না। সায়ন্তনী স্নেহময়ের বাগদত্তা হওয়ার পরেও একদিন স্নেহময়ের কামনা-বাসনার শিকার হতে হয় বুদ্‌নীকে। বুদ্‌নী এরপর স্নেহময়ের অপরাধ ক্ষমা করলেও বুদ্‌নীর জীবনে রয়ে যায় স্নেহময়ের আদিম প্রবৃত্তি মেটানোর দাগ। বুদ্‌নীর বিয়ের সাতমাসের মাথায় তার ছেলে হলে এবং ছেলের গায়ের রং ফর্সা হওয়ায়, বুদ্‌নীর স্বামী সন্দেহ করে এই সন্তান তার নয় এবং এই প্রতারণা মেনে নিতে না পেরে বুদ্‌নীর স্বামী আত্মহত্যা করে, বুদ্‌নী শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়। স্নেহময়ের বাড়িতে কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ যেন বুদ্‌নী এই নারকীয় জীবন পায়। গল্পের পরিণতিতে শান্ত স্বভাবের বুদ্‌নীর সায়ন্তনীর সামনে স্নেহময়ের সাথে তার সন্তানের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্যে বুদ্‌নীর সাথে করা স্নেহময়ের অন্যায়ের প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'আকাশ মাটির খেলা' গল্পের বিষয়বস্তু- প্রেম, মনস্তত্ত্ব, ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব ও তার পরিণতি। সুদামা কুঙ্কল বাসমতি ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে। সুদামা পেটের দায়ে মেদিনীপুরের ইটভাটায় কাজে আসে, বাসমতির সাথে পরিচয় হয়। ইটভাটার ঠিকাদার কুনু সাংগির বাসমতিকে পছন্দ হয়। সুদামা ও বাসমতি একে অপরকে ভালোবেসে ফেললে কুনু কখনই তা মেনে নিতে পারেনা এবং প্রতিশোধস্পৃহায় সুদামাকে লোক দিয়ে আহত করে, বাসমতিকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে। লোকজনের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে যখন কুনু পালাতে যায় তখন প্রবল স্রোতে সে ভেসে যায়। প্রকৃতি যেন কুনুর কৃতকর্মের শাস্তি তাকে দেয়। দুটো নিষ্পাপ ভালোবাসাকে কলঙ্কিত করার পাপের শাস্তি হিসাবে প্রকৃতি পাপীকেই ধুয়ে মুছে ফেলে, এ যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ।

অনিল ঘড়াইয়ের 'বনের মানুষ বনে' গল্পে যোগী দাসের করমপদা নামক গ্রাম্য, বন্য এলাকার প্রতি, করমপদা হাড়িয়াওয়ালির রানির প্রতি গভীর ভালোবাসা চিত্রিত। গল্পে যোগী দাস বিবাহিত, তার চার সন্তান, স্ত্রী আছে। সে ফাইলেরিয়া রোগে আক্রান্ত, সে ক্লাস ফোর সরকারী চাকুরীজীবী হওয়ার আগে রিক্সা চালাতো। এই যোগী দাসের কাজের সূত্রে করমপদার সাথে যোগসূত্র হলেও তার জীবনের সাথে করমপদার প্রতি টান, এক অচ্ছেদ্য বন্ধন চিত্রিত। সে সাংসারিক হলেও, সংসারের ঘেরাটোপে সে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না। প্রকৃতির মাঝে, বনজঙ্গলের দেশ করমপদা এবং করমপদার হাঁড়িয়াওয়ালি রানীর নিকট সে জীবনের আরাম, বাঁচার আনন্দ খুঁজে পায়।

যোগী দাসের স্ত্রী, সন্তান থাকার পরেও রানীর প্রতি যে টান, তা কেবল দেহের নয়, মনের টান, আত্মিক টান। যোগীর যখন শরীর অসুস্থ, জীবনের শেষ সময় সে তখন করমপদায় রানীর কাছে যায় রানী তাকে শহরে ফিরিয়ে দিলেও যোগী দাস রানীর ভালবাসার টানে মাঝরাস্তায় ট্রেন থেকে নেমে পড়ে এবং প্রকৃতির মাঝেই মৃত্যুবরণ করে। রানীও এই শোকে যোগী দাসের বুকের উপর মাথা রেখেই মৃত্যুবরণ করে। এক নির্মল ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে থাকে মানুষ, প্রকৃতি। আত্মার টানে দুটি হৃদয় এক হয়ে যায় মৃত্যুর মাধ্যমে। যোগীর প্রকৃতির সাথে, রানীর সাথে যে অচ্ছেদ্য আত্মার বন্ধন তা যমুনা ছিন্ন করেনি, বনের মানুষকে তার মনের মানুষের সাথে সে বনেই রেখে যায়।

অনিল ঘড়াইয়ের 'খরার আকাশ' গল্পে নুনা মান্ডি, শঙ্খীর দাম্পত্য, দাম্পত্য কলহ, দারিদ্র-অভাব, ভালোবাসা চিত্রিত। নুনা মান্ডি কলকারখানায় কাজ করত, তাদের দাম্পত্য ভালোই ছিল, কিন্তু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নুনার কাজ থাকে না। অভাবের সংসার খরার আকাশের ন্যায় রূপধারণ করে। অভাবে তাদের দাম্পত্যে মনোমালিন্য তৈরি হয়। বিয়ের আগে নুনার কাছে শঙ্খীর কথা ছিল মধু মাখানো, কিন্তু এই অভাবের সংসারে শঙ্খীর বাক্যবাণ বিষের ন্যায় বিদ্ধ হয় বেকার নুনা মান্ডির জীবনে।

এই রূঢ়, অভাবের জীবনে তাদের যখন সামান্য খাবারই বিলাসিতা, সেখানে যখন নুনা পাগলা কুকুরে কামড়ানো শুয়োরকে মারা যেতে দেখে, তখন সে লোভ সামলাতে না পেরে মৃত শুয়োরের মাংস বাড়িতে নিয়ে আসে খাবার জন্য। এই মাংস খেয়েই নুনা ভীষণ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থা হলে, শঙ্খীর নুনার প্রতি যে হৃদয়ের টান, তাকে বাঁচিয়ে তোলার প্রয়াস, আকুতি তা যেন তাদের দাম্পত্যে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে পুনরুজ্জীবিত করে। খরার আকাশের রুক্ষতা যেমন বৃষ্টি দিয়ে নমনীয় হয়, তেমনই এই দুর্ঘটনাই নুনা ও শঙ্খীর দাম্পত্যের খরার আকাশে ভালোবাসার বৃষ্টি ঘটিয়েছে।

প্রেম-পরকীয়া দাম্পত্য ও মনস্তত্ত্ব কেন্দ্রিক গল্পের বিষয়বস্তু আলোচনার পর বোঝা যায় গল্পকারগণ আদিবাসী মানুষদের জীবনে প্রেম-পরকীয়া, তাদের দাম্পত্যের নানাস্তরের চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। কেবল আদিবাসী নয়, আদিবাসীদের সাথে সমাজের অন্য প্রান্তিক জাতির মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ক, তার পরিণতি ও পাশাপাশি গল্পে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও আদিবাসী সমাজের নানান রীতি-প্রথা-আইন লিপিবদ্ধ।

৫.খ|৩- রাজনীতিকেন্দ্রিক বিষয়:

আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী বেশ কিছু ছোটগল্পের (১৯২৩-১৯৯০) বিষয়- প্রান্তিক, জনজাতি মানুষদের রাজনীতি সচেতনতাবোধ, তাদের জীবনের সাথে রাজনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগ। বিভিন্ন গল্পকারদের গল্পে আদিবাসী মানুষের রাজনীতিবোধ এবং রাজনৈতিক জীবন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও মানদন্ডে অঙ্কিত। পাশাপাশি গল্পে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিত ও রাজনীতির নানান দৃষ্টিকোণ গল্পে চিত্রিত, কোনো গল্পে আদিবাসী মানুষ সচেতন প্রতিবাদী, কোথাও রাজনীতি সম্পর্কিত তাদের মনোভাব পরিস্ফুট, কোনো গল্পে তারা সরাসরি যুক্ত রাজনীতির সাথে। তৎকালীন সময়ের রাজনীতি ও আদিবাসী মানুষদের সেই রাজনীতির

সাথে যোগসূত্র- প্রাসঙ্গিক গল্প আলোচনার মধ্যে এই বিষয়সত্যকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হল। রাজনীতিকেন্দ্রিক বিষয় বৈচিত্র্যময় গল্পগুলি হল- বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'বোতাম', মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রোপদী', 'অপারেশন? বসাইটুডু', অসীম রায়ের 'দুই বৃদ্ধের কাহিনি', 'আরম্ভের রাত', প্রফুল্ল রায়ের 'কার্তিকের ঝড় বন্যা এবং চুনাও', দেবেশ রায়ের 'রাখি পূর্ণিমার রাত' এবং তপন বন্দোপাধ্যায়ের 'বিষয় যখন গণা' গল্পগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয়সত্যকে স্পষ্ট করা হল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোতাম' গল্পে এলিশাবা কুই ওরফে চম্পু হো-র রাজনৈতিক জীবন কাহিনি ও তার এই রাজনীতিতে আসার আগে এক সরল অরণ্যানী নারী হিসাবে চিত্রিত। তার চরিত্রের উত্তরণ, পরিবর্তন ও রাজনীতির সাথে এই আদিবাসী অরণ্য নারীর যোগসূত্র গল্পে রচিত। আগষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এলিশাবা কুই এর রাজনৈতিক জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত সে পালামৌ কংগ্রেস গর্ভমেন্টের প্রেসিডেন্ট, তার জেলখাটা, সরাসরি রাজনীতির সাথে যোগসূত্রের চিত্র গল্পে চিত্রিত। পাশাপাশি গল্পে বোঝা যায় ইংরেজ শাসনকালের শেষ সময় ঘণীভূত, সাহেবরা একে একে দেশ ছাড়ছে।

গল্পে এলিশাবা কুই ওরফে চম্পুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পূর্ব ইতিহাস উদ্ঘাটিত। এলিশাবা কি করে এলিশাবা হল। কুলিকামিন নারী চম্পু হো'র সমস্ত নিকট পরিজনরা মারা যাওয়ার পর, মিশনারিদের দ্বারা শিক্ষিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে মিশনারিরা তাদের শিক্ষিত করবার উদ্যোগ নিয়েছিল, তার উদাহরণ এরকম বেশ কিছু গল্পে দেখি। এই গল্পে চম্পু চরিত্রের এলিশাবায় উত্তরণের কাহিনি ইতিবাচক দিক। এর আগেও সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ', রমাপদ চৌধুরীর 'দরবারী' গল্পেও মিশনারি দ্বারা আদিবাসী সমাজে শিক্ষাপ্রসারের প্রয়াসের এরকম উদাহরণ পাওয়া যায়। এলিশাবার দৃঢ় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি তার চম্পু হো'র কোমল নারীজীবন গল্পে চিত্রিত। গল্পে কথকের সাথে চম্পু'র কুড়ি বছর আগে এক সুস্নেহবন্ধনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ও উপহার হিসাবে কথক চম্পুকে জামার বোতাম দিয়েছিলেন নিজের। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চম্পু ওরফে এলিশাবার চরিত্রের স্বরূপ চিত্রিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে আদিবাসী নারীর এই নেতৃত্ব দেওয়ার দৃষ্টান্ত, আদিবাসী সমাজ যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছিল, কিছু সংখ্যক আদিবাসী মানুষদের মধ্যেও রাজনীতি সচেতনতার স্পষ্টরূপ গল্পে লিপিবদ্ধ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পে দ্রৌপদী মেঝেন ও তার স্বামী দুলন দুজনেই নকশাল আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং তারা নকশাল আন্দোলনের গেরিলা যোদ্ধা। সাঁওতালদের নকশাল রাজনীতি ও রাজনীতি সচেতনতার, এক বিদ্রোহী নারীর রাজনীতি সচেতনতার, তার প্রতিবাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ গল্পে।

দ্রৌপদীর স্বামী ও দ্রৌপদী দু'জনেই সাঁওতাল ও নকশাল আন্দোলনের গেরিলা যোদ্ধা। তাদের আসল নাম পরিচয় ও বাসস্থান তাই সবই পরিবর্তিত। দুলন তাদের গোষ্ঠী মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় এনকাউন্টার হয়ে মারা পড়ে। গল্পে জোতদারদের অত্যাচারের গল্পও চিত্রিত। পাশাপাশি দ্রৌপদীকে 'মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল' রূপে দাগিয়ে তার খোঁজ ও অবশেষে পুলিশের ফাঁদ পেতে সে ধরা পড়ে গেলে, তার উপর চলে শারীরিক ও মানসিক প্রবল অত্যাচার। গল্পের শেষে দ্রৌপদীর এই সমাজের প্রতি নগ্ন প্রতিবাদের রূপ যা স্পষ্ট করে তৎকালীন নকশাল আন্দোলনে জড়িত মেয়েদের, হাজার নারীর ওপর অত্যাচারের স্বরূপ।

মহাশ্বেতার আরও অনেক গল্প যেমন 'অপারেশন? বসাই টুডু' ইত্যাদি আরও অনেক গল্পে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিত ও আদিবাসী মানুষগুলোর রাজনীতির সাথে যোগাযোগের চিত্র চিত্রিত। মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পে আদিবাসী জীবনবৃত্তি তীব্রভাবে আশ্লিষ্ট সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাধারার প্রেক্ষাপটে তা চিত্রিত। গল্পটি গভীরতম মানবিক আবেগ, জ্বলন্ত বাস্তব-চেতনা, সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রকৃত প্রকাশ এবং ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক বাস্তবতার প্রথম পাঠ রেখায়িত।

বসাই টুডুর মধ্যে দিয়ে সমগ্র বঞ্চিত আদিবাসী সমাজের প্রতিবাদ মূর্ত। বঞ্চিত আদিবাসী সত্তার ক্ষোভ ও প্রতিরোধের ভাষা গল্পে দুভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, প্রথমত বামপন্থী রাজনীতিতে কীভাবে আদিবাসী খেতমজুরের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি, তা স্পষ্ট বসাই টুডুর বক্তব্যে এবং দ্বিতীয়ত বসাই টুডুর নকশাল আন্দোলনের গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করতে গিয়ে বারংবার মৃত্যু এবং পুনরুজ্জীবনের কাহিনির মাধ্যমে আসলে আদিবাসীদের অপরাজেয়, অবিনশ্বর সংগ্রাম প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ দেশে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে, তার কোনরকম ফলভোগী হয়নি শ্রমিক বা খেতমজুররা। বিত্তশালী শ্রেণি আরও ধনী হয়েছে, মধ্যবিত্ত দরিদ্রতর হয়েছে, নিম্নবিত্তরা নিঃস্ব প্রায় বলা চলে। সমাজের শ্রেণিবিভক্ত সামাজিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত, জাতপাতের বৈষম্য এই গল্পেও অসাধারণ মুন্সীয়ানার সাথে লেখিকা তুলে ধরেছেন। বসাইটুডু কালী সাঁতরাকে জানায় কীভাবে কিষাণ সভা কোনোদিনই খেতমজুরের ন্যূনতম অধিকারে স্বপক্ষে কোনোরকম লড়াই করেনি, এর মূল কারণ পার্টির উচ্চবর্ণ কমরেড ও আদিবাসী কমরেডদের মধ্যেকার শ্রেণিগত ব্যবধান। কালী সাঁতরার দৃষ্টি দিয়েই বসাই নামক অপরিচিত মহাদেশের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। বসাই টুডুর নিজস্ব সংগ্রামের হাত ধরেই সে ব্যক্তি থেকে মিথে পরিণত হয়েছে। তাই তার মৃত্যু হলেও বিদ্রোহের সত্যতা শেষ হয়ে যায় না, উত্তরাধিকারের ধারাপথে কালান্তরে তার অগ্রগতি অব্যাহতই থেকে যায়।

অসীম রায়ের ‘দুই বৃদ্ধের কাহিনি’ গল্পে বৃদ্ধ শম্ভু হেমব্রম ও তার পুত্র শিবু হেমব্রমের রাজনীতি সচেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাঁওতালদের নকশাল রাজনীতি ও রাজনীতি সচেতনতাবোধ শম্ভু হেমব্রম ও শিবু হেমব্রম চরিত্রে স্পষ্ট। গল্পে পিতা-পুত্রের রাজনৈতিক চেতনা, ভাবধারায় অনেক পার্থক্যে রয়েছে। শিবু আদিবাসী হয়েও সে শিক্ষিত, তার লেখা সাঁওতালি পালাগান কলকাতা, বিহারে অনুষ্ঠিত হয়, সমাজ সম্পর্কে তার সুগভীর জ্ঞান আছে। গল্পে শিবু তৎকালীন নকশাল আন্দোলনের সময়ে যুবক চরিত্র আর শম্ভু বৃদ্ধ, প্রাচীনমনস্ক। নব মতাদর্শ ও প্রাচীন মতাদর্শ এই দুই মতাদর্শের রূপরেখা, মিল-অমিল গল্পে স্পষ্ট। শম্ভুর ছেলে শিবু সক্রিয় নকশাল কর্মী এবং এই লড়াই জোতদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে। তারা মনে করে ভালো-খারাপ সব নির্বিশেষে সকল জোতদারদের খতম করবে। শিবুরা ভালো খারাপের বিচার করতে চায় না। এখানেই গল্পে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত যুবকদের যে মনোভাবের ত্রুটি তা ধরা পড়ে। শম্ভু কিন্তু শিবু’র এই মনোভাবের সাথে একমত ছিল না, ভিন্ন মত পোষণ করে। তিনি মনে করেন ‘ভালোর মধ্যে ভালো’। সরল রাজনৈতিক মেরুকরণে জোতদার মানেই কৃষক শ্রেণির শত্রু, এই মনোবৃত্তিতে সহমত পোষণ করে না শম্ভু। শম্ভুর ভাবনায়-অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে নকশাল আন্দোলনের রাজনীতির সত্যরূপ। শহর থেকে এসে কেবল ‘জোতদার জোতদার’ করে চিৎকারে বিপ্লব হয়ে যায় না, একথা সে শিবুকে বোঝাতে পারে না, সে রণক্লান্ত। গল্পের শম্ভুর জীবনকাহিনি আর হাড়ি জাতির বৃদ্ধের কাহিনির সমান্তরালে গল্পের বিষয়বস্তু চিত্রিত।

অসীম রায়ের ‘আরম্ভের রাত’ গল্পে পানু চক্রবর্তী যিনি দিনাজপুর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস এই গল্পে লিপিবদ্ধ। ১৯৬৭ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা নিয়ে ১৯৬৮ সালে অসীম রায় লেখেন ‘আরম্ভের রাত’ গল্পটি। ১৯৬৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টির দুই ভাগ হয়, এবং তিক্ততার সম্পর্ক তৈরি হয়। তৎকালীন সময়ে কংগ্রেসের টালমাটাল অবস্থার দরুন জনগণ দুই কমিউনিস্ট পার্টির সি.পি.আই(এম) ও সি .পি.আই-এর তিক্ত সম্পর্ক, ভেদাভেদ উপেক্ষা করে জনগণ কংগ্রেসকে হারিয়ে দুটি ফ্রন্টকে একত্রে করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। ভোট গণনার যে উচ্ছ্বাস, নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর জনতার যে বিজয় উল্লাস তা এই গল্পে লিপিবদ্ধ।

এই ভোটের নির্বাচন ফলাফল শোনার পর পানু চক্রবর্তীর মনে অতীতে খাদ্য আন্দোলনে যোগ দেওয়া আদিবাসী সাঁওতালদের গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে। রাজনীতির অর্থ, ফাঁক-ত্রুটি, নিরীহ আদিবাসী মানুষদের রাজনীতির শিকার হওয়ার বাস্তবতাকে লেখক তুলে ধরেছেন।

প্রফুল্ল রায়ের ‘কার্তিকের ঝড়, বন্যা এবং চুনাও’ গল্পে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহারে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র আদিবাসী মানুষগুলিকে কীভাবে রাজনীতির খুঁটির মতো ব্যবহার করে রাজনীতি করা হয় তা চিত্রিত। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তাদের ভোটের জন্য এই দরিদ্র অসহায় মানুষদের জীবন বিপন্ন করে তাদের অজান্তে সরলতার সুযোগ নিয়ে আবার এই ভালোমানুষের মুখোশ পড়ে ভোট গণনায় জয়ী হয়। এই চিত্র কেবল তৎকালীন সময়ে নয়, বর্তমান সমাজেরও রূপ। ভোটের রাজনীতির চিত্র কোনোদিনই বদলায় না, আসলে শাসক চরিত্রের স্বরূপের বদল প্রাচীন-বর্তমান কোনকালেই হয়নি। ভোটের রাজনীতির নগ্নরূপ প্রফুল্ল রায় তাঁর এই ‘কার্তিকের ঝড় বন্যা এবং চুনাও’ গল্পে তুলে ধরেছেন। এই আদিবাসী মানুষগুলো শুধুমাত্র রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহৃত, তাদের জীবন বিপর্যস্ত। এই আদিবাসীদের মধ্যে একজন শিক্ষিত ছেলে গ্রামের মানুষদের বোঝাতে গেলেও সে এই রাজনীতি শক্তির কাছে পরাজিত হয়। ভোটের রাজনীতির বাস্তব স্বরূপ প্রতিফলিত এই ‘কার্তিকের ঝড়, বন্যা এবং চুনাও’ গল্পে।

দেবেশ রায়ের ‘রাখি পূর্ণিমার রাত’ গল্পে রথু ও বুধারু লোহার রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বর্ণিত। গল্পে দেখা যায় খাশ জমিতে ঝান্ডা পোতা নিয়ে বিবাদ, সেই বিবাদের জটিলতা নিয়েই ভানুবাবুর মতো মানুষরা রথু লোহার ও বুধারুর মতো বোকা, সহজসরল মানুষগুলোকে

ব্যবহার করে। ভানুবাবুর মতো রাজনীতিবিদরা আদিবাসী মানুষদের স্বার্থে বা তাদের কথা ভেবে আসলে কোনো কাজ করে না। তাদের একটাই উদ্দেশ্য রাজনীতি ও স্বার্থ। তাদের আখের গোছাতে তারা সদা ব্যস্ত। ভানুবাবুর মতো মানুষদের জন্য বুধারু লোহার ও রথু লোহারদের মতো মানুষরা একে অপরের শত্রু হয়। ভানুরা তাদের জয়ের জন্য সবকিছু করতে পারে। গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় বুধারুর সমর্থনে ভানুবাবু মিছিল বার করেন এবং সেই মিছিলে প্রচার করেন রথু লোহার বুধারুকে খুন করবার জন্য অপহরণ করেছে। এই কথা শোনা মাত্র বুধারু সেই স্থান থেকে পালিয়ে যায় এবং রথু লোহার মদ্যপ অবস্থায় এই কথা শোনার পর নিজের মনেই বলতে থাকে সে বুধারুকে মারেনি, তারা ঝান্ডার রাখি দু'জনে হাতে বেঁধেছে। মিছিল চলে গেলে রথু নদী পার হতে গিয়ে মত্ত অবস্থায় স্রোতে ভেসে মারা যায়। লাভ হল ভানুবাবুর। আদিবাসী প্রান্তিক মানুষগুলিকে কেবল রাজনীতির ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছে রাজনীতিবিদরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

তপন বন্দোপাধ্যায়ের 'বিষয় যখন গণা' গল্পে একটা নিতান্ত দরিদ্র আদিবাসী কীভাবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার তা চিত্রিত। গণা মুর্মু এক সামান্য খেতমজুর যার সামান্য চাষের জমির উপর পঞ্চায়েত থেকে রাস্তা করার প্রকল্প হয়। অমিয় সামন্ত এবং অঘোর ভুঁইঞা তদের আসন্ন ভোটে জিতবার জন্য লোক দেখানো জনদরদী কাজ করতে গণার জমি ফিরিয়ে দিতে চায়। তার মতে- "ইলেকশন লড়তে আদিবাসীদের মতো একটা বিষয় টনিকের মতো কাজ করবে।"[৩২] অঘোর ভুঁইঞার এই কথার মাধ্যমে রাজনীতিবিদদের স্বার্থপর মনোভাব পরিস্ফুট। অঘোর ভুঁইঞা এবং বিরোধীদলের মহিমকান্তর দ্বন্দ্বে পিষ্ট হয় গণা। গল্পে দেখা যায় যে গণার জমি নিয়ে রাজনীতিবিদদের এত মাথাব্যথা, শোরগোল সে গণার মতামত কেউ জানতে চায় না, তাকে দাবার ঘুঁটির ন্যায় কেবল ভোটের জন্য ব্যবহার করা হয়। রাজনীতির চক্রান্তে গণার জীবন বিভ্রান্ত-বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গণা হাতজোড় করে আকুতি অঘোরদের মতো মানুষদের কান অবধি পৌঁছায় না। রাজনীতির ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয় গণার মতো দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষদের। তাদের মৃতদেহ নিয়েও মানবতাহীন, বিবেকহীন রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করে, ভোটে জয়ী হয়। এটাই চিরন্তন সত্য।

(৪) অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতকেন্দ্রিক বিষয়:

প্রান্তিক, জনজাতি জীবননির্ভর বেশকিছু ছোটগল্পে অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষয়ের মাধ্যমে আদিবাসী জীবনের, সমাজের গূঢ় সমস্যা, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক দিক প্রতিফলিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অক্ষয়বটোপাখ্যানম্', বনফুলের 'তবে কি?', 'মণিকাঞ্চন', এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'সব ভূতুড়ে' গল্পগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে গল্পের বিষয় সত্যকে তুলে ধরা হল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অক্ষয়বটোপাখ্যানম্' গল্প যেন 'ভূত পুরাণের' পরিশিষ্ট। প্রচন্ড ঝড়ে রাঢ়বাংলার আমোদপুর স্টেশনের পাশে শতাব্দী প্রাচীন বুড়ো বটগাছ সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। তার মৃত্যু আসন্ন। গল্পে কথকের স্বপ্নে সেই বটগাছ তার আত্মকথনে আধাভৌতিক, আধাদৈবিক কাহিনি শুনিয়েছে। নানা পুরাণকথা, ভূতকথা, অতিলৌকিক কাহিনির মাধ্যমে গল্পের বিষয় আবর্তিত। তবে গল্পে দেবতাদের ভাগ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের দেবতাও আদিবাসী 'শিডিউলড্ দেবতা' বা নিম্নবর্গের দেবতা এরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। এই মনোবৃত্তিই খুবই প্রাসঙ্গিক তৎকালীন সমাজে। যেমন– শিবকে প্রাচীনে উচ্চবর্ণের দেবতা মনে করা হত আর মনসা, চণ্ডী, মা ষষ্ঠীকে নিম্নবর্গের দেবতা। সমাজের বর্গীকরণের ন্যায় দেবতাদের বর্গীকরণ। পাশাপাশি যুদ্ধের চিত্র ও একটা বটগাছের আত্মকথনের মাধ্যমে, তৎকালীন সামাজিক নানান পরিস্থিতি গল্পে অতিলৌকিক কাহিনির মধ্যে দিয়ে চিত্রিত।

বনফুলের 'তবে কি?' গল্পে অতিলৌকিক ভাবের মধ্যে দিয়ে আদিবাসী ও হিন্দুদেবতা কৃষ্ণের মিলন ঘটিয়েছে লেখক। গল্পে বিলাস, হরিসেবক এরা আদিবাসী নয়, সভ্য শহুরে মানুষ। হরিসেবক ধর্ম গোঁড়া, জাতিভেদ বিশ্বাসী এক মানুষ। সে স্বপ্নে দেখে মান্দার পাহাড়েই মধুসূদন আছে, তিনি সভ্য,পবিত্র মানুষকে তার অভীষ্ট বর দেবেন। এখানে বিলাস হরিসেবকের থেকে পৃথক মনস্কের। বিলাস সেই মান্দারে পাহাড়ে গিয়ে দেখতে পায় এক সাঁওতাল যুবক, যার গায়ের রং কালো, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ ও তার বাঁশির অপূর্ব সুর এক আলাদা দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। বিলাস ছেলেটির পরিচয় জানতে পারে না, সেই মায়াবী পরিবেশে। এরপর হরিসেবকের অসুস্থ মেয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে। বিলাস হঠাৎ স্বপ্নে আবার সেই ছেলেটিকে দেখে এবং সে তার নাম বলে 'মধুসূদন'। গল্পে বিলাস ধর্মপ্রাণা ছিল না। হরিসেবকের স্বপ্নে দেখা 'সভ্য মানুষ' কথাটা একটা আলাদা রূপক। আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজ যে সমাজকে,

যে সমাজের মানুষকে অসভ্য মনে করে, জংলী মনে করে সেই আদিবাসী জাতির ছেলেকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রতিষ্ঠা, গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্যতে এক অনন্য শৈল্পিকমাত্রা আনে। ভগবান সব মানুষের, সে জাতপাতের উর্দ্ধে। বনফুল এই সারমর্মই গল্পে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাই তিনি বিলাসকে মধুসূদনের দর্শন দিয়েছেন, হরিসেককেকে নয়। ভগবান উদারতায়, সংকীর্ণতায় নয়। অতিলৌকিক বিষয়ের মধ্যে দিয়ে লৌকিক সারসত্য রূপ প্রস্ফুটিত।

বনফুলের ‘মণিকাঞ্চন’ গল্পেও অতিলৌকিক ঘটনাকে আশ্রয় করে গল্পের বিষয়বস্তু রচিত। কাঞ্চন সান্যাল কয়েক লক্ষ টাকা চুরি করে মণিমালার সাথে সুখে সংসার করবে বলে। কিন্তু তা হয় না। কাঞ্চন পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে যেতে যেতে সাঁওতালি গ্রামে এসে পড়ে। যাদের সাথে সভ্য জগতের সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই। এই গ্রামে গিয়েই কাঞ্চন সাপের মাথার মণির কথা জানতে পারে, যা বহুমূল্য ও দুর্লভ। মণিমালার সাথে সুখে সংসার করার লোভে, আরও বেশি টাকার লোভে কাঞ্চন পাহাড়ের মাথায় যায় মণি চুরি করতে। এই নিয়েই এক রহস্যময় অতিলৌকিক কাহিনি গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘সব ভূতুড়ে’ গল্পও লেখক এক ভৌতিক কাহিনির অবতারণা করেছেন। কোলিয়ারি অঞ্চলে আদিবাসী মানুষের জীবনযযন্ত্রণার স্বর, ক্ষোভ টুইলা মাঝি চরিত্রে প্রতিফলিত। টুইলার আত্মা তার মৃত্যুর জন্য, তার ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী কোলিয়ারির উর্দ্ধতন বাবুদের শাস্তি দিতে চায়। কোলিয়ারিতে কাজ করতে এসে কয়লাখাদানে কতশত আদিবাসী শ্রমিক প্রাণ হারায় যার দায় কোনো উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নেয় না। টুইলার এই প্রতিশোধ যেন গোটা আদিবাসী সমাজের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদের স্বর।

বাংলা ছোটগল্পকাররা এই অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিতে অতিপ্রাকৃত রূপকের মোড়কে সমাজসত্যকে, সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

৫.খ|৫- প্রকৃতিপ্রেম নির্ভর কেন্দ্রিক বিষয়:

জনজাতি জীবনাশ্রয়ী বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর পর্যালোচনায় একদিকে যেমন আদিবাসী সমাজজীবন, বিবিধশ্রেণির আদিবাসী মানুষদের ব্যক্তিজীবন, তাদের পরিবার জীবন, তাদের মনস্তত্ত্বের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিন্যাসের নিরিখে আদিবাসী চরিত্রের স্বরূপ, অর্থনৈতিক জীবন পরিবেশিত তেমনই বেশকিছু গল্পে শহুরে তথাকথিত আধুনিক মানুষদের সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতির প্রতি, সেখানকার মানুষদের প্রতি ভালোবাসা, দৃষ্টিভঙ্গি, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা গল্পে পরিবেশিত। গল্পে আদিবাসী মানুষ এবং আদিবাসী অঞ্চল বা জঙ্গল ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আদিবাসীরা প্রকৃতির সন্তান একথা বলা হয়, পাশাপাশি তথাকথিত আধুনিক ও সভ্য মানুষদের থেকে লোকালয় থেকে দূরে অরণ্যে বসবাস করায় তাদের 'বুনো' বা 'জংলী' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। অরণ্যে বসবাসকারী অরণ্যবাসীদের প্রতি শহুরে মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের সাঁওতাল পরগনার প্রতি, অরণ্যের আদিমতার প্রতি ভালোবাসা-মোহ, প্রকৃতির রহস্যময়রূপকে কেন্দ্র করে বেশকিছু গল্পের বিষয়বস্তু রচিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে', 'কবি', 'অরণ্যে', 'কুশলপাহাড়ি', 'কালচিতি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনতুলসী', অসীম রায়ের 'শৈলেনবাবু সমাচার', 'তাড়ি', এবং প্রফুল্ল রায়ের 'চারিদিকে কুয়াশা'- গল্পগুলি পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে গল্পের বিষয়বস্তুর সত্যরূপ স্পষ্ট করা হবে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে' গল্পে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের পটভূমিতে ছোটনাগপুরের চাইবাসা নামক জায়গা থেকে কিছু দূরে গৈলকেরা অরণ্যের প্রকৃতি বর্ণিত। শহুরে মানুষের বাকৈলা নামক বন্য ত্রলাকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এখানকার আদিবাসী হো জনজাতির কথা পাওয়া যায়। যারা ধর্মে খ্রিস্টান ও তাদের মাথায় লালফিতা বাঁধা। *হে অরণ্য কথা কও* (১৯৪৮) তে লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন হো ও মুণ্ডা আদিবাসীরা জমিদারদের অত্যাচার থেকে অব্যহতি পেতে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। সেই অভিজ্ঞতাই লেখকের বিভিন্ন গল্পে বারবার ফিরে আসে। কথকের কাছে ছোটনাগপুরের অন্য জঙ্গলের থেকে গৈলকেরার ঘন অরণ্য আলাদা, এর শোভা অপূর্ব ও স্বতন্ত্র। গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করেননি, পাশাপাশি অরণ্যের ভীষণ রূপের কথাও বলেছেন,যা একইসাথে মোহময়ী ও সর্বনাশা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ গল্পে শহুরে তথাকথিত আধুনিক কিছু মানুষের সিংভূমজেলার পাহাড়-জঙ্গলময় স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। তারা কুলামাড়ো নামক জঙ্গলে ঘেরা বন্যদেশে এক আদিবাসী কবির সন্ধান ও সাক্ষাৎ পায়। রঘুনাথ দাস নামক আদিবাসী কবির নিরাভরণ জীবনযাপন, সাহিত্যচর্চা, সংসারের কোলাহল থেকে দূরে দিনযাপন, সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন, এই শহুরে মানুষদের ভারতের প্রাচীন কবি কালিদাস, ভাসের কথা, এই প্রকৃতির কোলে তাঁদের কাব্য রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শহুরে মানুষদের এক অন্য অভিজ্ঞতা, দিনযাপনের কাহিনি গল্পের বিষয়বস্তু। একদিকে শহুরে মানুষরা তাদের কর্ম থেকে বিরতি নিয়ে তাদের শখ মেটাতে এই জঙ্গলে ঘুরতে আসে, আর অপরদিকে এই অরণ্যের শান্ত পরিবেশকে ভালোবেসে, সংসারের কোলাহল থেকে দূরে রঘুনাথ দাস এই অরণ্যেই তার জীবনযাপন করে। শহুরে ও আদিবাসী গ্রাম্য মানুষদের এটাই পার্থক্য। একটা শখ আর একটা নিখাদ ভালোবাসা প্রকৃতির প্রতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যে’ গল্পের পাহাড়ি জঙ্গলে ঘেরা সিংভূমের মাইন্‌স নামক জায়গায় অবস্থিত সাঁওতালী গ্রামের প্রকৃতিবর্ণনা ও কথকের দৃষ্টিতে অরণ্যের শোভা ও আদিবাসী মানুষদের কথা গল্পের বিষয়বস্তু। এই গল্পেও অরণ্যের শোভার পাশাপাশি অরণ্যের ভয়ংকর রূপ বর্ণিত। এই সমস্ত গল্পে শহুরে মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি অরণ্যের শোভার পাশাপাশি ভয়ংকর রূপ ও অরণ্যর সন্তানদের কথা গল্পে বর্ণিত। যদিও এই গল্পে আদিবাসীদের নিবিড় জীবনচর্চার রূপ পাওয়া যায়না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য আর এক প্রকৃতির সৌন্দর্য ও আদিবাসীদের নিয়ে লেখা গল্প ‘কুশল পাহাড়ি’। গল্পে সভ্যমানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরহোড় জনজাতির জীবনচর্যার কিছু টুকরো চিত্র এবং প্রকৃতির মধ্যে অরণ্য জীবনের সত্যতা বর্ণিত। এই গল্পেও ‘কবি’ গল্পের ন্যায় এক আরণ্য কবি ওরফে সাধুর সাথে কথকের পরিচয়। সেই সাধুর জ্ঞান, নিরাভরণ জীবন, মুক্তির সাধনা উপলব্ধি, ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যর সাথে অরণ্যের আদিমতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটেছে গল্পে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিনির্ভর ও শহুরে সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আরণ্যক জীবনকেন্দ্রিক গল্পগুলিতে একদিকে অরণ্যের নির্মল শোভা বর্ণিত অন্যদিকে অরণ্যের ভয়ংকর রহস্যময় রূপ চিত্রিত। লেখকের নিজস্ব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা গল্পগুলিতে মূলত লিপিবদ্ধ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এবং প্রফুল্ল রায়ের গল্পেও প্রকৃতির এই দু’রকমরূপের কথা পাওয়া যায়।

এই আলোচনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালচিতি’ গল্পটিতে আলোকপাত করা হল। পাহাড় ও জঙ্গলাকৃত প্রকৃতির কোলে অবস্থিত কালচিতি আদিবাসী গ্রাম। টাউন থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রাম যেখানে সংসারের কোলাহল নেই, জমিদারদের উৎপাত নেই, আড়ম্বরের কৃত্রিমতাহীন পক্ষীকাকলিমুখর স্নিগ্ধ এক জায়গা কালচিতি গ্রাম। সারোয়া পাহাড়ের এপারে টেঁড়াপানি গ্রাম এবং অপরপ্রান্তে কালচিতি গ্রাম। এই টেঁড়াপানি গ্রামের আদিবাসী মানুষরা অবিরাম বন্য পশু, দারিদ্র্যর সাথে নিত্য সংগ্রাম-সংঘর্ষ করে জীবনযাপন করছে। গল্পে লেখক কালচিতি ও টেঁড়াপানি গ্রামের বৈপরীত্য দৃশ্য উপস্থাপনা করেছেন। অন্যদিকে গল্পে শহর থেকে অনেকদূরে, পাহাড়ি বনের ধারে, শাল-আসান-মহুল গাছের ছায়ায় লুকানো এই কালচিতি গ্রামের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ‘কালচিতি’ গল্পের উপজীব্য। এই গ্রামের মানুষদের জীবনযাপন অত্যন্ত সাধারণ, তাতে কৃত্রিমতার স্পর্শমাত্র নেই। এখানকার ছেলেমেয়েরা শহর থেকে দূরে থাকলেও তারা স্কুলে পড়াশোনা করে, তাদের আচার-ব্যবহারে মার্জিত ভাব স্পষ্ট। তাদের খাওয়াদাওয়াতেও বাজারের কেনা পণ্যের থেকে বেশি তাদের নিজেদের জমিতে উৎপাদিত গ্রামেরই জিনিস। অরণ্য শ্বাপদসংকুল এলাকায় অভ্যস্ত এই আদিবাসী মানুষরা নির্ভীক জীবনযাপন করে। এই প্রকৃতির সবকিছুই তাদের আপন। প্রাকৃতিক নৈসর্গিক রূপ ও শহরের মানুষদের দৃষ্টিতে এই গ্রাম ও গ্রামের আদিবাসী মানুষদের আতিথেয়তার চিত্র গল্পে সুঅন্বিত। এছাড়াও কালচিতি গ্রামের পরিবেশ কিছু অংশের জনজাতি মানুষদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উত্তরণের ইঙ্গিত বহন করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বনতুলসী’ গল্পে কথকের প্রকৃতিপ্রেমের সাথে সাঁওতাল আদিবাসী নারীর প্রতি ভালোলাগা, বনতুলসী জঙ্গলের, প্রকৃতির নিষ্ঠুররূপ বর্ণিত। প্রকৃতি যেমন ভালোবাসায় স্নিগ্ধ, তেমনই সর্বগ্রাসীও। তার রহস্য অন্তহীন। গল্পে কথক বনতুলসীর প্রকৃতিপ্রেমে মত্ত হয়েছিলেন জীবনের কৈশোর বয়সে, সেই বনতুলসীর ঘন অরণ্যর মাঝে কথক তার প্রথম ভালোবাসা তুরী জাতির মেয়েকে পেয়েছিল। কথক যৌবনে এসেও সেই বনতুলসীর মাঝেই পূর্ণযৌবনা সাঁওতাল মেয়ের প্রতি রোম্যান্টিসিজমের আবেগে-ভালোবাসায় ভাসেন। গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক প্রকৃতি কেবল নয়নাভিরাম নিসর্গদৃশ্য নয়, এই মোহেই লুকিয়ে থাকে মরণফাঁদ, এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে মানবীর ও প্রকৃতির প্রেমের এক মিলনান্তক রূপই গল্পের উপজীব্য হয়েছে।

অসীম রায়ের ‘শৈলেনবাবু সমাচার’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শৈলেনবাবু, যিনি একজন শহুরে আধুনিক মানুষ। তিনি সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় ড্রাফটম্যান পদে কাজ করতেন। এই শৈলেনবাবুর সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতি এবং সাঁওতাল পরগনার মানুষদের প্রতি ভালোবাসা, দৃষ্টিভঙ্গি গল্পে চিত্রিত। এছাড়াও পঞ্চাশ বছর আগের সাঁওতাল পরগনার যে প্রকৃতি, অরণ্য, তা বর্তমান সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের আধুনিক পুঁজিবাদী মানুষ কীভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছে তা বর্ণিত। এই পুঁজিবাদের আগ্রাসনে সাঁওতাল পরগনার প্রকান্ড মহুয়ার শোভা অপসারিত হয়েছে, যেন চারদিকে বৃক্ষহত্যা অর্থাৎ জঙ্গল কেটে সাফ করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বৃক্ষহত্যার উৎসব চলছে।

শৈলেনবাবুর চোখে সাঁওতাল পরগনার সৌন্দর্য, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপরূপ শোভা, আমলকি, ইউক্যালিপটাস, জাকারান্ডা, কাঠচাঁপা গাছের প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত। শহুরে মানুষ হয়েও শৈলেনবাবুর কাছে কলকাতার মানুষ হিংস্র প্রাণী। তাঁর কাছে সাঁওতাল পরগণার গ্রাম্য আদিবাসী সহজসরল মানুষগুলি নিখাদ, তাদের মধ্যে রক্তলোলুপতার- হিংস্রতার লেশমাত্র নেই। এই গ্রাম্য জংলী পরিবেশের প্রতি শৈলেনবাবুর যে ভালোবাসা, চাকরিজীবনে এবং পরবর্তীতে সেই টানেই তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে, স্ত্রী বিয়োগের পর জীবনের শেষসময়ে বাহিঙ্গা আদিবাসী গ্রামে এসেছেন। চাকরিজীবনে শৈলেনবাবুর প্রকৃতিপ্রেমের পাশাপাশি ভালোবাসা ছিল আঁকার প্রতি। দুই ভালোবাসা মিলে যায় এই সাঁওতাল পরগনায়, তাঁর আঁকা, রং-তুলিতে ফুটে ওঠে আদিবাসী সাঁওতাল সহজ-সরল মানুষজন, সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতি। এতেই ছিল শৈলেনবাবুর মনের আরাম, এক অদ্ভুত শান্তি। জীবনের শেষেও তিনি তাই শহুরে কোলাহল থেকে দূরে, ভালোবাসার জায়গায় এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গল্পে শৈলেনবাবুর অর্থাৎ শহুরে মানুষের সাঁওতাল পরগনার প্রতি ভালোবাসা, আত্মিক টান এবং শহুরে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিবাসী মানুষদের প্রকৃতি গল্পে লিপিবদ্ধ।

অসীম রায়ের ‘তাড়ি’ গল্পে সোমেন মুখোপাধ্যায় নামক বাঙালি কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে সাঁওতাল পরগনার লালামাটির শোভা বর্ণনা, তৎকালীন ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পটভূমি ও আদিবাসী মানুষদের জীবনাচরণ বর্ণিত। গল্পে সাঁওতাল পরগনার লালমাটি এক কবির কবিতায় তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণিত– ‘বিদ্রুপশাণিত নগরবাসী রূপান্তর নেয় এক গ্রামীণ রাখালে’।[৩৩] পাশাপাশি গল্পে যুগের অন্তঃসারশূন্যতা, কলকাতা ছেড়ে মানুষের বিদেশে বা অন্যত্র পালানোর চিত্র লিপিবদ্ধ। সোমেনবাবুও

এরকম মানুষেরই দলে, যে কলকাতা ছেড়ে এই সাঁওতাল পরগনায় পালিয়ে এসেছেন। আদিবাসীদের তাড়ির নেশা, কলকাতার বাইরে যে পশ্চিমবাংলার খারাপ অবস্থা, তৎকালীন সময়ের কথা, যুগসচেতনতা গল্পের বিষয়ে বারবার উঠে এসেছে। আদিবাসীদের সহজ সরলতার কথা সোমেনবাবু বললেও, ওঁনার স্ত্রী বিনতা এই আদিবাসী মানুষদের কোনো এক অজ্ঞাত কারণে 'আনগ্রেটফুল' বলতে থাকে। গল্পের পরিণতিতেও তাই সাঁওতাল পরগনার তাড়ির নেশায় মত্ত মানুষদের দ্বারা সোমেনবাবুর নিগৃহীত হওয়ার চিত্র পাওয়া যায়। অন্যসব গল্পের থেকে ব্যতিক্রমী এক ঘটনার সম্মুখে দাঁড় করায় লেখক। অন্য সব গল্পে আদিবাসীরা নিগৃহীত-লাঞ্ছিত, এক্ষেত্রে শহুরে মানুষ তাদের দ্বারা আক্রান্ত, লাঞ্ছিত। হাতেগোনা এক-দুটি গল্পে আদিবাসীদের নেতিবাচকরূপ চিত্রিত, তার মধ্যে অসীম রায়ের 'তাড়ি' অন্যতম।

প্রফুল্ল রায়ের 'চারদিকে কুয়াশা' গল্পে শহুরে, আধুনিক মানুষদের ছোটনাগপুরের পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা সাঁওতাল পরগনায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। গল্পে অরণ্যর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই তার ভয়ঙ্কর রূপ প্রচ্ছন্ন তা পরিস্ফুট। কথক এবং তার তিন বন্ধু মিলে ভাদ্রমাসে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ঘুরতে গিয়ে জটিল অরণ্যের গাঢ় কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়ার বিষয় গল্পে বর্ণিত। প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে আকর্ষণ, নিসর্গ সৌন্দর্য-মোহের যে নেশা তার অন্তরালেই থাকে গভীর বিপদ।

প্রকৃতি বিষয়কেন্দ্রিক গল্পগুলিতে একদিকে যেমন প্রকৃতির অপরূপ শোভার পাশাপাশি পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা সাঁওতাল পরগনা, আদিবাসী গ্রামের শোভা বর্ণিত, তেমনই এই প্রকৃতির রহস্যময় রূপও চিত্রিত। প্রথম আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা গেছে তারা সভ্যসমাজ থেকে দূরে অরণ্যে বসতি স্থাপন করে। আলোচিত এই গল্পগুলিতে দেখা যায় সভ্যসমাজ থেকে বহু ক্রোশ দূরে গভীর অরণ্যানি যেখানে সভ্যতার আলো সেভাবে পৌঁছায়নি, সেখানে এই আদিবাসী মানুষদের জীবনযাপন, সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জনতায় তাদের বাস। শহুরে, কৃত্রিমতায় পূর্ণ মানুষদের কাছে অরণ্য বাহ্যিকভাবে সুন্দর কিন্তু এর গভীরে গেলেই অরণ্য তাদের কাছে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। যারা প্রকৃতির ভাষা বোঝে, গভীরভাবে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে, সেই প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সন্তানরাই সুন্দর। গল্পগুলি বিশ্লেষণে বোঝা যায় আধুনিক সভ্যসমাজ থেকে বহু দূরে এই অরণ্যতে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষদের জীবন অনেক নির্মল, নির্ভেজাল। গল্পগুলির বিষয়কেন্দ্রিক বিশ্লেষনে শহুরে মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাঁওতাল পরগনা

ও আদিবাসী মানুষদের জীবনচর্যার সহজ নিরাভরণ রূপ ও প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের পাশাপাশি জটিল রহস্যময় স্বরূপ চিত্রিত।

৫.খ|৬- আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সঙ্কট-সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয়:

এই গবেষণাকার্যে আদিবাসীজীবন কেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় বেশ কিছু গল্প আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থান সামাজিক সমস্যা, সঙ্কট নিয়ে রচিত। আদিবাসীরা মূলত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারা হতদরিদ্র, শিক্ষার আলো তাদের মধ্যে প্রবেশ করেনি। আদিবাসীদের বেশিরভাগ মানুষই অশিক্ষিত হওয়ায় তারা নানান সামাজিক অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারে জর্জরিত। আমাদের গবেষণাপত্রে নির্বাচিত আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থান, সামাজিক চিত্র ও নিজস্ব সংস্কার বিষয়কেন্দ্রিক গল্পগুলি হল– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিলাসন’, ‘বরমলাগের মাঠ’, ‘ঘাসের ফুল’, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘সাঁওতাল’, ‘রেজিং রিপোর্ট’, ‘বলিদান’, ‘পৌষ-পার্বণ’, ‘মরণবরণ’, ‘বন্দী’, ‘বনবিহগী’, সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘আণ্টা বাংলা’, ‘বন্যা’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সাঁওতাল’, সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’, লঘু আরণ্যক’, উচলে চড়িনু’, কমলকুমার মজুমদারের ‘বাগানকেয়ারি’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ভোগবতী’, ‘সৈনিক’, ‘বীতংস’, রমাপদ চৌধুরীর ‘জলরঙ’, ‘তিনতারা’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘ঝুমরা বিবির মেলা’, ‘মানুষ অমানুষের গল্প’, সমরেশ বসুর ‘শানবাউরির কথকতা’, ‘আইন নেই’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘জল’, ‘এম ডব্লু বনাম লিখিন্দ’, ‘শিশু’, ‘নুন’, বিছন’, ‘ডাইনি’, ‘ঘন্টাবাজে’, ‘জঙ্গল’, ‘অর্জুন’, ‘প্রেতোৎসব’, ‘রাবণবধ’, ‘বড়াম মায়ের থানে’, ‘হরিরাম মাহাতো’, ‘সাগোয়ানা’, ‘দৌলতি’, ‘পালামৌ’, ‘গোহুমণি’, দেবেশ রায়ের ‘মৃত জংশন’ ও ‘বিপজ্জনক ঘাট, ভগীরথ মিশ্রের ‘প্রয়াগবেজের হাই’, ‘পৌষ-পরবের কুশীলব’, ‘বনমহোৎসব’, তপন বন্দোপাধ্যায়ের ‘আলোচনা চক্র’, ‘হাঁড়িয়ার দেশের কবিতা’, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘পাতালের মুখ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘রেখে আসা’, ‘ঝড়ে কাক মরে’, ‘কল’, অমর মিত্রের ‘ভারতবর্ষ নামান্তর আত্মপাথর’, ‘দানপত্র ১’, নলিনী বেরার ‘টি.আই. প্যারেড’, ‘নুয়াসাহীর বটতলা’, ‘বাঘাতঙ্ক’, ‘ঝরা পালকের জাদু’, সৈকত রক্ষিতের ‘বশীকরণ’, ‘ছল’, ‘বয়ার কাড়া’, ‘আঁকশি’, ‘পাঘা’, ‘মাড়াই কল’, ‘পট’, ‘মূলুন’, ‘রাঙামাটি’, শবরচরিত ‘উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা’, অনিল ঘড়াইয়ের ‘নুনা সামাডের গল্প’, ‘হাতিছাপ’, ‘খরার আকাশ’, ‘অরণ্যের জীবন’, ‘বনের মানুষ বনে’।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিলাসন’ গল্পে জৈনপন্থী আদিবাসী সাঁওতাল মানুষদের সংস্কার বিশ্বাসজনিত কাহিনি, তৎকালীন সময় প্রেক্ষাপট গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে রচিত। এক শুভ শিলাসনকে আদিবাসী মানুষগুলি দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। তাদের বিশ্বাস জৈনধর্মের মূল সত্য- ধর্ম, অহিংসা, সত্য, প্রেম, অক্রোধ– পঞ্চ সত্যকে যদি কেউ অমান্য করে তাহলে ঐ সাদা পাথর কালো হয়ে যাবে ও সর্বনাশ হবে। বিলিতি ডিগ্রিধারী মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অমলের সাথে কাঁদনের অতীতে ঝামেলার কারণে, কাঁদনের মনে অমলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব ছিল। সেই অতীতের মনোভাব, হিংসা থেকেই কাঁদন অমলের উপর প্রতিশোধ নেয় এবং সাদাপাথর ও কালোপাথরে রূপান্তরিত হয়। এরপরই গ্রামে নেমে আসে সংকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে পুলিশ মনে করে এই টিলায় নিশ্চয় কয়লার সঞ্চয় আছে। পুলিশের ধারণা পানাগড় থেকে চুরি করে আনা অস্ত্র বারুদ এই স্থানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। এই আদিবাসীদের গ্রামের টিলার তলা পর্যন্ত কয়লার সঞ্চয় মাটির তলায় পুঞ্জীভুত ছিল, যার ভিতরে পিলার কাটিং করে বণিকের দল নিয়ে গেছে অনেক আগেই। এই খাদের তলে ডাম্পের সন্ধানে পুলিশ প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটালে আশপাশের গ্রামেও ভূমিকম্প হয় ও পাতালগর্ভে হারিয়ে যায় শিলাসন। সেই শিলাসন রক্ষায় কাঁদনের স্ত্রী শুচিস্মিতা ওই ধ্বংসাবশেষেই লাফিয়ে পড়ে। সে নিজের স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে, গ্রামকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে নিজের জীবন দিয়ে শিলাসনকে আঁকড়ে ধরে রক্ষা করে। গল্পে তারাশঙ্কর আদিবাসী মানুষদের বিশ্বাস-সংস্কারের পাশাপাশি গল্পে অতীতের কিংবদন্তীকে চলমানকালের সঙ্গে যৌগিক মিশ্রণে রসায়িত করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বরমলাগের মাঠ’ গল্পে বাউরি সমাজের বেদিয়াজাতি ও বেদিয়া নারীর প্রতি যে বিশ্বাস, বরমলাগের মাঠকে ঘিরে তাদের যে কিংবদন্তী কাহিনি, আদিবাসী মানুষদের অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার চিত্রিত। গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি বাউরি জাতির মানুষদের বরমলাগের মাঠ ও ব্রহ্মনাগকে ঘিরে নানা কিংবদন্তী কাহিনি পাশাপাশি গ্রামের ছেলে নটবর বাউরীর বেদের মেয়ের প্রেমে পড়ে গ্রাম পরিত্যাগ ও বেদের মেয়ের নানা জাদুবিদ্যায় পারদর্শীতার কাহিনি নটবরের ছেলের মৃত্যু এবং গল্পের আগাগোড়া অন্ত্যজ ও আদিবাসী মানুষগুলোর অন্ধবিশ্বাস, অর্থনৈতিক অবস্থান, সংস্কারকে কেন্দ্র করেই গল্প রচিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঘাসের ফুল’ গল্পে কয়লা খাদানের শ্রমজীবী মানুষদের জীবন-জীবিকা, বঞ্চনার কাহিনি ও তাদের মর্মান্তিক পরিণতি চিত্রিত। জীবিকার প্রয়োজনে তাদের অমানুষিক পরিশ্রমে, খনিগর্ভে তাদের মানুষ বলে চিনতে পারা দুষ্কর, যেন ‘বীভৎস কালোমূর্তি।’ তাদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রম, জীবনবিপর্যয় করে স্বল্প পারিশ্রমিকে শ্রমের পরেও তারা তাদের প্রাপ্যটুকুও পায় না, তাদের সাথে মনুষ্যেতর ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত মজুরির লোভ, সেটা দুই টাকা বেশি পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে এই আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষগুলিকে খনিগর্ভের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়।

কোলিয়ারির খাদে আগুন লাগার কথা খাদানের মালিকেরা জানলেও পদক্ষেপ নেয়নি, পরবর্তীতে ভয়াবহ পরিস্থিতি হলে তা সামাল দিতে পারিশ্রমিক বেশি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে কুলিকামিনদের খাদে নামাতে চায়। কিন্তু তারা রাজি না হওয়ায় মালিক পক্ষ আরও বেশি পারিশ্রমিকের লোভ দেখায়, তারা মনে করে ‘টাকায় দুনিয়া কেনা যায় - মানুষ কি দুনিয়ার বাইরে?’[৩৪], বেআইনিভাবে অতিরিক্ত মজুরির লোভ দেখিয়ে দারিদ্র মানুষগুলোকে খনি গর্ভে মৃত্যুর মুখোমুখি ঠেলে দেয়, শুধুমাত্র খাদান বাঁচাতে। আগুনের অগ্রগতিকে রুখে দিতে ভিতরের আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার না করেই কর্তৃপক্ষ খনিমুখ বন্ধ করে দেয়। চুড়কীর মতো আরও অনেক শ্রমিকরা মালিকপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্রিয়াকলাপ, স্বার্থপর মানসিকতা ও লোভের কারণে খনিগর্ভে আটকে পড়ে এবং মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়। এই দরিদ্র, অসহায় মানুষগুলো সামান্য কিছু টাকা উপার্জনের জন্য তাদের এই জীবন বিপন্ন করে কাজের তাগিদেই স্পষ্ট তাদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার স্বরূপ। তাদের এরূপ মর্মান্তিক পরিণতি মালিক শ্রেণির মুখোশ, স্বার্থকে যেমন অনাবৃত করেছে, তেমনই ফুটে উঠেছে আদিবাসীদের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো। যন্ত্রের নির্মম পেষণে এইভাবে চুড়কীর ন্যায় বহু ‘ঘাসের ফুল’ অনুক্ষণ পদদলিত হচ্ছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘সাঁওতাল’ গল্পে আদিবাসী এই অরণ্যচারী মানুষগুলোর উপর জমিদারদের নৃশংস অত্যাচারের কথা চিত্রিত এবং সাঁওতালদের লাঞ্ছনার চিত্র গল্পে বিষয়বস্তু হয়েছে। জমিদারদের অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার এই সহজসরল মানুষগুলো, অরণ্যের সন্তানদের অরণ্য থেকে উৎখাত করার জন্য নিদারুণভাবে তাদের উপর অত্যাচার করা হত এবং শেষমেষ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, তাদের আবার নতুন বসবাসের জায়গার সন্ধানে পাড়ি দিতে হয়। গল্পে আদিবাসী অনার্য এই জাতিকে আত্মবিশ্বাসী, প্রতিবাদী, স্বাধীনচেতামনস্ক হিসাবেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যেন

জমিদারদের অত্যাচার, কূটনীতির কাছে হেরে যায়। তৎকালীন সময়ের জমিদারদের অত্যাচারের বাস্তব মুখোশ গল্পে উন্মোচিত। গল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের প্রতি জমিদার নায়েবদের অত্যাচারের, লাঞ্ছনার চিত্র চিত্রায়িত। গ্রামের জমিদার নানাভাবে খাজনা নিয়ে গ্রামবাসীদের অত্যাচার করে, কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা সহ্যের সীমা ছাড়ায় যখন লখিন্দরের মেয়ে টেবিকে জমিদার বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। আদিবাসী সমাজের নিয়মানুসারে টেবিকে এরপর গ্রামবাসী বুকে বিষবাণ বিদ্ধ করে হত্যা করে। জমিদারের পাপের শাস্তি নিরাপরাধ টেবিকে তার জীবন দিয়ে দিতে হয়। গ্রামবাসী সকলে টেবির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে নায়েবের চাপরাশিকে হত্যা করলে, নায়েবের নির্দেশে জমিদারের লোক সাঁওতাল পল্লীতে রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সকল গ্রামবাসী তাদের পুরানো বাসস্থান ছেড়ে নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেও টেঁবির বাবা লখিন্দর কেবল এই জায়গা ছেড়ে যেতে পারে না। সে তার মৃত মেয়ের স্মৃতি আকড়ে থাকে, তার মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল হয়। জমিদার, নায়েবের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে টেঁবির বাবা নায়েবের ছয় বছরের মেয়েকে চুরি করে। এই গল্পে সাঁওতালদের প্রসঙ্গে শৈলজানন্দ বলেন-

'ভারতের সেই আদিম অনার্য অধিবাসী হয়তো মিষ্ট কথার গোলাম হইতে পারে কিন্তু দুনিয়ার কাহারও চোখরাঙানির অনুশাসন মানিয়া চলে না'।[৩৫]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পৌষ-পার্বণ' গল্পে চিত্রিত কয়লা কুঠির সাঁওতাল কুলি শ্রমিকদের 'বাঁদনা' উৎসব, পৌষপার্বন যা সাঁওতাল, বাউরিদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের-উৎসবের দিন। এই উৎসবে আদিবাসী সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি বাউরি সমাজে লখাইয়ের মৃত্যুতে কোড়া, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের শবদেহ সৎকারের জন্য পাওয়া যায় না উৎসবের দিনে। গল্পে আমোদী ও লোটনীর নিদারুণ অর্থাভাবের চিত্র ও তাদের করুণ পরিণতি গল্পের বিষয়বস্তু।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পে কয়লাখাদানে কাজ করা আদিবাসী শ্রমিকদের বিপর্যস্ত জীবনকাহিনি, মালিকপক্ষ ও উর্দ্ধতন কর্মীদের মুনাফার লোভে ও ষড়যন্ত্রের কারণে অসহায়, দরিদ্র, সহজ-সরল আদিবাসী মানুষগুলির মৃত্যু, তাদের ট্র্যাজিক পরিণতি কয়লাখাদানের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। সাহেবদের কাছে এই আদিবাসী মানুষগুলির প্রাণের কোনো মূল্যই নেই, তারা কেবল তাদের হাতের

ঘুঁটির স্বরূপ। এর প্রতিবাদ যদি কোনো সৎ-মানুষ করতে আসে সেক্ষেত্রে তাকেও এই শ্রমের, কয়লাখাদানের রাজনীতির, ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়। এই একই প্রসঙ্গ রমাপদ চৌধুরীর 'জলরঙ' গল্পেও পাই। তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কয়লাখাদানে কাজ করতে যাওয়া অর্থাভাবের কারণে এই আদিবাসী মানুষগুলোর সুযোগ সম্পূর্ণরূপে মালিকপক্ষ নিয়ে থাকে। পাশাপাশি তারা সহজ সরল ও অশিক্ষিত হওয়ায় কখনই তারা মালিকপক্ষের কূটবুদ্ধি বুঝতে না পেরে প্রাণ হারায়। এক অন্ধকারময় বীভৎসতার মাঝেই আদিবাসী মানুষগুলোর জীবন সর্বদা পিষ্ট এই নিষ্ঠুরতাই গল্পের মূল বক্তব্য।

এই একই প্রসঙ্গে শৈলজানন্দের অন্য আর এক গল্প 'বলিদান'। গল্পে আদিবাসী কিছু সংস্কার সংস্কৃতির পাশাপাশি তাদের সুখ দুঃখের দাম্পত্য জীবনের কাহিনি গল্পে বর্ণিত। কিন্তু গল্পের মূল বিষয়– কয়লাখনিতে কাজ করা আদিবাসী মানুষদের জীবন জীবিকার সংগ্রাম তাদের প্রতি হওয়া অন্যায়, বঞ্চনার কাহিনি। নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পরও তাদের সাথে মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো ব্যবহার করা হয় এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চরম নিষ্ঠুরতার কাজ করা থেকেও সাহেবরা পিছপা হয় না। 'বলিদান' গল্পে চূড়ান্ত অমানবিক নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা ও মালিকপক্ষের লোভ লালসার কারণে যুপকাষ্ঠে বলি হতে হয় লাকু মাঝি, সোনিয়া ও টগরীর প্রিয় মুরগী লছমনিয়াকে। গল্পে যেমন মালিকশ্রেণির মুখোশ অনাবৃত হয়েছে, তেমনি অসহায়,লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানবাত্মার চরম ট্র্যাজিক পরিণতি প্রকাশিত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'মরণবরণ' গল্পে লেখকের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে কয়ালখনিগুলিতে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষদের চূড়ান্ত বঞ্চনার চিত্র প্রতীয়মান গল্পে একদিকে দেখা যায়, পিতৃ-মাতৃহীন ভাটুল মাঝির অসহনীয় যন্ত্রণাময় জীবন, যে কারণে সে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ভাটুল মাঝির মানসিক চাপ, যন্ত্রণার পিছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দায়ী কয়লাখনির শ্রমিকদের দাস জীবন। ভাটুল মাঝি এক দুর্যোগের রাতে একসঙ্গে তার ছয় সন্তানকে হারায়, যারা আকস্মিক দুর্ঘটনায় খনিগর্ভে তলিয়ে যায়। এছাড়া ভাটুল দ্বিতীয় বিবাহ করলেও তার স্ত্রী রুকি কুঠির সাহেবের লালসার শিকার হয়েছে। সর্বস্বহারার বেদনাবোধে ভাটুল মাঝি আত্মঘাতী হয়, যার পিছনে কয়লাকুঠির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান। এর পাশাপাশি গল্পে কয়লাখাদানে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিকের স্ত্রীদের অবস্থানের বাস্তবসম্মত ছবি গল্পে ধরা পড়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘বন্দী’ গল্পেও কয়ালাখনির আদিবাসী, প্রান্তিক শ্রমিকদের শোষিত, নিষ্পেষিত জীবনের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। গল্পে দেখা যায় কয়লাখাদানে কাজ করতে গিয়ে নিশির মৃত্যু হলে, সেই মৃত্যুসংবাদ গোপন করতে নিশির ভাই পানটুকে সাহেব পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিতে চায়। সাহেব টাকার লোভ দেখিয়ে, দরিদ্র মানুষদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মুখবন্ধ করতে চায়। কিন্তু গরীব হলেও পানটু এবং সাঁওতালি মেয়ে পাণি সাহেবের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাদের বন্দী করা হয় এবং বন্দী অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়। যখনই আদিবাসীরা সরকার ও উচ্চবর্ণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, তখনই তাদের ষড়যন্ত্র করে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই গল্পে কয়লাখনির শ্রমিকদের দারিদ্র্য এবং অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সাহেব ও উচ্চবর্গীয় শ্রেণি কীভাবে আদিবাসী মানুষদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রাণশক্তি খনির অন্ধকারে বন্দী করে নিঃশেষ করে দেয়, তারই সত্যরূপ উদ্‌ঘাটিত। এছাড়াও গল্পে দেখা যায়। কিছু শহুরে শিক্ষিত মানুষ এবং কর্মীসঙ্ঘ শ্রমিকদের স্বার্থে যতই লড়াই করুক না কেন, পরিণামে ফলস্বরূপ দেখা যায় সরকারী আইন প্রশাসন আদতে উচ্চবর্গীয় মালিক পক্ষের নিয়ন্ত্রাধীন। এই গল্পের সারমর্মে দার্শনিক সক্রোটিস এর একটি উক্তি প্রযোজ্য- “যার টাকা আছে তার কাছে আইন খোলা আকাশের মত, আর যার টাকা নেই তার কাছে মাকড়ষার জালের মত।”

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘বনবিহগী’ গল্পে সাঁওতাল জনজাতিগোষ্ঠীর গ্রামীণ পরিবেশে আদিমজীবন স্বভাব উদ্ভাসিত, পাশাপাশি চিত্রিত আড়কাঠির কবলে পড়ে সহজ-সরল মানুষগুলির অসহায়তার চিত্র এবং কয়লাখনির শ্রমিকদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনাময় জীবন। গল্পে দেখা যায় মুকরি এবং সোনা আদিবাসী সমাজের নিয়মের কারণে বিবাহ করতে না পেরে, তারা সেই গ্রাম পরিত্যাগ করে। কিন্তু আড়কাঠির ফাঁদে পড়ে তারা কয়লাখনিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়। এই আড়কাঠির কবলে পড়ে আদিবাসীদের দুর্বিষহ জীবনের কথা আরও বহু গল্পে পাওয়া যায়। কয়লাখনির দুর্বিষহ দাসত্বের পথ পেরিয়ে মুকরি এবং সোনা পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। এই গল্পে দেখা যায় আদিবাসী সহজসরল মানুষদের বিশ্বাসভঙ্গ হতে, তারা মনে করে তারা যেমন মিথ্যাচার করে না, তেমনই অন্যকেউও তা পারে না, তাদের এই বিশ্বাসে আঘাত লাগে। পরিণতিতে তাদের এই বোধের কারণেই তারা তাদের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছে। তারা চোখ রাঙানির অনুশাসন না মেনে, গোলামি দাসত্ব জীবনের অন্ধকার পেরিয়ে পুনরায় তারা সাঁওতালদের গ্রামীণ কৌম জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আন্টাবাংলা' গল্পটি তিনপুরুষ কালব্যাপ্তি একটি গল্প, যে গল্পে উপন্যাসের ব্যাপ্তি লক্ষণীয়। 'নীলদর্পণ' নাটকে যেমন বাংলা কৃষকদের উপর নীলকর সাহেবকে অত্যাচারের কথা পাওয়া যায়, তেমনি আন্টাবাংলা গল্পেও বিহারের নীলকর সাহেবদের আদিবাসী গ্রাম্য মানুষগুলোর উপর অত্যাচারের চিত্র পাওয়া আয়। সতীনাথের পিতা ছিলেন পূর্ণিয়া কোর্টের ব্যবহারজীবী, সেখান থেকে নীলকরদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ার কিছু নথিপত্র পেয়েছিলেন সম্ভবত, সেই অনুসন্ধিৎসাই তথ্যরূপে গল্পে লিপিবদ্ধ।

আন্টাবাংলার সাহেবের অত্যাচারের বিরসা ওঁরাও এর মৃত্যু। বিরসার নাতি বোটরা তখন তার মায়ের গর্ভে। এক্ষেত্রে কেবল লেখক নীলকরদের অত্যাচারের পাশাপাশি নীলকরদের অবস্থার পরিবর্তনের ঐতিহাসিক তথ্যও পরিবেশিত। যে আন্টাবাংলায় বোটরার দাদু বিরসার মৃত্যু, বোটরার মায়ের ওই আন্টাবাংলায় সাহেবের রক্ষিতা হওয়া, এতকিছুর পরেও বোটরা আন্টাবাংলার সাথে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে নিজের জীবনের অঙ্গ হিসাবে মোহে জড়িয়ে ফেলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করলে সাহেবরা দেশ জুড়ে চলে যেতে থাকে এবং আন্টাবাংলার রূপ পরিবর্তন হতে থাকে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বোটরাকে বাধ্য করে আন্টাবাংলা ছেড়ে আসামে কাজ নিতে হয়। বোটরা ওঁরাও এর মৃত্যু হয় তার ঠাকুরদার মৃত্যুদিনে। বোটরার জীবন আন্টাবাংলাকে ঘিরে এবং কালের নিয়মে আন্টাবাংলার ধ্বংসের সাথে সাথে বোঁটরার মৃত্যু গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতি। বোটরার জীবন ও আন্টাবাংলা একসূত্রে গাঁথা। একটা কালের অস্তমিত সময়ের কথা গল্পে লিপিবদ্ধ।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'বন্যা' গল্পে বিহারে ব্রাহ্মণ, তিয়র, ধাঙর, মুসহর, বাতার, তাৎমা এবং মুসলিম জাতির মানুষের বাস। বিহারের জাতিভেদ প্রথা এবং স্বার্থসিদ্ধির কারণে কোন্দলে লিপ্ত মানুষের বাস্তবিকরূপ গল্পে উদ্‌ঘাটিত। সমাজের অন্ত্যজ মানুষদের উচ্চবর্ণের মানুষরা সর্বদাই হেয় করে, অপদস্ত করে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষরা এক জায়গায় আসতে বাধ্য হয়। গল্পে বিহারের আদিবাসী অনগ্রসর শ্রেণির জীবনযাপন ও লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পে দেখা যায় বন্যার আগে যে তাৎমা, তিয়র, ধাঙরদের ব্রাহ্মণ সমাজ হেয় করত, বন্যার পর এই চরিত্রের রূপবদল ঘটে, তিয়র বউ এর কাপড় চুরি করে এক ব্রাহ্মণ বউ। ব্রাহ্মণরা যাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলত, বন্যায়,

প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদেরই বস্ত্রচুরি করে। তিয়র বউ তার কাপড় চুরি যাওয়ায় কখনই কেউ ভাবেনি ব্রাহ্মণ গিন্নি একাজ করতে পারে। সত্য উদ্‌ঘাটনে গল্পের মূল সারমর্ম প্রকাশিত, উচ্চবর্ণে জন্মালেই কেউ মহৎ চরিত্রের অধিকারী হয় না, তার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, মনন-মানসিকতা এক্ষেত্রে দায়ী হয়। সমাজের সকল অপবাদ-গঞ্জনা যাদের মাথায়, সেই কলঙ্ক বন্যায় ধুয়ে যায়, তারাই আজ প্রতিবাদে মুখর। জাতিভেদের মর্মমূলে, প্রথাগত ধারণায় লেখক এই গল্পে কুঠারাঘাত হানে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদিবাসীকেন্দ্রিক ছোটগল্প সেরকম নেই। দারিদ্র্য, শোষিত অন্ত্যজ জীবন দুর্গতির চিত্র থাকলেও জনজাতিপ্রসঙ্গ সেভাবে গল্পে আসেনি। তবে ‘সাঁওতাল’ গল্পে লেখকের মার্কসবাদী জীবনবীক্ষার মধ্যে আদিবাসীদের সামাজিক দিক এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ ভিন্ন দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। লেখকের ‘সাঁওতাল’ গল্পে লেখক উচ্চবিত্ত মানুষদের অসংযত মানসিকতা, বিকারগ্রস্থ জীবনস্বভাবের বিপরীতে আদিবাসীদের স্বাভাবিক, সুস্থ-মুক্ত জীবনচর্যার রূপ চিত্রিত। ঝুমুরিয়া গ্রামের কন্ট্রাক্টর হেরম্ব চক্রবর্তীর অধীনে গাছ কাটার কাজে নিযুক্ত শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আসে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ। কাজ করতে আসা এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মুক্তমনা সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপন দেখে হেরম্বের ভাবনার চিন্তাসূত্রে ধরা পড়েছে উচ্চবর্ণীয় সমাজে নারীর অবস্থান এবং এর পাশাপাশি আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থানের স্বরূপ। লেখক সভ্যজগতের স্বাধিকারচুত সমস্ত নারী যখন পরাধীন পণ্য রূপে বিবেচিত সেখানে এই আদিবাসী মেয়েরা স্বাধীন সম্মানীয়া এবং নারী পুরুষের বিভাজন নেই, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে তাদের। হেরম্বের চোখে ধরা পড়েছে, তার নিজের স্ত্রী নিয়মিত প্রত্যেক বছর সন্তানধারণের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পবার জন্য হেরম্বের সাথে সহাবাসে অসম্মতি জানায়, সেখানে সাঁওতাল সমাজে স্ত্রীরা কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র নয়, তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালোবাসা আছে। তাদের সমাজে বাল্যবিবাহ নেই, এমনকি সন্তান জন্মের ক্ষেত্রেও কয়েকবছর ব্যবধান আছে। গল্পে সমাজের উচ্চত্তর জাতির তুলনায় আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান অনেক মর্যাদাপূর্ণ।

গল্পে হেরম্বের চিন্তাসূত্রের পাশাপাশি হেরম্বের নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কুনাই সাঁওতালের মেয়ে তপাকে জোড় করে ভোগ করতে চাওয়ার ঘৃণ্য আচরণে, নারীর অবমাননার প্রতিবাদে সাঁওতালরা মুহূর্ত বিলম্ব না করে হেরম্বের কাজ পরিত্যাগ করে চলে যায়। আদিবাসী সমাজে নারী অবমাননা, জোড়পূর্বক নারীকে ভোগ করার বাসনা তাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য। হেরম্ব দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সাঁওতালদের যে বিশ্বাস অর্জন

করেছিল। নিজের ভুলের জন্য এক লহমায় সেই বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। আদিবাসীরা হেরম্বের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেয়নি, তারা তার এই অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ বিশ্বাসহন্তাকে পরিত্যাগ করেছে। গল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মৌল প্রবণতার সূত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সাম্যবাদী আদিবাসী চেতনা, যার মূলে ক্রিয়াশীল মার্কসীয় সমাজবীক্ষা।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে কুর্মি, ভীল, মাহাতো জনজাতির মানুষের অত্যাচারিত, বঞ্চিত-লাঞ্ছিত জীবনকথা চিত্রিত। নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের রাজার শোষণ এবং অভ্রখনির মালিক ধনী শ্রেণির মার্চেন্টদের শোষণের চাপে পদদলিত ও পিষ্ট হয়েছে অসহায় দরিদ্র কুর্মি ও ভীল জাতির মানুষরা। সামন্তবাদী ও ধনবাদী শ্রেণির লড়াইয়ে কুর্মিরা দাবার ঘুঁটির ন্যায় ব্যবহৃত হলেও, পরবর্তীতে দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বে কুর্মিরা প্রতিবাদ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং তারা অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। এই দরিদ্র জনজাতির স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন সাময়িক। ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, মধ্যবিত্ত, কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ, শ্রেণিসংঘাত, পরিণতি গল্পে চিত্রিত। গল্পে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরোধ, সেই বিরোধের পটভূমিতেও অসহায় দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের অধিকার কেড়ে নেওয়া ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চিত্রিত। অবক্ষয়িত সামন্ততন্ত্রের রূপ ও ধনতন্ত্রের আগ্রাসন এবং পরিণতিতে নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে শোষক শ্রেণির কোনও ভিন্নতা থাকে না। নির্মমতার অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়েছে কুর্মি সমাজ, ষড়যন্ত্রের নিষ্ঠুরতায় খুন হয়েছে দুলাল মাহাতো। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র প্রয়াস ধনতন্ত্রের নির্মম আগ্রাসন, শ্রেণিদ্বন্দ্বের নিষ্ঠুরতা, কৃষিজীবী মানুষদের খনির শ্রমিকে রূপান্তর এবং এই শ্রমজীবী মানুষের মর্মান্তিক পরিণতি গল্পে অঙ্কিত। অন্ত্যজ মানুষদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে শাসকদল তাদের নিষ্ঠুরতা দিয়ে সর্বদাই সর্বস্বান্ত করেছে।

কমলকুমার মজুমদারের 'বাগান কেয়ারি' গল্পে লোধা সাঁওতাল আদিবাসী কুলিকামিন মানুষদের অসহায়ত্ব, বিপর্যস্ত জীবনচিত্র বর্ণিত। নাম গোত্রহীন আদিবাসী মানুষগুলোর একটাই পরিচয় তারা শ্রমিক। এই প্রান্তিক মানুষগুলি দূরদুরান্ত থেকে নতুন পত্তনমুখী নগরে কাজ করতে আসে। বনের গাছ কেটে নগরপত্তনের কাজে একজন শ্রমিক মারা গেলে, সেই মৃতদেহ নিয়েও ঠিকাদাররা রাজনীতি করে। তাদের কাছে শ্রমিকদের জীবন ভীষণই তুচ্ছ, এই মৃতদেহকে কেন্দ্র করে উচ্চবিত্ত স্বার্থপর মানুষদের মুখোশ যেমন অনাবৃত হয়েছে তেমন সামাজিক বৈষম্যও ফুটে উঠেছে। মৃতদেহটার পরিচয় পাওয়া যায় না, তা কেবল বেওয়ারিশ লাশে পরিণত হয়, কেউই জাতপাত ও থানা পুলিশের ভয়ে মৃত শ্রমিকের সাথে

পরিচিতির কথা স্বীকার করে না। সমাজের মানুষ কতটা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, রূঢ় বাস্তবতার প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভোগবতী' গল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানচিত্র বর্ণিত। গল্পে গৃহস্থ ও বুনো সাঁওতাল এরূপ চিহ্নিত করে লেখক একদিকে তাদের সামাজিক জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেছে অন্যদিকে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে আদিবাসী মানুষগুলোর অবস্থান ও তাদের সঙ্কটের চিত্র গল্পের মূল বিষয়বস্তু। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোনা ও শুকলাল এখানে গোটা আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে গল্পের কাহিনি রচিত। গল্পে দেখা যায় গাছ কাটতে গিয়ে আদিবাসী শ্রমিক সোনার প্রাণ যায়। একটা আদিবাসী মানুষের প্রাণ যাওয়া খুবই নগণ্য বিষয়–

> 'যুদ্ধের ক্যাজুয়ালটি। অমন কত হয় অমন কত হয়েছে। কে তার খবর রাখে, কে তা নিয়ে নিজেকে বিব্রতবোধ করে? লাইন তৈরি করতেই হবে– বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্যে, অসুরদের নিপাত করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যে। একটা সাঁওতাল মেয়ের মৃত্যু। তার জন্যে মাটি কাটা বন্ধ থাকবে না – মাটি ফেলা না'।[৩৬]

সমাজের উর্দ্ধতন মানুষদের কাছে, সাহেবদের কাছে কেবল তাদের মুনাফাই সব, আদিবাসী মানুষরা ভীষণই তুচ্ছ। জীবিকার প্রয়োজনে এক অন্ধকারময় বীভৎসতার মাঝে তারা পিষ্ট। গল্পের শেষে সাহেবের হাতে শুকলালের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু, সোনার মর্মান্তিক পরিণতি একদিকে যেমন মালিকশ্রেণির মুখোশকে অনাবৃত করেছে, তেমনি অসহায়–লাঞ্ছিত–নিপীড়িত আদিবাসী মানুষগুলোর চরম ট্র্যাজিক পরিণতি ও তাদের সামাজিক অবস্থানকেও প্রকাশ করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পে আদিবাসী যাযাবর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অনুর্বর মাটির পালগ্রামে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও আদিবাসীদের যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী জীবনযাপনের জন্য বসতি গড়ে তোলার ছবি লিপিবদ্ধ। চন্দ্র চৌধুরীর ন্যায় প্রজাসুখসর্বস্ব ভালো, সৎ, উদার জমিদারের কল্যাণে এই যাযাবর বুনো আদিবাসীরা স্থায়ী আস্তানা পেয়েছে, তারা অনুর্বর জমিতে ফসল ফলিয়েছে। এই আদিবাসী মানুষদের সাথে নীল বাহাদুর, জমিদারের হাতির সখ্যতার কাহিনি গল্পে এক নতুন মাত্রা আনে। চন্দ্র

চৌধুরীর মৃত্যু, ইন্দ্র চৌধুরীর নতুন জমিদারি ভার গ্রহণ যেন আদিবাসীদের সুখের জীবনে কালো ছায়া নেমে আসে। চন্দ্র চৌধুরীর ছেলে নতুন জমিদার হয়ে পালগ্রাম থেকে সাঁওতালদের তাড়িয়ে সেখানকার টিলার এক্সক্যাভেট বা খনন করে টিলার ইতিহাসকে জানতে চায় ও নিজের নাম বানাতে চায়। অতীতের কবরের উপর, শশ্মানে যারা নতুন ফসল ফলিয়ে বাসযোগ্য করে তুলল সেই আদিবাসীদেরই ইন্দ্রচৌধুরী উৎখাত করতে চায় মাটির তলার অস্তিত্বকে জাগিয়ে তুলতে। সেই কারণেই ইন্দ্রচৌধুরী যড়যন্ত্র করে বৃদ্ধ নীলবাহাদুরকে তিনদিন অভুক্ত রেখে সাঁওতালদের ক্ষেত নষ্ট করতে তাকে পালগ্রামে ছেড়ে দেয়। যে সাঁওতালরা নীলবাহাদুরকে এতটা ভালোবাসত তাদের তীরের আঘাতে তার মৃত্যু, সাথে নীল বাহাদুর দ্বারা বেবি অস্টিনের শেষ, ইন্দ্রচৌধুরীর যান্ত্রিক গাড়ির অন্তিম আর্তনাদ।

গল্পে দেবীকোট জমিদারবংশের দুই পুরুষের কাহিনি বর্ণিত, একপুরুষ সাঁওতালদের বসতি স্থাপন করায় আর এক পুরুষ উচ্ছেদ। গল্পে নীল বাহাদুরকে সৈনিকরূপে ব্যবহার করেছে ইন্দ্রচৌধুরী, কিন্তু সেই সৈনিক নিজের যাবার শেষ সময়ে ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্টিনকেও শেষ করে। খিদের তাড়নায় সাঁওতালদের যে এককালে বন্ধু ছিল সেই প্রাণী আজ অত্যাচারীর হাতে হিংস্র সৈনিক মাত্র। গল্পে নীল বাহাদুর যেমন সৈনিক, তেমনই সাঁওতালরাও নিজেদের অস্তিত্বরক্ষায় আজ সৈনিকের রূপ ধারণ করেছে। পালগ্রাম সেজে উঠেছে রণযুদ্ধের সঞ্জীবনীতে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বীতংস’ গল্পের বিষয় সহজসরল, দারিদ্য-লাঞ্চিত, অসহায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন ও তাদের শিক্ষাহীনতা, সরলতার সুযোগে স্বার্থপর দালালের ফাঁদে, চক্রান্তে তাদের বিপন্ন জীবনকাহিনি। সাঁওতাল পরগনার এই সহজসরল মানুষরা নানারকম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী। আদিবাসী মানুষগুলির সহজসরল জীবনে সুন্দরলাল সাধুর ছদ্মবেশের প্রবেশ করে এবং নানান ক্রিয়াকলাপে, সুকৌশলে তাদের জীবন ও মননে পাকা আসন করে নেয়। আদিবাসী মানুষদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং জীবনের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে, সুন্দরলাল তার সুদক্ষ অভিনয়ে আদিবাসী মানুষগুলোকে মনে বিশ্বাস জাগায় করম দেবতার কোপে তাদের গ্রামে মড়ক লাগবে, মড়কের প্রকোপ থেকে কেউ বাঁচবে না, তাই গ্রামের মানুষদের এই গ্রাম ত্যাগ করা উচিত। সুন্দরলালের আসল উদ্দেশ্য আসামের চা-বাগানে এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা এবং জন প্রতি টাকা উপার্জন। সুন্দরলালের এখানে উপরি পাওনা বুধনী। সহজসরল, নির্বোধ, দারিদ্রলাঞ্ছিত

জীবন থেকে মুক্তির স্বপ্ন- শহর, চুড়ি, তেল আর শাড়ির আশা দেখিয়ে বুধনীর মতো মেয়েদের জীবন নষ্ট করে সুন্দরলালদের মতো স্বার্থান্বেষী মানুষেরা। এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মানুষগুলির অসহায়তা, শিক্ষাহীনতা, দারিদ্রতাই এদের মূল সর্বনাশের কারণ। সুন্দরলালের কুমতলবের কথা তারা আঁচও করতে না পেরে, প্রাণ বাঁচাতে সুন্দরলালের উপর বিশ্বাস করে তারা তার সাথে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে সুন্দরলালের পিছনে চলতে শুরু করে, অজানা জীবনের উদ্দেশ্যে। সুন্দরলাল তার স্বার্থসিদ্ধি পূরণে মানুষগুলির জন প্রতি নিজের কমিশনের অর্থের পরিমাণের হিসাব গুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আদিবাসী মানুষরা সুন্দরলালদের মতো মানুষদের পাতা ফাঁদে পা দেয় নির্বোধের মতো, এর পিছনে মূল কারণ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষাহীনতা, অতিরিক্ত সহজ-সরল মানসিকতা।

আদিবাসীদের অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার বিষয় রমাপদ চৌধুরীর 'জলরঙ' গল্পে বর্ণিত। গল্পের বিষয় হয়েছে কয়লা খনির শ্রমিক, আদিবাসী মানুষদের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম ও বঞ্চনার কাহিনি। শতশত কুলিকামিনরা তাদের জীবনবিপন্ন করে কয়লাখাদানে পেটের দায়ে কাজ করে। মেয়ে শ্রমিকদের খাদানে কাজ করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নিয়মানুযায়ী রাতে কাজ করতে হয় না, কিন্তু বাস্তবে উর্দ্ধতন বাবুদের ভোগ-লালসার শিকার হতে হয়। যে মেয়েরা এর প্রতিবাদ করে তাদের উপর শ্রমের রাজনীতি ও ষড়যন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া হয়। গল্পে রূপমণি এরকমই এক নির্যাতিতা, অন্যায়ের শিকার। এছাড়া গল্পে এই আদিবাসী মানুষগুলোর পাশে কোনো মানুষ দাঁড়ালে তারাও সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। গল্পে কয়লাখাদানের শ্রমের রাজনীতির একটা ক্রম যা উর্দ্ধতন থেকে চলে আসছে এবং আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণা, অসহায়ত্বের চিত্র গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে কোলিয়ারি অঞ্চলের অধিবাসী সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আজীবন লালিত অন্ধবিশ্বাস, কু-সংস্কারের কাহিনি গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। গল্পে চিত্রিত সাঁওতাল জাতির তুড়ুখ চাষি মিঞা মাঝি'র পুত্র স্নেহবাৎসল্য ও অন্ধবিশ্বাস, যা আদিবাসী জীবনের মূল সত্যরূপে গভীরে নিহিত। রমাপদ চৌধুরীর গল্পের বিষয়বস্তুতে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে একটা ইতিহাস তথা এক একটি ঘটনাবৃত্তের মিথ হয়ে ওঠার দুরূহ জটিল প্রক্রিয়া। 'দরবারী', 'রেবেকাসোরেনের কবর', 'ঝুমরাবিবির মেলা'– এই গল্পগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় অন্তর্লীন ইতিহাস চেতনা।

'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে স্নেহবাৎসল্যে অন্ধ বৃদ্ধ পিতা মিঞামাঝি ছেলের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, ঝুমরা বিবির সংস্পর্শ থেকে, তার সর্বনাশী আকর্ষণ থেকে তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে মিঞা মাঝি ছেলের মিথ্যা খুনের দায় নিজে নেয়। এক পিতার আত্মদানের মর্মস্পর্শী জীবনালেখ্য। ছেলে ডাকাতি-খুন ছেড়ে সৎ হয়ে যাবে এবং ছেলের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে মিঞা খুনের মিথ্যা দায় নিজের মাথায় নেয় এবং ফাঁসির সাজা নিতে চায় কিন্তু শেষমেষ মিঞার ভাবনা কার্যকরী হয় না। বুধনের বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা এবং মিঞার মনের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কারণে সে নিজে আত্মহত্যা করে। সমাজ দ্বারা ঝুমরা ও তার মেয়ে আসমিনার অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত হওয়ার পাশাপাশি আদিবাসী সমাজের নানা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার কীভাবে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তা স্পষ্ট। আদিবাসী অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের বীজ তাদের জীবনের গভীরে প্রোথিত, যা তাদের জীবনযাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের আজীবন লালিত এই অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারই তাদের জীবনসত্য। গল্পটি আদ্যন্ত আচ্ছন্ন আদিবাসীদের অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষা এবং কুসংস্কার আর এই কারণেই তারা বহু বছর পরেও মিঞা এবং ঝুমরা যাকে সমাজ ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করেছে, তাদের ভুলতে পারে না। এক অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় যেন তারা রয়ে যায় জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারে। ঝুমরার নামে বহুবছর পরেও গ্রামে 'ঝুমরা বিবির মেলা' নামক অনুষ্ঠান হয়, যেখানে মিঞা ও ঝুমরাকে গ্রামে শুভ-অশুভের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করে আদিবাসী দেবতা 'এল্লা বোঙার' পূজা চলে। এখানেই দেখা যায় ঘটনাবৃত্ত কীভাবে ইতিহাস চেতনায় পর্যবসিত হয় পরিণত হয় এক আঞ্চলিক মিথে।

ইতিহাস চেতনার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক দেশ-কাল-পটভূমিকে এক নতুন রূপে দেখতে শেখায় রমাপদ চৌধুরী। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, সময়ের যথার্থ স্বরূপ মূর্ত হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে। গল্পের আড়ালে চিরকালের সংকটের কথা লিপিবদ্ধ। যারা এ গল্পে প্রোটাগনিষ্ট, তাদেরই লেখক 'ভারতবর্ষ' বলে অভিহিত করেছেন।

একটি জনজাতি তাদের ঐতিহ্যের অহংকার, পরম্পরা হারিয়ে ফেলে একটা গোটা দেশকে বহির্দেশের সম্মুখে ভিখারি রূপে তুলে ধরল। 'ভারতবর্ষ' স্বাধীন ভারতের এক মানবিক দলিল স্বরূপ আখ্যান। প্রাচীন মানুষকে তাদের মেরুদন্ড আত্মবিশ্বাসের প্রাচীরকে লোভের জাল আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের সময়ে আমেরিকান সৈনিকদের ট্রেন মাহাতো গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হল্টে ব্রেকফাস্টের জন্য ট্রেন কিছুসময় দাঁড়াতো। ব্রেকফাস্টে সৈনিকদের দেওয়া ডিম ও ডিমের খোসা

জমতে শুরু করে হল্টের নাম হয় আন্ডা হল্ট। মাহাতোরা এই ট্রেন ও সৈনিকদের দেখতে আসত, এ যেন তাদের গ্রাম্য সরল জীবনে এক অন্য নতুন হাওয়া। গল্পে বাঁকবদল ঘটে যেদিন সাহেব এক মাহাতো ছেলেকে আধুলি ছুঁড়ে দেয় বকশিস স্বরূপ। প্রথমে তারা তা নিতে চায় না, তারা ভিক্ষা চায় না, তারা কেবল কৌতুহলী দৃষ্টিতে আশ্চর্য চলমানতা দেখবে বলেই ভিড় জমাত। তাদের ছিল পরিশ্রমের ফসল আর কৌতূহল। কিন্তু আস্তে আস্তে এই ছুঁড়ে দেওয়া আধুলির লোভ পেয়ে বসে মাহাতো গ্রামবাসীকে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে মাহাতো বুড়ো প্রথমে ধরা দেয় না। কিন্তু শেষমেষ শেষরক্ষা হয় না। মাহাতো বুড়োও যেদিন ভিখিরি হয়ে গেল, সেদিন আর ট্রেন থামল না কিন্তু একটা গোটা জাতি, দেশ যেন ভিখারি হয়ে গেল।

বস্তুত এখানে গল্পটি কেবল স্থান-কাল-পাত্রের সীমানায় আবদ্ধ নয়, মানুষকে ভিখারি বানানোর এক আশ্চর্য গল্প। যারা বিক্রি হতে চায় না, শিরদাঁড়া শক্ত, লোভের জালে অরণ্যের সেই সহজসরল মানুষগুলিও তাদের আত্মমর্যাদা ভুলে ভিক্ষার পথে পা বাড়ালো। ভিক্ষাবৃত্তির অভ্যাস থকে বেরোতে না পারা ও না চাওয়ার এক অন্তহীন দ্বন্দ্বই গল্পে পরিস্ফুট। এই ভিক্ষাসুলভ মনোবৃত্তি, মানসিকতা একবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মননেও সমানভাবে বিরাজমান, এই গল্প বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই ভিক্ষাবৃত্তির অভ্যাসের নির্লজ্জ অভিব্যক্তি ও ইতিহাসবোধের যথার্থ অভিজ্ঞান এই গল্পে ব্যক্ত।

রমাপদ চৌধুরীর ‘মানুষ অমানুষের গল্প’ গল্পে বাঁদর মারার আদিবাসী মানুষদের জীবন-জীবিকা বিষয়বস্তু হয়েছে। সমাজের এই প্রান্তিক মানুষরা ‘হা-লা-লা-লা বান্দরমার’ চিৎকার করে তীর-ধনুক দিয়ে বাঁদর মারে নিজেদের ভাষায় গান গায়, শিকার করা পশুর চামড়া গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। যাদের বসতি গ্রামের বাইরে। এই বাঁদর মারার দলের মানুষদের জীবন–জীবিকার পাশাপাশি টিকলি, রিদে, রচ্চন ও লারীদের মনে এক অদ্ভুত আদিম হিংস্রতা, আদিম জীবনের অঙ্গ হিসাবে গল্পে বর্ণিত।

এরকমই আর এক গল্প সমরেশ বসু’র ‘আইন নেই’ গল্প। গল্পে বস্তুত পক্ষে মনুষ্যধর্মর কথাই সমরেশ বসু ঘুরে ফিরে বলেন, আর সেকারণেই জীবন সংগ্রামের প্রেক্ষিতকে সত্যমূলে তুলে ধরতে

শহরের আধুনিক মানুষের গন্ডির বাইরে জীবনের জোয়ার-ভাটায় আদি-মানুষের কথকতায় জীবনের সত্যরূপ খুঁজতে হয়। গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের বাঁদর মেরে জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি আদিবাসী মানুষের খাদ্য সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। আইনের আওতায় অনেক কাজ বন্ধ হয়ে গেলে আপাত দৃষ্টিতে তা কল্যাণকর মনে হলেও সব মানুষের ক্ষেত্রে তা যে সুখকর হয় না, তা এই গল্পের মূল মর্মে রচিত।

সমরেশ বসু'র 'শানবাউরির কথকতা' গল্পের বিষয়বস্তু রচনার প্রেক্ষিত আদিবাসী মানুষদের জীবনযাপন উৎসবের কাহিনি রচিত। গ্রামে বাউরি ও আদিবাসীরা প্রতিবেশীরূপে সহাবস্থান করে, আর সেই প্রেক্ষিতে আদিবাসীদের নিজস্ব শতাব্দী প্রাচীন আদিম উৎসবের কথা বর্ণিত। গল্পে শানা বাউরীর জীবনচর্যা বর্ণিত, সেই প্রেক্ষিতেই আদিবাসীদের কিছু সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের চিত্র গল্পের বিষয়বস্তুতে অঙ্গীভূত হয়েছে।

মহাশ্বেতার গল্পগুলি যেন নিছকই কেবল গল্প বা কাহিনি নয়। গল্পের কাহিনি প্রায়শই জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, সত্য পটভূমি থেকে তুলে নেওয়া, কুশীলবরা রক্তমাংসের মানুষ। এই জীবন্ত চরিত্রগুলি যে অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজের শোষণ আর অপশাসনের শিকার, সেই ঘটনার আভ্যন্তরীণ চিত্র লেখিকার গল্পে, সাহিত্যকর্মে পরিস্ফুট। জীবনের সত্য, মানুষের সত্যজীবনই লেখার মূল ভিত্তি।

মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' গল্পে সমাজের প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষদের জলের সমস্যা, তাদের সংস্কার এবং লোভী উচ্চবিত্ত মানুষদের স্বার্থান্বেষী ক্রিয়াকলাপ চিত্রিত। 'অপারেশন বসাই টুডু' গল্পের পূর্বাভাস যেন 'জল' এবং 'এম ডব্লু বনাম লখিন্দ' গল্পদ্বয়। চরসা নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় সাঁওতাল, দোসাদ, ডোম, বাগদী, কাহার প্রভৃতি সমাজের দলিত মানুষদের বাস। এই চরসা নদীকে কেন্দ্র করেই প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষদের জীবন সংগ্রাম এবং জোতদার-মহাজন-প্রশাসন ও পার্টির বিরুদ্ধে প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ উজ্জীবিত।

আদিবাসীদের জলসংকট প্রশাসনের কাছে 'একটা ইস্যু মাত্র'। সংবিধানানুযায়ী 'সুজাত-কুজাত কোনো ভেদাভেদ নেই' কিন্তু বাস্তবে বিচ্ছিন্নতা এবং ভেদাভেদজ্ঞান মানুষের রক্তে মিশে। আইনানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে জাত সহিষ্ণুতা আছে কিন্তু বাস্তবিক রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে নদীতে জল নেই, মানুষ জল পাচ্ছে না, সেখানে বর্ণহিন্দুরা কুয়ো দখল করে রাখে। গল্পে সন্তোষ পূজারী চরসা ব্লকের জোতদার।

এই সন্তোষ পূজারী চরসা ব্লকের খরা ও বন্যায় সরকারি ত্রাণ নিয়ে ব্যবসা করে উদরপূর্তি করে। এই ত্রাণের টাকাতেই খোঁড়া কুয়ো, যা ব্যবহার করে কেবল বর্ণহিন্দুরা। সমাজের প্রান্তিক, দলিত আদিবাসী মানুষরা এই জল যাতে ব্যবহার না করতে পারে তাই রাতে কুকুর ছেড়ে রাখা হয়। এরই মাঝে সমাজদরদী মানুষ জিতেন মাইতি এই গ্রামের অসহায় মানুষদের জন্য চিন্তাভাবনা করে, জনহিতৈষী কাজ করে। সে এমন কাজ করে যা সন্তোষের স্বার্থে আঘাত লাগে। জিতেন মাইতি প্রান্তিক মানুষদের দুর্দশা দূর করতে, এই অসহায় মানুষদের জলের কষ্ট নিবারণ করতে চরসায় বাঁধ দেয়। জলের সংকট মেটে। কিন্তু সন্তোষের ষড়যন্ত্রে, প্রশাসন যে পন্থা অবলম্বন করে তাতে সন্তোষের পথই কণ্টকমুক্ত হয়। প্রতিবাদে পুলিশের গুলিতে মঘাইয়ের মৃত্যু। সরকারী ভাবে যখন বলা হয় আদিবাসী, প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবন সংকটহীন, এই বাক্যে যেন অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হয়, ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় সমাজের আসল রূপ পরিস্ফুট।

লেখিকার 'এম.ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ' গল্পে লখিন্দরের এম.ডব্ল্যু বা ন্যূনতম মজুরীর স্বপ্ন ভীতু লখিন্দরকে সাহসী, বিপ্লবী করে তোলে। তার এই স্বপ্ন যেন তার জীবনে নতুন বাঁক আনে তাকে দুঃসাহসী করে তোলে। একজন সহজ, সাধারণ, ভীতু মানুষের ব্যক্তি উত্তরণ ঘটে, অগ্নিগর্ভ সমাজের ছিটকে আসা আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠে লখিন্দর।

মহাশ্বেতা দেবীর 'হরিরাম মাহাতো' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত দুটি গল্প- 'হরিরাম মাহাতো' ও 'সাগোয়ানা'। 'হরিরাম মাহাতো' গল্পে চিত্রিত হরিরাম মাহাতোর জীবন পরিক্রমা, যেন এক জন্ম থেকে অন্য জন্মান্তরে পরিক্রমা। গল্পে হরিরামের মানসিক দ্বন্দ্ব চিত্রিত। সে মিশনে ছোট থেকে বড়ো হয়েছে। সেই মিশনেই যখন তাকে মুচলেকা দিতে বলা হল যে, পড়াশোনার শেষ হলে সে মিশনকে সেবা করবে, এখানেই হরিরাম এই দাসত্বে আপত্তি জানায়। এখানেই মিশনের ভাবধারার বিরুদ্ধে সে নিজে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল।

হরিরামের মধ্যে তার মানবিক স্বভাবধর্মের জাগরণ ঘটলে সেই মানবমুখিনতায় সে দুর্গত শিশুদের জন্য, গরীব চাষীদের সাহায্যে সে এগিয়ে আসে। এখানেই হরিরাম ও মিশনের শ্রেণিস্বার্থে সংঘাত হয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর গোলামির শিকলটা হরিরামের পায়ে বেড়ী হয়ে থাকে। মিশন ও হরিরামের দ্বন্দ্বের অদৃশ্য জালে হরিরাম আরও জড়িয়ে পড়তে থাকে। মিশনের সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হিসাবে কাজ করার

মধ্যে দিয়ে হরিরামের মধ্যে নিপীড়িত শ্রেণিচেতনার জাগরণ ঘটে। ক্ষেতমজুর, দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা তা যে কেবল কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার সমস্যা নয়, তার বিস্তৃতি যে সারা দেশের সমস্যা- এই উপলব্ধিই যেন হরিরামের চেতনার এক নতুন জন্ম দেয়। হরিরামের লড়াই আসলে আদিবাসীজনের জমির লড়াই, অধিকারের লড়াই, মুক্তির লড়াই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদের লড়াইয়ে হরিরামের মৃত্যু সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতারই জিত হয়। পাশাপাশি চিত্রিত নিয়মতান্ত্রিক আইনি সংশোধনবাদী লড়াইয়ের বিকল্পে শ্রেণিসংগ্রাম, ঘুরে দাঁড়ানোর, বিপ্লবী শক্তির কথা বারংবার ফুটে ওঠে।

'হরিরাম মাহাতো' ও 'সাগোয়ানা' দুই গল্পেই এমন চরিত্র আছে যারা আদিবাসী স্বজাতির হয়েও অন্য আদিবাসীদের উপর অত্যাচার চালাতে দ্বিধাবোধ করে না। ঝাড়খন্ড আন্দোলনের পটভূমিতে আদিবাসীজনের লড়াইয়ের গল্প 'সাগোয়ানা'। সিংভূমের প্রশাসন বিডিও ও ত্রিপুরী দারোগার সম্মিলিত শাসক শ্রেণির হিংসায় বেষ্টিত শালবন। আদিবাসীদের বাসস্থান শালবন কেটে, তাদের সর্বনাশ করে, অধিকার কেড়ে নিয়ে সরকার শালবন উচ্ছেদন করে সেগুনবন রোপন করবার প্রয়াস করে। আদিবাসীদের কাছে শালবন প্রাণদাত্রী স্বরূপ, তাদের সেই জীবন নিয়ে রাজনীতি, চক্রান্ত চলে। এই শাল-মহুয়া বাঁচাতে গিয়ে ত্রিপুরী দারোগার গুলিতে প্রাণ যায় বাণেশ্বরের। আদিবাসীদের মধ্যে জেগে ওঠে শ্রেণিবিপ্লব, শ্রেণিসংগ্রামের চেতনা। রক্তের বন্যায় গণতন্ত্রকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, 'শাল আদিবাসী, সাগোয়ানা দিকু/ সাগোয়ানা রোপাই বন্ধ করো।।'[৩৭] প্রতিবাদী স্বরকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার পরিণাম শ্রেণিসংগ্রাম।

সরকার শালগাছ কেটে সেগুনগাছ পুঁততে চায় কারণ সেগুন গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, সগোয়ান অর্থাৎ সেগুনের কাঠের দামও বেশি অর্থাৎ ব্যবসায়িক লাভ বেশির কারণে প্রশাসনের এই চিন্তাভাবনা। এই সাগোয়ানার লড়াই সিংভূমের আদিবাসীদের জীবন-মরণের লড়াই হয়ে যায়। ১৯৭৪-১৯৭৭ সালের ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সিংভূমের অরণ্যজীবী আদিবাসী মানুষদের সাগোয়ান প্রতিবাদী আন্দোলন শক্তিশালী আন্দোলন। বনবিভাগের ঠিকাদার ও সরকারী আধিকারিকরা আদিবাসীদের দিনের পর দিন আইনের নামে শোষণ করে চলেছে, তাদের নিজ ভূমির উপর নিজেদেরই কোনো অধিকার থাকছে না। আদিবাসী স্বার্থরক্ষায় নানা আইন হলেও আদতে তা অচল। ঠিকাদার, মহাজন ও জমিমালিকদের ক্রিয়াকলাপের পিছনে যে প্রশাসনের মদত আছে, মহাশ্বেতা দেবী সমাজ রাজনীতির এই সত্যরূপ গল্পগুলির মাধ্যমে

তুলে ধরেছেন, উন্মোচন করেছেন এই লোভাতুর, স্বার্থান্বেষী মানুষদের চরিত্রকে। সাগোয়ানা লড়াইকে ঘিরে নানান রাজনৈতিক জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত। আদিবাসী সর্বহারা মানুষ শ্রেণিসংগ্রামের চেতনায় জাগ্রত হয়ে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে অধিকার রক্ষার স্বার্থে।

লেখিকার 'প্রেতোৎসব' গল্পের কাহিনিতেও 'হরিরাম মাহাতো' এবং 'সাগোয়ানা' গল্পের দেবকী সিং এবং ময়ূরধ্বজ সিং-এর ন্যায় স্বজাতির মানুষ যখন উচ্চপদে চলে যায় সে তখন অন্য শ্রেণির মানুষ হয়ে যায়। রাজাবাবুর মনোভাবও আদিবাসী অর্থাৎ স্বজাতি সম্পর্কে প্রতিকূল। তিনিও মনে করেন আদিবাসী হলেই আদিবাসী উপকার করতে হবে এমনটা নয়। রাজাবাবু এবং এই উচ্চশ্রেণির মানুষদের সম্পর্কে অশোকের যে বক্তব্য তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমস্যা-

(১) 'সে সাঁওতাল তোরা ভি সাঁওতাল, কিন্তু সে মণিব আর তোরা চাকর কেন? উত্তর দিবি, সে যখনই উজির হল, টাকা বাগাল, জমি বাগাল, তখনি সে-

- বুঝেছি। 'সে অন্য শ্রেণীতে গেল?'[৩৮]

(২) 'আমরা চিন্তায় আধুনিক হতে পারি না, এই হল আমদের পিছিয়ে থাকার কারণ, আমাদের মধ্যে যে শিক্ষিত হয়, চাকরি পায়, সে অবধি সমাজের নিচুতলার মানুষদের কথা ভাবে না'।[৩৯]

সমস্যা আরও জটিল হয়ে যায় যখন বলাইবাবুর মতো ছদ্মবেশী আদিবাসী দরদী মানুষদের সহজসরল আদিবাসী মানুষরা বিশ্বাস করে, মুখোশের অন্তরালে থাকা তাদের আসল স্বরূপ কী তা বুঝতে পারে না। আদিবাসীদের সহজ বিশ্বাসের ফলাফল রজনীর মতো মেয়েদের অকাল মৃত্যু, অত্যাচারিত গলিত শবদেহ। গল্পে রাজনীতির নির্মম বাস্তব উদ্‌ঘাটিত, যেখানে দেখা যায়- বেজায় ধনী মানুষদের স্বার্থই প্রশাসন দেখে, গরীবের দিকে নজরও যায় না। শ্রেণিবৈষম্য থেকেই সমাজের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মনে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রাজাবাবুর 'প্রেতোৎসব' এ 'প্রেতনিধনের উৎসব' সূচিত হয় গ্রামে। গল্পের কাহিনিতে সুস্পষ্টরূপ চিত্রিত যে বিভিন্ন কল্যাণকারী সংস্থা, সরকার, সংগঠন আদিবাসীদের স্বার্থে কাগজে-কলমে নানা কাজ করলেও, আদতে রাজাবাবুর মতো মানুষদের হাতেই এর নিয়ন্ত্রণ থাকে। পুলিশ, প্রশাসন, সরকার 'তেলা মাথায় তেল ঢালে'। গরীবদের জন্য কারোর কোনো জনদরদী মনোভাব আদতেও

নেই। কিন্তু গল্পে শেষ পর্যন্ত গ্রামের মানুষরা ক্ষমতাশালী উচ্চবিত্ত মানুষ, শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে নামে, তারা শোষণের জাল ছিন্ন করে রুখে দাঁড়ায়। আদিবাসীদের মধ্যে অবস্থান সম্পর্কে সচেতনাবোধ, বিদ্রোহের সত্তা জেগে ওঠে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দৌলতি', 'পালামৌ' এবং 'গোহুমণি' গল্পের কাহিনি কেবল গল্পকথা নয়। এই তিন গল্পের কাহিনি লেখিকার পালামৌ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা– 'দৌলতি' ও 'পালামৌ' এর মতো 'গোহুমণি' ক্ষেত্রেও দেশ, গ্রাম, পথঘাট, বর্ণিত মানুষজন, ওদের জীবনের ঘটনা এতো আমি ১৯৬৩-১৯৮১ ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি'।[৪০] লেখিকার গভীর প্রত্যক্ষ দর্শন ও জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতাই গল্পে লিপিবদ্ধ।

'দৌলতি' গল্পে বর্ণিত দাসমজুর প্রথা ১৯৭৬ সালে সরকারীভাবে 'দাসমজুর প্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন' পাশ হয়ে গেলেও বাস্তবে তা কার্যকরী হয়নি। এই গল্পের কাহিনি লেখিকা কোন একটি জার্নালে পেয়েছিলেন। যেখানে ছিল ঋণবদ্ধ পরিবারের মেয়ের শরীর ব্যবহার করে ঋণের টাকা পরিশোধ করার চল ছিল হিমালয়ের পাদদেশে জৌনসার বাওয়ার অঞ্চলে। এই দাসমজুর প্রথা একবিংশ শতকেও বন্ধ হয়নি। গল্পে এই নারী নির্যাতনের মর্মান্তিক ছবি ধরা পড়েছে 'দৌলতি', 'পালামৌ' ও 'গোহুমণি' গল্পে।

'দৌলতি' গল্পে উন্মোচিত দাসপ্রথার নির্মম রূপ। দৌলতি, গোহুমণি, সোমনী, দেওকী এদের শরীর ঋণদাতা মালিকের কাছে জমির ন্যায়, যা প্রতিদিন পুরুষের অত্যাচার দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। মালিকরা এদের শরীরকে জমি বানিয়ে চাষ করে ফসল তোলে অর্থাৎ পরিবারের ঋণ শোধ করে। কিন্তু এই ঋণ শোধ যেন আর তাদের জীবদ্দশায় হয় না। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বেড়েই চলে। সেওরা গ্রামের মুনাবর সিং চান্দেলার কামিয়া গনোরি নাগেসিয়ার মেয়ে দৌলতিকে পরমানন্দ মিশির মিথ্যে ভুলিয়ে কেবল তিনশো টাকার বিনিময়ে কিনে নেয় এবং তাকে বানায় 'কামিয়া রেন্ডি'। এই মেয়েদের শরীরে যখন নানা রোগের বাসা বাঁধে, শরীর যখন একেবার শেষ হয়ে যায়- যক্ষায় যখন শরীর ঝাঁঝরা, যৌন ব্যাধির ক্ষত সর্বাঙ্গে, স্রাবে বিকট দুর্গন্ধ তখন তাদের মুক্তি মেলে এই দাসত্বের জীবন থেকে। গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জীবন পরাধীনতার বেড়াজালে আবদ্ধ, দাসপ্রথার মতো বর্বর প্রথার পাশবিক চিত্র উন্মোচিত। পনেরোই আগষ্ট স্বাধীনতার সকালে দৌলতির মৃত্যু চোখের সামনে উন্মোচিত করে স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তঃসারশূন্য আসল ভারতবর্ষের দৃশ্য।

'দৌলতি' গল্পে উন্মোচিত দাসমজুর প্রথার নির্মমতা। 'পালামৌ' গল্পে এই নির্মম-নিষ্ঠুর দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জাগৃতি সূচিত। 'দৌলতি' গল্পে দৌলতির বেঁচে থাকার লড়াই ব্যর্থ হলেও, 'পালামৌ' গল্পে বাসমতির প্রতিবাদ রয়েছে, সে মুক্তির পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়। গরীব মেয়েরা ধর্ষিত হলে আগে প্রশাসনের, তৎপরতা ছিল না, মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছিল না, এখন হচ্ছে। পালামৌয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজের প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের গড়ে তোলার ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর 'জঙ্গল' ও 'অর্জুন' দুটি গল্পেই শবর, খেড়িয়া জনজাতির মানুষদের দিয়ে সমাজের লোভী স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ অবৈধ, অপরাধমূলক কাজ করিয়ে জেল খাটায়। 'জঙ্গল' গল্পে লেখিকার আদিবাসী জনজীবন, শবরদের অবস্থান, পশ্চিমবঙ্গের চলমান বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ অর্জিত অভিজ্ঞতার কাহিনি লিপিবদ্ধ। গল্পে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ সমাজে রাজনীতির স্বার্থের কারণে আদিবাসীদের সরল, মূর্খ এবং তাদের কুসংস্কার বজায় রাখা প্রয়োজন। গল্পে আদিবাসীদের বঞ্চনার বিভিন্ন দিক ধরা পড়লেও পরিণতিতে আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুহূর্ত চিত্রিত।

লেখিকার 'অর্জুন' গল্পে শবর, খেড়িয়া জনজাতির গায়ে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে অপরাধপ্রবণ জাতি'র তকমা ছিল, তা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫২ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হলেও, বাস্তবে তা বর্তমানই ছিল। কারণে-অকারণে এই জনজাতির মানুষদের জেলে যেতেই হয়-

> "পুরুলিয়াতে শবর ঘরে জন্মালে জঙ্গলে হাত দিতেই হবে, জেলেও যেতে হবে, এ একেবারে নিয়ম।'[৪১]

শবর, খেড়িয়া জনজাতির মানুষগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ মেনে নিয়েছে। এই দরিদ্র মানুষদের অসহায়তার সুযোগ নেয় বিশাল মাহাতোর মতো মানুষরা। সে সরকারি জমিতে থাকা অর্জুন গাছটি কাটিয়ে নিতে চায় কেতু শবরকে দিয়ে। বিশাল মাহাতো টাকার লোভ দেখিয়ে কেতুকে রাজি করলেও, পরে কেতুর গাছটিকে তাদের আপনজন মনে হয়। অর্জুন গাছটি তাদের অরণ্যজীবনের যেন একমাত্র প্রতীক, যা আজও দাঁড়িয়ে। অর্জুন গাছটা যেন তাদেরই জীবনের প্রতীকি ব্যঞ্জনা। তারা উপলব্ধি করে সমাজ চিরকাল তাদের ব্যবহার

করেছে স্বার্থসিদ্ধির কারণে, উচ্ছেদ করেছে, জেলে ভরেছে। অর্জুন গাছটাকেও এই সমাজের লোভী মানুষ তার স্বার্থসিদ্ধির কারণে উচ্ছেদ করতে চাইছে।

গল্পে আদিবাসীদের সচেতনতা বোধ, উপলব্ধির পাশাপাশি কৌশলী প্রতিরোধের কাহিনিও চিত্রিত। অর্জুন গাছটিকে 'গড়াম দেবতা' হিসাবে পূজা করে সাঁওতাল, খেড়িয়া, শবর জনজাতির মানুষরা। অসহায় শবরদের সঙ্ঘবদ্ধ রূপ বিশাল মাহাতোর কাছে অচেনা লাগে, তার মনে ভয়ের উদ্রেক ঘটায়। আদিবাসীদের সচেতনাবোধের উদ্রেক, আত্মোপলব্ধি এবং প্রতিবাদী, প্রতিরোধী একতাই তাদের মূল শক্তি।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ঘন্টা বাজে' গল্পে বিরহা গ্রামের ভুঞা রাজাদের তৈরি ঘন্টাটি যেন আদিবাসীদের চেতনার উদয় এবং সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে অপমানিত আদিবাসীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বর। গল্পে দেখা যায় বিরহা গ্রামে ভুঞা রাজাদের দ্বারা নির্মিত লোহার ঘন্টাটি বাজিয়ে যুগে যুগে আদিবাসীদের সমস্ত বিপদে-আপদে, আনন্দানুষ্ঠানে বা যেকোনো প্রয়োজনে তাদের একত্রিত করা হয়েছে। এই ঘন্টাই যেন হুঁশিয়ারির প্রতীক, গ্রামদেবতার প্রতীক। ছদ্ম আদিবাসী দরদী বিজিত গুপ্ত ও প্রভাস ভুঞার মতো মানুষদের ফাঁদে সহজসরল সুবল ধরা পড়ে এবং গ্রামের মানুষ, তার নিজের পিতা ভারতও তাকে ভুল বোঝে, সুবলকে একা করে দেয়, গ্রামছাড়া করে, অপমান করে। সুবল তার বাবার বলা কঠিন কথা মেনে নিতে পারে না, পারে না এই অপমান সহ্য করতে, প্রেতের মতো বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতে। লাঞ্ছিত অপমানিত সুবল বেইমানের তকমা গায়ে নিয়ে সেই ঘন্টার শিকলেই ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

এই ঘটনার দশবছর পর ভারত সিং সেই ঘন্টা বাজায় গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে। সে উপলব্ধি করতে পারে তার ছেলের মৃত্যুর পিছনের আসল কারণ। ভারতের কণ্ঠে ঘোষিত হয় প্রতিবাদের সুর, প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা, শ্রেণিসচেতনতা বোধ। ভারতের এই ঘন্টা বাজানো এবং তার আত্মপলব্ধি কথাগুলোর মধ্যে স্পষ্ট হয় আদিবাসী সমাজের মানুষদের ভিতরে সচেতনতাবোধের জাগরণ ঘটেছে। তারা ছদ্ম আদিবাসী দরদী মানুষ বিজিত গুপ্ত ও প্রভাস ভুঞার মতো উচ্চবিত্ত মানুষদের প্রত্যখ্যান করছে। এই ঘন্টা বাজার মধ্যে আদিবাসীদের শোষণ-ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

মহাশ্বেতা দেবীর 'রাবণবধ' গল্পে নামকরণেই গল্পের কাহিনির পরিণতি স্পষ্ট। এই গল্পে শোষণ জর্জরিত, অসহায় শবর জনজাতির মানুষদের যন্ত্রণার সীমা যখন অতিক্রম করে যায়, অত্যাচারিত হতে হতে তারা একদিন রুখে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে। শোষণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া, প্রতিরোধ গড়ে তোলা, অসুর বিনাশের কাহিনিই চিত্রিত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বড়াম মায়ের থানে' গল্পে সাঁওতাল জনজাতির মানুষ, তারা তাদের অধিকার সচেতনবোধে এবং কৌশলে তারা তাদের অধিকার প্রাপ্য আদায় করে নিয়েছে। গল্প কাহিনিতে দেখা যায়, গ্রামের উচ্চবিত্ত পরিবার হরকান্ত মহাপাত্রের বাড়িতে পারিবারিক দেবতা মোহনচাঁদজীউ এর সোনার মূর্তি, সোনার গয়না চুরি গেলে, দোষ হয় গরীব সাঁওতালদের। এই চুরি আসলে করে মন্দিরের পুরোহিত ও ভাইপো, কিন্তু দোষ হয় সাঁওতালদের। পুলিশের হাতেও আদিবাসী গরীব মানুষগুলিকে লাঞ্ছিত হতে হয়। রতন সাঁওতাল যখন বড়াম মায়ের থানের কাছে থাকা বটগাছের ডালে বসে ভাবতে থাকে এর বদনামের প্রতিকারের উপায়, তখনই সেই গাছের নীচে মোহনচাঁদ জীউর মন্দিরের পুরোহিত ও তার ভাইপোকে দেবতার গয়না নিয়ে শলা-পরামর্শ করতে শোনে। মুহূর্তেই রতনের কাছে সমস্ত সত্য প্রকাশিত হলে, সে বুদ্ধি খাটিয়ে পুলিশের কাছে এবং হরকান্তজীর পরিবারের সকলের কাছে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে। রতন ছক অনুযায়ী অভিনয় করে বড়াম মায়ের ভর হওয়ার এবং এই সুযোগে সে হরকান্তের মায়ের থেকে সাঁওতালদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নেয় এবং বিনিময়ে হরকান্তবাবু ও গ্রামবাসীদের সামনে, পুলিশের সামনে দেবতার মূর্তি ও সোনার গয়না সম্পর্কিত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে। এই উপলক্ষে বড়াম মায়ের থান বাঁধানো হয়, ভোজ হয়। রতনের বুদ্ধির বলে ধর্মকে ব্যবহার করে, মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আদিবাসীদের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার ইতিবাচক কাহিনি। আদিবাসীদের অবস্থানের ধীরে ধীরে বদল হচ্ছে, তাদের মধ্যে অধিকার সচেতনাবোধ জাগছে, এই গল্পে তারই ইঙ্গিত মেলে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'নৈঋতে মেঘ' (১৯৭৯) গ্রন্থের অন্তর্গত 'নুন', 'শিশু', 'ডাইনি' ও 'বিছন' গল্পের পটভূমি বহির্বঙ্গের। গল্পের পটভূমি বিহারের, বর্তমানের ঝাড়খন্ড।

লেখিকার 'ডাইনি' গল্পে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ডাইনি প্রথার বিষয়টিকে নতুন প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন। আদিবাসী সমাজের শিক্ষাহীনতার কারণে তাদের মজ্জাগত কুসংস্কার- ডাইনি সম্পর্কিত

নানান অন্ধবিশ্বাস। আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজের মানুষেরা বিশ্বাস করে ডাইনি কেবল মানুষের ক্ষতি করে, তার প্রভাবেই যাবতীয় অশুভ কাজ হয়। এই অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণাকে কাজে লাগিয়ে উচ্চবর্ণের হনুমান মিশ্র সমাজের নিম্নবর্ণীয় মানুষদের মধ্যে প্রচার করে ডাইনির আবির্ভাবের মূলে রয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির পাপাচার। এই কারণে গ্রামবাসীরা ডাইনি সন্দেহে একে অপরকে অবিশ্বাসের চোখে দেখা শুরু করে। 'কে?' ডাইনি তাদের মধ্যে এই চিহ্নিতকরণের উদ্বেগ তৈরি করতে, তাদের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে সফল হয় হনুমান মিশ্রর মতো ধান্দাবাজ মানুষরা।

ডাইনি সন্দেহে গ্রামবাসী অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মম হয়ে ওঠে। হনুমান মিশ্র কুরুডা, টুরা, মুরহাই গ্রামে ডাইনির আবির্ভাবই গ্রামের যাবতীয় অকল্যাণমূলক কাজের মূলে এই ধারণা-আতঙ্ক ছড়ানোর সাথে সাথে এক সাবধানবাণীও ঘোষণা করে, ডাইনিকে যেন হত্যা না করা হয়, পাথর মেরে বা আগুন ছড়িয়ে ডাইনিকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ডাইনি তাড়াতে যখন সকল গ্রামের পুরুষরা একত্রিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক, আক্রমণ প্রতিক্রমণের পর উদ্‌ঘাটিত হয় আসল সত্য- 'ডাইনী নেই'। আসল সত্য হল টুরার পাহানের বোবা মেয়ে সোমরিই ডাইনিরূপে মিথ্যা অভিযুক্ত হয়েছে। সোমরি বোবা হওয়ায়, দুর্বলতার কারণে হনুমান মিশ্রের ছেলের আদিম প্রবৃত্তির, তার যৌন লালসার শিকার হতে হয় এবং সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। নিজেদের অন্যায়কে আড়াল করতেই হনুমান মিশ্র গ্রামবাসীর মনে এই ডাইনি ভীতির বীজ বপন করে এবং নিজের ছেলের করা পাপ-অন্যায় থেকে বাঁচতে সে এই নিকৃষ্টতম কলাকৌশল অবলম্বন করে। শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীর সামনে সত্যের উন্মোচন ঘটলে তারা ডাইনির মিথ্যাচার সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করে এবং হনুমান মিশ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

গল্পে তৎকালীন বিহার, পালামৌ অঞ্চলে উচ্চবর্ণের কৌশলী শোষণে নিম্নবর্ণ ও আদিবাসী মানুষদের শোচনীয় দুরাবস্থা চিত্র এবং এর প্রতিবাদের শোষণের জাল ছিন্ন করে এই অত্যাচারিত-নিপীড়িত মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ইতিবাচক ছবি চিত্রিত। গল্পের মধ্যে আদিবাসী সমাজের ভবিষ্যতের কুসংস্কার মুক্ত জীবনের ইঙ্গিত রয়েছে।

'নৈঋতে মেঘ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'শিশু' গল্পটিই এই গ্রন্থের অন্য গল্পের থেকে আলাদা। মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দশম খন্ডের ভূমিকায় নন্দিতা বসু লিখেছেন-

‘ঐ গ্রন্থে একমাত্র ‘শিশু’ গল্পটিই এ ব্যাপারে অনেকটা ব্যতিক্রমী। এবারে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ‘শিশু’ই এই গ্রন্থে একমাত্র গল্প যার কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন বহিরাগত মধ্যবিত্ত মানুষ, শহরের লোক, সে মহাশ্বেতার বেশিসংখ্যক সম্ভাব্য পাঠকদের মতনই একজন; এবং গল্পে এই চরিত্রের কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা যা তাকে দীর্ণ করে সেটি হল মানুষ এখানে রাষ্ট্র, ও ভৌগোলিক অর্থে বৃহত্তর সমাজের বীভৎস অন্যায়ের আক্রমণের সামনে কীভাবে বেঁচে আছে তার আবিষ্কার, যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশীদার মহাশ্বেতার পাঠকেরা। বলা যায়, এ গল্প পাঠকের কাছে আত্মানুসন্ধানের সেই জানালা, যা দিয়ে রামগড় পাহাড় থেকে রাঁচি -চাইবাসা বা সিংভূম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দরিদ্র, অপমানিত, যুযুধান মানুষের যে ছবি সম্পূর্ণ গ্রন্থটি দিচ্ছে তার এক অংশ ও চরম এক পর্যায় একই সঙ্গে চোখে পড়ে। সেই সঙ্গে গোটা ছবিতে থাকে যে দেখছে তার অবস্থান ও অপরাধ।’[৪২]

গল্পে স্বাধীন ভারতের বুকে আদিবাসী মানুষদের অবিশ্বাস্য, ব্যাখ্যাতীত দারিদ্রর কথা লিপিবদ্ধ। লোহরিতে আসা এক রিলিফ অফিসারের আদিবাসী সম্পর্কিত ধারণা ছিল, আদিবাসী পুরুষরা বাঁশি বাজায় এবং আদিবাসী নারীরা ফুল পরে, নাচে। সভ্য মানুষের ভাবনাতীত দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনযাপন করে আদিবাসী মানুষগুলো। লোহরিতে আসা রিলিফ অফিসার বি.ডি.ও.-র কাছ থেকে আগারিয়া জনজাতির পুরাকথা শোনে এবং সেখানেই সে জানে সরকারী উদ্যোগে পাহাড় ফাটানোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ করে কুভা গ্রামে আগারিয়া জনজাতির মানুষরা এবং পুলিশের হাত থেকে আত্মগোপন করতে গিয়ে তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে যে তখন থেকে সেই জনজাতির মানুষদের আর কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। রিলিফ অফিসার ত্রাণের সামগ্রী চুরি করা ধরতে গিয়ে চন্দ্রালোকিত রাতে আগারিয়া জনজাতির হারিয়ে যাওয়া, না খুঁজে পাওয়া মানুষদের আবিষ্কার করে। এই রিলিফ অফিসার সাক্ষী হয়েছে কীভাবে বছরের পর বছর প্রয়োজনীয় খাবার না পেয়ে, অনাহারে কাটাতে কাটাতে আগারিয়া নারী-পুরুষদের স্বাভাবিক আকৃতি নষ্ট হয়ে তারা শুকিয়ে শিশু শরীরের ন্যায় খর্বাকৃতি হয়ে গেছে। আমাদের সভ্য সমাজের মানুষের ভাবনা থেকে বহুযোজন দূরে অবস্থিত আদিবাসী জনজীবন। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী অফিসারটিকে ঘিরে আগারিয়া মানুষদের যে ক্ষোভ প্রদর্শন তা যেন তাদের সাথে হওয়া অন্যায়-বঞ্চনার প্রতিবাদ। কুভা গ্রামের এই জনজাতির মানুষদের প্রতিবাদের ভাষা-

‘ওরা পিশাচ আনন্দে, প্রতিহিংসার উল্লাসে খিক-খিক করে হাতে। তারপর ওরা ওঁকে ঘিরে ছুটতে থাকে, হাসতে-হাসতে। মাঝে মাঝে খষে দেখায় পুরুষাঙ্গ, বুঝিয়ে দেয়, ওরা পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় মানুষ’।[৪৩]

এই আদিবাসী মানুষগুলোর প্রতিবাদের ভাষা স্বাধীনতার তিনদশক পরে সুখস্বপ্নে মজে থাকা সভ্যসমাজের ভাবনায় অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করে, চোখের সামনে উন্মোচন করে সুখ রাষ্ট্রের ভিতরে থাকা কঙ্কালসার চেহারার আরেক ভারতবর্ষের ঠিকানা।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘বিছন’ গল্পে অনুগতভাবে মাথা নীচু করে, মালিকের নির্দেশে জীবন কাটানো কুরুভা গ্রামের আদিবাসী, হরিজন, অন্ত্যজ মানুষরা, বহু যন্ত্রণা সহ্য করার ও ভয়ে ভয়ে মালিকের স্বার্থরক্ষার পরও সন্তানের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, নিজেদের নির্বোধ চরিত্র বদলে কৌশলী সত্তায় উত্তরণ এবং শত্রুনিধন করে তার শ্রেণির মানুষদের মধ্যে এক শক্তিশালী উৎপাদিকা শক্তির বীজধান হাতে ধরিয়ে দেওয়ার মধ্যে নতুনভাবে জীবন চলার ইঙ্গিত বর্তমান।

১৯৭৭ এর জরুরি অবস্থার ঠিক পরবর্তী প্রেক্ষাপটে এবং তৎকালীন বিহার বর্তমানে ঝাড়খন্ডের পটভূমিতে রচিত ‘নুন’ গল্পে ও ‘শিশু’ গল্পের ন্যায় অনুরূপ ভাবে ধরা পড়েছে আদিবাসীদের উপর হয়ে চলা অভাবনীয় ষড়যন্ত্র, অত্যাচার। পালামৌয়ের বুঝার গ্রামের আদিবাসী মানুষরা ভারতের ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত জানত না বেঠবেগারি বেআইনি। বারো বছরের বেশি সময় কোনো জমি চাষ করলে জমির অর্ধেক ফসলে তাদের অধিকার জন্মায়। একটা সময় আদিবাসী মানুষগুলোর সামনে এই সত্য এসে যাওয়ায় তারা মহাজন উত্তমচাঁদ বানিয়ার উপর ক্ষিপ্ত হয়। আদিবাসীদের সচেতনতাবোধ উত্তমচাঁদের কাছে পরাজয়ের সমান এবং এই ক্রোধ-আক্রোশ থেকে উত্তমচাঁদ আদিবাসীদের নুনে মারার প্রতিজ্ঞা করে। বাজারের সবচেয়ে সস্তা জিনিস নুন হলেও জীবন ধারণে নুনের ভূমিকা গুরত্বপূর্ণ, সেই নুন বিনা আদিবাসীদের বেঁচে থাকে কঠিন হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত পূর্তি মুন্ডা এবং আরও দুই আদিবাসী মানুষ হাতির জন্য বরাদ্দ নুন মাটি চুরি করতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মারা পড়ে। এই মানুষগুলোর মৃত্যুর কারণ, দায় কার? এই প্রশ্নের মধ্যে দরিদ্র মানুষগুলোর পরাজয়ের, জীবনের অনন্ত দুঃখের কাহিনি বর্ণিত।

দেবেশ রায়ের ‘মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট’ গল্পে রাজবংশী আদিবাসী মানুষদের তীব্র, কঠিন সংগ্রামময় জীবনচিত্রের অনবদ্য রূপায়ণ ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের বার্ণেশ ঘাট থেকে জলপাইগুড়ি যাবার রাস্তা হল এই নৌকাপথ। বর্ষায় যখন তিস্তা উত্তাল হয়ে যায়, বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তখনই এখানকার রাজবংশী মাঝিমোল্লারা তাদের জীবনকে হাতে নিয়ে নদীতে নৌকা চালাতে নেমে পড়ে। এই আদিবাসী মাঝিদের সারাজীবন সংগ্রাম, দারিদ্রতার সাথে লড়াই করতে হয়, তাই তারা এই লড়াইয়েও যেন অভ্যস্ত, বাড়তি কিছু উপার্জনের জন্য। এই বার্ণেশ ঘাটের স্থায়ী বাসিন্দা ধরার কাজ করে উপার্জন করে ভাদুই, সে কমবয়সী ছেলে হলেও তার বুদ্ধিদীপ্ত কথার ধার রাবণের মতো বড় মাঝিদেরও হারিয়ে দেয়। এভাবেই বিপজ্জনক ঘাটের আনাগোনা বজায় থাকে। শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের তাগিদে এই মাঝি-মোল্লারা তাদের জীবনের পরোয় না করে, তিস্তার প্রবলতার সাথে লড়াইয়ে নামে, তিস্তাকে জয় করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে।

ভগীরথ মিশ্রের ‘প্রয়াগবেজের হাই’ গল্পে লোধা জনজাতি এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষদের উপর প্রশাসন ও সমাজের উচ্চবর্গীয় শ্রেণির শোষণচিত্র বিম্বিত। গল্পে দেখা যায় সরকারি জঙ্গলে কাঠ কাটবার জন্য লোধা জনজাতির মানুষদের প্রশাসনের লোকেরা হাজতবাস করানোর হুমকি দেওয়ায় শুশুক লোধা এর প্রতিবাদ করে। এই অরণ্যবাসী প্রান্তিক মানুষদের জীবন-জীবিকা দুই ক্ষেত্রেই তারা অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। সমাজ ও আইনের মারপ্যাঁচে প্রশাসন এবং উচ্চবর্গীয় শ্রেণি আদিবাসী প্রান্তিক মানুষদের থেকে অরণ্যের প্রতি তাদের সামান্য অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় জনজাতি মানুষরা প্রতিবাদ করছে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করে নেয়। শুশুক লোধার মতো খুব কম মানুষই ফৌজদারির বিরুদ্ধে এমন সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু শুশুকের এই সাহসী পদক্ষেপের পরিণাম লোধা জনজাতির মানুষদের জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে আসে। রাতের অন্ধকারে প্রশাসন তাদের ষড়যন্ত্র সফল করে, তারা লোধাপাড়া জ্বালিয়ে দেয়, লোধা পাড়ার সমস্ত মুরগী দিয়ে থানায় ‘ফিস্টি’ করে, লোধা মানুষদের থানায় নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হয়, প্রতিবাদ করায় তাদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও সমাজের প্রান্তিক ও জনজাতি মানুষদের অধিকার তাদের সামাজিক দুরাবস্থার চিত্রই গল্পে মূলত প্রতিপন্ন। দেশে স্বাধীনতা এলেও দেশের

প্রতিটা কোণায় তিরিশ বছর পরেও স্বাধীনতার আলো পৌঁছায়নি, সেই সমাজবাস্তবতার প্রতিরূপই গল্পে প্রতিবিম্বিত।

ভগীরথ মিশ্রের ‘পৌষপরবের কুশীলব’ গল্পে সমাজের প্রান্তিক, খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে ভোট ‘পৌষপরবের কুশীলবে’র ন্যায়। উৎসবকে কেন্দ্র করে যেমন বাইরে কর্মরত প্রবাসী মানুষরা ঘরে ফেরে, আনন্দোল্লাসে, রঙ-তামাশায় মাতোয়ারা হয়, তেমন ভোটেও পরিবার থেকে দূরে থাকা মানুষরা ঘরে ফিরেছে, আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছে। তাদের কাছে ভোটের সঠিক অর্থ প্রতিপন্ন না হলেও, এই ভোট যেন তাদের জীবনে ক্ষণিকের আনন্দ, ক্ষণিকের বিশ্রাম, মুক্তির বাতাস বয়ে এনেছে, ভোট এই প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের কাছে উৎসবে পর্যবসিত।

গল্পে পৌষপরবের কুশীলবের ন্যায় ভোটের আনন্দ-উল্লাস চিত্রের পাশাপাশি মন্দিরের চূড়ায় আটকে পড়া হনুমানটির লম্ফঝম্ফ, বাঁচার বিফল প্রয়াস, ভয় পেয়ে লাফ না দেওয়ার মধ্যে আদিবাসী মানুষদের প্রতিমুহূর্তে নিদারুণ বিপন্ন জীবন কাটানোর প্রতীকি ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

লেখকের ‘একদিনের বিকিকিনি’ গল্পে ভোটকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদদের দরিদ্র আদিবাসী ও সমাজের প্রান্তিক মানুষদের ব্যবহারের চিত্র এবং রাজনীতি প্রতীয়মান। বর্তমান সমাজে ভোট যেন বাজারের পণ্যদ্রব্য বেচা-কেনা করার মতো বিষয়ে পর্যবসিত। ভগীরথ মিশ্র দেশ-কাল-রাজনীতির স্বরূপকে খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনন দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন রাজনীতির স্বরূপ। গল্পগুলিতে রাজনীতি ও ভোটের স্বরূপ এবং সামাজিক প্রেক্ষিত চিত্রিত।

ভগীরথ মিশ্রের ‘বনমহোৎসব’ গল্পে কানাপাথর দুর্গাসুন্দরী হাইস্কুলে বহু ঐতিহ্যমন্ডিত বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে একদিকে সভ্যসমাজের নাটকীয় জনদরদী মনোভাবের যেমন উলঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে, তেমনই লোধা, সাঁওতাল, লোহার জনজাতির মানুষদের সামাজিক অবস্থান, অরণ্য নিধনের বাস্তব স্বরূপ উন্মোচিত। বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, ডি-এফ-ও সাহেব এছাড়াও সমাজের আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যেখানে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন জঙ্গলকে যেকোনও মূল্যে টিকিয়ে রাখতে হবে, ‘একটি গান, একটি প্রাণ’, সেই ভাষণের বিপরীত দৃশ্যে দেখা যায়-

> ‘সেই জঙ্গল কেইট্যে সাফ কইরে দিল্যাক ঠিকাদার। মহেশ্বর কোটাল আক্ষেপ করে বলে, নিলামে যতটা বন লিল্যাক, তার দ্বিগুন বন কাইট্ল্যাক। বহু মনিষ্যি তার ভাগ পাইল্যাক। মাঝে মাঝে ঝাঁটি চোরদের ধইরে কেস দিল্যাক বিটবাবু। চোর বদলাম দিল্যাক মোদ্যারকে। মোরা নাকি জঙ্গল কাটি’।[88]

মহেশ্বর কোটালের এই কথা থেকে স্পষ্ট হয় ঠিকাদার ও পুঁজিবাদী সমাজ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কারণে, মুনাফার লোভে কীভাবে নির্বিচারে অরণ্য নিধন করে চলেছে। আবার শাসক শ্রেণি অত্যাচারিত-শোষিত শ্রেণির মানুষদের উপরই অরণ্য নিধনের দোষ চাপায়। রেঞ্জার সাহেব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে- “জঙ্গল যারা ধ্বংস করছে, তারা ‘দেশের শত্রু”, অথচ দেশের আসল শত্রুরা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে, ষড়যন্ত্রের জালে আদিবাসী মানুষদের ঘাড়ে দোষ চাপায়। গল্পে একদিকে দেখা যায় বৃক্ষরোপণের চিত্র, অন্যদিকে অরণ্যনিধন ও অরণ্য আইনের ফলে আদবাসী মানুষদের প্রাণ, খাদ্য, আশ্রয় যে জঙ্গল, তা থেকে তাদের উচ্ছেদ। বনমহোৎসব আসলেই কেবল উৎসবে পর্যবসিত, সমাজ কেবল বাণী আওড়ায়, শব্দের মর্মভেদী উপলব্ধিবোধ উচ্চবর্গীয় শ্রেণির নেই। লেখক গল্পে একদিকে আদিবাসী মানুষদের সংকট সমস্যা যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই সমাজের বাস্তব মনোভাবও তুলে ধরেছেন।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁড়িয়ার দেশের কবিতা’ গল্পের বিষয় হয়েছে পুরুলিয়ার টাঁড় রুক্ষভূমি, যেখানে আদিবাসীদের বাস, সেই রুক্ষ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সরকারের তরফ থেকে কিছু পানীয় জলেরে কুয়ো বসানোর প্রকল্প হয়, এই প্রকল্পের শর্ত ছিল কুয়োগুলোর খনন হবে কোনো আদিবাসী পরিবারের জমির উপর। কিন্তু আইন মেনে কূপ খনন করা হলেও তা কোনোটাই আদিবাসীদের মঙ্গলকার্যে আসেনি, কারণ- আদিবাসী গ্রামের দু-তিন মাইলের মধ্যেও কোনো কূপ খনন হয়নি। এই সত্যতা যাচাই করতে সরকারী কর্মচারী যখন গ্রামে-গ্রামে পৌঁছায় তখন দেখা যায় সামান্য জলের জন্য কী নিদারুণ সংগ্রাম প্রতিনিয়ত সমাজের প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষগুলি করে চলেছে। সরকারিভাবে কুয়ো খনন হলেও, তার কোনো সুযোগ-সুবিধা আদিবাসীরা ভোগ করতে পায় না। প্রচন্ড গরমের দাবদাহের মধ্যে চার-পাঁচ মাইল দূরে এসে আদিবাসীদের জল সংগ্রহ করতে হয়। এই রুক্ষ টাঁড়ভূমির ন্যায় আদিবাসী মানুষদের জীবনও রুক্ষ, তাদের সরলতার কারণে বঞ্চিত হতে হয় এবং তারা প্রতিনিয়ত ঠকে যায়। তাদের এই নিবুর্দ্ধিতার সুযোগ নিয়ে উচ্চবিত্ত মানুষরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে আর অন্যদিকে আদিবাসী

মানুষগুলি তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে, সরকার কর্তৃক আদিবাসী স্বার্থে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও আদতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি, বাস্তবের সেই নির্মম সত্য উন্মোচিত লেখকের 'হাঁড়িয়ার কবিতা' ও 'আলোচনাচক্র' গল্পে।

এই আদিবাসী মানুষগুলির কাছে জীবনসত্য হাঁড়িয়া, তারা জানে তারা খরার সন্তান, খরা মাথায় করে জন্মেছে, অভাব-অনটনই তাদের সঙ্গী, হাঁড়িয়াই তাদের প্রাণরস। অনাদিকাল ধরে শহুরে মানুষদের দ্বারা প্রবঞ্চনার শিকার এই আদিবাসী মানুষগুলো। গল্পে সরকারী আইন প্রণয়ন, প্রকল্পের সাথে বাস্তবতার কতটা পার্থক্য তার সত্যরূপ পরিস্ফুট। আসলে আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি তাদের জীবনচর্চা, প্রাতিস্বিক মূল্যবোধকে ছুঁয়ে তৈরি হয় না, তারই প্রমাণ মেলে এই গল্পে।

'হাঁড়িয়ার দেশের কবিতার' ন্যায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলোচনা চক্র' গল্পেও আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং সরকারী আদিবাসী স্বার্থে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবে তা কতটা রূপায়িত হয়েছে, কাগজে কলমে গৃহীত নানান নিয়ম, প্রকল্প ও বাস্তবতার পার্থক্যের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। গল্পে দেখা যায় 'আদিবাসীসমাজ' শিরোনামে কুসুমডিহি নামক আদিবাসী গ্রামে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় শহর থেকে নামকরা নানান বিশেষজ্ঞ, গুণী-মানী ব্যক্তি, রিপোর্টাররা আসে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আদিবাসীদের নিয়ে সভা হলেও আদতে তারা যে আদিবাসী দরদী নয় তা বোঝা যায় যখন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এলাহী খাবার আয়োজন করা হলেও আদিবাসীরা খালি পেটে থাকতে হয়, বলা হয় না খেয়ে থাকাই আদিবাসীদের অভ্যাস। এখানেই সভার এবং সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষদের মুখোশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গাড়িতে করে আসেন, খাওয়া-দাওয়া করে, নানান গালভরা লোক দেখানো জনদরদী প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায়। সাধারণত, এই সহজসরল মানুষগুলি সেগুলো বিশ্বাস করে, সভা শেষে বোকার মতো অভ্যাসের বশে হাততালি দেয়।

এই আদিবাসীদের মধ্যে ঈশান চন্দ্র দিগার, লোধা জনজাতির মানুষ যে সোচ্চারে এই আলোচনা সভার মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিবাদ করে। তার কথায় সরকারী দপ্তরের নগ্ন বাস্তবতা, অফিসারদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ফুটে ওঠে। এই সভায় এই উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরা মিষ্টি ব্যবহার করলেও, প্রয়োজনের সময় তারা এই মানুষগুলোকে মানুষ বলেই মনে করে না, অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। সরকারী

প্রকল্প অনুযায়ী যদি বা গ্রামে কোনো টিউবওয়েল পোঁতা হয়, তা বছর ঘুরতে না ঘুরতে অকেজো হয়ে যায়। ঈশান চন্দ্র দিগার সমগ্র আদিবাসীদের সাথে হয়ে চলা দীর্ঘদিনের প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচারকে সোচ্চারে তুলে ধরেছে। গল্পে এই লোধা জাতির মানুষের কথায় অনাদিকাল থেকে চলে আসা উচ্চবিত্তদের জনদরদী মুখোশ যেমন খসে পড়ে, তেমনই আদিবাসী স্বার্থে গৃহীত সরকারী প্রকল্পগুলো আসলে কতটা মূল্যহীন, কেবলই লোক দেখানো তা পরিস্ফুট।

ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'পাতালের মুখ' গল্পে অর্জুনের জলের প্রবল তৃষ্ণা, কিন্তু কোথাও একফোঁটা জল পাওয়া যায় না। আদিবাসী গ্রামের পাশে টিউবকল থাকলেও সেখানে জল পাওয়া যায় না। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলোচনাচক্র' গল্পে ঈশানচন্দ্র দিগারের আদিবাসী সমাজ ও সরকারী প্রকল্পকে নিয়ে বলা কথা- আদিবাসী গ্রামে সরকারিভাবে লাগানো টিউবকল একবছরের মধ্যে অকেজো হয়ে যাওয়ার উদাহরণ এই গল্পে পাওয়া যায়। জলের তৃষ্ণা এত তীব্রই হয়ে যায় যে শেষমেষ সে তার ঘামবিন্দু দিয়ে জলের তৃষ্ণা মেটাতে চায়। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সামান্য জলটুকুও না পাওয়ার বাস্তবচিত্র প্রকট হয়েছে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'রেখে আসা' গল্পে একদিকে লোধা, খেড়িয়া জনজাতির মানুষদের দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনযাপন ও অন্যদিকে শহুরে মানুষদের মেকি আদিবাসী দরদী মনোভাবের বৈপরীত্যে কৃষ্ণার মানবিক মানসিকতা এই আদিবাসী মানুষগুলোর প্রতি। গল্পে চিত্রিত শহুরে মানুষদের আদিবাসী মানুষ সম্পর্কে যে 'ইন্টারেস্ট' তা কেবল হাততালি কুড়ানোর তাগিদে, আদিবাসী দরদী মনোভাব এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল নয়। কৃষ্ণার আদিবাসী গ্রামে গিয়ে প্রত্যক্ষ করে আমাদের শহুরে বিলাসিতাময় জীবন থকে বহু ক্রোশ দূরে অবস্থিত এই জনজাতি মানুষগুলোর দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন। তাদের এই দারিদ্র্যপূর্ণ, অনাড়ম্বরহীন জীবনযাপন দেখে কৃষ্ণার মনে মায়া হয়। শীতের দিনেও কেবল একটা ছেঁড়া কাঁথাই এই দরিদ্র মানুষগুলোর সম্বল। এই অসহায়তা যেন কৃষ্ণার মনে লাগে তাই সে সকলের আড়ালে তার শালটা সে রেখে আসে। সে লোকদেখানো কিছু করেনি, তার সামর্থানুযায়ী মানবিক হয়ে খুব সামান্য কিছুর মাধ্যমেই কৃষ্ণা এই মানুষগুলোর সমব্যথী হয়ে তাদের কষ্ট একটু লাঘব করতে চেয়েছে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘কল’ গল্পে কোড়া, সাঁওতাল জনজাতির মানুষদের আর্থিক দুরাবস্থার কারণে তারা চিরকালই জীবনের, ভাগ্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। সুবলের এই আর্থিক অনটনের কারণে সে তার বউকে পরিধানের একটা ভালো শাড়ি, শায়া কিনে দিতে না পারায় সে তার বউকে বাবার বাড়িতে রেখে আসে। সেখানেও ধানকলে কাজ করতে গিয়ে সুবলের স্ত্রী পালং পরকীয়ার কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়লেও, সেই সমস্যার সমাধান করে পালং সুবলের কাছে ফিরে এলে সমাজের প্রধান বুড়ো লগন দাস চল্লিশ টাকা জরিমানা করে। আদিবাসী সমাজের নিয়ম অনুযায়ী ধার্য জরিমানা চল্লিশ টাকা সুবল না দিতে পারলে পালং এর সাথে সুবল পুনরায় সংসার করতে পারবে না। সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষদের লোভের কারণে এবং কিছু অযৌক্তিক নিয়মের কারণে পালংকে পুনরায় বাপের বাড়ি ফিরে যেতে হয়। এরপর সুবল কৌশলে চল্লিশ টাকা জোগাড় করে পালংকে বাপের বাড়ি থেকে ফেরত আনতে চায়। ১০ই ফাল্গুন কোঁড়াদের পার্বণ, যা মনসার জাগানের দিন ,পালং যেহেতু উৎসবের দিন বাড়িতে ফিরবে সেই আনন্দে সুবল তার শালা, ভায়রাভাই, গোটা পরিবারকে ভালো কিছু খাওয়াতে চায়। তাই সে ফন্দী করে ফলিডল দিয়ে বাবুদের বাড়ির বিদেশী ইঁদুর মারবার পরিকল্পনা করে। তার বিষক্রিয়ায় মৃত ইঁদুরগুলো সুবল পৌঁছানোর আগেই মুরাই গিয়ে নিয়ে আসে এবং ওই মরা ইঁদুরের নাড়িভুঁটি দিয়ে বানানো বড়া খেয়ে পালং এবং তার ভাই এর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। আর্থিক দুরাবস্থা এবং ভাগ্যের নির্মম ও নিষ্ঠুর পরিহাসে সুবলদের মতো মানুষরা যেন সারা জীবনই কলে পড়ে থাকে।

‘প্রযুক্তি-মস্তানি মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। যে প্রক্রিয়া মানুষকে ভূমিদাস করে, সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়।’[৪৫] এই অনুভবেরই কাহিনি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘ঝড়ে কাক মরে’ গল্প।

অমর মিত্রের ‘ভারতবর্ষ’ (নামান্তর ‘আত্মাপাথর’) এবং ‘দানপত্র ১’ গল্পদ্বয়ে ভূমিহীন আদিবাসীদের অসহায়তা এবং ভারতবর্ষের আবহমানকাল ধরে চলে আসা আদিবাসী বঞ্চনার ইতিহাস সম্বনয়ী চিত্র চিত্রিত। লেখকের ‘ভারতবর্ষ’ (নামান্তর ‘আত্মাপাথর’) গল্পে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মহুলবনি এলাকার দরিদ্র আদিবাসী মানুষদের দিয়ে মহাপাত্রদের মতো জমির মালিকরা নিস্ফলা চাষ করিয়ে, সুফলা করে, হতদরিদ্র আদিবাসী মানুষদের বঞ্চিত করে তা সুকৌশলে কেড়ে নেওয়ার চিত্র দেখা যায়। বুদাং মুন্ডার ন্যায় অন্যান্য আদিবাসী মানুষদের কর্ষিত জমি চলে যায় সরকারী

ফরেস্টের অধীনে। আবহমানকাল ধরেই আদিবাসীদের সাথে এই বঞ্চনা হয়ে আসছে। কখনও তাদের বাসস্থান অরণ্য থেকে উচ্ছেদ করা হয়, কখনও সরকারী আইনের নামে তাদেরকেই অরণ্যসম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়, এখানেও অনুরূপভাবে জমির মালিকেরা আদিবাসীদের ফলানো ধানই আদিবাসীদের ধার দিয়ে বেগার খাটিয়ে নেয়। বেগারপ্রথা পঞ্চাশের দশকে বন্ধ হলেও আদতে তা কেবল আইনিভাবে বন্ধ হয়েছিল, বাস্তবিক রূপ গল্পে প্রতিফলিত।

গল্পে একদিকে আদিবাসীদের ওপর উচ্চবর্ণের দ্বারা জমিকেন্দ্রিক শোষণ, অপরদিকে জনজাতির মানুষদের উপর জোড়পূর্বক দিকুদের ধর্মবিশ্বাস আরোপ, শোষণের নানারূপ পরিস্ফুট। আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কৃতি গ্রাস করে দিকুদের ধর্মবিশ্বাস আরোপিত করার ফলে মুন্ডাদের পূর্বপুরুষদের কবরের ওপর চাপানো পাথর দিকুদের ব্যাখায় হয়ে যায় জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির। সমস্ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতিবাদ থাকলেও পরিণতিতে বুদাং মুন্ডার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং মহাপাত্রদের সমস্ত ধান ঘরে তোলায় উন্মোচিত হয় আদিবাসীদের বারবার উচ্চবর্ণের ক্ষমতার কাছে পদদলিত হওয়ার ইতিহাস। মহুলবনিতে আদিবাসীদের যে অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহ, সেই বিদ্রোহে হাজার হাজার মশালধারীর উপস্থিতি চমক লাগালেও শেষে বোঝা যায় কবরের ওপর চাপানো পাথর বা শ্মশানবুরুগুলোয় মশাল বসিয়ে মুন্ডারা আসলে ভয় দেখানোর কৌশল তৈরি করেছে। আসলে ভারতবর্ষের আদিম মানুষদের আদিম বিশ্বাসের প্রাচীনত্বের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উন্নাসিকতা।

অমর মিত্রের ‘দানপত্র ১’ গল্পের বিষয়বস্তুতে দেখা যায় আশির দশক থেকেই আদিবাসীদের মধ্যে স্বজাতি সচেতনতাবোধ সঞ্চারিত। তারা কেবলই অত্যাচারিত হচ্ছে তা নয়, তারা ঘুরে দাঁড়ানোর, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস করছে। এই গল্পের সাহেবমারি বাস্কের দানপত্র আসলে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হওয়া আদিবাসীদের প্রতিবাদীসত্তার প্রতীক হিসাবে ব্যঞ্জনা পেয়েছে, ঠিক যেমন ‘ভারতবর্ষ’ গল্পের শ্মশানবুরু আদিমতার প্রতীক হিসাবে অন্বিত। এই গল্পে আদিবাসী মানুষরা বুঝতে পারে তাদের ‘সরলতা’ স্বভাববৈশিষ্ট্যই তাদের জীবনের অন্ধকারের মূল কারণ। এই সত্য অনুভব করে তারা তাদের সরলতাকে সরিয়ে প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে।

তারা দেখেছে যে ঈশ্বরবাবু কন্যার সম্মান রক্ষার্থে সাঁওতাল হয়েছে 'সাহেবমারি', সেই ঈশ্বরবাবুই সাহেবদের মনোরঞ্জনের ভোগ্য-পণ্য হিসাবে আদিবাসী নারীদের ব্যবহার করছে। সাঁওতাল পুরুষ ঈশ্বরবাবুর কন্যাকে বাঁচাতে সাহেবকে হত্যা করে সাহেবমারি নামে পরিচিত হয়। মানুষ প্রকৃত সত্য জানল না, ঘটনা উল্টে সাঁওতালের কারাবাস হয়, সাহেবের মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়। আদিবাসীদরদী দেবেন্দ্রনাথ ভীষণ চেষ্টা করে সাঁওতালদের হৃতজমি পুনরুদ্ধারের কিন্তু নথিপত্রের মারপ্যাঁচে মালিকানার হাতবদল এমনভাবে হয় যে সাঁওতালরা জমি হারায়। এই গল্পে আদিবাসীদের সাথে আবহমানকাল ধরে হয়ে আসা অন্যায়, ভূমিহীনতা ও বঞ্চনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ।

সাহেবমারি বাস্কের যে দানপত্রের আয়োজনে, তার মূল আকাঙ্ক্ষা দানপত্রে উল্লিখিত ভূমি গ্রহণের জন্য সকল আদিবাসী ও অন্ত্যজ মানুষ হয়ে উঠবে সাহেবমারি, প্রতিবাদী। দানপত্রের মধ্যে দিয়ে প্রতিরোধের এই প্রবাহমানতা বজায় থাকে অতীত থেকে বর্তমানেও।

নলিনী বেরার 'ঝরাপালকের জাদু' গল্পে কল্পকথার কাহিনি, বাচ্ছাভুলানো আদিবাসী লোককথা থাকলেও গল্পের বিষয়ে অভিনবত্ব আছে। অন্যান্য প্রায় সকল লেখকদের লেখায় আদিবাসীদের সঙ্কটচিত্র, প্রেম-দাম্পত্য গল্পের বিষয়। বেশিরভাগ গল্পেই আদিবাসীরা শোষিত-লাঞ্ছিত-বঞ্চিত। এই প্রথম নলিনী বেরার গল্পে অন্য এক দৃশ্যের সাক্ষী হতে হয়। যেখানে ডাঙাসাহির বুধন মুর্মু, একজন সরকারি চাকুরীজীবী। যার কাছে চাকরির 'টিপস্' নিতে এসেছে গ্রামের উচ্চবিত্ত বাড়ির মানুষ। সমাজে খুবই ধীরে ধীরে হলেও আশির দশকের শেষ দিক থেকে আদিবাসী মানুষ ও তাদের সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া প্রবেশ করছে, তা গল্পে পরিস্ফুট।

নলিনী বেরার টি.আই প্যারেড গল্পে কথক এবং কথকের স্ত্রী শহরবাসী। কথকের জেঠতুতো দাদা সতীশচন্দ্র যিনি 'মাস্টার দা' নামে খ্যাত, তাঁর শ্রাদ্ধে কথকের গ্রামের বাড়ি ফেরার সূত্রে কথকের মুখে গ্রামের আদিবাসী, প্রান্তিক মানুষদের জীবনচর্যার, তাদের লোকায়ত জীবন চিত্র প্রতীয়মান। শীতের দিনে কথকদের গ্রামের যাযাবর-বাজিকর, ইরানি-বেদিয়াদের দল উট, ঘোড়া, খচ্চর, বাঁদর, হনুন, ভিনজাতের মুরগি, কখনো বিরল প্রজাতির পাখি নিয়ে আসে। এছাড়াও গল্পে প্রান্তিক মানুষদের জীবনাচরণের পাশাপাশি সাঁওতালদের ১লা মাঘের উৎসবের কথা, তাদের লোকজীবনচিত্র বর্ণিত।

নলিনী বেরার 'নুয়াসাহীর বটতলা' গল্পে নুয়াসাহীর বটতলা গ্রামের ভূমিজ জনজাতির মানুষদের প্রান্তিক জীবন চিত্রিত। নলিনী বেরার 'বাঘাতঙ্ক' গল্পের মাঝুডুব্কার জঙ্গলে শিকারে গিয়ে ত্রিলোচনের বাঘের আক্রমণে মৃত্যু এবং এই জঙ্গলে মহুয়া ফল সংগ্রহ করতে গিয়ে সনাতন মুর্মুর মায়ের ভাল্লুকে আক্রমণের কথা পাওয়া যায়। এই প্রান্তিক মানুষদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয় প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। ত্রিলোচন বনকুঁদরি ফল সংগ্রহ করতে গিয়ে, স্ত্রী সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে সে ভয়কে জয় করে আর একটু বেশী ফল লাভের আশায় মগ্ন হয়ে অসাবধানবশত ত্রিলোচন বাঘের লেজে পা দিলে বাঘটা আক্রমণ করে ত্রিলোচনকে। গ্রামবাসী হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয় না। সংবাদপত্রের শিরোনামে বাঘের থাবায় আহত ত্রিলোচনের সংবাদ প্রকাশিত হলেও প্রশাসনিক কোনো সাহায্য তারা পায়নি। যে গ্রামবাসীরা ত্রিলোচনের সংবাদপত্রের শিরোনাম হওয়া নিয়ে আস্ফালন ও ক্ষোভ, ইয়ার্কি প্রকাশ করছিল, ত্রিলোচনের মৃত্যু তাদের মনের মধ্যে বাঘাতঙ্কের সঞ্চার ঘটায়। লেখক গল্পের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করেছেন, অরণ্য কেবল নয়নাভিরাম নিসর্গদৃশ্য নয়, সেখানে আছে হিংস্র বন্যপশুর উপদ্রব, অতর্কিতে আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য অরণ্যবাসী মানুষদের প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে বাঁচতে হয়।

সৈকত রক্ষিতের কাছে গল্প কেবল 'কাহিনির অনুষ্ঠান নয়'। লেখকের কথায়-

> 'পরিবেশের কথা বলতে গেলে, স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে অর্থনৈতিক জীবন, যা সমাজ একজন মানুষকে তার নির্দিষ্ট অবস্থান জানিয়ে দেয়। শ্রেণী অবস্থান থেকেই মানুষের মধ্যে আসে শ্রেণী সচেতনতা। আসে শ্রেণী বিদ্রোহও। আমার বিভিন্ন গল্পে জীবন প্রান্তিকতায় পৌছে যায়, বিদ্রোহের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর গড়ে ওঠে'।[৪৬]

লেখকের গল্পগুলির চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় লেখক যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা, মানুষের মনের পরিবর্তন, চেতনা আসার কথা বলেছেন, সেই বিদ্রোহের বদলে অধিকাংশ চরিত্ররা আত্মসমর্পন করেছে অথবা সমাজে তাদের বিপ্রতীপ অবস্থার কথা বলেছে। গল্পগুলি পুরুলিয়ার সমাজ ও প্রান্তিক জীবন থেকে উঠে আসা এবং এই গল্পের মধ্যেই পুরুলিয়ার সামগ্রিক লোকায়তজীবন লিপিবদ্ধ। এই আদিবাসী প্রান্তিক মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তাদের সঙ্কট সমস্যার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে লেখকের 'ছল', 'আঁকশি', 'মূলুন', 'রাঙামাটি', 'বয়ার কাড়া', 'পট', 'শবরচরিত' গল্পগুলি আলোচনা করা হল।

সৈকত রক্ষিতের 'আঁকশি' গল্পের প্রথমাংশে মাঝ জঙ্গলে বসবাসকারী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক জীবন, ঘরকন্নার ছবি লিপিবদ্ধ। এই আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষদের দারিদ্রের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার সংগ্রামের চিত্রের ফাঁকে ফাঁকে সভ্যসমাজের আগ্রাসনের কথা লেখক তুলে ধরেছেন-

> 'তবে এখন সেভাবে আর শিমুলগাছ দেখা যায় না। দিনকে দিন কাঠের দামে আগুন লাগছে। জঙ্গলও সাফ হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। দরকারি ও মুল্যবান গাছগুলো লরি বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে শহরের দিকে'।[৪৭]

দিনের পর দিন শহুরে মানুষদের অর্থলোলুপতার কারণে অরণ্যের নিধন, আইনি-বেআইনি উভয় পদ্ধতিতেই, যে কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বনবাসী মানুষরা। যাদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে এই অরণ্যের উপর। মাগারামের মতো মানুষদের জীবন-জীবিকা নির্ভরতার জায়গা এই অরণ, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান। কিন্তু মাগারাম ও তাদের মতো মানুষদের এই সামান্য সম্বলটুকুও সভ্যতার স্বার্থান্বেষী, ধনলোলুপ শ্রেণির আগ্রাসনে নিঃশষিত, তাই আদিবাসী মানুষদের জীবন ও জীবিকার দায়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয়। খিদের তীব্র জ্বালায়, অনাহারে দুধের শিশুকে কেবল ফ্যান খাইয়ে রাখতে হয়। দারিদ্রক্লিষ্ট প্রান্তিক, জনজাতির অসহায় চিত্রই গল্পে লিপিবদ্ধ। এই সহজসরল মানুষগুলোর জীবন দারিদ্রপূর্ণ হলেও তারা এত কষ্টেও খুব সামান্য সামান্য ব্যাপারেই খুশি হয়ে যায়। তারা কেবল রাঢ়ের বাজীকরের ডুগডুগি নিয়ে ভালুকয়ালার মতো নাচ-গানে যেমন অনাবিল বিস্ময়ে খুশিতে মেতে ওঠে, তেমনি কেবল সামান্য খেজুরে, কি ফ্যানেই তারা খুশি হয়। এই প্রান্তিক মানুষদের জীবন নিতান্তই সাধারণ, যতটুকু প্রয়োজন, তার থেকেও অনেক কমেই এদের জীবন সীমাবদ্ধ।

সৈকত রক্ষিতের 'মূলুন' গল্পে গোবিন্দপুর গ্রামে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বাস। এই প্রান্তিক মানুষদের অর্থ লাঞ্ছিত হতদরিদ্র সাংসারিক অবস্থ ও সেইহেতু সংসার বিপর্যয়ের কাহিনি গল্পের বিষয়। গ্রীষ্মের দাবদাহে তাদের খাদ্যের ভরসা কেবল 'মূলুন', রসালো পদ্মমূল। এই পদ্মমূল ভেজে অথবা সিদ্ধ করে খেয়ে তাদের জীবন চলে, মূলুন খন্ড খন্ড করে কেটে আঁটি বেঁধে যানবাজারে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। বংশ পরম্পরায় দারিদ্য, অভাব অনটনই এই সব মানুষদের নিত্যসঙ্গী। তীব্র খিদের জ্বালা সহ্য করবার সহিষ্ণুতা যেন তাদের জন্মগত অন্ধকারময় জীবনের অভ্যাস। দুয়ারা-আদরি অসহায়, নিদারুণ

দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবন সংগ্রাম, যা গ্রীষ্মের দাবদাহে চরমতার সীমালঙ্ঘন করে। যেখানে তারা পেটের খিদে মেটানোর জন্য সামান্য মূলুনটুকুও পায় না। অর্থহীন প্রান্তিক মানুষদের চরম দুর্দশার কাহিনি গল্পে উদ্ভাসিত।

সৈকত রক্ষিতের 'রাঙামাটি' গল্পে দেখা যায় রাঙামাটি গ্রামে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের জীবন আদ্যপ্রান্ত নানান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার জর্জরিত। এই প্রান্তিক মানুষদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীন আচরণের মূল কারণ তাদের শিক্ষাহীনতা, অজ্ঞতা এবং আর্থিক দুরাবস্থা। অর্থনৈতিক সঙ্কট ও শিক্ষাহীনতাই প্রান্তিক মানুষদের সমস্যার মূল কারণ। তাদের জীবনের অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে কুসংস্কার, যুক্তিহীনতার বীজ। এই অন্ধবিশ্বাসের কারণে সঞ্চারানির মতো বহু আদিবাসী নারীর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। এমনকি আদিবাসী মানুষদের এই কুসংস্কারের বিষয়ে পুলিশও কখনও হস্তক্ষেপ করে না, বরং সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখে নিরীহ-দুর্বল, অসহায় মানুষদের উপর অত্যাচার করে, চলে অর্থনৈতিক পোষণ। বনমালী সঞ্চারানির মতো মানুষেরা এই শোষণের যূপকাষ্ঠে প্রতিনিয়ত বলি হয়, ছেড়ে যেতে হয় নিজেদের বাসস্থান। বিষধর, স্বার্থান্বেষী মানুষদের সীমানা থেকে বহু দূরে, কোনো এক নিরুপদ্রব নীড়ের উদ্দ্যশ্যে পাড়ি দিতে হয় বনমালী, সঞ্চারানিকে, এক ইউটোপিয়ার আশায়।

সৈকত রক্ষিতের 'বয়ার কাড়া' গল্পে লোধা, শবর, সর্দার জনগোষ্ঠীর বাস পিয়ারশোল গ্রামে। গল্পে আদিবাসী প্রান্তিক দারিদ্র দুর্দশা জর্জরিত জীবনচর্যার মধ্যে, অস্তিত্বের সংকট এবং কারুণ্যের মধ্যেও মানুষ যেন সব কষ্ট ভুলে হাসতে চায়। দু-দুন্ড সুখের মুহূর্ত, বিনোদন চায়। তাতেই যেন তাদের এই অনেককিছু না পাওয়া, প্রকৃতি দ্বারা বঞ্চিত, ভাগ্য দ্বারা লাঞ্ছিত জীবনে খুশির আমেজ আসে। এই বিনোদনের কারণেই তাদের লোকায়ত জীবনের অঙ্গ 'খুঁকড়া লড়াই', 'কাড়া লড়াই', 'বাইনাচ'। এই কাড়ার লড়াইকে ঘিরেই গল্পে কাহিনি এগিয়েছে। গল্পের শেষে দেখা যায় গ্রামের এই মানুষগুলি তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট, দুর্দশার কথা ভুলে এই কাড়ার লড়াই উৎসবে মনের ফূর্তিতে যোগ দেয়। গ্রামে গ্রামে আদায় করা চালডাল দিয়ে হয় বারোয়ারি কাঙালের ভোজ। এই খেলাই যেন দীর্ঘদিনের অভুক্ত অনাহারী গ্রামবাসীর পেটভরে খাওয়ার সুযোগ করে দেয়। ক্ষণিকের এই আনন্দতেই যেন প্রান্তিক মানুষরা তাদের বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায়, সন্ধান পায় অস্তিত্বের।

সৈকত রক্ষিতের ‘পট’ গল্পে ‘পটকার’ মানুষদের জীবন-জীবিকা ও তাদের শিল্প ও জীবন বিপন্নতার চিত্র চিত্রায়িত। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত ও লাঞ্ছিত গুহিরাম চিত্রকরের বেঁচে থাকার লড়াই, লাঞ্ছনা প্রাপ্তির কাহিনি লিপিবদ্ধ। আদিবাসী পরিবারে কেউ মারা গেলে, সেক্ষেত্রে মৃত্যু পরবর্তী কিছু লোকবিশ্বাস প্রচলিত। এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে, মানুষকে কিছুটা ভুল বুঝিয়ে গুহিরাম তার জীবিকা নির্বাহ করে এবং পরিবারের জন্য অন্নের সংস্থান করে। কালের নির্বাহ করে এবং পরিবারের জন্য অন্নের সংস্থান করে। কালের নিয়মে এবং দারিদ্র্য অনটনের কারণে গুহিরাম তার এই চিত্রকর বৃত্তির শৈল্পিক নৈপুণ্য হারিয়েছে। তাও সে অভাবের তাড়নায় এই বৃত্তি ছাড়তে পারেনি। গ্রামের কোন বাড়িতে কে মারা গেছে, এছাড়াও মৃতব্যক্তি ও মৃতের পরিবার সম্বন্ধে নানা খোঁজখবর নিয়ে সে মৃতের বাড়ি যায় এবং মড়াঘরে গিয়ে অশরীরীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা এছাড়াও আরও নানান বানানো কল্পনামিশ্রিত কিছু কথা গুহিরাম মৃতের পরিবারকে বলে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে। সেখান থেকে সে এভাবেই উপার্জন করে। কিন্তু তার এই জীবিকার যদি খবর বা মৃতের তথ্য ভুল হয় জীবন বিপন্ন। গুহিরামও ভুলবশত এক শয্যাশায়ী ব্যক্তির বাড়িতে চলে যায় এবং সে শত কাকুতি-মিনতি করলেও তাকে নিগৃহীত হতে হয়। প্রহৃত হতে হতে ও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার অভুক্ত সন্তানদের মুখ। জীবন সংগ্রামের দ্যোতনাপ্রকাশী এ ছবি অর্থ লাঞ্ছিত প্রান্তিক জীবনের করুণচিত্র ।

সৈকত রক্ষিতের ‘শবরচরিত’ গল্পে কালাপতি গ্রামের ভেলাইডাঙা জঙ্গল পরিবৃত গ্রামে সাঁওতাল, শবর জনজাতির বাস। নির্জন, আদিম ভূখন্ড যা সভ্যতার আলো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বহুক্রোশ দূরে অবস্থিত। গল্পে তাদের খাদ্য-বস্ত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে সুস্পষ্ট তাদের আর্থিক দুরাবস্থা, তাদের ঘর বা বাসস্থান জঙ্গলের ঝাঁটি, লতাপাতা দিয়ে ছাওয়া, দরজা হলো শুকনো তালপাতার আড়াল, বর্ষার দিনে তারা এই ঘরে বা বাইরে যেখানেই থাকুক তারা ভেজে। খাবার বলতে বাসি মাড়, ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ, মহুয়া, কন্দমূল, কুসুম বিচি ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকা আদিম প্রজাতি। তাদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের অবস্থা থেকে তাদের আর্থিক দুরাবস্থা, অনটন, দৈন্যতার চিত্র প্রকট। এই প্রতিকূলতাকেই ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়া সাঁওতাল-শবর মানুষদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে ভক্ত দাসের মতো পুঁজিবাদী সভ্যতার স্বার্থান্বেষী মানুষেরা। ভক্ত দাস এই সাঁওতাল-শবরদের বাসস্থান জঙ্গলের মাঝে বিশাল ব্যবসা করে। ভক্ত দাস উপজাতি মানুষদের দিয়ে জঙ্গল থেকে নানান ফল, গাছের ছাল, জংলি মূল, গ্যেঁঠালা, পাতপালহা

সংগ্রহ করিয়ে সে শহরে বহুমূল্যে বিক্রি করে। এর বিনিময়ে সাঁওতাল-শবর মানুষরা পায় দু-পয়সা কিন্তু ভক্ত বিক্রি করে পাইকারদের কাছে দু-টাকায়। এই আদিবাসী মানুষদের না জানার সুযোগে তাদের প্রাপ্য থেকে ভক্ত দাস বঞ্চিত করে। আবহমানকাল ধরেই আদিবাসীদের বঞ্চনা চিত্র, প্রতিকূলতাকে জয় করে তাদের বাঁচার আর্তি গল্পে পরিস্ফুট।

সৈকত রক্ষিতের 'ছল' গল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণার কারণে একটি সুখী দাম্পত্যে ভাঙনের চিত্র রূপায়িত। পাশাপাশি নিয়ম-নীতির, সমাজের চুক্তির দোহাই দিয়ে কিছু স্বার্থপর, লোভী মানুষদের দ্বারা নিরীহ, সহজসরল স্বগষ্ঠীর লোকেদেরই নিগৃহীত হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ। আদিবাসী সমাজে নিয়মের নামে, কীভাবে জরিমানার নামে লুট করা হয় –

> "জৈর্‌বানা? কী জৈর্‌বানা? কী দিবার ক্ষেমতা আছে হামদের?' নিরীহ ভক্তি হাঁসদা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গদাধরের দিকে।
>
> 'দিতেই হবেক!' একটা আনুমানিক হিসেব করে রামলাল জানিয়ে দেয়, 'তদের জৈর্বানা আটকুড়ি টাকা লগদ, তিনমণ ধান।'
>
> 'ধান! তার উপরি লগদ টাকাও?' কালসুলির প্রশ্ন রামলালকে, 'কথার ল্যা দিতে পারব?' 'লগদ টাকা দিতে নাই পারবি ও ঘঁসুর দে। খুঁকড়া দে। থাল-গৈরাঘটি যা আছে ঘরে স্যা গুলাই আইনে দে'।[৪৮]

সাঁওতাল গ্রামে প্রাকৃতিক কারণে ফলন ভালো না হওয়ায়, চাষের ক্ষতি হওয়া, শস্যহানির পিছনে আদিবাসী মানুষরা ভাবে এর পিছনে ভূতের কারসাজি রয়েছে। তাদের এই অযৌক্তিক বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যখন সখাবাবা তাদের বলে পূর্বদিকের গ্রামের কেউ তাদের গ্রামে এসেছে, যে এই সর্বনাশের মূলে। এই কথার প্রেক্ষিতেই গ্রামবাসী কালসুলির স্ত্রী কালিন্দীকে ডাইনি সন্দেহ করে এবং কালসুলির পরিবারকে নানাভাবে হেনস্তা করতে থাকে, জরিমানা করে। পঞ্চায়েতের নামে, জরিমানার নামে এক অসহায় দরিদ্র পরিবারকে কতটা লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় তা এই গল্পে চিত্রিত। স্বগোষ্ঠীর মানুষরাই পৈশাচিক উল্লাসবোধ করে মানুষকে নিপীড়িত করে। রামলালদের মতো মানুষরা কেবল নিজ স্বার্থে এক সুখী দাম্পত্য, সুখী গৃহকোণ

ভাঙতে দ্বিধাবোধ করে না। রামলালের কালিন্দীর প্রতি অনেকদিন ধরেই নজর ছিল, লোভ ছিল, সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, গ্রামবাসীর অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে আরও উস্কিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। গল্পে জনজাতি মানুষদের জীবনের আদ্যপ্রান্ত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজালে বন্দী, আর এই বন্দীত্ব থেকে মুক্তির কোনো আশার আলো লেখক দেখায়নি। এই অন্ধকারের সুযোগে রামলালাদের মতো মানুষরা বারবার জয়ী হয়। গল্পে একদিকে জনজাতি মানুষদের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কামায় জীবনের পাশাপাশি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সমাজে নিয়মের নামে সৃষ্ট অরাজকতা সুস্পষ্ট।

অনিল ঘড়াইয়ের 'নুনা সামাডের গল্প' গল্পের বিষয় হয়েছে- সরলতার সুযোগ নিয়ে আদিবাসী মানুষদের উচ্চবিত্ত মানুষদের ঠকিয়ে নেওয়ার কাহিনি। গল্পের প্রথমেই চিল ও শকুনের কথা বলা হয়েছে। এই চিল যেন কথকের বাবার প্রতীকী রূপ এবং শকুন নুনা সামাডের প্রতীকীরূপে ব্যঞ্জনা পেয়েছে। চিলের স্বভাব ভালো নয়, সে লোভী, হিংস্র, অন্যের জিনিস ছোঁ মেরে কেড়ে খেয়ে নেয়, ঠিক কথকের বাবা এবং কাকার ন্যায় স্বভাববর্বর, নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কথকের কাকা বাবারা মনে করে আদিবাসীরা যত মুর্খ থাকবে তত তাদের ভালোভাবে ঠকিয়ে নেওয়া যায়। সামন্তবাদী শোষণের নিষ্ঠুর মনোভাব চিত্রিত।

গ্রামের যে জমি পূর্বেই কথকের বাবা সরকারের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে দেয় কিন্তু ড্যামের কাজে জমিগুলো এখনও ব্যবহার না হওয়ায় এই জমি চাষ করে নুনা সামাড। এই জমির উপর আইনত কোনো অধিকারই কথকের পিতার না থাকলেও, নুনা সামাড যেহেতু আইনের মারপ্যাঁচ বোঝে না, তার অজ্ঞতার-সরলতার সুযোগ নিয়ে এখনও কথকের বাবা নুনা সামাডের থেকে ফসলের ভাগ নেয়, উল্টে মিথ্যা অপবাদ দেয়। নুনা সামাড ও অন্যান্য আদিবাসীদের দারিদ্র ক্লিষ্ট জীবনের কথা জানলেও তাদের প্রতি কোনো দরদী মনোভাব পোষণ না করে, অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভের কারণে। তাদের সরলতা, শিক্ষাহীনতা, দারিদ্র-নম্রতার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন এই দরিদ্র, আদিবাসী মানুষগুলোকে শোষণ ও পদদলিত করে চলা এই শহরবাসী মানুষদের আদিবাসীরা 'কমবু' অর্থাৎ 'লুটেরা' হিসাবে চিহ্নিত করে। এই গল্পে শহরবাসী ভোগী, লোভী, স্বার্থপর মানুষ যারা অন্যায়ভাবে অন্যের জিনিস লুটে নেয়, তার প্রতিভূ রূপে চিল প্রতীকি মূর্ত। আবহমানকাল ধরে এই আদিবাসী, প্রান্তিক মানুষদের উপর অন্যায়-অত্যাচার হয়ে আসছে তারই বাস্তব চিত্র গল্পে লিপিবদ্ধ।

অনিল ঘড়াইয়ের 'অরণ্যের জীবন' গল্পের বিষয় হয়েছে আদিবাসী মানুষদের গভীর অরণ্যে বিপদসঙ্কুল জীবনযাপন এবং সন্তানহারা বাবা-মা'র আর্তি। গল্পে দেখা যায়, সোমরা হাঁড়িয়া বানায় এবং এ বিষয়ে তার যথেষ্ট পসার। সোমরার কাজে সাহায্য করে তার স্ত্রী গুরুবারি। বাড়িতেই হাঁড়িয়া বানানোয়, তাদের বাড়িতে সর্বদাই মহুয়া মজুর থাকে। এই মহুয়ার মদিরা গন্ধের আকর্ষণে অরণ্যের ভাল্লুক, হাতি প্রায় তাদের বাড়িতে হানা দিত। এহেন বিপদকে মাথায় নিয়ে তাদের জীবন ও জীবিকা। কখনও বুনো হাতির তান্ডবে ফসল নষ্ট হয়, কখনও ঘর। কেবল বন্যপ্রাণী নয়, সভ্যসমাজের অর্থলোলুপ, স্বার্থান্বেষী, লোভী মানুষদের থাবা থেকেও এই অরণ্য ও অরণ্যের গহনে বসবাসকারী মানুষগুলো রেহাই পায় না। অরণ্যের সন্তানরাই সামান্য ফল মূলটুকু পায় না, সভ্যসমাজ তাদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে।

এই গভীর অরণ্যে বসবাসকারী গুরুবারি ও সোমরার জীবনে একদিন অতর্কিতে বুনো হাতির আক্রমণে নেমে আসে বিপর্যয়, তারা তাদের বহুকাঙ্খিত একমাত্র সন্তান তিন বছরের মানুয়াকে হারিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে যায়। এই সন্তানশোকে সোমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না, সে কেবল তার সন্তানের হত্যাকারী হাতিকে প্রাণে মারতে চায়। গল্পে মূলত দারিদ্রক্লিষ্ট, বঞ্চিত, অসহায় অরণ্যবাসী সমাজের প্রান্তিক মানুষদের বিপন্ন জীবন চিত্রায়িত। এই খরায় পোড়া রুক্ষ জীবনে ট্র্যাজেডির পাশাপাশি গল্পে পশুর সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্কও চিত্রিত। গল্পের পরিণতিতে দেখা যায়, যে হাতিটি মানুয়াকে হত্যা করে, সে যেন তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় নতমস্তকে গুরুবারি ও সোমবার কাছে ক্ষমা চায়। গুরুবারির প্রাণ বাঁচিয়ে সে যেন তার পূর্বকৃত কাজের প্রায়শ্চিত্ত করে। এক অবলা প্রাণীর এরূপ সচেতন, মানবিক আবেদন এবং সোমরার ক্রোধ জলে ধুয়ে যাওয়া যেন দীর্ঘদিনের অপরাধবোধ, ক্রোধ ধুয়ে যাওয়া এই গল্পে অরণ্য ও অরণ্য সন্তানদের আত্মিক সম্পর্ক এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষদের বিপদকে মাথায় নিয়ে তাদের জীবনযাপন চিত্রিত।

সর্বোপরি আলোচনার পর দেখা যাচ্ছে প্রান্তিক জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলির পটভূমি ও বিষয় বৈচিত্র্যময়। গল্পগুলি আলোচনায় দেখা যায়, প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত জীবনচর্যার পাশাপাশি তাদের আদিম বিশ্বাস-সংস্কার অতীতের কিংবদন্তি চলমান কালের সঙ্গে যৌগিক মিশ্রণে সম্পৃক্ত।

তথ্যসূত্র-

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বিভূতিভূষণ, *গল্পসমগ্র ২*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বাদশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪২৭, পৃ. ২৯৪

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮১

৩ .ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩১৬

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ২৭৫

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪

৬. চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৯

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৮. চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৬৭

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩

১১.বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র ১,* কলকাতা: মৌসুমি প্রকাশনী, বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৯৫

১২. রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪২৭, পৃ. ২৭৭

১৩. সেন, অভিজিৎ, *সেরা ৫০ টি গল্প* , কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৩৬৯

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সেরা ৫০ টি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২১৬

১৫. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ১৬৬

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০

১৮. ঘড়াই, অনিল, *সেরা ৫০ টি গল্প,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশার্স, মে ২০১৪, পৃ. ১৪৮

১৯. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৪২৪, পৃ. ২৬৩

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস, শ্রী সবিতেন্দ্র রায়, শ্রী মনীশ চক্রবর্তী (সম্পা.), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ৬২০

২২. বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র ১,* কলকাতা: মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৫২৭

২৩. বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: মৌসুমি প্রকাশনী, রথযাত্রা: জুলাই ৫, পৃ. ৩৭০

২৪. রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪২৭, পৃ. ২৪৯

২৫. চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৯৭

২৬. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দশম খণ্ড* , কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৩, পৃ. ৫৬১

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১

২৮. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৫২

২৯. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা* (সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ), কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ৩৭

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৭

৩১. Ranger, Rabekh and Paul Fedoroff, *Commentary: Zoophilia and the law, the journal of the American Academy of psychiatry and the law*, online December 2014

৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়,তপন, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪২১, পৃ. ১০১

৩৩. রায়, অসীম, *গল্পসমগ্র*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ১০৩

৩৪. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, চতুর্দশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৪০২

৩৫. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র ২*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ৯

৩৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *গল্পসমগ্র*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ২৯০

৩৭. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র একাদশ খণ্ড*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৪১০, পৃ.২১৩

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

৪০. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ত্রয়োদশ খণ্ড*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১২

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩

৪৪. মিশ্র, ভগীরথ, *আমার একান্নটি গল্প*, কলকাতা: ফার্মা. কে. এল. মুখোপাধ্যায়, আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৩০৬

৪৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৪২১, পৃ. ৭

৪৬. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা* (সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ), কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ৭

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

গল্পে প্রান্তিক ও জনজাতি চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ

বাংলা কথাসাহিত্যে, সে ছোটগল্পই হোক কী উপন্যাস, চরিত্রচিত্রণ ও মানবমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কত শত ভিন্ন মনমর্জির মানুষ বাংলা ছোটগল্পের চরিত্রচিত্রশালাকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে স্বতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পের প্রান্তিক জনজাতি চরিত্রগুলি মানবজীবনের অপার রহস্যচেতনায় মুখর। মানবজীবনকেন্দ্রিক সত্যের সন্ধানে এবং বিশ্বাসযোগ্য জীবনকেন্দ্রিক সত্যের রূপাবয়ব নির্মাণে মানবজীবনের অন্দরমহল এক ও অদ্বিতীয় উপকরণ। মানবিক সম্পর্ক অর্থেই- *The social and interpersonal relations between human beings,* অর্থাৎ সম্পর্ক কেবল মানবতাবাদের কোনো তত্ত্ব-সমীকরণ দ্বারা বিচার্য বস্তু নয়। মানবিক সম্পর্কের বিচিত্রতা এবং সম্পর্কের সমীকরণ অনেক বৃহৎ ও প্রসারিত। জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলেই ব্যক্তিমানুষের সংশয়, উপজাতি মানুষগুলির জীবনের স্বভাব-স্বরূপ ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকতার নানান স্তর ফুটে ওঠে। লেখকরা তাঁদের গল্পে চরিত্রগুলিকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন? এই বিষয়টি বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য। গল্পে চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে সমাজের, মানুষের নানা যে স্বর ব্যক্ত হয়, সেখানে লেখকের কোন ভাবনা প্রতীয়মান এবং সেই চরিত্রচিত্রণে স্রষ্টার মনোভাব কতটা ধরা পড়েছে, আবার কোথায় স্রষ্টার মনোভাবকে উপেক্ষা করেই চরিত্ররা তাদের স্বাতন্ত্র্যে উন্মুখ, তা খুঁজে দেখার পাশাপাশি চরিত্রগুলির উপস্থিতি, তারা কতটা শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার, প্রতিবাদী, এর পাশাপাশি চরিত্রগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক স্তরীয় বিন্যাস গল্পে ধরা পড়েছে, এই অধ্যায়ে মূলত তারই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানী ও তাঁদের মনস্তত্ত্বের রূপরেখা:

মন ব্যতীত মানবজীবন কখনও হতে পারে না কারণ- মন কখনই মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থান, সমাজ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সাহিত্যে চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে তাই মনোবিশ্লেষণ তাদের জীবনচর্যায় আবশ্যক। আমাদের গবেষণাপত্রে নির্বাচিত ছোটগল্পকার ও তাঁদের প্রান্তিক জনজাতি জীবনকেন্দ্রিক ছোটগল্পে যেমন একদিকে উঠে এসেছে আদিবাসীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনচর্যা, রাজনৈতিক অবস্থান, তেমনই তাঁদের সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে মানবমনের জটিলতা, মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্য। চরিত্রের বা ব্যক্তিমনের মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্য বা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পূর্বে কিছু মনোবিজ্ঞানীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয় ধারণা আলোচনা আবশ্যক। বর্তমান অধ্যায়ের মনোবিজ্ঞানীদের মনোবিদ্যা, তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপের

রূপরেখা নির্মাণ এবং গল্পে প্রান্তিক, জনজাতি চরিত্রচিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *পাভলভ পরিচিতি* গ্রন্থটির কাছে আমি ঋণী।

সাধারণত মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে প্রথমেই সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর নামই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, এছাড়াও আইভন পাভলভ, এডলার, ইয়ুং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের এবং দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের মতামত আলোচনা করা হল। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মানবমনের তিনটি অবস্থার কথা বলেছেন— অবচেতন (*subconscious*), প্রাক্-চেতন (*un-conscious*) এবং চেতন (*conscious*)। এই তিন অবস্থার আবার তিন প্রক্রিয়া আছে- ইদ্, ইগো, সুপার ইগো। ইদ্– সহজ প্রবৃত্তির আদিম বিদ্রোহীভাব যা নির্জ্জান মন যার সঙ্গে বাইরের সমাজের সম্পর্ক নেই। লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং ব্যক্তির প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে শক্তি জোগায়। মানুষের ব্যক্তিজীবনে নানারকমের চাহিদা-প্রবণতা আসে, কিন্তু সামাজিক বা ব্যক্তিগত নানান কারণে মানুষ তার চাহিদা সবসময় পূরণ করতে পারে না। এই অপূর্ণ অবদমিত ও জন্মগত মানুষের চাহিদা-আকাঙ্ক্ষাগুলো অবচেতন মনে এসে জমা হয়। ইদ্ হচ্ছে মানুষের নগ্ন কামনা-বাসনার প্রতিচ্ছবি। এখানে মানুষ ও পশু স্বভাবগতভাবে এক। ইদ্ সবসময় সুখভোগের নীতি অনুসরণ করে। ইদ্ তার কোনো ইচ্ছা সরাসরি পূরণ করতে পারে না, তাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজন ইগো বা অহম্-এর। ইগো পরিচালিত বাস্তব যুক্তি, বুদ্ধি ও নীতির দ্বারা। এই ইগো বা অহম্ই ঠিক করে দেয় মানুষের ব্যক্তিত্ব। সুপার ইগো নামক ফ্রয়েড আর এক উচ্চ মানসিক স্তরের কথা বলেছেন— সেই সুপার ইগো ব্যক্তির অতি শৈশবেই জন্ম হয়। ইগো বা অহমের উপর কন্ট্রোল করে এই সুপার ইগো। এই সুপার ইগো যুক্তিপূর্ণ স্তরের নৈতিকতা হিসেবে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ তা বলে দেয়। সুপার ইগো পুরানো বিবেকের পোশাকি নাম। সুপার ইগো নৈতিকজ্ঞানের আধার হিসেবে ইদ্-এর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে নির্জ্জান স্তরে দমন করতে ইগোকে সাহায্য করে। এই সুপার ইগোর আছে দুটি অংশ— একটি উচিত-অনুচিত বোধ ও দ্বিতীয়টি হল বিবেক।

ফ্রয়েডের মতে, আমাদের জীবনের যাবতীয় ইচ্ছা, চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের মূলে রয়েছে যৌন প্রবৃত্তি বা *Libido*। অতৃপ্ত যৌন চাহিদা বা অপূর্ণ যৌন আকাঙ্ক্ষাই হল মানসিক বিকারের মূল কারণ। ফ্রয়েডের দুই শিষ্য মনোবিজ্ঞানী এ্যাডলার এবং মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং। মানুষের মনের যাবতীয় ক্রিয়া হল কামজ— ফ্রয়েডের এই মতবাদ থেকে একটু ভিন্ন মত পোষণ করে ইয়ুং, *Libido* বা কাম সম্পর্কে

তিনি মনে করেন, এটা কেবল যৌন আকাঙ্ক্ষা নয়, *Libido* হল ব্যক্তির সকল প্রকার প্রচেষ্টার মূল শক্তি। ফ্রয়েডের মতানুসারে মানুষ অন্তর্মুখী ও আত্মসর্বস্বকেন্দ্রিক, কিন্তু এ্যাডলারের মতে মানুষ বস্তুনিষ্ঠ ও বহির্মুখী।

ইদম্, অহং এবং পরাহং— এই তিনের টানাপোড়েনে মানুষের মনের নগ্ন প্রবৃত্তি থেকে অহংকে রক্ষার জন্য আমাদের বিবেক বা সুপার-ইগো (পরাহং) প্রাচীর রচনা করে। অর্থাৎ কামবাসনার অবদমনই মানুষের আচরণ ও মনের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে ফ্রয়েডের মতামত। একেই বলে 'লিবিডো'। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব অনুসারে আমরা কাম ও মৃত্যু প্রবৃত্তির সঙ্গে নিয়ত লড়ে চলেছি। ফ্রয়েডের মতবাদানুসারে কাম একমাত্র যৌনকেন্দ্রিক, মানুষ ও পশুকে একই গোত্রে সামিল করা এই বিষয়গুলো ফ্রয়েডের দুই শিষ্য ইয়ুং ও এডলার স্বীকার করেননি। ইয়ুং কামকে কেবল যৌনকেন্দ্রিক অর্থের বাইরে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন।

ফ্রয়েডের মতে মানুষ নির্জ্ঞানস্থিত অবদমিত জৈবশক্তির হাতের ক্রীড়ানক। তাঁর এই মতবাদ ব্যবহারবাদী স্কিনার, মানবতাবাদী রজার্স স্বীকার করে নিলেও সাধারণ মানুষ তা মেনে নেয় না। ভাববাদীরা মনে করেন মনের ধর্ম মননক্রিয়া। বস্তুবাদী পাভলভ মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মতবাদকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের যাবতীয় শিক্ষা কার্যসাপেক্ষ পরাবর্ত ক্রিয়ার ফলে অনুষ্ঠিত। পরিবেশ যেমন মানুষকে প্রভাবিত করে তেমনই মানুষও প্রয়োজনানুসারে পূর্ব পরিকল্পনা মত পরিবেশকে প্রভাবিত করে। ভাববাদীরা মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে চায়নি। পাভলভ মনে করেন মানুষের মানসিকতা কার্যকারণ সম্পৃক্ত, স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর এবং বস্তুর জটিলতম বিন্যাস মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পাভলভ মস্তিষ্ক ও মনকে এবং মানুষের পারিপার্শ্বিক সমাজ-পরিবেশকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড ও পাভলভের মতামত অনেক আলাদা। পাভলভ মনে করেন, মানবচৈতন্য পশুর চৈতন্য অপেক্ষা উন্নত এবং মানুষের ভাষাভিত্তিক চিন্তার সাহায্যে, মানুষ তার চিন্তা ও যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে। ফ্রয়েড যেখানে মস্তিষ্ককে গুরুত্বহীন মনে করেন, পাভলভ সেখানে মস্তিষ্ককে গুরুত্ব দেয়। পাভলভ নিমিত্তবাদী এবং তিনি 'পরাবর্তভিত্তিক মনোবিদ্যা' ধারণা গড়ে তোলেন। ফ্রয়েডের লিবিডোভিত্তিক ধারণা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি। লিবিডোভিত্তিক ধারণার পাশাপাশি পাভলভের এই পরাবর্তভিত্তিক ধারণার আলোচনাও দরকার। মানবশিশু দুটি শর্তহীন পরাবর্ত নিয়ে

জন্মগ্রহণ করে— প্রথমত, আত্মরক্ষামূলক ও দ্বিতীয়ত প্রজাতি সংরক্ষণ পরাবর্ত। আত্মরক্ষামূলক পরাবর্তক্রিয়া মানুষের জন্ম থেকেই সহজাত ধর্ম। শৈশবে পিতামাতার এবং শিশুর উপর পারিবারিক প্রভাব, শৈশব যৌনতা সম্পর্কীয় ধারণা বুঝতে শৈশবে শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কেও আলোচনা প্রাসঙ্গিক। পাভলভের মতে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক কীরূপ হবে তা নির্ভর করে সমাজের কোনধরনের উদ্দীপক পিতামাতা সন্তানকে প্রভাবিত ও শর্তায়িত করছে তার ওপর, যে সম্পর্ক সহজ কামজ প্রবৃত্তি।

পাভলভের মতো অন্য বস্তুবাদী মনস্তত্ত্ববিদরাও বলেন, পলায়নী প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে বদলাবার প্রয়াসই সব মানুষের কর্তব্য। ফ্রয়েড মনে করেন সামাজিক নানাবিধ নিষেধের কারণে, সমাজের কারণে, সহজ প্রবৃত্তির অবদমন ঘটিয়ে মানবমন অসুস্থ হয়ে যায়। আমরা প্রতিনিয়ত কাম ও মৃত্যু প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছি। সেই সংগ্রামে হেরে গিয়ে, সমাজ যে আমাদের নির্জ্ঞান প্রবৃত্তিকে অবদমনের চেষ্টা করছে বলে আমরা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছি। ফ্রয়েড মনে করেন সভ্য সমাজের ব্যক্তিমাত্রই কমবেশি নিউরোটিক রোগে আক্রান্ত। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ অনেকটা অনুমাননির্ভর। সহজাত প্রবৃত্তিকে অবদমনের মধ্য দিয়ে সমাজের কারণে মানুষ মনোবিকারগ্রস্ত— একথা কেউই মানতে চায়নি। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড ও পাভলভ উভয়ের মতামত, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, ধারণা অনেক পৃথক এবং বৈপরীত্যময়। সেসব নিয়ে এখানে বিশেষ আলোচনা করা হল না।

ফ্রয়েড, পাভলভ, ইয়ুং, এডলার, স্কিনার, রজার প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী ছাড়াও ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের যুগসংকটের ঘূর্ণিপাকে 'অস্তিত্ববাদী' দর্শন গুরুত্বপূর্ণ। অনেক গল্পেই দার্শনিক সার্ত্রে প্রবর্তিত 'অস্তিত্ববাদী' দর্শনের ভাবধারা পাওয়া যায়। এই দর্শনের মূল কথা— অস্তিত্বের সংকট। অস্তিত্বের এই সমস্যা বা সংকটকে অস্তিত্ববাদীরা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না। জীবন যেখানে গভীর সংকটে আবদ্ধ, যখন সেখান থেকে উত্তরণের ক্ষীণ আশাও বিলীন হয়ে যায় তখনই দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। এই সংকট থেকে মুক্তির আশা, স্বপ্নই হল 'ইউটোপিয়া'। কিন্তু জীবনযন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের কাছে যখন এই ইউটোপিয়ার সত্য প্রতীতি লাভ করে না, তখন মানুষের মনে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, অস্তিত্বের তীব্র সংকট তৈরি হয়। মনের এই নিঃসঙ্গতায় আনন্দানুভূতির থেকে বিষাদময়তা গুরুত্ব লাভ করে।

ব্যবহারবাদী স্কিনার, ওয়াটসন মনে করেন, মানবমন ও মানবচরিত্র নিষ্ক্রিয় কাদার তালের ন্যায়, তাকে ছাঁচে ফেলে গড়ে নেওয়া যায়। মানুষের নিজস্ব স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য নেই। ফ্রয়েডও যেমন মানুষের আচরণ যুক্তিহীন মনে করেন তেমনই স্কিনারের মতেও ব্যক্তিমানুষ মাত্রই যন্ত্রবিশেষ। ওয়াটসনও মনে করেন মানুষের মননক্রিয়া একধরনের ব্যবহার। ব্যবহারকারীরা মস্তিষ্ককে গুরুত্ব দিতে চায় না।

মানবমনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ফ্রয়েড মনে করতেন আমাদের মনের শক্তি কেবল জীবনমুখী। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখার পর তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান আমাদের মনের মধ্যে দুটো পরস্পরবিরোধী শক্তি কাজ করে- একটি জীবনমুখী *(Eros)*, অপরটি মৃত্যুমুখী *(Thanatos)*।[১] মনের এই জীবনমুখী শক্তির প্রকাশ ঘটে দুটি প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে— আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি। আমাদের সব কাজের মধ্যে, ভালোবাসার মধ্যেও এই দুই প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে। লিবিডোর প্রকাশ ভালোবাসায় আর ভালোবাসার মূলে আছে জীবনমুখী প্রবৃত্তির অন্তর্গত আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি। মৃত্যুমুখী যে মানসিক শক্তি মানুষের মনের মধ্যে আছে ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন 'থ্যানাটস্'। এই থ্যানাটস্ দুরকমের হতে পারে— এক আত্মঘাতী এবং দ্বিতীয় পরঘাতী। আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মহত্যা, জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলা। পরঘাতী অর্থাৎ হত্যা, অন্যকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা। আত্মহত্যার কামনা ও আত্মরক্ষার কামনা দুটি বিপরীত কামনার মধ্যে দ্বন্দ্ব। জুর্কাহাইম এই আত্মহত্যার ক্ষেত্রে তিনটি ধরনের কথা বলেছেন— 'ইগোইস্টিক', 'অলট্রইস্টিক' বা 'পরার্থবাদী', 'অনন্বয়বাদী'।[২] তবে কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ শর্তের উপর আত্মহত্যা-প্রবণতা নির্ভরশীল নয়, সমাজ পরিবেশগত কারণে, অর্থনৈতিক কারণে, মানসিক নানা কারণে মানুষ আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়। গল্পের চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনোবিজ্ঞানীদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক মতবাদ স্বল্প আলোচনায় দেখানো হল।

আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী গল্পে আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ

মনকে বাদ দিয়ে একটা মানুষকে, তার চরিত্রকে বোঝা যায় না। মন কখনো মানুষের সমাজ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। মানুষের বিকাশ-বিস্তার, মানুষকে জানার আগ্রহ বিগত কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে। চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), কার্ল মার্ক্স, ফেড্রিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫), সিগমুণ্ড

ফ্রয়েড প্রমুখ চিন্তানায়করা মানুষের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। ডারউইন মানুষের বিবর্তনের পথের সন্ধান করেছেন, মার্ক্স মূলত সামাজিক বিন্যাস, পরিকাঠামোর উপর গুরত্ব দিয়েছেন, ফ্রয়েড সামাজিক বিন্যাসের পাশাপাশি ব্যক্তিমানুষের মন, সম্পর্কের দিকে গুরত্ব দিয়েছেন। এই ধারাগুলি পরস্পরের পরিপূরক।

গল্পে চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ- এই আলোচনায় জনজাতিকেন্দ্রিক গল্পগুলির চরিত্র আলোচনার মাধ্যমে বিচিত্র মননের অধিকারী প্রান্তিক আদিবাসী চরিত্রের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য। মনঃসমীক্ষণ বা সাইকো-অ্যানালিসিস এর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সাহিত্য এবং মনঃসমীক্ষণ— উভয়েরই লক্ষ্য মানবমনের অভীপ্সা পর্যবেক্ষণ এবং মনের গভীর প্রকোষ্ঠে চলা আকাঙ্ক্ষা, রহস্যের বিশ্লেষণ করা। তবে একজন শিল্পীর পর্যবেক্ষণের যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং এক মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি তা আলাদা। শিল্পের ক্ষেত্র কেবল ব্যক্তির মানসিকতাতে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সেই ব্যক্তিমানুষের যোগাযোগের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা সাহিত্য-শিল্পের ধর্ম। মনঃসমীক্ষণ কেবল মানুষের উপলব্ধি-অনুভব নয়, মনের গহনে থাকা রহস্যের উন্মোচন এবং কল্পনাবোধকে বিশ্লেষণ করে। সাহিত্যিক সাধারণ মানুষকে কেবল সাধারণভাবে নয়, অনেক গভীরভাবে মানুষের ব্যবহার, তার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। সাহিত্যে সেই পর্যবেক্ষণের যথাযথ রূপচিত্রণের মাধ্যমে মানবমনের নির্জ্ঞানের স্বরূপটি শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই মনঃসমীক্ষণ, মানসিক সমস্যা বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতির উদ্ভব হয়। একটা চরিত্রের শৈল্পিক রূপের বিকাশ ঘটে সেই চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কথাসাহিত্যে মানুষের চরিত্রচিত্রণে যেমন মনস্তত্ত্বের ব্যবহার আবশ্যক তেমনই মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও জীবনচর্যার খুঁটিনাটি অপরিহার্য। সাহিত্যের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান উপাদান- মানবচরিত্র এবং সেই চরিত্রের মনোজগতে একজন মানুষ তার চিন্তাভাবনা এবং বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত হয়। সেই মনোজগৎ অত্যন্ত জটিল এবং নানা স্তরীয় বিন্যাসে বিভক্ত। মনের চেতনার যে অংশ প্রকাশিত তা দিয়েই অপ্রকাশ্য অনেক কথা অনুমান করে নিতে হয়। মানবমনের চেতন এবং অবচেতন এই দুই অংশ নিয়েই মনস্তত্ত্ব। মনস্তত্ত্ব হল মানুষের বাস্তব আচরণ এবং মানুষের অন্দরে হওয়া ভাবনা-ক্রিয়াকলাপ, অনুভূতি।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ— এই মূল আলোচনার পূর্বে মন ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে দু-এক কথা বলতেই হয়। প্রাচীনকালে গ্রিক সাহিত্যে মন ও আত্মাকে এক ও অভিন্ন হিসাবে গণ্য করা

হলেও প্রাচ্য সাহিত্যে মন ও আত্মা পৃথক হিসেবে বিবেচ্য। দর্শনে মন ও আত্মা নিয়ে বহুমত, তর্ক-বিতর্ক আছে। মন সম্পর্কে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো বলেন মন ও মানুষের দেহ এক ও অবিচ্ছিন্ন সত্তা। আধুনিক যুগে স্নায়ুবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান বিকাশের পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানেরও বিকাশ ঘটে। সমাজ, জীবনদর্শন সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান সমাজের সামনে, আমাদের সামনে মানুষের অবচেতন মনের গহনে চলা কর্মধারার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে। মানুষ কিছু জৈবিক আবেগ-প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ তার নিজের অন্তরের গহনে চলা ভাবনা নিজে সবসময় সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে যেমন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে হয়, সাহিত্যেও লেখক তার কলমে মানবমনের নির্জ্ঞানস্থিত প্রকোষ্ঠকে শৈল্পিকগুণে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছেন। জীবনের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত বহু চরিত্রের ছন্নছাড়া মিছিল, মানুষের মনোজগতের অন্দরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনার স্তর, মানবমনের রহস্য একটি চরিত্রকে কতটা জীবন্ত করে তুলেছে এবং জীবনের তল আবিষ্কারের পথ নিম্নে আলোচনা করা হল।

'বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)'- শীর্ষক গবেষণাপত্রে আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ' গল্পে সিঁদুরচরণ ও কাতু চরিত্রের প্রেম ও সিঁদুরচরণের ভ্রমণকাহিনি বর্ণিত। এছাড়া আদিবাসী মানুষগুলো বাংলায় এসে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে বাংলার হিন্দুসংস্কৃতিকে নিজস্ব সংস্কৃতি বানানোর তথ্য পাওয়া যায়। সিঁদুরচরণ ও কাতু সামাজিক প্রথানুযায়ী বিবাহিত নয় এবং সিঁদুরচরণের থেকে কাতু বয়েসে বড়ো। তারা থাকে স্বামী-স্ত্রীর মতো, খেয়াল রাখে ভালোমন্দ একে-অপরের। অন্য আরও পাঁচটা সম্পর্ক থেকে আলাদা এক সম্পর্ক, ভিন্ন এক দাম্পত্যের ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ। বর্তমানের 'লিভ ইন্' সম্পর্কের মতো আধুনিক ভাবনা লেখক তাঁর লেখায় সমাজের চোখে প্রান্তিক এই মানুষগুলোর প্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন।

সিঁদুরচরণ ও কাতু দুজনেই নিজেদের টান-ভালোবাসা গভীরভাবে উপলব্ধি করে একে অপরের থেকে দূরে থাকে। দূরত্বই যেন তাদের ভালোবাসা বাড়িয়েছে, সম্পর্কে গভীরতা এনেছে। হাজারো প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও কাতু একবারও সিঁদুরচরণকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি। সিঁদুরচরণও দিনশেষে, সব

কাজে কাতুকে মনে করেছে। গল্পে সিঁদুরচরণ ও কাতু পারস্পরিক বিশ্বাস-ভরসা, ভালোবাসায় উজ্জ্বল দুই চরিত্র।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিকারী' গল্পের জংলী দেহাতি বালক মাগনিরাম চরিত্রটি আলোচনা করা হল। মাগনিরাম সাঁওতাল গোষ্ঠীর ছেলে। মাগনিরাম ম্যালেরিয়ার জ্বরের প্রকোপে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার জীর্ণতা, অক্ষমতা, অন্যান্য আদিবাসী পুরুষের ন্যায় বলবান না হওয়ার হীনমন্যতাবোধে মাগনিরাম চরিত্রটি অসহায়তার দ্যোতনা সৃষ্টি করে।

মাগনিরাম শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হলেও, তার চরিত্রে কবিতা বানানোর, গান বাঁধার প্রতিভা রয়েছে। সে কান্দালতার নীল ফুল ছুঁতে চায়, সে সন্তান হিসাবে চায় তার বাবা যেন তাকে নিয়ে গর্ববোধ করে, সে বাবার মনে সুখ দিতে চায়, তার এই স্বপ্নই তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা পায়। তার হীনমন্যতাবোধের কারণে সে যখন বুধন সাঁওতালকে দেখে যে সে বাঘ-হাতি মেরেছে, মাগনি ঠিক সেরকম 'মরদ' হতে চায়। সে তার বাবার সুযোগ্য পুত্র হতে চায়, বাবাকে খুশি করতে চায়। তার অক্ষমতা, অসহায়তা, দুর্বলতা, সকলের উপহাস; তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কারণে মাগনিরাম হীনমন্যতাবোধে ভুগতে থাকে। সে ভাবে তার পিতার সে সুযোগ্য সন্তান নয়। কেবলমাত্র বাবাকে আনন্দ দিতে, আকস্মিক উত্তেজনার বশে সে একা পাগলা হাতি মারতে বনে চলে যায়। তাৎক্ষণিক উদ্দীপক দ্বারা পরিচালিত হয়ে মাগনিরাম এক হঠকারী কাজ করে বসে, এর পরিণামে মাগনিরামের জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজেডির বিষণ্ণতা। মাগনিরাম তার রক্তাক্ত, থেঁতলানো মৃতদেহ দিয়ে সে তার বাবার মনে আনন্দ-গর্ববোধ দিয়ে গেল, কিন্তু এই একশো টাকার আনন্দ সুখের নয়, পিতার কাছে তা নিদারুণ পুত্রশোক। গল্পে আদিবাসী ষোলো বছরের মাগনিরাম চরিত্রটি শারীরিক অসুস্থতার কারণে অসহায়তা, হীনমন্যতাবোধ থেকে নিজের জীবনে ট্র্যাজিক পরিণতি নামিয়ে আনে। সবকিছুর ঊর্ধ্বে এক পুত্রের নিজের জীবন বিপন্ন করে পিতার মনে আনন্দ দেওয়ার ইচ্ছা মাগনিরাম চরিত্রে এক অন্য মাত্রা আনে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' গল্পের রঘুনাথ দাস কবির চরিত্র অবলম্বনে জনজাতি চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল। সিংভূম জেলায় পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গলে ঘেরা বন্যদেশে বর্বরদের গ্রামে অর্থাৎ আদিবাসী গ্রামে রঘুনাথ দাসের মতো ব্যক্তিত্ব বিরল। শহুরে সাধারণ

মানুষদের কাছে তা বড়ই অসংগত। আদিবাসী মানেই আধুনিক শহুরে সমাজের কাছে তারা বুনো, জংলী। এইরকম জনশূন্য জায়গায় সংসারের কোলাহল থেকে দূরে রঘুনাথ দাসের জীবনযাপন বড়ই অভাবনীয়। রঘুনাথ দাস সরল, সাধাসিধে, আড়ম্বরহীন, উদারমনস্ক, বিনয়ী মানুষ। সে জ্ঞানী, আর জ্ঞানই মানুষকে বিনয়ী হতে শেখায়। সে রামায়ণ, মহাভারত, সিংভূম রাজবংশের ইতিহাস, সাঁওতালি গ্রন্থ পড়ে, কবিতা, গান লেখে। এর থেকে বোঝা যায় রঘুনাথ শিক্ষিত, তার মধ্যে সাহিত্যের জ্ঞান-অনুশীলন আছে। রঘুনাথ দাস আদিবাসীদের জন্য টুসু গান লেখে, টুসু পরবের সময় তার ত্রিশ টাকার বই বিক্রি হয় তাতেই তার সারাবছর চলে যায়। রঘুনাথের মধ্যে জ্ঞানের গরিমা নেই, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, বিনয়ীভাব, আতিথেয়তার সুহৃদ মনোভাব রঘুনাথ চরিত্রটিকে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ রূপে প্রতিষ্ঠা করে।

রঘুনাথের স্ত্রীর সঙ্গে রঘুনাথের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সরল, সুন্দর তা স্পষ্ট। এই দম্পতির চাহিদা নিতান্তই সামান্য, বলা চলে জীবন থেকে যেন তাদের চাহিদাই নেই। তাদের জীবন অনাড়ম্বর হলেও তাদের মন একদম খাঁটি। ছায়ানিবিড় প্রকৃতির কোলেই প্রাচীন ভারতবর্ষের কবিগণ তাঁদের শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন, যেমন- মহাকবি কালিদাসও (চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী) এরকমই প্রকৃতির কোলেই *কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর মতো সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করেছিলেন। প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির মানুষ, প্রকৃতির কবি তার জীবনচর্যা, জ্ঞান, বিনয়ী মন এই সবকিছুই রঘুনাথ চরিত্রটিকে অনন্য, নান্দনিক করে তোলে।

জনজাতি চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ আলোচনায় যেসমস্ত আদিবাসী নারীচরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে হবে, তা থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোতাম' গল্পের হো গোষ্ঠীর রমণী এলিশাবা কুই ওরফে চম্পু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আলাদা এক আদিবাসী নারীচরিত্র। এলিশাবা কুই বা চম্পু রাজনীতি সচেতন এক আদিবাসী নারী, যে স্বাধীন পালামৌ আদিবাসী কংগ্রেস গর্ভমেন্টের প্রেসিডেন্ট। সে আদিবাসী মানুষদের মধ্যে বিরলতম নারী চরিত্র, তার রাজনীতিবোধ, তার ব্যক্তিত্ব তাকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এলিশাবার চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে একদিকে তার সচেতন ও প্রতিবাদী রাজনীতি সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে নেত্রীসত্তার পাশাপাশি সাহসী, সহানুভূতিশীল মনোভাব ও নারীসুলভ কোমলতা প্রস্ফুটিত।

এলিশাবা কুই যখন চম্পু হো হিসাবে কুলি-কামিনের কাজ করত তখন কথক অসুস্থ হলে সে সেবা-শুশ্রুষা করে কথককে সুস্থ করে তোলে। পরম মমতাময়ী, স্নেহশীলা, সহানুভূতিপূর্ণ এক নারীহৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে খ্রিস্টান মিশনারি দ্বারা শিক্ষিত হয়ে সে তৎকালীন সময়ের এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। এই গল্পে এলিশাবা চরিত্রটি মিশনারিদের আদিবাসীস্বার্থে করা কাজের ইতিবাচক রূপ। এক বন্য গ্রামের অশিক্ষিত কুলিকামিন শ্রমিক থেকে স্বাধীন গর্ভমেন্টের আদিবাসী নেত্রী হওয়ার পথ, যে উত্তরণ তা এলিশাবা ওরফে চম্পুর আত্মপ্রত্যয়, সাহসী, দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় বহন করে। এলিশাবা কেবল রাজনীতিবিদ নয়, তার চরিত্রে যে চম্পুর নারীসুলভ কোমলতা, স্নেহপরায়ণতার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এবং কেবল চারটি বোতামের বদলে নিঃস্বার্থভাবে অচেনা মানুষকে সেবা, চম্পু ওরফে এলিশাবা চরিত্রটিকে বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তোলে।

জনজাতি জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পের চরিত্রচিত্রণ এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বেদের মেয়ে’ গল্পের বেদিয়া রমণী শিবি চরিত্রটি আলোচনা করা হল। শিবি বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসে, বৈপরীত্যে-বৈসাদৃশ্যে জীবন্ত রেখায় চিত্রিত এক নারী। মানুষের মন বড়ই জটিল তা শিবি চরিত্রেও লক্ষণীয়। বেদিয়া নারী শিবি তার প্রথম যৌবনে গুপ্ত বংশের ছেলে প্রভাতকে প্রথম দেখে ও তার প্রতি অনুরাগ, আকর্ষণ বোধ, এক অদ্ভুত ভালোলাগার বোধ তৈরি হয়। শিবি প্রভাতের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে প্রভাত কেঁদে ফেলে, এক্ষেত্রে শিবির মনে প্রভাতের জন্য সহানুভূতি জাগে, দুঃখ লাগে। তার সাত-আট বছর পর শিবির ভোলার সঙ্গে বিবাহ হয় এবং শিবি তার স্বামী অন্তঃপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক দুরাবস্থার কারণে শিবিকে বাধ্য হয়ে দেহব্যবসা করতে হয়। এক্ষেত্রে শিবির মনভাবে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ‘নিমিত্তবাদ’ ক্রিয়াশীল। সে নিজের কামনা-বাসনা পূরণার্থে নয়, সে আর্থিক অসংগতির কারণে দেহব্যবসার পথে পা দিয়েছে। শিবির এই ঘৃণ্যপথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবই মূল। শিবি দেহব্যবসা করলেও সে তার মনের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য বজায় রেখেছে। শিবির জীবনে সারসত্য- দেহের চামড়া পুড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে পবিত্রতা-অপবিত্রতার কথা মূল্যহীন। সে ভোলাকে মন থেকে ভালোবাসে, ভোলাও সেকথা জানে-

'কি করে জানবি তোরা শিবির কথা, বেদের মেয়ের কথা। তোদের বাইরের খোসাটা দিয়ে খেলা করে, তার বুকের ভিতরের মানুষ বুকের ভিতরে আছে, থাকে। এই কথা তাদের বুকের মানুষও জানে। যেটা একদিন পুড়ে যাবে, পচে যাবে, প'ড়ে থাকবে, সে জিনিসের আবার 'ছুঁত-পবিত''।[৩]

এইখানে শিবি ও ভোলার দাম্পত্যের, তাদের বিশ্বাস-ভরসা-ভালোবাসার এক অটুট বন্ধনের ছবি চিত্রিত। পাশাপাশি শিবির মনের একটা স্তর উদ্ঘাটিত, তার শরীর হাজারজনে স্পর্শ করলেও, তার মনের অধিকার কেবল একজনের।

শিবির জীবনে প্রথম ভালোলাগা কিশোরী বয়সে, প্রভাতবাবুকে ঘিরে। শিবি-ভোলার বিয়ের সাতবছর পর প্রভাতবাবুর সঙ্গে শিবির হঠাৎ দেখা হলে, শিবির মনে আবার সেই পুরানো প্রথম ভালোলাগার পরশ জেগে ওঠে, সে প্রভাতবাবুর জন্য যেখানে সে যেত না, সেখানেই তার আসা-যাওয়া শুরু— 'কাচের ঢাকার মধ্যে দুর্লভ ফুল ঢেকে রাখে। তার চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় নীল মাছি। তেমনি ভাবে শিবি এবার ঘুরতে লাগল গুপ্ত পাড়ায়'।[৪] শিবি বিবাহিত, তার মনের মানুষ তার স্বামী, তারপরও প্রভাতবাবুর উপর শিবির এক অদ্ভুত আকর্ষণ। মানবমনের অন্তরের গূঢ় অতল রহস্যময়তার হদিশ পাওয়া দুষ্কর। এক্ষেত্রে শিবি চরিত্রে ও তার মনস্তত্ত্বে একটা বৈপরীত্য দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। শিবির প্রভাতবাবুর উপর এক অদ্ভুত অমোঘ আকর্ষণ থাকলেও, সবকিছুর ঊর্ধ্বে তার স্বামী। সে ভোলার জন্য সবকিছু করতে পারে, নির্দ্বিধায় মরতেও পারে। শিবি প্রেমাস্পদ অন্তপ্রাণ একদিকে, অন্যদিকে তার চরিত্রের মধ্যে রয়েছে আদিমতার উগ্রতা, স্বৈরিণী নারীর ছদ্মবেশ। একটা আদিম হিংস্র সরীসৃপ যে ঐ ছদ্মবেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সম্পৃক্ত। ভোলাকে বাঁচাতে অবস্থার প্রেক্ষিতে অজান্তে সে প্রভাতবাবুকে খুন করে। শিবি যেন নিজের বুকেই ছুরি মেরেছে, প্রভাতবাবুর শরীরের রক্তপাত শিবির মনে রক্ত ঝরায়। স্বামীর প্রতি প্রবল আনুগত্য, ভালোবাসা, পাশাপাশি প্রভাতবাবুর উপরও অদ্ভুত টান— এই বৈপরীত্য, মনস্তত্ত্বের বৈসাদৃশ্যে বিভাজিত প্রেমিকা এক নারীচরিত্র শিবি বেদেনী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাপুড়ে গল্প'-এর বেদিয়া রমনী কালী বেদিনী স্বৈরিণী, স্বেচ্ছাচারী, রহস্যময়ী, প্রতিশোধস্পৃহায় প্রবল এক নারী চরিত্র। কালী তিন-তিনবার বিয়ে করেছে, স্বামীদের ছেড়েছে– এ থেকে তার চঞ্চলমতী সত্তার পরিচয় লভ্য। সে ভিক্ষা করে, মদ খায়, অন্যান্যরা কালীকে ভয়ও পায়,

আবার ভালোবাসে। সে এমনই এক চরিত্রের যাকে উপেক্ষা করা যায় না, এমন বিচিত্র আকর্ষণীয় মাদকতায় ভরপুর কালী বেদেনী।

কালীর পোষ্য সাপকে ভৈরব ওষুধ বা ধুলো পোড়া দিয়ে কোনো কারণ ছাড়া হত্যা করে। ‘মেয়েটা সর্বনাশী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। আপাদমস্তক লেহন করছে দৃষ্টি দিয়ে।’[৫]— কালীর দৃষ্টিভঙ্গি স্থির হলেও তার মন তখন প্রতিশোধের আগুনে প্রজ্বলিত। সেই প্রতিশোধের মনোভাবেই কালী তার সমাজকে ত্যাগ করে ভৈরবের সঙ্গে যাযাবরের জীবন বেছে নেয়। পরবর্তীতে কালীর, ভৈরবের ঠোঁটে কামড়ে রক্ত বার করে দেওয়া, ভৈরবের মুখে সাপের বিষ ঢেলে দেওয়া, শঙ্খচূড় সাপকে ধুলোপড়া দিয়ে মেরে ফেলার মধ্যে কালীর প্রতিশোধ স্পৃহা কতটা ভয়ঙ্কর-নিষ্ঠুর-আক্রমণাত্মক হতে পারে তা দেখা যায়। সে যেন প্রতিশোধের আগুনে নারী থেকে বিষধর নাগিনীর রূপ ধারণ করেছে। রহস্যময়তা, নিষ্ঠুর প্রতিশোধস্পৃহায় পূর্ণ আদিবাসীজীবনের হিংস্রতা, আদিমতা ও ক্রূঢ়তায় পূর্ণ জীবন্ত প্রতিমূর্তি কালীর মধ্যে রয়েছে এক আদিম হিংস্র সরীসৃপের নিষ্ঠুরতা, যা তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সম্পৃক্ত।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ, আলোচনার স্বার্থে তারাশঙ্করের ‘কমল মাঝির গল্প’-এ কালকেপুর ডাঙ্গার সাঁওতাল গোষ্ঠীর সমাজপতি কমল মাঝি চরিত্রটি বিশ্লেষণ করা হল। নব্বই ঊর্ধ্ব বয়স্ক কমলমাঝি সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পলোকের আদিকথা বলত। সে মনে করত সৃষ্টির সব মানুষ ভাই-ভাই। সে সমাজ-সংসারের যে হিংসা, মানবমনের অন্তরের হিংসা-ক্ষোভকে আদি পুরাকথার মাধ্যমে, নিজের উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা দমনের চেষ্টা করেও কমলমাঝি যেন নিজেই মানবমনের আদিমতার কাছে হেরে যায়। কমলমাঝির জীবনের সব মানুষ চলে গিয়েছে, কেবল সে সাঁওতাল সমাজের সমাজপতি— এই অধিকারবোধই যেন কমলমাঝির বেঁচে থাকার আশ্রয়-সম্বল, তার অস্তিত্বের স্বরূপ।

কমলমাঝির চরিত্রে জ্যাঁ পল সার্ত্রে-র ‘অস্তিত্ববাদী’ দর্শনের মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মানুষ যখন অস্তিত্ব-সংকটবোধে ভোগে, তখন তার মধ্যে বিষাদময়তার ভার দেখা যায়। কমল মাঝিও তেমনই সোনাইকে সাঁওতাল সমাজপতি হিসাবে, নিজের জায়গায় অন্য একজনকে দেখে সহ্য করতে পারেনি। যে মানুষ নিজে সংগ্রাম রোধ করত, আদিম হিংস্রতাকে উপেক্ষা করার কৌশল বলত, সেই মানুষ নিজেই নিজের জীবনদর্শন ভুলে সংগ্রামে যুক্ত হয়ে যায়। কমল মাঝির মধ্যেও হিংস্র মনোভাবের উদ্রেক হয়।

ফ্রয়েডের ‘নির্জ্ঞান’ তত্ত্ব অর্থাৎ মানবমনের নির্জ্ঞানে সদা হিংস্রতা বিরাজমান, তবে এক্ষেত্রে যৌন কামনা-বাসনা নেই। মানবমনের নির্জ্ঞানে থাকা যে আদিমতা, তাই প্রকাশ পেয়েছে কমলমাঝির চরিত্রে। অস্তিত্ব সংকটে ভুগে কমল মাঝির ট্র্যাজিক পরিণতি হয়। কমল মাঝি নিজেই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বললেও সে নিজেই সৃষ্টিতত্ত্বের নিয়ম, কালের নিয়মে পুরাতনের বদলে নতুনের আসার নিয়ম মেনে নিতে পারেনি, নিজের অধিকারবোধ ত্যাগ করতে পারেনি। কমলমাঝি মানবজীবনের সব হারানোর ব্যথা ও অস্তিত্ব সংকটবোধ অনুভূতির দ্যোতনায় উজ্জ্বল এক ট্র্যাজিক চরিত্র।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘একটি প্রেমের গল্প’-র ফুলমণি, বুধন চরিত্রগুলি আলোচনা করা হল। আদিবাসী সাঁওতাল রমণী ফুলমণি অপরূপ সুন্দরী, সে রবীন্দ্রনাথের গান ‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ!’-এর মত সুন্দর। এই সৌন্দর্য্য বহু পুরুষ কাতর, কিন্তু ফুলমণি কখনই কাউকে মন থেকে ভালোবাসতে পারেনি। ফুলমণির ছিল রূপের অহংকার আর সেকারণেই সে বিশেষ একজনের অপেক্ষায় ছিল। তার এই অপেক্ষার অবসান ঘটে বুধন মুর্মু, যে বাঘমারা বীর পুরুষ, তার সংস্পর্শে এসে। হাজারো দৃষ্টি উপেক্ষা করলেও বুধনকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি— ‘বুধনের বেলা থুথু ফেলতে পারেনি ফুলমণি।’[৬] বুধন পরিশ্রমী, সে মাদল বাজাতে ও আদিবাসী নাচে পারদর্শী, সাহসী পুরুষ, যা ফুলমণিকে আকর্ষণ করে। বুধন বাঘ মেরে ফিরলে ফুলমণি তার সেবা করে, এখানে ফুলমণির মমতাময়ী নারী হৃদয়ের চিত্র উদ্ভাসিত। ফুলমণি নিজেও পরিশ্রমী, তাই তার অলস-কুঁড়ে, চোর-ছ্যাঁচর-মাতাল পুরুষ জীবনসঙ্গী হিসাবে পছন্দ ছিল না। সে চেয়েছিল বুধনের মতো পরিশ্রমী পুরুষ। ফুলমণির সঙ্গে বুধনের প্রেম হয়, বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু ফুলমণি ও বুধনের বিয়ে হয় না, বুধন ফুলমণিকে ঠকিয়ে হাসি মেঝেন নামক এক বিলাসিনী মেয়েকে বিয়ে করে। ফুলমণি হাজারো চেষ্টা, ভালোবাসা, কোনো কিছু দিয়েই বুধনকে নিজের করতে পারেনি।

ফুলমণি যখন তার ভালোবাসার, প্রেমের প্রতিদান পায় না, তখন তার মধ্যে এক হীনমন্যতা কাজ করে। এক্ষেত্রে ফুলমণির মনস্তত্ত্বে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। সে তার হীনমন্যতা বোধের কারণেই হাসি মেঝেন-এর মতো রঙিন শাড়ি পড়ে সাজতে চেয়েছিল। মানুষের মধ্যে যখন হীনমন্যতাবোধ কাজ করে অন্য একজনের জন্য তখনই সে তার মতো হতে চায়। হঠাৎ বুধন পালিয়ে বিয়ে করলে, ফুলমণি

এই আকস্মিকতায় প্রচণ্ড কষ্ট পায়। এই কষ্ট থেকেই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বানুসারে ফুলমণির মধ্যে 'পরঘাতী' মনোভাবের জন্ম হয়। ভালোবাসার ধারা প্রতিহত হওয়ায় মানুষের মধ্যে আক্রমণাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই মানুষের মধ্যে পরঘাতী অর্থাৎ হত্যার মনোবৃত্তি প্রকট হয়। ফুলমণি প্রচণ্ড বেদনা-আঘাত থেকে জাত ক্ষোভের কারণে হাসি ও বুধনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ফুলমণি বুধনকে হত্যা করতে গেলেও শেষে সে তা পারে না, যেন তার মনের বিবেক বা সুপার ইগো তাকে এই কাজ করতে দেয় না। বরং ফুলমণি যে কাটারি দিয়ে বুধনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল সেই কাটারি দিয়ে নিজেরই গলার নলি কেটে ফেলে আত্মহত্যা করতে চায়। মানুষের জীবন যখন বিষাদময় হয়ে যায়, গভীর সংকটে জর্জরিত জীবন থেকে আর বেরিয়ে আসার উপায় থাকে না, সে যখন অস্তিত্ব সংকটে ভোগে, তখনই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ফুলমণির ক্ষেত্রেও এই মনোভাবই লক্ষ্যণীয়। সে ভালো, সৎ মনের মানুষ হওয়ায়, নিজের বিবেকবোধের কারণে সে আকস্মিক হঠকারিতায় অসামাজিক কোনো কাজ করতে পারেনি—

> 'কাটতে গিয়ে কেঁদে ফেললাম। কাঁদতে কাঁদতে মনে হল— লে-লে- তুর সুখ হোক। তু সুখ কর — খুব সুখ কর। আমি মরব। আমি মরব।'[৭]

বুধনের প্রতি ঘৃণা থাকলেও, ফুলমণির বুধনের প্রতি গভীর ভালোবাসা তার ঘৃণাকে অতিক্রম করে গেছে। মদ্যপ অবস্থায় সুযোগ পেয়েও শিক্ষাদীক্ষাহীন আদিম সমাজের এই নারী হত্যার চেষ্টা থেকে আত্মসংবরণ করেছে। মনোবিজ্ঞানী পাভলভের মতে, প্রক্ষোভতাড়িত বা মাদক দ্রব্যের প্রভাবাধীন অবস্থায় মানুষ অজ্ঞানে ও প্রমত্ত অবস্থায় তাৎক্ষণিক উদ্দীপক দ্বারা পরিচালিত হয়ে পাশবিক আচরণ করে ফেলে। এক্ষেত্রেও ফুলমণির মনস্তত্ত্বেও প্রেমের পরিণতি না পাওয়ায় তার মধ্যে হীনমন্যতাবোধ, ক্ষোভ থেকে হত্যার চিন্তা এলেও শেষ মুহূর্তে তার বিবেক তাকে এই পাশবিক কাজ করা থেকে বিরত করে।

ফুলমণি চরিত্রে ত্রিবিধ স্তর লক্ষ্যনীয়- আমরা প্রথমে হাসি-খুশি, যৌবনবতী, অহংকারী, সহজ সরল এক নারীকে পাই, পরবর্তীতে প্রেমোন্মত্ত এক আদিম নারীসত্তা চিত্রিত এবং তৃতীয়ত, সে এক পরিপূর্ণ, শিক্ষিত, মার্জিত নারী, যে সংশোধনাগারে থাকাকালীন নিজের জীবনকে কাজে লাগিয়েছে সঠিকভাবে। এক অশিক্ষিত-অমার্জিত নারী থেকে ফুলমণি উত্তরণ হয়েছে শিক্ষিত, মার্জিত নার্সে। এছাড়াও গল্পের শেষে ফুলমণি যাদের বাড়িতে কাজ করত তার নাতি প্রশান্তশংকর, যে তার 'মিতে' ছিল তার

খোঁজ পেলে, সেই বাড়ির কর্তা যখন প্রশান্তশংকরের নার্সিংহোমে নার্স হওয়ার প্রস্তাব দেয় ফুলমণিকে, সে রাজি হয় না—'সে – না। না-না-না।'[৮] প্রশান্তশংকরের স্ত্রীর রূপের খোঁজ নেওয়া এবং এতবার না বলার মধ্যে, 'না' শব্দটির উপর এত জোড় ফুলমণি চরিত্রের এক অব্যক্ত রহস্যময় অনুভূতির ইঙ্গিত দেয়।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেহের প্রদীপে রূপের শিখা' গল্পে আদিবাসী নারীচরিত্র চারু আত্মস্বার্থান্বেষী, প্রেমোন্মত্ত, স্বৈরিণী নারী চরিত্র। সামাজিক-জাতিগতকারণবশত কৃষ্ণকিশোর ও চারুর বিবাহ হয়নি। কায়স্থ জমিদার বংশের ছেলে কৃষ্ণকিশোর, যার প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করে কৃষ্ণকিশোর ও চারুর পরকীয়ার কারণে। কৃষ্ণকিশোর যখন দ্বিতীয়বার ভামিনীকে স্ত্রীর পরিচয়ে বাড়ি আনে, তখন চারু তাদের জীবনে আসে। চারু নিজেই নিজের মনের রহস্যময়তা, জটিলতা, ক্রূঢ়তা, হিংসার কথা স্বীকার করেছে। চারু এখানে স্বৈরিণী নারীচরিত্র ঠিকই কিন্তু সে কৃষ্ণকিশোরকে মন থেকে ভালোবাসে। তার প্রেমোন্মত্ত ভালোবাসার কারণে কৃষ্ণকিশোরের প্রথমা স্ত্রী মারা যায়, সে ভামিনীর উপরও অন্যায় করছে এই পাপবোধ তার আছে। সেই পাপবোধ-আত্মগ্লানিবোধেই সে কৃষ্ণকিশোরের বাড়িতে দাসীর মতো থাকে। কৃষ্ণকিশোর পঙ্গু হয়ে গেলেও, লম্পট চরিত্রের হলেও চারু তাকে পরিত্যাগ করে না। সে কেবল ব্রাত্য সমাজের, নিচু জাতের মেয়ে বলেই সামাজিক কারণে তাদের বিবাহ হয় না। চারু চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে বোঝা যায় সামাজিক জাতিভেদ প্রথার কারণে কত সম্পর্ক পরিণতি পায় না, কত মানুষ তার মনের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

গল্পে কৃষ্ণকিশোরের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে পরিচিত ভামিনী, যার আসল নাম সতী, সেও আসলে তার নিজের স্বামীকে পরিত্যাগ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে কৃষ্ণকিশোরের রূপের মোহে। কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের রূপ থাকলেও গুণ ছিল না, সে লম্পট চরিত্রের। ভামিনীকে সে বিবাহ করেনি, তাকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল। ভামিনী ওরফে সতীর স্বামী রাধাবিনোদ গোস্বামীর গুণ ছিল-সে সৎ, বিশ্বাসী,ছিল স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য কিন্তু রূপ ছিলনা বলে ভামিনী গোস্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি। দাম্পত্যে ছিল কেবল শ্রদ্ধাবোধ। মানুষ যা সহজে পেয়ে যায় সেটার মূল্য সে দিতে পারে না, ভামিনীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। রূপের মোহে ভামিনী বিশ্বাসঘাতকতা করার পর নিজেও ঠকে যায়। যার জন্য সে ঘরের মানুষকে ছাড়ে সেই তাকে ঠকায়, কর্মের ফল যেন সে হাতেনাতে পায়। সে প্রায়শ্চিত্ত করে চারুকে ও কৃষ্ণকিশোরকে

একসঙ্গে রেখে নিজে কৃষ্ণকিশোরের দ্বিতীয় স্ত্রীর পরিচয়ে কৃষ্ণভামিনী হয়ে বেঁচে। সে বোঝে, ভালোবাসার মর্ম।

চারু ভামিনীর এই কাহিনি না জানায় সে আত্মগ্লানি, পাপবোধে ভোগে। এখানে চারু, ভামিনী উভয়েই স্বৈরিনী নারীচরিত্র। চারু-ভামিনী এক সঙ্গে থাকতে থাকতে দুজনে যেন দুজনকে বোঝে, সহমর্মী হয়ে ওঠে। প্রান্তিক নারী চারু চরিত্রে আত্মগ্লানি, পাপবোধ, রহস্যময়তা, মমত্ববোধ, হিংসা, প্রেমোন্মত্ত দৃঢ় সত্তার পাশাপাশি রয়েছে খানিক বিষাদের ছায়া।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে আলোচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে বেদেনী নারী চরিত্রটি অবলম্বন করা হল। গল্পে চিত্রিত বেদেনী সৎ, সহজ-সরল, রহস্যময়ী, সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত নারীচরিত্র। এই বেদের মেয়ে বা বেদে জাতি যাযাবর, তারা দূরে সাপের বিষ বেচতে যায় সামান্য উপার্জনের তাগিদে। তারা বাড়ি বাড়ি সাপের খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করে। এরা দরিদ্র হলেও সৎ। বেদেনী ও নাদির তাদের আদিম 'মিতালির খেলা' এই সমস্ত লোকক্রীড়া দেখায়। এই খেলার ক্ষেত্রে সাহসী মনের পরিচয় পাওয়া যায় বেদেনী নারীর। তাদের রক্তের আদিমতায় যেন এই উগ্র সাহসিকতা মিশে, যা তাদের সহজাত ধর্ম। কিন্তু হঠাৎই বেদেনীকে জমিদারবাবু প্রহার করে, অপমান করে, লাঞ্ছনা করে তাড়িয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস বেদেনী তার সন্তানকে বাণ মেরেছে। বেদেনীর মন বেদনাবোধে ভরে ওঠে। কোনও প্রমাণ-যুক্তি ছাড়াই কেবল আদিবাসী হওয়ার অপরাধে এবং বিনা কারণে সে কিছু না করেও বেদেনী সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের অপমানের, নির্যাতনের শিকার হয়। গল্পে বেদেনী এক নির্যাতিত, অত্যাচারিত আদিবাসী সমাজের প্রতিভূ, যারা বিনা কারণেই লাঞ্ছনার শিকার হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্করীতলার জঙ্গলে' গল্পের প্রান্তিক চরিত্র ঘনশ্যাম দাস ও গীতা দাসী চরিত্র অবলম্বন গল্পের আদিবাসী চরিত্রচিত্রন ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল। গল্পের সূচনা ঘনশ্যামের ফাঁসি, মৃত্যুর পরিণতি দিয়ে। গল্পে ঘনশ্যাম চরিত্রটি আদিম হিংস্রতায় প্রবল প্রেমোন্মদনামুখর এক পুরুষ। সে বিধবা গীতাকে তার চার বছরের কন্যা সন্তানসহ ভালোবেসে বিবাহ করে। কিন্তু ঘনশ্যামের আক্রোশ জন্মায় গীতার চার বছরের কন্যা সন্তান টুলুর উপর। চার বছরের মেয়ে

টুলু তাকে প্রথমে বাবা বলতে চায় না, এছাড়া টুলু যেন ঘনশ্যামকে প্রথম থেকেই অপছন্দের নজরে রাখে। শিশুরা ভীষণই অনুভূতিপ্রবণ হয়, সেকারণেই হয়ত টুলুর শিশুমন ঘনশ্যামের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব-ব্যবহার পোষণ করে। ঘনশ্যাম ও গীতা যখনই ঘনিষ্ঠ হতে যায় তখনই টুলু বাঁধা সৃষ্টি করে। ঘনশ্যাম ও গীতার মাঝে টুলু যেন তাদের ভালোবাসার প্রতিবন্ধক। ঘনশ্যামের গীতার প্রতি যে ভালোবাসা, তকে একান্ত কাছে পাবার যে বাসনা তা পূর্ণতা পায় না টুলুর কারণে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বানুসারে ঘনশ্যামের মনস্তত্ত্বে 'থ্যানাটস্' বা পরঘাতী মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। ভালোবাসার ধারা প্রতিহত হওয়ায় মানুষ আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে। ঘনশ্যামের ক্ষেত্রেও এই মনোভাবই কাজ করেছে। সে টুলুকে খুন করতেও পিছপা হয়নি। ঘনশ্যামের প্রেম প্রাপ্তির সুখে, প্রেমের উন্মাদনায় কান্ডজ্ঞানশূন্য। আদিম হিংস্রতার যে ধারাটি প্রেম ও প্রেমমনস্তত্ত্বকে পুষ্ট করে, সেই আদিম উগ্রতা ঘনশ্যাম চরিত্রের রাক্ষুসে-বর্বর রূপকে জীবন্তভাবে রূপায়িত করে।

গীতা চরিত্রটিতে মনস্তাত্ত্বিক স্তরীয় বিন্যাসের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দ্বিবিধ অনুভূতি চিত্রিত। গীতা যুবতী, বিধবা, তার চার বছরের কন্যা সন্তান আছে। গীতা ও ঘনশ্যাম দুজনে ভালোবাসে বিয়ে করে। গীতা এক সুখী দাম্পত্যের ছবি আঁকে কিন্তু তা পূরণ হয় না। গীতা তৎকালীন সময়ে বিধবা নারী হয়েও অকপটে স্বীকার করে ঘনশ্যামের জন্য তার দেহ কাঁদে, অকপটে এই শারীরিক কামনা-বাসনের কথা স্বীকার করায় তার মনের সাহসিকতার প্রমাণ মেলে। পাশাপাশি গীতার হৃদয় মাতৃত্বে, ভালোবাসায় উদ্বেল তার মেয়ের জন্য। সে যখনই বুঝতে পারে ঘনশ্যাম তার মেয়েকে মারতে চায় সে তার মেয়েকে বাঁচাতে প্রাণপাত করলেও শেষরক্ষা হয় না। ঘনশ্যামের ফাঁসির সাজা হলে ঘনশ্যামের মৃত্যুতে গীতার মনের এক অদ্ভুত মনোভাব চিত্রিত–

> 'টুলুকে ঠিক আজ মনে পড়ছে না। ঘনশ্যামের মরা মুখখানা সামনে রয়েছে। ওই যে। ওই চিতায় চড়াচ্ছে।
>
> ঘনশ্যামের জন্যই বুকটা হুহু করছে।
>
> 'কার দোষে কি হল সে তা জানে না। কার দোষ? কার'।[৯]

স্বামী সন্তান হারিয়ে আজ গীতা সর্বহারা। ঘনশ্যাম তার সন্তানকে নির্মমভাবে খুন করেছে, সেক্ষেত্রে সাক্ষী দিয়েছে সে নিজে, সেই ঘনশ্যামের মৃত্যুতে গীতার মনের দ্বন্দ্ব, যা মানবমনের অন্তরের গহনে চলা জটিল রহস্যময়তার সন্ধান দেয়। প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য ঘনশ্যামের ক্রূঢ়তা ও উন্মত্ততা যেমন প্রস্ফুটিত, তেমনই গীতার দ্বান্দ্বিক মনোভাবও চিত্রিত, যা দুটি চরিত্রকে নতুন তাৎপর্যমন্ডিত মাত্রায় স্বতন্ত্র করেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী' গল্পের খোঁড়া শেখ, জোবেদা চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ আলোচনা করা হল। গল্পে খোঁড়া সাপের ওঝা, সাপিনীর প্রতি প্রেম-মমতা এবং তার স্ত্রী জোবেদার প্রতিও প্রেম-ভালোবাসার সম্পৃক্তিতে চিত্রিত এক স্বতন্ত্র চরিত্র। সর্পশিশুর প্রতি খোঁড়ার যে টান, অনুভূতি, ক্রিয়াকলাপ, আকর্ষণ তা যেন যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশ। মানুষ নয় বা মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি যৌন আকর্ষণকে 'জুফিলিয়া' *(zoophilia)* বা 'পশুকামিতা' বলা হয়। খোঁড়া সাপিনীকে নাকে মিনি, সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করছে, আদর করে মুখে চুম্বন করছে এই সবকিছুর ক্ষেত্রে খোঁড়ার সাপটির প্রতি যৌন আকর্ষণই পরিস্ফুট। এই পশুর প্রতি যৌন আকর্ষণ বা সঙ্গম প্রাচীন আমেরিকার অনেক আদিবাসী, মিশরীয়দের মধ্যেও প্রচলিত ছিল এছাড়াও ভারতের খেজুরাহ মন্দিরেও এই পশুকামিতার ভাষ্কর্য পাওয়া যায়। পাশাপাশি হিন্দুধর্মের কিছু গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে।

তারাশঙ্কর এই গল্পে পশুকামিতার আসক্তিকেই এক নবদৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম তুলে ধরেছেন। সাপিনীর প্রতি আকর্ষণ এবং জোবেদার প্রতিও নিখাদ ভালোবাসা, এই দ্বৈত ভালোবাসার দ্বন্দ্বে খোঁড়া চরিত্রটি আবর্ত। তবে এই ভালোবাসার দ্বন্দ্বে যেন সর্পপ্রেমই জয়ী, এক্ষেত্রে খোঁড়ার কোনো যৌন আকর্ষণ কাজ করেনি, কাজ করেছে মমতা। খোঁড়া চরিত্রে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি আদিম প্রবৃত্তি থেকে উত্তরিত হয়ে মমতা প্রাধান্য পেয়েছে।

এই গল্পের নারীচরিত্র খোঁড়ার স্ত্রী জোবেদা স্বামীকে ভালোবাসে, এই কারণেই সে সর্পশিশুটিকে সহ্য করতে পারে না। নারী ও নাগিনী উভয়ে পরস্পরের প্রতি সতীনের মতো আচরণ করেছে। জোবেদা খোঁড়ার এই সাপটির প্রতি আসক্তিতে ঈর্ষা পরায়ণা হয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু সাপটিও যেন ঈর্ষাপরায়ণ হয়েই রাতের আঁধারে সকলের অগোচরে ঘুমন্ত জোবেদাকে দংশন করে। জোবেদার স্বামীর প্রতি নিখাদ

ভালোবাসাই যেন তার প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। নারী ও নাগিনীর এই অসম লড়াইয়ে জোবেদা হেরে যাওয়া করুণ এক নারী চরিত্র।

গল্পে আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাসের ফুল' গল্পের কয়লা খাদানের শ্রমিক চুড়কী প্রগ্‌লভা, প্রাণবন্ত ও প্রতারিত এক নারীচরিত্র। চুড়কী প্রাণের উচ্ছ্বল স্পন্দনে কোলিয়ারির এক কর্মচারী বিনোদকে ভালোবেসে ফেলে। বিনোদের গান শোনার বিনিময়ে চুড়কীর রোজ একটি করে জবাফুল উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে যৌবনের আবেগ, তার সহজ সরল কোমলতা পরিস্ফুট। কিন্তু চুড়কীর এই কোমলতা হার মেনে যায় কোলিয়ারির মালিকদের স্বার্থের কাছে, অর্থলিপ্সার কাছে। খনির আগুনের মৃত্যুগহ্বরে সু-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের শিকার চুড়কী ও চুড়কীর ন্যায় অন্যান্য আদিবাসী শ্রমিকরা। যন্ত্রের নির্মম পেষণে, আমলাতন্ত্রের উচ্চাকাঙ্খা ও নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ চুড়কীর বেদনাদায়ক মর্মান্তিক পরিণতি। অসহায় শ্রমিজীবী কুলিকামিনদের জীবনের প্রতিভূ চুড়কী চরিত্রটি বাংলা ছোটগল্পের স্বতন্ত্র রেখায়ন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী' গল্পে রাধিকা বেদেনী জৈবিক কামনা বাসনায় উজ্জ্বল স্বৈরিণী, চঞ্চলমতি নারীচরিত্র। বেদিয়াদের যাযাবরী জীবনযাত্রা যেন রাধিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতেও স্পষ্ট, তার সামাজিক জীবনের সাথে সাথে মানসিকতাও যাযাবরী হয়ে যায়। সে এক পুরুষে স্থির নয়। রাধিকা দেহকামনার উদগ্রতায়, আদিম প্রবৃত্তি ও লালসায় সে সবসময়ই নিজের প্রবৃত্তিজাত কামনাপূরণে সচেষ্ট, সেই কারণেই সে বারংবার নিজের সঙ্গী বদলায়।

রাধিকা চরিত্রের বিশিষ্টতার মর্মমূলে রয়েছে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব। ফ্রয়েডের মতে মানুষের জীবনের যাবতীয় ইচ্ছা, চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের মূলে থাকে যৌন প্রবৃত্তি। এক্ষেত্রে রাধিকার মনস্তত্ত্বেও প্রকাশিত তার জীবনের যাবতীয় চাহিদার মূলে তার যৌন প্রবৃত্তি, যৌনানুভূতির তীব্রতা, যে কারণে সে বারবার সঙ্গী বদল করতে থাকে। শিবপদকে রাধিকা পরিত্যাগ করে কারণ রাধিকার নিজ দেহে যে মাদকতা আছে, তা শিবপদর ছিল না, তাই সে তাকে ছেড়ে কঠোর বলিষ্ঠ দেহের শম্ভুর সাথে পালিয়ে যায়। একইভাবে কিস্টোর তুলনায় শম্ভুর দৈন্যতা যখন রাধিকার চোখে পড়ে সে যেন হীনমন্যতায় ভোগে

এবং কিস্টোর চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে শম্ভুক ত্যাগ করে। শম্ভুকে কেবল ত্যাগই করে না, শম্ভুকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চায়- 'মরুকবুড়া পুড়্যা।'

এখানে রাধিকা চরিত্রের মনস্তত্ত্বে একদিকে রয়েছে যৌনানুভূতির তীব্রতা, অন্যদিকে রয়েছে আক্রমণাত্মক মনোভাব। ফ্রয়েড মানবমনের যে দুই প্রবৃত্তির কথা বলেছেন তার একটি হল মৃত্যুচেতনা বা *thanatos.* এই থ্যানাটসের মধ্যে একটি হল পরঘাতী বা হত্যা। গল্পে রাধিকা চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব পরিলক্ষিত। রাধিকা জৈবিক কামনা-বাসনায় উজ্জ্বল, রহস্যময়, স্বৈরিণী, স্বতন্ত্র এক নারীচরিত্র।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বনফুলের 'তবে কি?' গল্পের চরিত্র আলোচনা করা হল। গল্পে হরিসেবক, বিলাস এবং পণ্ডিতজী কেউই জনজাতি বা প্রান্তিক চরিত্র নয় ঠিকই কিন্তু প্রান্তিক ও জনজাতি চরিত্রচিত্রণ আলোচনার ক্ষেত্রে এই গল্পে হরিসেবক ও বিলাস চরিত্রটির মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া দরকার। হরিসেবক ধার্মিক, জাতিভেদ মানা গোঁড়া মনের মানুষ। হরিসেবক অন্ধ কুসংস্কারে, প্রাচীনপন্থী ধারণায় বিশ্বাসী। সে স্বপ্ন দেখে—

> 'অদ্ভুত স্বপ্ন। স্বপ্নে কে একজন দিব্যকান্তি পুরুষ এসে যেন হরিসেবককে বলছে তুমি আগামী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত্রে মান্দার পাহাড়ে যেও। সেখানে মধুসূদন আছেন। তিনি সেদিন একটি সভ্য লোককে তাঁর অভীষ্ট বর দেবেন।'[১০]

গল্পে প্রথমে হরিসেবকের স্বপ্ন এবং দ্বিতীয়বার বিলাসের স্বপ্নের কথা আছে। *দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম* (১৯০০) গ্রন্থে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড স্বপ্ন সম্পর্কে বলেছেন, স্বপ্ন মানুষের অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশী পূর্ণতার রূপ। মানুষের চাপা আকাঙ্ক্ষার আবৃত প্রতীক এবং ফলস্বরূপ হল স্বপ্ন। গল্পেও দেখা যায় হরিসেবকের কন্যা অসুস্থ এবং সে তার প্রতিকার খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। তারপরই সে এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। এক্ষেত্রে বোঝাই যায়, ফ্রয়েডের স্বপ্ন-মনস্তত্ত্ব হরিসেবকের স্বপ্নের মূলে বিরাজিত।

হরিসেবক যে স্বপ্ন দেখে তাতে 'সভ্য লোকের' কথা পাওয়া যায়। বিলাস পাহাড়ে উঠে এক আদিবাসী সাঁওতাল যুবককে দেখে যার মাথায় ময়ূরপুচ্ছ ও সে বাঁশি বাজানোয় মত্ত। লেখক এখানে

আদিম ও তথাকথিত ‘অসভ্য’ মানুষের মধ্যে কৃষ্ণের রূপ নির্মাণ করেছেন। গল্পে এই আদিবাসী রহস্যময় অনাথ যুবককে লেখক হিন্দুধর্মের কৃষ্ণবর্ণীয় দেবতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান আর্য-অনার্য দেবতা, এসব নিয়ে নানান তর্ক-দ্বিমত চলছে। লেখক এখানে যেন প্রতিষ্ঠা করেছেন সকল মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজমান, সে সভ্য-অসভ্য মানে না। গল্পে শ্যামবর্ণ কিশোর আদিবাসী ছেলেটির চরিত্রচিত্রায়ণের রহস্যময়তার অন্তরালে লেখক সচেতনভাবে সভ্য-অসভ্য সমাজের বিভেদটা মুছে দিতে চেয়েছেন।

বনফুলের ‘বুধনী’ গল্পের বিল্টু চরিত্রটি প্রেমোন্মদনামুখর ব্যতিক্রমী এক চরিত্র। বিল্টুর তার স্ত্রী বুধনীর প্রতি ভালোবাসা এতটাই প্রবল হয়ে যায় একটা সময় যে সে তার নিজের সন্তানকেও তদের ভালোবাসার মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখে। বিল্টু তার এই আদিম বিচারবোধহীন উগ্র ভালোবাসায় কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বা বন্ধকতা না রাখতে শিশু পুত্রটিকে হত্যা করে। এক্ষেত্রে বিল্টুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ফ্রয়েডীয় মনোভাব লক্ষ্যণীয়- থ্যানাটস নামক যে মৃত্যুমুখী শক্তি যার একটি ভাগ হত্যা করা অর্থাৎ পরঘাতী শক্তি, এর উদ্দেশ্য হল অপরকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা। এছাড়া ফ্রয়েড আরও বলেন, মানুষ স্বভাবর্বর, সে সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মায় কিন্তু সমাজ-সভ্যতার কারণে তা অবদমিত থাকে, কখনও সুযোগে ছিদ্রপথে অবদমিত হিংস্র প্রবৃত্তি বেরিয়ে সে মানুষকে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহিত করে। বিল্টুর চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে তার এই হিংস্র প্রবৃত্তির মূলে স্বভাববর্বরতা মনস্তত্ত্বই কাজ করেছে। এই হত্যার জন্য তার কোনো পাপবোধ বা কুণ্ঠা নেই, তার একমাত্র চাওয়া পাওয়া বুধনী। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও সে কেবল বুধনীকেই চেয়েছে। প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য উন্মত্ততা বিল্টু চরিত্রকে ভীষণভাবে জীবন্ত করে তুলেছে।

আদিবাসীকেন্দ্রিক গল্পে আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় চরিত্রাবলীর স্বরূপ নির্ণয়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘রাঙাশাড়ি’ গল্পের পুরুষ-নারী চরিত্রাবলীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হল। গল্প ‘মজ্‌রো’ কয়লাকুঠিতে কাজ করতে আসা আদিবাসী সাঁওতাল যুবক লুটন মাঝি চরিত্রের প্রেম-ব্যর্থতা, জীবনযুদ্ধে পরাজিত, সব হারানোর ব্যথা-বেদনাবোধের অনুভূতি চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক বিষণ্ণতায় ভাস্বর করে তুলেছে। লুটন পেটের দায়ে কয়লা চুরি করে, জুয়া খেলে। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক কারণ তাকে এই অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য করে। সে বাঁশি বাজায়। আদিবাসী সমাজের নিজস্ব খেলা বা প্রথানুসারে, লুটনের কুকুর জিন্না ও লুটনীর কুকুর বাঘার

লড়াইয়ে লুটনের কুকুর জিন্না জয়ী হলে লুটন লুটনীকে বিয়ে করার অনুমতি পায়। লুটনীকে বিবাহ করবার কারণে 'কন্যাপণ' হিসেবে লুটন তার পছন্দের বাঁশিও লুটনীর দাদাকে দিয়ে দেয়। আদিবাসী সমাজের বিবাহে কন্যাপণ গুরত্বপূর্ণ রীতি। এরপরও তাদের বিবাহ হয় না। লুটনীকে রাঙা শাড়ি উপহার দেওয়ার জন্য ও পুজোর আনুষঙ্গিক নানা খরচের কারণে সে ঝোলা-কয়লা চুরি করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। কয়লার চাঙড় খসে পড়ে লুটনের দুই হাত অকেজো হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে লুটনীর অন্যত্র বিয়ে হওয়ার কথায় অব্যক্ত বেদনার জ্বালায় একা গুমরে মরে। যাকে খুশী করতে গিয়ে লুটনের জীবনে এই বিপর্যয় নেমে আসে, বিপদে সেই লুটনীও তার দাদার কথায় অন্যত্র বিবাহে রাজী হয়ে যায়, এই বিপদে লুটনের পাশে তার কুকুর জিন্না ছাড়া আর কেউ থাকে না। আলোয় তো সবাই সঙ্গ দেয়, অন্ধকারে নিজের ছায়াও সাথে থাকেনা, এই ধ্রুব সত্যই লুটন জীবনযুদ্ধে পরাজয়, একাকীত্ব দিয়ে উপলব্ধি করে।

গল্পে চিত্রিত লুটন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে গল্পকার আদিবাসী মানুষদের জীবনসত্যের অন্ধকার, ভয়ানক ট্র্যাজিক রূপটা তুলে ধরেছেন। এরকম সামান্য অর্থের জন্য অনেকেই তাদের জীবন হারায়, কেউ বা পঙ্গু হয়ে যায়। এদের কেউই কোনো লাভ বা মুনাফার জন্য এই চুরিবৃত্তি গ্রহণ করে না, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করতে চায় বেঁচে থাকার তাগিদে। 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'- প্রবাদবাক্যের ন্যায় ভাগ্যও যেন এদের সঙ্গে নির্মম পরিহাস করে। গল্পের আর এক চরিত্র লুটনী, এমন এক নারীচরিত্র, যে তার হবু স্বামী লুটনকে ভালোবাসলেও তার দাদার ভয়ে সে তার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। সে রাঙাশাড়ি চেয়েছিল বলেই লুটন ঝুঁকি নিয়ে চুরি করতে গিয়ে তার এই বিপর্যয়। গল্পে লুটনীর চরিত্রটি দৃঢ়মনস্ক নারীচরিত্ররূপে চিত্রিত হয়নি। সে কঠিন সময়ে লুটনের পাশে দাঁড়াতে পারেনি, বরং তার দাদার ভয়ে অন্যত্র বিবাহে সম্মত হয়। সে লুটনকে ভালোবাসলেও সে দৃঢ়সত্তার নারীচরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি বলেই তাকে লুকিয়ে লুটনের সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয় রাতের অন্ধকারে, তার দাদার হাতে মার খেতে হয়। লুটনী যদি সাহসী হত তাহলে গল্পটা অন্যরকম হতে পারত।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে শৈলজানন্দের 'সব ভূতুড়ে' গল্পের টুইলা মাঝি চরিত্রটি একটি বিষাদময় চরিত্র। গল্পে টুইলা মাঝি ভূত, সে কোনো জীবন্ত মানুষ না হলেও তার যে যন্ত্রণা, ক্ষোভ, তা যেন সমগ্র আদিবাসী মানুষের স্বর। কোলিয়ারিতে আদিবাসীরা শ্রমিক হিসাবে দিন-রাত কাজ করেও তারা যথাযথ শ্রমের মূল্য পায় না, উপরন্তু তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা প্রতি পদে পদে। সমাজের শোষক শ্রেণির

বেশি মুনাফার লোভের বলি হয় এই আদিবাসী দরিদ্র, সহজ-সরল মানুষগুলিকে। টুইলা মাঝির স্বরে যেন সেই মানুষদের, তার নিজের মৃত্যুর ক্ষোভ ঝরে পড়ে, সে প্রতিবাদ-প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠে—

> ‘আমাকে মেরেছিস বানে ডুবোই, জলের ভেতর ঠিক ইঁদুর মারা করে। ছেলেটা ছিল, আবার তাকেও মেরে দিলি!’[১১]

টুইলা মাঝি তার উপর হওয়া, তার ছেলের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চায়। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা কোলিয়ারিতে বুর্জোয়া সমাজের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় টুইলা মাঝি। এরূপ অন্যায়-অত্যাচার, ষড়যন্ত্রের শিকার কোলিয়ারিতে প্রতিনিয়ত কাজ করা শ্রমিকদের সহ্য করতে হয় , এই দৃষ্টান্ত শৈলজানন্দের ‘বলিদান’, ‘রেজিং রিপোর্ট’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঘাসের ফুল’ এছাড়াও আরও বহু গল্পে পাওয়া যায়। টুইলা জীবিত অবস্থায় এর প্রতিবাদ করতে পারেনি, তার পুত্রের মৃত্যুর যন্ত্রণাবোধের ক্ষোভ মৃত্যুর পরেও তার মধ্যে রয়ে গেছে। গল্পটি ভূতুড়ে হলেও সমগ্র আদিবাসীদের উপর হয়ে চলা অন্যায় অত্যাচারের চিত্র এবং তাদের প্রতিশোধ-প্রতিরোধের চিত্র প্রতিফলিত। টুইলার নিজের মৃত্যু, তার সহকর্মীদের মৃত্যু এবং তার পুত্রের মৃত্যুর বেদনাবোধ টুইলা চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে ত্বরান্বিত করে।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘মা’ গল্পের চরিত্রাবলী অবলম্বনে আদিবাসী চরিত্রদের স্বরূপ ও তাদের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্ ঘাটনের চেষ্টা করা হল। গল্পে বৃদ্ধ দুখন চরিত্রটি সৎ, পরিবারহারা, ট্র্যাজিক চরিত্র। যার কেবল এক পনেরো-ষোলো বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই মারা গেছে। স্বামীর অত্যাচারে দুখনের মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সে তার বাবার কাছে তার স্বামীর দুশ্চরিত্রের কথা অনেকবার বললেও দুখন বিশ্বাস মেয়ের কথায় বিশ্বাস না করে জোর করে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠালে, পরবর্তী সময়ে তার মেয়ের আত্মহত্যা দুখনকে মনস্তাপ ও অপরাধবোধে ভোগায়। সেও তাই তিন-চারদিন অন্ন-পানি গ্রহণ না করে মৃত্যুমুখে নিজের জীবন ঠেলে দেয়। যেমন নিজের হাতে নিজের মেয়েকে মৃত্যুমুখে সে ঠেলে দিয়েছিল সেই আত্মগ্লানিবোধে, অপরাধবোধের মনস্তাপে সে নিজেও মৃত্যুবরণ করে, যেন আত্মহত্যা করে। সে যদি তার মেয়ের কথা বিশ্বাস করত, তাহলে তার মেয়ের এই পরিণতি হত না। এই অপরাধবোধেই বৃদ্ধ দুখন নিজের মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। গল্পে দুখন ও তার মেয়ে এই চরিত্রের মনস্তত্ত্বে

সার্ত্রের ‘অস্তিত্ববাদ’ কাজ করেছে। তাদের জীবন এক গভীর সংকটের আবর্তে আবদ্ধ। তা থেকে তারা উত্তরণের পথ, মুক্তির পথ পায়নি, যা তাদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। দুখন তার মেয়েকে, তার সন্তানকে রক্ষা না করতে পারায় তার চরিত্রে প্রবল মনস্তাপ, অপরাধবোধের কারণে সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী পরীকে কখনো বিবাহ না করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করায়। দুখনের আত্মগ্লানি থেকে তিলে তিলে নিজেকে শেষ করা, তার মৃত্যু যা আত্মহত্যারই নামান্তর।

গল্পের অন্য এক চরিত্র পরী, সাঁওতাল কুলি কামিন রমণী যে মাতৃত্বের কোমল-মধুর পরিচয়ে জীবন্ত এক চরিত্র। মাতৃ-পিতৃহীন নারী পরী যে তার পিতৃসম জ্যাঠার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে কোনদিন বিয়ে করবে না। পরী তার পিতৃসম জ্যাঠাকে অত্যন্ত ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, সেবা করত। সে আদর্শ মেয়ে বলা যেতে পারে। সে তার জ্যাঠাকে দেওয়া কথার কারণে প্রেমিক টুরাকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে, টুরার বাবার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছে। পরীর মনস্তত্ত্বে প্রচণ্ডভাবে দ্বিধা-দোলাচলের চিত্র পাওয়া যায়, একদিকে তার জ্যাঠাকে দেওয়া কথা, অন্যদিকে টুরার ভালোবাসা। কিন্তু পরী তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি, সে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হলেও টুরাকে ফিরিয়ে দেয়, বিয়ে করেনি। পরী যখন জানতে পারে সে মা হতে চলেছে, তখন—

> ‘সেইদিন হইতে টুরার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। নিজের প্রতিও ঘৃণা কম হয় নাই। প্রতি মুহূর্তেই তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু কোন্ অদৃশ্য শক্তি তাহাকে ক্রমাগতই সে পাপ হইতে বিরত করিতেছিল। এখন টুরাকে দেখিলেই তাহার আপদমস্তক জ্বলিয়া উঠে। তাহাকে খুন করিতে ইচ্ছা হয়।’[১২]

পরী চরিত্রে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জটিলতা পাই, তাকে মনোবিশ্লেষণের আলোকে যুক্ত করে ফ্রয়েডীয় অভিমত অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমাদের মনের মধ্যে জীবনমুখী ও মৃত্যুমুখী পরস্পরবিরোধী দুই শক্তি ক্রিয়াশীল। মৃত্যুমুখী যে শক্তি তা আত্মঘাতী এবং পরঘাতী দুই-ই হয়। আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মহত্যা এবং পরঘাতী অর্থাৎ খুন করা। পরী চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে আমরা তার আত্মহত্যার বাসনা এবং টুরাকে খুন করার প্রবণতা দেখি। এত কিছু দ্বিধা-ভাবনার পরেও পরী না আত্মহত্যা করতে পেরেছে, না খুন করতে। পরী আত্মহত্যা করতে গিয়েও পারেনি তার অনাগত সন্তানের জন্য, আমাদের মনে যে ভালোবাসার শক্তি,

যে জীবনীশক্তি আছে, এক্ষেত্রে তার কাছে পরীর মনের মৃত্যুশক্তি পরাজিত হয়েছে। টুরার সন্তানই তার জীবনীশক্তি, তার জীবনের ইউটোপিয়া।

এই সন্তানই টুরা ও পরীর প্রেমে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। সন্তানের জন্মের সঙ্গে যেন পরীর জীবনের আঁধার কেটে এক সূর্যোদয় হয়। সে শান্তরূপে টুরার আহ্বান মেনে নেয়। মাতৃত্ব পরী চরিত্রের উত্তরণ ঘটায়। এই কালো পাথরে খোদাই করা কঠিন মূর্তি যেন নিমেষে মাতৃত্বের পরশে কোমল মধুর রূপ ধারণ করে। পরী চরিত্র মাতৃত্বে উজ্জীবিত এক চরিত্র, পাশাপাশি টুরা চরিত্রটি বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে সে প্রেম মনস্তত্ত্বের রঙের রেখায় উজ্জ্বল এক চরিত্র। ভালোবাসার অর্থ বলপূর্বক ভোগ করা নয়, ভালোবাসার আসল প্রকাশ অপেক্ষায়, ত্যাগে– এই দর্শনই টুরা চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করে। পরী বারবার টুরাকে প্রত্যাখ্যান করলেও সে অপেক্ষা করেছে, পরীকে ভালোবেসেছে, তার পাশে থেকেছে। টুরার অপেক্ষার পরিণাম টুরা ও পরী চরিত্রদুটির মধুর মিলনে প্রতিফলিত। টুরা সৎ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রেমিক সত্তার পুরুষচরিত্র।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠিকে নিয়ে লেখা অন্য এক গল্প 'রেজিং রিপোর্ট', গল্পে টুইলা নামে আদিবাসী সাঁওতালী শ্রমিক কয়লাখাদানে কাজ করতে গিয়ে মারা যায়। বলা চলে সাহেবরা মুনাফার লোভে অসংরক্ষিত জায়গায় সব জেনেও টুইলাকে বিপদসঙ্কুল এলাকায় পাঠানোয় ধসে চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়। গল্পে টুইলার বিধবা যুবতী স্ত্রী সোহাগী অসহায়, শোষিত, বিধবা, পতিব্রতা নারী চরিত্র। সোহাগীর মতো হাজারো আদিবাসী নারীরা এভাবেই তাদের স্বামীকে হারায়, পেটের দায়ে স্বামীর মৃত্যুর পরদিনই যে খাদানে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে সেই স্থানেই তাকে কাজে যেতে হয়। সোহাগী অর্থ-লাঞ্ছিত, নিয়তি লাঞ্ছিত। সহজ সরল মানুষগুলো নিয়তির হাতে, উচ্চশ্রেণির হাতে মার খেয়ে জীবনের দুঃখবোধ ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়, সেইসব ট্র্যাজিক বেদনায় নিমজ্জিত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেছে এই সোহাগী চরিত্রটি।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ঝুমরু' গল্পটির ঝুমরু এবং দাসী চরিত্রাবলী অবলম্বনে আদিবাসী মানুষদের জীবন ও মনোবিশ্লেষণে তাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হল। ঝুমরু রূপসা কয়লাখনির সাঁওতাল শ্রমিক, যার বয়স আঠারো কি উনিশ। সে অনাথ, পাঁচ নম্বর সাঁওতালি ধাওড়ার লছি সর্দারের স্ত্রী দাসীর কাছে পাঁচবছর

বয়স থেকে মানুষ হয়েছে। ঝুমরু ভালোবাসে মতিকে। কিন্তু সাংসারিক জটিলতায় তাদের বিয়ে হয় না। গল্পে ঝুমরু অভিমানী, প্রেমিক যুবকরূপে চিত্রিত। ঝুমরু আজীবন মতির সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল এই জটিল পৃথিবীর বাইরে একান্ত তাদের ভালোবাসার সংসারে —

> '...এমনি করিয়া উভয়ে উভয়ের একান্ত পাশাপাশি স্নিগ্ধ সুরভিত বনপথ ধরিয়া তাহারা সমস্ত জীবন ভরিয়াই চলিতে পারে! এই গভীর অরণ্যানী ভেদ করিয়া পৃথিবীর কোনো মানবের বিষদৃষ্টি আসিয়া পৌঁছিবে না — হিংসাহীন, দ্বেষহীন, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ভিতর দিয়া যদি সে এই রহস্যময়ী নারীর হাত ধরিয়া পথ চলিতে চলিতে জীবনের সমস্ত শূন্যতা ভরিয়া লইতে পায় তাহা হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া সে চলবে - শুধু চলিবে! বাধা বন্ধনহীন এ পথ চলার যেন শেষ না হয়!'[১৩]

ঝুমরু চরিত্রে প্রেমিক সত্তার এক অনবদ্য রূপায়ণ ঘটেছে। ঝুমরু চরিত্রে প্রেমিকসত্তার পাশাপাশি সে প্রবল অভিমানীও। সে তার পালিতা মাকেও অন্তর দিয়ে ভালোবাসে আর সেই কারণেই লছির প্রতি তার পালিত পিতা বা আশ্রয়দাতার অন্যায় স্বীকার করেনি। তার পালিতা মা তার বিয়ের কন্যাপণ দিলেও সে লছির অপমান-অত্যাচার-আঘাত সহ্য করতে পারেনি, শেষমেষ গৃহত্যাগ করেছে। সে মুখ বুজে অন্যায় সহ্য না করে প্রতিবাদ করেছে। ঝুমরুর স্বরে তার অভিমান ঝড়ে পড়ে— 'সে বলিতেছে, না, তুর টাকা আমি লিব নাই, তুর ঘরেও আমি থাকব নাই। আমার তরে সবারই কষ্ট কেনে!'[১৪] ঝুমরু দ্বিবিধ স্তরে বিভাজনে গঠিত এক চরিত্র। সে প্রেমিক, প্রতিবাদী, অভিমানী মনের মানুষ।

গল্পে ঝুমরুর পালিতা মা দাসী যে ঝুমরুকে সন্তানস্নেহে বড় করেছে। দাসী চরিত্রটি মাতৃস্নেহ-রসে উজ্জীবিত মহৎ ও সৎ এক চরিত্র। দাসীর স্বামী ঝুমরুকে অকারণে লাঠির আঘাত করলে ঝুমরুর আঘাত যেন দাসীর অন্তরে লাগে। ঝুমরু তাকে ভুলবশত 'মা' সম্বোধন করায় সে তার জীবনের অপূর্ণতার মাঝে পূর্ণতা পায়। দাসী স্বামীর কাছে কখনো ভালোবাসা পায়নি, সেও মাতৃহীনা ছিল। তার নিজের না পাওয়াগুলো তার পালিত সন্তান ঝুমরুর মধ্যে দিয়ে পূরণ হয়েছিল। ঝুমরু না ভাত খেলে দাসীও ভাত খেতে পারে না, ঝুমরুর জন্য দাসী নিজের জমানো টাকাও দিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না। সে তার বাবা-মায়ের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত, স্বামীর ভালোবাসা থেকে

বঞ্চিত, ঝুমরুর ভালোবাসা দাসীর মতো অভাগী নারীর মনে শান্তি আনলেও ঝুমরুও অভিমানের বশে তাকে ছেড়ে যায়। মাতৃস্নেহে আকুল দাসী তা মেনে নিতে পারে না, সে যেন সারাজীবনের অভাগী, ট্র্যাজিক বেদনায় ভাস্বর এক নারী।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় শৈলজানন্দের 'বলিদান' গল্পের টগর চরিত্র সাহেবদের দ্বারা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, সর্বস্বহারা এক বেদনাদায়ক ট্র্যাজিক নারীচরিত্র। আদিবাসীরা সাহেব-উর্ধ্বতন বাবুদের নিষ্ঠুর লোভ, মুনাফার স্বার্থে কতটা অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি গল্পে উন্মোচিত। লাকুমাঝি ও টগরের অভাবের হলেও তাদের পুত্রসন্তান সোনিয়াকে নিয়ে সুখের সংসার। এখানে টগর ত্রিবিধভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে— ১) সে সোনিয়াকে নির্মমভাবে হারায়, ২) সে আপ্রাণ ভাবে তার স্বামীকে বাঁচাতে চাইলেও সাহেবদের চক্রান্তে লাকু প্রাণ হারায় এবং ৩) টগরের প্রিয় মুরগী লছমনিয়াকেও সে বলিদান দেয় রাগে-ক্ষোভে-হতাশায়। টগর ও তার স্বামী দুজনেই সহজ, সরল। তাদের সরলতার সুযোগ নেয় সাহেবরা। আদিবাসীজীবনের চরম বাস্তব দিকটা উদ্ভাসিত, কী নিদারুণ কষ্ট-অত্যাচার এই আদিবাসী মানুষগুলোকে সহ্য করতে হয় তারই উদাহরণ টগর ও লাকু মাঝি। সর্বহারা বেদনা বিধুর, প্রতিবাদী এক নারীচরিত্র টগর। কিন্তু এদের যে সামান্য প্রতিবাদ তা সাহেবদের মতো মানুষদের গায়েও লাগে না। এই মানুষগুলো যেন নিয়তি দ্বারাও নির্যাতিত।

গল্পে লাকু-টগরের সুখী দাম্পত্য, তাদের সংসার একনিমেষে নষ্ট হয়ে যায় সাহেবদের চক্রান্তে। টগর নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে লাকুকে বাঁচালেও সাহেবদের চক্রান্ত ও নিয়তি যেন লাকুকে মৃত্যুগহ্বরে টেনে নেয়। গল্পে লাকু চরিত্রটি তার সন্তান সোনিয়াকে লেখাপড়া শিখিয়ে কয়লাকুঠির সর্দার বানাতে চায়, সে আশাবাদী এক চরিত্র, পাশাপাশি সে সাহসীও, কারণ- সমূহ বিপদের মাঝে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিষাক্ত গ্যাস বন্ধ করতে একাকী এগিয়ে চলে। লাকু প্রতিবাদীমনস্কও, সে সাহেবকে খুন করে তার পুত্রের মৃত্যুর বদলা নিতে চায়। সাহেবদের কূটনীতি, ষড়যন্ত্রের শক্তির কাছে লাকু পারে না, উল্টে সে-ই সাহেবদের চক্রান্তে, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে জীবনযুদ্ধে হেরে যায়। টগর ও লাকু দু'জনেই গল্পের নির্যাতিত, অসহায় এক চরিত্র।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে শৈলজানন্দের 'রহস্যময়ী' গল্পের সাঁওতাল রমণী মইনু চরিত্রের মধ্যে লেখক মানবমনের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। মইনু গল্পের প্রথম থেকেই বড় রহস্যময়ী এক নারী। তাকে পাওয়ার জন্য, তার ভালোবাসায় এক সাহেব ইঞ্জিনিয়ার নিজের সবকিছু ছেড়ে তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মইনু সাহেবকে কথা দিয়েও কথা রাখে না, সে বারে বারে সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করে। সে কোলিয়ারিতে কাজ করে, মদ খায়, সিগারেট খায়, একাকী জীবনযাপন করে। 'মানুষের মন বড় বিচিত্র। কারও কথা শোনে না। মদ খেয়ে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে মইনু।'[১৫] মইনু'র মনের গহনে চলা ভাবনা রোধ করতে, ভাবনাকে ভোলাতে মইনু মদ খায়। মাদকদ্রব্য মানুষের সাধারণ চেতনা লোপ করলে অবচেতনে থাকে মইনুর অবদমিত চাওয়া-পাওয়াগুলো। সাহেবকে পরিত্যাগ করে, তার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা, তার জীবনযাপন তাকে রহস্যময়ী করে তোলে।

মইনু যখন ঠিকাদারকে বলে— 'ভা-লো-বা-সা। ভালোবাসা কাকে বলে জানিস তুই? ভালোবেসেছিস কাউকে?'[১৬] মইনু'র এই কথায় একটা যন্ত্রণার আভাস বর্তমান। ময়নার পালিয়ে বেড়ানো,যাযাবর স্বভাব, মনের দ্বিধা-সংকট থেকে মুক্তির আশায়, নিজের ভালোবাসার কাছে, নিজের মনের আয়নার সামনে না দাঁড়াতে পারার ভীতির কারণে তার এই পলায়নবৃত্তি মনোভাব। মইনু চরিত্রে পলায়নী প্রবৃত্তির অন্তরালের কারণ- মইনু তার মা'র কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই সে সাহেবকে ভালোবাসলেও কখনো তা স্বীকার করতে পারে না। তার মায়ের জীবন অভিজ্ঞতা মইনু'র জীবনে সংকটের, দ্বিধার সৃষ্টি করেছে। সে না পারছে ছাড়তে না ধরতে। সাহেবও যেমন তার ভালোবাসায় দগ্ধ হয়েছে, মইনুও তেমন বিরহে দগ্ধ হয়েছে। গল্পে মইনু রহস্যময়ী নারীচরিত্র যার অন্তঃস্থলে লুকিয়ে রয়েছে আপাত গূঢ় এক বিরহবেদনা, দ্বিধা। মইনু বিপর্যস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, অবসাদগ্রস্ত, রহস্যময়ী ট্র্যাজিক নারী, যার মনোবিশ্লেষণে নানান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক স্তরীয় বিন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় শৈলজানন্দের 'প্রতিবন্ধক' গল্পের ত্রয়ী চরিত্র পল্টু, কিন্নি ও ঝুমন— এই চরিত্রদের মধ্য দিয়ে ত্রিকোণ প্রেমকাহিনি ও তাদের মনস্তত্ত্ব উঠে এসেছে। কিন্নি পল্টুর বিয়ে করা স্ত্রী হলেও সে ঝুমনকে ভালোবাসে। গল্পে কয়লাখনির আদিবাসী শ্রমিকদের মানুষদের প্রেম-ভালোবাসা, দাম্পত্য-পরকীয়া, লোভ-লালসা, হিংসা-ক্ষোভের কথা লিপিবদ্ধ। পল্টু ও ঝুমনের মধ্যে মারামারি হয় কিন্নিকে নিয়ে কিন্তু ঝুমন হেরে যাওয়ায়, ঝুমন কিছুদিনের জন্য

নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কিন্তু ঝুমনের কিন্নির প্রতি প্রবল ভালোবাসার টান তাকে আবার কিন্নির সামনে এনে দাঁড় করায়। কিন্নি পল্টুর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে পল্টুকে ভালোবাসে না, পল্টুর মনে এই ভাবনা থেকে ঝুমনের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা জাগে। পল্টুর মধ্যে ফ্রয়েডীয় থ্যানাটসের পরঘাতী মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু পরিণামে সে আত্মঘাতী হয়। ঝুমনের মধ্যে তার ভালোবাসা কিন্নিকে হারানোর দুঃখে আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। সে যখন দেখে তার এবং কিন্নির সম্পর্ক সমাজের চাপে পরিণতি পাবে না, কোনো আশা নেই, সে তখন এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্নিও ঝুমনকে অনুসরণ করে খাদানে যায়। পল্টু নিজের স্ত্রীর পরকীয়া মানতে না পেরে, সে ঝুমনকে খুনের পরিকল্পনা করে।

পল্টুর মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েডীয় ও পাভলভীয় দুই মনস্তত্ত্বই কাজ করেছে। পল্টু হঠাৎ ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে ঝুমনকে খুন করতে যায়। পাভলভীয় মনস্তত্ত্বানুসারে মানুষ ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে যুক্তিহীন ও পাশবিক আচরণ করে থাকে। তীব্রতম আবেগের কারণে মানুষের সেই মুহূর্তে কোনোকিছু আর যুক্তিবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সেই মুহূর্তে মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অসামাজিক কাজ করে বসে এবং ভাবনাচিন্তার কোনো অবকাশ থাকে না। প্রেমের প্রতিদান না পেলে মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে। পল্টু চরিত্রের মনস্তত্ত্বে পাভলভীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব যথার্থভাবে পাই। স্ত্রী কিন্নি তাকে না ভালোবাসায় তার নিজের মনে একটা হীনমন্যতা ছিল, সেই হীনমন্যতার জায়গা থেকে ঝুমনের প্রতি পল্টুর ক্ষোভ। সে ঝুমনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তবে এক্ষেত্রে পল্টু নিজের আচরণে-চিন্তায় পরিবর্তন আনে, কিন্নি ও ঝুমনের ভালোবাসার প্রত্যক্ষ দর্শনে। পল্টু উপলব্ধি করে কিন্নি তাকে ভালোবাসে না, কিন্নি ও ঝুমনের ভালোবাসার মাঝে সে প্রতিবন্ধক। সে শেষমেষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে ঝুমন ও কিন্নির ভালোবাসার পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করে। এর থেকে বোঝা যায় পল্টু এক সৎ, প্রেমিক, ত্যাগের মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল মানবসত্ত্বা, যে প্রেমমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরীয় বিন্যাসের রেখায় জীবন্ত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠি’ গল্পের বিলাসী প্রেমিকা নারীচরিত্র। প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য সে তার জীবনকেই উৎসর্গ করে দিয়েছে। বিলাসীর সাথে নান্‌কুর ভালোবেসে বিয়ের দু-তিন বছর পর নান্‌কু খাদানের অন্য এক নারীশ্রমিক মাইনুর সাথে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং মাইনুকে নিয়ে হঠাৎ নান্‌কু পালিয়ে যায়। এই বিশ্বাসঘাতকতায় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায় বিলাসী, সে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে, অভিমানে স্তব্ধ হয়ে যায়-

'সে কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে তাহাকে এমন ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিল? বিশ্বাস না করিয়াও তো সে পারে না! প্রথম যৌবনের সুখ-স্মৃতি-গুলা বিলাতীর মনে পড়িতে লাগিল- সেই নান্কু আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে! বিলাসী যে তকে চিরকাল ইমাওনদার বলিয়াই জানে! ... ক্ষুব্ধ অভিমানে তাহার মনে হইতে লাগিল, তুই বেইমানী করতে পারিস নান্কু, আর আমি পারি না? ... বিলাসী প্রাণপণে অশ্রুনিরোধ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল'।[১৭]

মানুষ হঠাৎ প্রবল শোক পেলে স্তব্ধ হয়ে যায়, বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। নান্কুর থেকে হঠাৎ পাওয়া মানসিক আঘাতে বিলাসীও যেন তাই স্তব্ধ হয়ে পড়ে, বাস্তবকে মেনে নিতে পারে না, কিন্তু সত্য যখন প্রকট হয়, বাস্তবতাকে মেনে নেয় বিলাসী।

বিলাসী এরপর রমনার কাছে যায়, বছরখানেক একসাথে থাকে। কিন্তু বিলাসীর চেতনায় নান্কুর ফিরে আসার ক্ষীণ আশা, তার প্রতি ভালোবাসা অমলিন থাকে। সময় মানুষের ক্ষতে প্রলেপ লাগায় কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি, সময় ও রমনা বিলাসীর নান্কুর প্রতি দুর্বলতা-ভালোবাসাকে মলিন করতে পারেনি। তার সচেতনতায় সেইভাব প্রকাশ না পেলেও তার গানে নান্কুর প্রতি ভালোবাসা,বিরহব্যথা-বেদনা, অপেক্ষা মূর্ত। বিলাসী সাধ করে নান্কুর জন্য পলুই কিনেছিল কিন্তু সেই পলুইয়ে রমনাকে হাত দিতে দেয় না বিলাসী বছর খানেক পরেও। এক্ষেত্রে স্পষ্ট কয়েকবছর পেরিয়ে গেলেও বিলাসীর নান্কুর প্রতি ভালোবাসা অমলিন।

বিলাসী যখন বিষণের মারফত নান্কুর ফিরে আসার এবং তার মৃত্যু সংবাদ পায় প্রথমে সে অভিমানে না গেলেও কিছু মুহূর্ত পরেই প্রবল ভালোবাসার কাছে, তার অভিমান হেরে যায়। নান্কু বেঁচে নেই, বিলাসী তার জীবনে এই শূন্যতার সত্যকে উপলব্ধি করায় সে নিজে থেকেই মৃত্যুবরণ করতে চায়। বিলাসীর এই আত্মহত্যা বা আত্মবলিদানের বাসনার অন্তরালে অস্তিত্বের সংকট ও তার দ্বারা নান্কুকে হত্যার পাপচেতনা কাজ করেছে। বিলাসী কোনোভাবেই তার দ্বারা নান্কুর মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি, সে বিষাদময়তায় ডুবে গেছে। বিলাসীর আত্মহননের বাসনাকে ফ্রয়েডীয় অভিমত অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমাদের মনের মধ্যে জীবনমুখী ও মৃত্যুমুখী পরস্পরবিরোধী দুই শক্তি ক্রিয়াশীল। আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও এই দুই শক্তি বা প্রবৃত্তি কাজ করে। মৃত্যুমুখী প্রবৃত্তি বা থ্যানাটসের মধ্যে আত্মঘাতী

ও পরঘাতী প্রবৃত্তি বিরাজমান। বিলাসীর মধ্যেও এই আত্মঘাতী প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল। সে নান্‌কুর মৃত্যুর কারণ হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করে এবং নান্‌কু না থাকায় সে তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলে এবং তারমধ্যে আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রবলতর হয়ে ওঠে। শত আঘাত, অভিমানের পরেও ভালোবাসার জন্য নির্দ্বিধায় নিজের আত্মবলি দেওয়ায় বিলাসীর প্রেম হয়েছে কালজয়ী, এই কালজয়ী প্রেমের মূল্যেই বিলাসী মহীয়ান ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নারীর মন' গল্পে ভুলি এক প্রেমিকা নারীচরিত্র। ভুলির স্বামী পীরু ভুলির আপন বোন টুরনীর সাথে মেলায় যায়, পরকীয়া সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ভুলি তার স্বামী ও বোনের এই পরকীয়া সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরে হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে টুরনীকে থাপ্পড় মারলে, পীরুও সর্বসম্মুখে ভুলিকে ভীষণ প্রহার করে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ভুলি তার বিয়ের প্রথম সম্বন্ধ আসা ভোলার কাছে যায় এবং ভুলি জানত ভোলা তাকে পছন্দ করে, তাই সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে ভোলাকে পীরুর সাথে মারামারি করে পীরুকে পরাস্ত করতে বলে। পীরুকে যদি ভোলা পরাজিত করে ভুলি তাকে বিয়ে করবে এই প্রলোভনও দেখায়। এক্ষেত্রে ভুলিকে নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য সুবিধাবাদী নারী বলেই মনে হয়। কিন্তু ভোলা পীরুর সাথে মারামারিতে পরাস্ত হয়, এরপর যখন ভুলি শোনে তার বোন টুরনী আসামে চা-শ্রমিকের কাজে চলে যাচ্ছে, সে আর কোনোদিন ফিরবে না এই সংবাদে ভুলির আনন্দিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা সে হয় না, বরং তার বোনের বদলে সে নিজে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। ভুলি চরিত্রের একদিকে তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা যেমন চিত্রিত, তেমনই তার বোনের প্রতিও গভীর ভালোবাসা পরিস্ফুট। টুরনী চলে গেলে সে নির্ঝঞ্ঝাটে পীরুর সাথে দাম্পত্যজীবন কাটাত পারত, কিন্তু তা সে করেনি। ত্যাগের মধ্যেই ভালোবাসার আসল সুখ তা ভুলি বুঝেছে। ভুলির এই আত্মত্যাগ, তার চরিত্রকে মহানুভব করে তুলেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'সাঁওতাল' গল্পে টেবির পিতা লখিন্দর স্বাভাবিকভাবেই স্নেহবৎসল পিতা পাশাপাশি প্রতিশোধী চরিত্র। যে সমাজের নির্মম প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে তার মেয়ের বিষবাণবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু দেখতে হয়। এই যন্ত্রণার জ্বালা মেটবার আগেই জমিদারের নায়েব গ্রামবাসীদের কুটির জ্বালিয়ে দেয়। উৎখাত হতে হয় মানুষগুলোকে। কিন্তু পিতার বুকের হাহাকার দেখা যায়- বনের ভিতর যেখানে টেবিকে মারা হয়েছিল সেই স্থানে সারারাত 'মা-মা' বলে পাগল প্রায় চিৎকার, লখিন্দরের হৃদয়ের কান্নামাখা আর্তি প্রকাশিত। টেবির বাবা ও তার মৃতা মেয়ের

যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিয়েছে নায়েবের ছয়বছরের কন্যাকে চুরি করে। লখিন্দর যেন এক বাবাকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা।

গল্পে আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘আন্টা-বাংলা’ গল্পের চরিত্রচিত্রণ ও তাদের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে আদিবাসী জনজীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল। গল্পের চরিত্র বিরসা ওরাঁও ট্র্যাজিক বিষণ্ণতায় ভাস্বর এক চরিত্র। সে নীলকর সাহেবদের বাংলোয় কাজ করে, বেঞ্জামিনদের তিনপুরুষের আধিয়াদার সে। তাদের চারবিঘা জমির তিনবিঘাই নীলচাষ করতে হয়। সাহেবদের কাছে পুরুষানুক্রমে বিরসারা মাথা নত করে থাকে। সেও সাহেবকে ‘হুজুর বাপ’ বলে সম্বোধন করে, ভয়-শ্রদ্ধা করে। তারা আদিবাসী হয়েও, সাঁওতাল হয়েও ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রিস্টান হয়েছে। বিরসা ওরাঁও ও তার পুত্রবধূ রেভারেন্ড টুডু পাদরির কথা শুনে রবিবার আন্টাবাংলায় সাহেবদের কাজে না যাওয়ায় তাকে শাস্তি পেতে হয়— চাবুক খায়, আটটি ইট মাথায় নিয়ে রোদের মধ্যে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকা। বিরসাকে সাহেব ‘কুক্কুরীর বাচ্চা’ বলে সম্বোধন করে। ইংরেজদের অত্যাচারের চিত্র বিরসা চরিত্রটিকে দেখলে স্পষ্ট। সহজ সরল আদিবাসী মানুষগুলোর উপর শোষণ ও আদিবাসী সহজ সরল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরসা চরিত্রটি অত্যন্ত সৎ তা বোঝা যায়—‘সাহেব সাজা দিয়েছে, তার নিমক খাই। ইমানের কাছে ঝুটা হতে পারব না’।[১৮]

বিরসা সততার সাথে এভাবেই দিনের শেষে মৃত্যুবরণ করে। বিরসা সাহেবদের অত্যাচারে প্রথম থেকেই দেখি তার মধ্যে ভয় মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল। সাহেব যখন বিরসাকে ডেকে পাঠায়, সে সাহেবের সামনে যেতে প্রচণ্ড ভয় পায়—

> ‘না জানি কী হইবে ভাবিয়া তাহারই বুক ঢিপ ঢিপ করে। নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্য, এই অভূতপূর্ব স্থিতির গুরুত্ব হালকা করিবার চেষ্টা করে একটি রসিকতা করিয়া; ‘বঞ্জমন সাহেব রাগে পায়জামা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।’ সে নিজেই এই কাষ্ঠ রসিকতার সময়োপযোগিতায় সন্দিহান; বিরসার ইহা শুনিবার মতো মনের অবস্থা থাকিবার কথা নয়’।[১৯]

বিরসার এই ভয় মনোবৃত্তি কেন তা মনস্তত্ত্বের নিরিখে আলোচনা করা যাক। আমরা ভয় কেন এবং কোন অবস্থায় মূলত পাই বা পেয়ে থাকি- যখন কোনো বিপদের আশঙ্কা করা হয় তখনই এই ভয় হয়। বিরসাও

যেন তার ভবিতব্য বুঝতে পেরেছিল। বিরসা পরিচিত ছিল সাহেবদের নিষ্ঠুরতার সাথে তাই সে সাহেব তার উপর কীরূপ অত্যাচার করতে পারে তা আন্দাজ সে করেছিল, তাই তার মধ্যে ভয় মনোবৃত্তি দেখা যায়। বিপদকে এড়িয়ে যেতে চাওয়া এবং বাঘের মুখে পড়লে যেমন আমাদের আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে বা নিষ্ক্রিয় ভাব কাজ করে, তেমনই বিপদের সময় আমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে আমাদের ছেড়ে চলে যায়। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল যিনি ভয়ের অনুভূতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভয়ের অনুভূতিকে পলায়নী প্রবৃত্তির রূপ বিশেষ বলেছেন। ভয় পেলেই আমাদের মনে পালানোর ভাব জাগে সেই জন্য হৃদপিণ্ডের কাজ দ্রুততর হয়। এই পলায়নকার্যে দেহের যন্ত্রাদিও সাহায্য করে। বিরসার ক্ষেত্রেও ভয় পেয়ে বুক টিপটিপ করতে থাকে, সে নিজের মনেই ভুয়ো কাষ্ঠরসিকতা করে সেই সময়ের ভয়ের অনুভূতি থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মুক্তি পেতে। ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মৃত্যুভয়। বিরসার মনেও ছিল এই মৃত্যুভয়, সে যেন আগেই তার ভবিতব্য বুঝে গিয়েছিল এবং তার ভয়ই তার জীবনে সত্যি হয়ে নেমে আসে। বিরসা এই সৎ, ট্র্যাজিক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক আদিবাসী নিম্নবর্গীয় মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক রূপ যেমন একদিকে তুলে ধরেছেন, তেমনই সাহেবদের করা শোষণ, নির্মম অন্যায়-অত্যাচারের চিত্রও তুলে ধরেছেন।

গল্পের অন্য এক চরিত্র বোটরার মা, বিরসার পুত্রবধূ। বিরসার পুত্রবধূ তার শ্বশুরের সঙ্গে কাজ করে, সে স্বামীহারা, ছোট ছেলে তার। তার শ্বশুরের প্রতি মমত্ববোধ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা চরিত্রটিতে স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ আনে। 'বোটরার মা'র কোনো নাম নেই, সে তার সন্তানের পরিচয়ে পরিচিত। প্রাচীন থেকে বিংশ শতাব্দীতেও মেয়েদের পরিচয়ই তার স্বামী-সন্তানের নামে। সে কারো মেয়ে, স্ত্রী, মা, তার নিজস্ব পরিচয়–নাম তা যেন এসবের অন্তরালে হারিয়ে যায়। বোটরার মায়ের স্বামী আসামে কাজে গিয়ে আর ফেরে না। তার কাছে পুনর্বিবাহের প্রস্তাব এলেও সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে না, শ্বশুর ও ছেলেকে নিয়েই তার সংসার। সে দৈন্য জর্জরিত জীবন থেকে মুক্তির আশা বা স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তা যখন পূরণ হয় না, সেই মুক্তির আশা ইউটোপিয়ার সত্য যখন প্রতীতি লাভ করে না, তখন বোটরার মাকে সাহেবদের রক্ষিতা হতে হয়। তার শ্বশুর মারা যায়, জমি বেহাত হয়। বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে আর কোনো উপায় না থাকায় বোটরার মাকে সাহেবকুঠিতে থাকতে হয়। বোটরার মা'র মনে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব 'নিমিত্তবাদ' ক্রিয়াশীল একথা বলা যেতেই পারে।

গল্পের অন্য এক চরিত্র বোটরা ওঁরাও চরিত্রটি দ্বিবিধ দ্বন্দ্বে আবর্তিত ট্র্যাজিক এক চরিত্র। 'আন্টাবাংলা'-কে কেন্দ্র করে বোটরা চরিত্রটি আবর্তিত ও তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি রূপ পেয়েছে। আন্টাবাংলাতেই বোটরার ঠাকুরদা বিরসার মৃত্যু ও তার মা নীলকর সাহেবের রক্ষিতা আবার সে নীলকর সাহেবদের বদান্যতায় ওই আন্টাবাংলায় চাকরি পায়। বোটরার জীবনটাই যেন আন্টাবাংলাকে ঘিরে আবর্তিত, তাই আন্টাবাংলার ইট-কাঠ-পাথরকেও সে ভালোবাসতে শুরু করে। আন্টাবাংলা, যেখানে তার ঠাকুরদার মৃত্যু, তার মায়ের রক্ষিতা হওয়া, তার বেড়ে ওঠা, তার চাকরি, বোটরার জীবনটাই যেন আন্টাবাংলা কেন্দ্রিক। আন্টাবাংলাই যেন বোটরা চরিত্রের প্রতীক। কালের নিয়মে আন্টাবাংলা ধ্বংস হলে বোটরার অস্তিত্বও যেন ধ্বংস হয়ে যায়।

বোটরাকে গল্পে যখন শিশুচরিত্র হিসাবে দেখা যায় তাকে সাহসী চরিত্র ও অনুসন্ধানী চরিত্র হিসাবে দেখা যায়। সে সবকিছু জানতে চায়, সে ছোট থেকেই পরিশ্রমী। এখানে বোটরা চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে পাভলভীয় মনস্তত্ত্বের কথা এসে পড়ে। পাভলভের মতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশই মূলত মানুষের মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ এবং জীবনের সমস্যা সৃষ্টির মূলে থাকে। পরিবারের বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ সেখানেই পরিবারের নিয়মকানুন, বিধিব্যবস্থা ও ন্যায়নীতির উৎস থাকে। এখানে বোটরার ক্ষেত্রেও এই সামাজিক পরিবেশই বোটরার ছোট থেকে রোজগারী ও সব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব তৈরির মূলে। বোটরা চরিত্র বিশ্লেষণে, মনোবিশ্লেষণে ও তার জীবন পরিণতিতে তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ভীষণভাবে অনুঘটকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বোটরা চরিত্রে তার ঠাকুরদার প্রতি গভীর ভালোবাসা বিদ্যমান। বোটরা আন্টাবাংলা নিয়ে ভীষণই আবেগপ্রবণ, সে যেদিন বার-রুমের বেদী ভাঙা হয় কেঁদে ফেলে। বাররুমের ইটগুলোকেও সে পরম যত্নে রাখতে বলে। বোটরাকে যখন আন্টাবাংলা ছেড়ে চলে যেতে হবে, তার যেন জীবন নিয়ে আশা কমতে থাকে—'আন্টাবাংলাই যখন ছাড়িতে হইল তখন আর দেশে ফিরিলেই বা কি, না ফিরিলেই বা কি?'[২০] আন্টাবাংলা ছেড়ে যাওয়ার জন্য বোটরার মনে সারাক্ষণই একটা অস্থির বেদনার ভাব বিরাজমান ছিল, সেখান থেকে সে 'হ্যালুসিনেশান' করতে থাকে। এছাড়া তার মধ্যে অসুস্থ ভ্রান্ত চিন্তা অনুভূত হয়, যাকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় 'ডিল্যুইশন' বলা হয়। এর লক্ষণও প্রকাশ পায় বোটরার মধ্যে, তার সব পেশী, শিরা দব্‌দব্‌ করে। শেষ পর্যন্ত বোটরার মৃত্যু, আন্টাবাংলা ধ্বংস যেন

এক যুগের স্মৃতির অবসান। এই আন্টাবাংলার ধ্বংসের সঙ্গে বোটরার জীবন পরিণতি গল্পে বোটরা চরিত্রে এক আলাদা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। আন্টাবাংলা ও বোটরার জীবন যেন সমান্তরালভাবে চিত্রিত।

গল্পে আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণশীর্ষক আলোচনায় সতীনাথ ভাদুড়ীর রচিত 'অভিজ্ঞতা' গল্পের চরিত্রদের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের যে মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত, তা বিশ্লেষণ করা হল। থানার দারোগা রামভরোসা প্রসাদ, নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একটি শিশুহত্যার রহস্য তদন্ত কীভাবে করলেন এই গল্পে তাই বর্ণিত। পুরণ সিং-এর জন্য দারোগা রামভরোসাকে একদিন অনেক অপমানিত হতে হয় এবং এই অপমান থেকেই রামভরোসার পূরণ সিংয়ের উপর একটা ক্ষোভ জমেছিল। শেষে রামভরোসা সাইকেল নিয়ে নিজের অজান্তেই পূরণ সিংকে আঘাত করে ফেলে এবং সে বিরসা মাঝির শিশু খুনের সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। গল্পে বিরসা মাঝি চরিত্রটি তার তিনমাসের শিশুপুত্রকে খুনের দায়ে সাব্যস্ত। বিরসার বউ মনে করে বিরসা তার শিশুপুত্রকে খুন করেছে কিন্তু বিরসা বারবার বলে সে ইচ্ছাকৃতভাবে তার ছেলেকে খুন করেনি, ঘটনার আকস্মিকতায় তার হাত থেকে কুড়ুল ছিটকে গিয়ে তার ছেলের মাথায় লেগে ছেলেটি মারা যায়।

ঘটনার আর একদিকে দেখা যায় বিরসার স্ত্রীর সোনাই সা নামক এক দোকানদারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং বিরসাও মনে করত এই পুত্রসন্তান তাদের নয়, তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি। সে অনেকবারই বাচ্চাটাকে খুন করার কথা ভেবেছিল। এখানে পাভলভীয় মনস্তত্ত্বানুযায়ী যদি বিরসার মনের ভাবনা বোঝার চেষ্টা করা হয় সেখানে দেখা যায় প্রেমের যথার্থ প্রতিদান না পেলে সাধারণ হীনমন্যতায় মন আচ্ছন্ন হয়। তাৎক্ষণিক উদ্দীপক দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ পাশবিক আচরণ করতে উদ্যত হয়। স্বাভাবিকভাবেই কোনো স্বামীই তার স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না। ফলে বিরসা তার পুত্রকে খুন করবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিরসার মনস্তত্ত্বে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব বিরাজমান। এর পাশাপাশি ফ্রয়েড থ্যানাটস্ নামক যে মানসিক শক্তির কথা বলেছেন তার পরঘাতী যে শক্তি দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয়, তার বহিঃপ্রকাশও বিরসা চরিত্রে প্রতিফলিত।

গল্পে দেখা যায় বিরসার মনের যে ক্ষোভ তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে গাছকাটার উপরে। গাছটাকেই যেন সোনাই সা'র প্রতীক রূপে চিহ্নিত করে তাতে কোপ দিতে থাকে, কারণ যেদিনই তার বউ এই

গাছটার উপর কাপড় শুকাতে দিয়েছে সেদিনই সোনাই সা বাড়িতে এসেছে। বিরসা তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার ধারাটি প্রতিহত হওয়ায় তার মনে হত্যার আক্রমণাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে, সে ভেবেছে এই শিশুপুত্রকে হত্যা করবে। বিরসা চরিত্রটিতে হত্যার এই মনোভাব থাকলেও পর মুহূর্তে সে স্নেহের পরবশ হয়ে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা ভেবেছে এতে শিশুটির তো দোষ নেই। সে নিজেকে সংবরণ করেছে। কিন্তু যেন ভাগ্যের বা নিয়তির নির্মম পরিহাসে তার মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই যেন সত্য রূপ পায়। আকস্মিকভাবে তার হাতের কুড়ুল ছিটকে তার পুত্রের মৃত্যু। এক্ষেত্রে যেন বিরসার মনের *Intuition power* এতটাই প্রবল ছিল যে তার মনের নেতিবাচক ভাবনা বা *negative energy* র প্রভাব বাস্তবে পরিণত হয়। বিরসা চরিত্রটি যেন ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

দেশভাগজনিত দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান বিভাজন, অন্ত্যজ মানুষের জীবনচিত্র উঠে এসেছে সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘রথের তলে’ গল্পে। সদ্য স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রূপটি গল্পে সুস্পষ্ট। চরিত্রচিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় গল্পের নাটসম্প্রদায়ের ভৈরব সর্দার চরিত্রটিতে আলোকপাত করা হল। ডালটন সাহেবের মতে, নাট সম্প্রদায় বেদিয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অনেকে মনে করে তারা নিম্নবর্গীয় হিন্দু। এ নিয়ে মতভেদ আছে। এক্ষেত্রে আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদিয়া জনজাতি নিয়ে লেখা গল্প ‘বেদেনী ’ দেখি, এছাড়াও আরও অনেক গল্প আছে যেখানে দেখা যায় বেদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ অনেকে নিজেদের ধর্ম হিন্দু আবার অনেকে মুসলমান ধর্মাবলম্বী হিসাবে পরিচয় দেয়।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভৈরো নাট আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নরম স্বভাবের, অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবাপন্ন, প্রতিবাদী স্বভাবের মানুষ। তার চরিত্রের এই স্তরীয় বিন্যাসই তাকে বিশিষ্ট করে তোলে। বিভিন্ন মেলায় নাচ-গান করেই নাটজাতির জীবন-জীবিকা এবং সমাজের নিজস্ব নিয়ম-রীতি। গ্রামের জমিদার শকুর খাঁ প্রজাদের উপর দয়াশীল ছিল ঠিকই কিন্তু জাতির মান-সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে কথা কাটাকাটিতে হঠাৎ ভৈরো সর্দার জমিদারকে খুন করে। এক্ষেত্রে ভৈরবের মনোবিশ্লেষণে পাভলভের মনস্তত্ত্বের কথা প্রাসঙ্গিক— প্রক্ষোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ যুক্তিবুদ্ধিহীন কাজ করে, পাশবিক আচরণ করে। প্রক্ষোভ সামাজিক ও প্রাকৃতিক দু’রকম কারণই মেজাজকে প্রভাবিত করে। তীব্রতম আবেগ বা তাৎক্ষণিক উদ্দীপক দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অসামাজিক কাজ করে বসে। ভৈরোর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তার নাতনির সম্ভ্রম রক্ষার্থে এবং নাট জাতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে ভৈরো

জমিদারকে হত্যা করে। এই কারণে সর্দারকে চোদ্দ বছর জেল খাটতে হয়েছে কিন্তু সে কোনোভাবেই নিজের ও জাতির মর্যাদায় আঁচ লাগতে দেয়নি।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে তার রেখে যাওয়া সমাজের গৌরব নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবর পায়। চোদ্দ বছর আগে ফেলে যাওয়া সমাজ আর চোদ্দ বছর পর ফিরে আসা সমাজ তার কাছে চেনা নয়, আপন নয়। সে আরও আঘাত পায় যখন বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে জাত-পাত, সাম্প্রদায়িকতার সম্মুখীন হয়। তারা কখনও হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ করেনি, তার নিজের জাত নিয়ে গর্ব ছিল তা যেন এক লহমায় ভেঙে যায়। একটি যুগের অবসান, অবক্ষয়ের ছবি পাওয়া যায় ভৈরো চরিত্রে। ভৈরো সর্দার একটা যুগকে বহন করেছে যা অবলুপ্তির পথে। হতাশায় ট্র্যাজেডিতে নিপতিত চরিত্র হলেও ভৈরোর মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধ, জাতির প্রতি সততা, কর্তৃত্বে যে বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা তা ভৈরো চরিত্রকে বিশিষ্ট করে তোলে।

সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পের স্টিফান হোরো আদিবাসী জনজাতির আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সচেতন, জেদী, প্রত্যয়ী, দৃঢ়সত্তার চরিত্র। স্কুলে তার কাছে হকিস্টিক না থাকলেও সে তার খেলার ইচ্ছা, জেদ এবং প্রবল মনোবলে হকিস্টিকের সঙ্গে নিজের খালি পায়ে তাল মিলিয়ে হকি খেলে। সে স্কুলে ইংরাজিতে বেশি নম্বর পেলে অন্য ছাত্র-স্যাররা সন্দেহ করে যে, সে খ্রিস্টান বলে কেবল বেশি নম্বর পেয়েছে। হোরো তার মেধা প্রমাণ করার জন্য সংস্কৃত নেয় এবং সফল হয়। এখানেই হোরোর মেধাবী, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ীসত্তার পরিচয় লভ্য।

স্টিফান হোরো মুন্ডা জনজাতির হলেও সে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়েছে। পড়াশোনায় মেধাবী হওয়ায় স্কুলের খ্রিস্টান ফাদার লিন্ডন ও অন্য ফাদাররা তাকে নিয়ে আশাবাদী ছিল। কিন্তু স্টিফানের মনে তার স্বজাতির প্রতি টান অনুভবে সে পড়াশোনায় উদাসীন হয়ে যায়। ততই যেন ফাদার তাকে আষ্টেপৃষ্টে খ্রিস্টানধর্মের প্রতি বেঁধে রাখতে চায়। ফাদারের মনে হোরোর স্বজাতিতে ফিরে যাওয়ার ভয় ও অপমানবোধে হোরোর প্রাণের বাঁশি ফাদার ভেঙে দেয়, কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হোরোর নির্লিপ্ততা তার চরিত্রের রহস্যময়তার আবহ সৃষ্টি করে।

কিন্তু তার নির্লিপ্ত মনোভাবের এবং রহস্যময় আচরনের উদ্‌ঘাটন ঘটে আটবছর পরে। মুন্ডা নেতা সোখোর জেল হলে স্টিফান হোরো বাহ্যিকভাবে নির্লিপ্ত থাকলেও অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেনি। সে বিরসাইট আন্দোলনে যোগ দেয়, তার জেল হয়। সে তার নাম পরিবর্তন করে রুনু হোরো নামে। জঙ্গলকে বাঁচাতে পাদরীদের থেকে দূরে সরে আসে কিন্তু এই যুদ্ধে সে তার ভালোবাসার মানুষ চিরকিকে হারায়। হোরোর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সচেতন দৃঢ় সত্তা যেন হতাশা, দুঃখবোধের অতল হারিয়ে গেছে পরাজয়ের ট্র্যাজেডিতে।

সুবোধ ঘোষের 'লঘু আরণ্যক' গল্পের মিঠি সাহসী, প্রতিবাদী এক আদিবাসী নারীচরিত্র। দানুয়া ভালুয়ার শ্বাপদসংকুল অরণ্যে মিঠি পশু খোঁজার কাজ করে। তার স্বামী মারা গেলে, সে তার শিশুসন্তানকে নিয়ে একাকী বাস করে, সে প্রসাদবাবুর কাজের প্রতিও অনুগত। কিন্তু প্রসাদবাবুর জৈবিক কামনা-বাসনার মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায়। মিঠি যেন হরিণী থেকে বাঘিনীতে রূপান্তরিত হয়। প্রসাদবাবু টাকা দিয়ে মিঠিকে কিনতে চাইলে, বলপূর্বক নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে চাইলে সে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর ন্যায় প্রসাদবাবুর গলায় হিংস্র দাঁতের কামড় দিয়ে তাকে হত্যা করে। এই হত্যা আত্মরক্ষার্থে। মিঠির আচরণে ও কর্মে অন্বিত সাহসিকতা সরণী বেয়ে প্রতিবাদী, প্রতিরোধী সত্তায় রূপান্তরিত।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো কুর্মি জনজাতির অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়, সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। স্বজাতির অধিকার সচেতনতা ও প্রতিবাদী চেতনায় ভাস্বর দুলার মাহাতোর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ফিউডাল রাজা ও সিন্ডিকেট নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মাহাতোকে হত্যা করে। প্রতিবাদের স্বরকে এভাবেই চিরকাল ক্ষমতা ও টাকার জোড়ে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। সামন্তবাদ ও ধনবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, প্রতিবাদের পরিণাম মৃত্যু, যা দুলাল মাহাতোর চরিত্রে ট্র্যাজেডির নিষ্ঠুরতা প্রতিভাত।

কমলকুমার মজুমদারের 'বাগান কেয়ারি' গল্পের কুলি-মজুর সাঁওতাল শ্রমিকটি অত্যাচারিত, অসহায়, লাঞ্ছিত মানুষ। বাগান কেটে নগর নির্মাণের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকটি অনাহারের ফলে অপুষ্টির কারণে মারা যায় এবং এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই মহাজনদের। তাদের কাছে কেবল লাভ-লোকসান গুরুত্ব পায়, বড়ই তুচ্ছ এই আদিবাসীদের জীবন। ধনবাদী শোষণ ও অত্যাচার, লাঞ্ছনার

নিষ্ঠুরতার প্রত্যক্ষ প্রতিভু এই নামগোত্রহীন কুলি শ্রমিকটি। এই চরিত্রটি কেবল একটি চরিত্র নয়, একটি গোটা শোষিত জাতির আখ্যান।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ-শীর্ষক আলোচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভোগবতী' গল্পটির আদিবাসী চরিত্র শুকলাল ও সোনা চরিত্রদ্বয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল। একদিকে সোনা চরিত্রটি সৎ, পরিশ্রমী, প্রেমিকা চরিত্র, অন্যদিকে তার আকস্মিক মৃত্যু যেন জীবনের ট্র্যাজেডি। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ কতটা লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত জীবনের মূর্ত প্রতীক সোনা ও শুকলাল চরিত্রটি। আদিবাসী মানুষদের জীবন কতখানি অসহায়, স্বাধীনতাহীন, অত্যাচারিত তার প্রমাণ এই গল্পের শুকলাল ও সোনা চরিত্রতে বিদ্যমান। সোনার মৃত্যু, যা ধনবাদী ও সামন্তবাদী সমাজের বিশেষ কাঠামোর স্বার্থে। বৃহত্তর সমাজে সোনার মতো আদিবাসী মেয়েদের মৃত্যু, যে ট্র্যাজিক পরিণতি তার দায় সমাজ নিতে চায় না—

> 'অমন কত হয় — অমন কত হয়েছে। কে তার খবর রাখে, কে তা নিয়ে নিজেকে বিব্রত বোধ করে? ডিফেন্স লাইন তৈরি করতেই হবে — বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্যে, অসুরদের নিপাত করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যে। একটা সাঁওতাল মেয়ের মৃত্যু। তার জন্য মাটি কাটা বন্ধ থাকবে না — মাটি ফেলাও না'।[২১]

আদিবাসী মানুষদের জীবন আধুনিক ধনবাদী ও সামন্তবাদী সমাজের কাছে কতটা তুচ্ছ, নিষ্প্রয়োজনীয় তা সোনার মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রকট। সোনার স্বামীর প্রতি নিখাদ ভালোবাসার রূপ দেখা যায়, সে ছিল তার স্বামীর ছায়াসঙ্গী। সোনা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে শুকলালের সঙ্গ দিয়েছে, কাঠকাটায়, মাটিকাটায় সবকিছুতে তার স্বামীর সাথে থেকেছে। তারা এক সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে চাইলেও, তাদের জীবনে কেবল সামান্য খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান ছাড়া আর কোনো চাহিদা না থাকলেও সভ্যসমাজের চাহিদাই তাদের জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য দায়ী।

শুকলাল সোনার স্বামী, এই চরিত্রটি প্রেম এবং প্রেম-মনস্তত্ত্বের রঙে ও রেখায় উজ্জ্বল জীবন্ত এক চরিত্র। যে তার স্ত্রী সোনাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। শুকলালের অনুভূতিতে তার মৃত স্ত্রীও ভোগবতী ঝরণা সর্বক্ষণ বিরাজমান। এই ভোগবতীকে ঘিরেই শুকলালদের মতো আদিবাসী মানুষগুলির জীবন

আবর্তিত। যে পাথরভূমি, প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের জীবন নির্ভর সেই প্রকৃতি ভূমির মাটিতেই কোপ পড়াকে শুকলাল মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, একটা অস্থিরতা তার মধ্যে কাজ করছিল। শুকলাল তার স্ত্রীকে ভীষণই ভালোবাসত, সোনার মৃত্যুতে যেন বুর্জোয়া সমাজের নগ্নরূপ শুকলালের চোখে ধরা পড়ে। সে এতটাই মানসিক আঘাত পায় তার স্ত্রীর মৃত্যুতে যে, সে যেন কাঁদতে ভুলে যায়, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারে না, স্তব্ধ হয়ে যায়। সে ভাবে তার স্ত্রীর মৃত্যু প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রবল মানসিক আঘাত মানুষকে স্তব্ধ করে দেয়। মানসিক আঘাতের দরুন যে মনের অবস্থা মানুষের মধ্যে দেখা দেয় তা কখনই মনোবিকারের পর্যায়ে পড়ে না। প্রবল মানসিক আঘাত, যেমন- পরমাত্মীয় বিয়োগ, এক্ষেত্রে মানুষ একধরনের মনস্তাপে ভোগে। যেটা শুকলাল চরিত্রেও লক্ষণীয়—

> ‘পাহাড় তার ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছে — সে-ও পাহাড়কে ক্ষমা করবে না। দু-হাতে সে ডাইনে বাঁয়ে যা পাচ্ছে কেটে চলেছে। পাহাড়টাকে আজ সে ন্যাড়ামুড়ো আর নির্মূল করে দেবে। একবার যাচাই করে দেখবে তার শক্তি বেশি না দেবতার প্রতাপটাই বড়’।[২২]

এরকম অবস্থায় সাময়িকভাবে মনের শান্তি হারানো কোন মানসিক ব্যাধি বা নিউরোসিসের লক্ষণ নয়। শুকলাল তার স্ত্রীকে হারিয়ে, মনস্তাপে সে ভোগবতী যাকে ঘিরে ছিল তাদের দাম্পত্য জীবন আবর্তিত, সেই ভোগবতীর কাছে যেতে চায়। শুকলাল যে ভোগবতীকে ঘিরে তাদের জীবন, যেখানে সে গভীর সংকটের আবর্তে আবদ্ধ সেখান থেকে উত্তরণের ক্ষীণ আশা দেখেছিল কিন্তু সেই আশাও তার বিলীন হয়ে যায়। সোনার মৃত্যুর সাথে ওতঃপ্রোত ভোগবতীর মৃত্যু, তার সঙ্গে শুকলালের মৃত্যু যেন চরিত্রের অস্তিত্বরক্ষাজনিত সংকটের তীব্রতা ও অস্তিত্ব রক্ষার অক্ষম নিষ্ফল প্রয়াস, যা গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনাকে ত্বরান্বিত করে।

চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ কেন্দ্রিক আলোচনায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘দুলারহিনদের উপকথা’ গল্পে দুলারহিন ও ভুখন চরিত্রদ্বয় আলোচনা করা হল। ভুখন ও দুলারহিন নিজেদের ভাইবোন বলে মনে করে এবং এদের একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল মনোভাবপোষণ করে। তাদের দু’জনের ছাড়া আর কেউ নেই, তাদের রাগ-অভিমান, কষ্ট, সব অনুভূতিই একে অপরকে ঘিরে আবর্ত।

দুলারহিন চায় ভুখন বিয়ে করুক, কিন্তু দুলারহিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ কর তুলতে কন্যাপণের জন্য জমানো টাকার থেকেও বেশি খরচ হয়ে যায়। ভুখন নিঃস্ব হয়েও দুলারহিনকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই বিয়ে, দারিদ্রতা নিয়ে অশান্তির কারণেই দুলারহিন ঘর ছাড়লে ভুখন দুলারহিনের খোঁজ বেরোয়। ঘরবাড়ি, নিজের কামনা, আকাঙ্খার অপমৃত্যু ঘটিয়ে, ভুখন দুলারহিনকে খুঁজে বেরিয়েছে। দুলারহিনকে না পেয়ে চরম হতাশার অন্ধকার ভুখনকে গ্রাস করেছে, তার জীবন যেন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ভুখনের মনোবিশ্লেষণে সাত্রের দর্শন 'অস্তিত্ববাদী দর্শন' এর মূল কথা-অস্তিত্বের সমস্যা বা সংকট মনোভাব ক্রিয়াশীল। অস্তিত্ববাদী দর্শনে মানবজীবনে আনন্দানুভূতির চেয়ে বিষাদময়তাই মানুষের মননে প্রাধান্য লাভ করে। ভুখনের জীবনেও পারিপার্শ্বিক সমস্যার কারণে, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে অস্তিত্বের সংকট দেখা যায়। তার জীবনের ট্র্যাজেডির অতলান্তে গভীরে লুকিয়ে থাকা জীবন যেন উদ্দেশ্যহীন শূন্যত্যে ভরা। সব হারানোর বেদনাবোধের সূক্ষ্মতা ভুখন চরিত্রের মধ্যে বিচিত্র অনুভূতির দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

এই গল্পে দুলারহিনদের নারীচরিত্রটি দারিদ্র্যলাঞ্ছিত নারী চরিত্র। দুলারহিন মমতাময়ী, তার ভাই ভুখনের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ অকৃত্রিম। দুলারহিন মন থেকে মেনে নিতে পারে না যে তার জন্য ভুখনের বিয়ে হবে না। সে তার ভাইয়ের কন্যাপণ জোগাড়ের জন্য নিজে বিয়ে করে তার কন্যাপণের টাকা দিয়ে ভাইকে বিয়ে দেবে এই চিন্তায় সে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। এখানে দুলারহিন চরিত্রে নিঃস্বার্থ, সহজ-সরল, কোমলতার দিক প্রস্ফুটিত। তাদের দুই ভাইবোনদেরই দুজনের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা নিখাদ ও অকৃত্রিম। তারা একে অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ভেবেছে। তবে দুলারহিনের নিঃসঙ্গ, একাকী জীবনে সংসার হয়েছে, সে সন্তানের মা হয়েছে। ভুখনের ন্যায় একাকী, হতাশাগ্রস্থ জীবন তাকে কাটাতে হয়নি।

রমাপদ চৌধুরীর আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক গল্পগুলির চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চরিত্র চিত্রণ এবং বিচিত্র ধারার চরিত্র নির্মাণের স্বরূপকে স্পষ্ট করা হল। রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে লেখকের জীবনকে দেখার ভঙ্গি স্বতন্ত্র। লেখকের গল্পগুলির আদিবাসী নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলির স্বরূপ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে লেখকের কথায় আমরা— 'এক অশ্রুবিন্দুর মধ্যেই যেন অনন্ত সিন্ধু' দর্শন করব। রমাপদ চৌধুরীর গল্পের চরিত্রচিত্রণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রথমেই আমরা ১৩৫৮ সালে রচিত 'জলরঙ' গল্পটির প্রসঙ্গে আসি। কোলিয়ারির শ্রমিকদের জীবনযাপনের ছবিকে কেন্দ্র করেই লেখক জলরঙ এঁকেছেন। জলরঙে আঁকা ছবি

যেমন যেকোন সময়েই জল পড়লে বা একটু অসাবধানতাবশত নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তেমনই কোলিয়ারিতে কাজ করা শ্রমিকদের প্রাণ কতটা অনিশ্চিত, পদে পদে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাদের কাজ, আদিবাসী নারীশ্রমিকদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার-শোষণ, এই সবকিছুই লেখক খুব কাছ থেকে দেখিয়েছেন। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মূলে থাকে স্রষ্টার আজীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতা। লেখকের কোলিয়ারি অঞ্চলকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পের চরিত্রচিত্রণকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

গল্পের শুরুতেই নির্মল প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণির সৌন্দর্যের তুলনা পাই সদ্য কোলিয়ারিতে যোগ দেওয়া বাবুর মুখে। গল্পে কোলিয়ারির ঠিকাদার, ম্যানেজার, এই উঁচু শ্রেণির লোকদের ক্ষমতা, রাজনীতি এবং শ্রমিকদের শোষণের যে চিত্র চিত্রিত হয়েছে তাতে এই আদিবাসী মানুষগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থান সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট। এই কোলিয়ারিতে কাজ করা নারী শ্রমিক বা রেজাদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার, শোষণের প্রকট রূপ রূপমণি চরিত্রটি বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হবে। গল্পটি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে লেখা এবং সরকার কর্তৃক তৎকালীন সময়ে দেশে নারীসুরক্ষা, নারী প্রগতির জন্য নানান আইন প্রণয়ন করা হয়। সরকারি আইন অনুযায়ী মহিলা শ্রমিকদের রাতে কাজে আসতে হয় না কোলিয়ারিতে, কিন্তু কোলিয়ারির উচ্চপদস্থ বাবুদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য বাবুদের বাংলোয় যেতে হত তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। প্রভাঙ্গ যখন বলে ওঠে— 'খাদে এখন রাতপাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলোয় এখনো...'।[২৩] প্রভাঙ্গের মুখের এই অসম্পূর্ণ কথাই আদিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থান স্পষ্ট করে। এই বাবুদের ভোগ-লালসা চরিতার্থতার জন্যই যখন গল্পের নায়িকা রূপমণিকে সর্দার গোপা সিং-এর ডেরায় যেতে বলেছিল, তখন সে না যাওয়ায় তার কাজ চলে যায়—

> 'দুপুর বারোটার সময় দুটো ঝুড়ি আর একটা শাবল নিয়ে গোপী সিং তার ডেরায় পৌঁছে দিতে বলেছিল রূপমণিকে। যায়নি রূপমণি। তাই কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে সে।'[২৪]

এখানে আদিবাসী নারীশ্রমিকদের বাড়িতে কাজে ডাকার নামে কেবল উচ্চপদস্থ বাবুরা তাদের ভোগলালসা চরিতার্থ করে এবং কোনো নারী যদি যেতে অস্বীকার করে তাকে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। রূপমণি

কোলিয়ারির সবচেয়ে সুন্দরী এবং সে প্রতিবাদীও। রূপমণি চরিত্রটিতে আমরা তার প্রতিবাদী সত্তা পাই যখন সে বলে— আর সকল মেয়েরা যাক, আমি যাব না। তার কাজ চলে যাবে, তার রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে— এই সব জেনেও রূপমণি প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার ঘোষণা করে যে উচ্চপদস্থ বাবুদের ডেরায় মনোরঞ্জনের জন্য যাবে না। কিন্তু পরের দিনই সে তার হবু স্বামীর প্রাণ এবং হাজ্‌রিবাবুকে বদনামের হাত থেকে রক্ষা করতে রূপমণি তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোপী সিং-এর কাছে ধরা দেয়। রূপমণি চরিত্রটি একদিকে যেমন সৎ, সাহসী, নির্ভিক, প্রতিবাদী, তেমনই অন্যদিকে সে আত্মত্যাগী। এখানে রূপমণি চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যর গভীরে আছে তার মানবমনের এক অন্য জগৎ। সে এমন এক পুরুষের জন্য নিজের মান-সম্মান, নিজের আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত হল, যার সঙ্গে তার কাজের সম্পর্ক কেবল— 'হয়তো আপনারই দুর্নাম বাঁচাবার জন্যে'।[২৫] এই শেষ বাক্যেই যেন রূপমণির গভীর ভাবনার তল পাওয়া যায় না।

'জলরঙ' গল্পের পুরুষ চরিত্রগুলির উপর আলোকপাত করা হল। গল্পে মূলত পাই সদ্য কোলিয়ারিতে চাকরি পাওয়া বাবু, যাকে মিশিরজী শ্রমিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন 'হাজ্‌রিবাবু' নামে। এই গল্পে ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বের সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত। এই গল্পের রাজনীতি শোষক-শোষিতের, শোষণের, শ্রমের রাজনীতি। যে রাজনীতির শিকার 'হাজ্‌রিবাবু'। এই সদ্য কোলিয়ারির চাকরিতে যোগ দেওয়া হাজ্‌রিবাবু চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, চরিত্রটি একদিকে সৌন্দর্যবোধে পূর্ণ, জীবনরসিক চরিত্র, তেমনই সে প্রতিবাদী, সৎ, সাহসী এবং দয়ালুও বটে।

প্রথমেই রূপমণিকে দেখে তার মনে এক পবিত্র সৌন্দর্যবোধ ফুটে ওঠে। পরবর্তীতে হাজ্‌রিবাবু চরিত্রটিকে দেখি কোলিয়ারির আদিবাসী নারী-শ্রমিক এবং পুরুষ-শ্রমিকদের ওপর হয়ে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে—'বললাম অন্যায়। আইন মেনে রেজাদের যতটুকু বাঁচিয়েছে, না-জুড়ি কুলিদের মেরেছে তার চেয়ে বেশী'।[২৬] এছাড়া যখন রূপমণির টাকার প্রয়োজন হয় তখন হাজ্‌রিবাবু তাকে এক টাকা দেয়। হয়তো সে চেষ্টা করলেই দু'টাকাই দিতে পারত, কিন্তু সে এক টাকাই দেয়। এখানে হাজ্‌রিবাবু চরিত্রটির মনের গহনে চলা যে ভাবনা-চিন্তা, যে সে নিজেও জানে যে চাইলেই রূপমণিকে দু'টাকা দিতে পারত, তাও একটা টাকাই দেয়। এই যে মনের এক দ্বিধা, সেখানে কোনো যুক্তি-বুদ্ধি নেই বা গ্রাহ্য হয় না, মানবমনের এক জটিল অবচেতন মনের হদিশ দেয়। পরবর্তীতে রূপমণিকে অন্যায়ের কবল থেকে রক্ষা করতে হাজ্‌রিবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করে, সে কোলিয়ারির উচ্চপদস্থ বাবুদের বিপক্ষেও রুখে দাঁড়ায়, কিন্তু

ব্যর্থ হয়। সে নিজেই কোলিয়ারির রাজনীতির শিকার হয় এবং তার কাজ চলে যায়। এই গল্পে হাজ্‌রিবাবু চরিত্রটি রূপমণিকে বাঁচাতে না পারলেও চরিত্রটি মানবদরদী, প্রতিবাদী, সৎ, সাহসী, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভরা জীবন্ত এক চরিত্র।

এই গল্পে পরিয়াগ নামক চরিত্রটি খুবই ছোট হলেও তা অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। পরিয়াগ রূপমণির হবু স্বামী বা 'ঠিগিয়া'। যার প্রাণ বাঁচাতে রূপমণি নিজের সম্মানের আত্মবলিদান দেয়। সেই পরিয়াগই তার প্রাণরক্ষাকারী হবু স্ত্রী রূপমণিকে ভুল বোঝে বা তার নামে ভুল ধারণা পোষণ করে— 'বিষণ্ণ হাসি হাসলে পরিয়াগ— গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ি দিয়েছে বাবু, রূপমণি ওর ডেরাতেই থাকবে।'[২৭] পরিয়াগের রূপমণি সম্পর্কে এমন কথা, বা ভাবনা বড় বেদনাদায়ক। যে নারী তার জন্য প্রাণপাত করে নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদা বলিদান দিল, সেই নারীকেই তার প্রিয়পুরুষ ত্যাগের কোনো স্বীকৃতি দিল না। পরিয়াগ চরিত্রটির কোনো প্রতিক্রিয়া গল্পে সেভাবে বেশি না থাকলেও কয়েকটি কথায় বোঝা যায় পরিয়াগ প্রতিবাদী নয়, সোচ্চার নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস তার নেই, সে এক দুর্বল পুরুষ চরিত্র।

চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে রচিত রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনি' গল্পটির দুই আদিবাসী চরিত্র— লাটুয়া ওঝা এবং তার মেয়ে সুরমণি। এই দুই চরিত্রের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হল। গল্পে ওঁরাও, মুণ্ডা, খেড়িয়া, ভূমিজ, সাঁওতাল এই সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিশ্বাস লাটুয়া ওঝার ওষুধে এবং মন্ত্রের জোরে সাপের বা কাঁকড়া বিছের বিষও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মৃত মানুষও প্রাণ ফিরে পায় এই রকম নানান কুসংস্কার, বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত আছে এই আদিবাসী মানুষগুলির মধ্যে। এই লাটুয়া ওঝার কন্যা সুরমণি, বাইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে। অন্ধ লাটুয়া ওঝা কথককে কুকুরে কামড়ানোর জন্য নানা রকমের জংলী শিকড়বাটা দেয় এবং সুরমণিও তার বাবার সব নির্দেশ পালন করে। কথকও এই সমস্ত শিকড়বাটা নেয় এবং সুরমণির হাতে দুটো রূপোর টাকা দেয় শিকড়ের মূল্য হিসেবে। সুরমণি সে টাকা নিলেও পরের দিন আত্মগ্লানিতে সে কথককে সেই মূল্য ফিরিয়ে দেয়। শত দারিদ্র্য, অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও সুরমণি টাকা ফিরিয়ে তার অন্ধ পিতার গোপন সত্য কাহিনি সবার সামনে তুলে ধরে— 'ইটা ফিরায়ে লে বাবু, কাম হবে না তুয়ার, ই দাওয়াই মিছা বটে'।[২৮] এই চরম সত্যি কথা সবার সামনে বলে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া, যে টাকাটা তাদের চরম অভাব-অনটনের সংসারে বড়

সম্বল, যা সুরমণি চরিত্রের আত্মপ্রত্যয়, সরল-সৎ, সাহসী মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলে। পাশাপাশি মেয়ের তার পিতার প্রতি অগাধ ভালোবাসারও প্রতিচ্ছবি এই গল্প। শুধুমাত্র অন্ধ বাবার অস্তিত্বকে বজায় রাখতে সুরমণি মিথ্যা কিছু ঘাসপাতা এনে তার বাবার ওঝাবৃত্তির কাজে দিয়েছে— কথকের সামনে সুরমণির এই স্বীকারোক্তি, তার চরিত্রের সাহসিকতাপূর্ণ সততার দিকটিকে উন্মোচিত করেছে। সুরমণির পাথর-কালো যুবতী দেহের যেমন সৌন্দর্য, তেমনই তার মননও সততার গুণে পূর্ণ।

সুরমণি চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাবার প্রতি মেয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসার পাশাপাশি রয়েছে বাবাকে মিথ্যা বলার যন্ত্রণা, বাবার স্বপ্ন সে ভালো ওঝা হবে, সেই স্বপ্নকে সত্যি করতে না পারার কষ্ট। একদিকে সুরমণি তার বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে সে নিজেই তার বাবার গোপন সত্যিটা প্রকাশ করছে। প্রথমে সে টাকা নিলেও পরে লোভ সংবরণ করে, মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটন করে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া, এই দ্বিস্তরীয় বৈপরীত্যের রেখায় চিত্রিত সুরমণি চরিত্রটি কেবল চরিত্র হয়ে থাকেনি, তা অনন্য সাধারণ সততার মূল্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গল্পে লাটুয়া ওঝা চরিত্রটি একটি ট্র্যাজিক চরিত্র। লাটুয়া ওঝার একসময় নামডাক, যশ সব ছিল, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ভাল্লুকের আক্রমণে সে অন্ধ হয়ে যায়। লাটুয়ার অন্ধত্বের ট্র্যাজিক পরিণামের অতল হতশ্বাসের মধ্যে তার অজান্তে তার মেয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, মনোবল বজায় রাখার জন্য মিথ্যা শিকড় এনে দেয়। মানুষের যখন সব আশা শেষ হয়ে যায়, তখন সে একটা সামান্য খড়কুটোকে অবলম্বন করেও বাঁচতে চায়। প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার একটা তাগিদ থাকে, সেরকম ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জীবনযাত্রার নিষ্ঠুর গহ্বর থেকে লাটুয়া মুক্তি পেতে সুরমণির মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরেছে, সে অলীক ভাবনায় ভাবিত হয়ে নিজের জীবনের বেঁচে থাকার অবলম্বন করেছে। আর মিথ্যাকেই সত্যি ভেবে বৃদ্ধ লাটুয়া ওঝা যেন বেঁচে আছে। কিন্তু হতদরিদ্র লাটুয়া ওঝার এই মিথ্যাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকা কি আদৌ বেঁচে থাকা? এই প্রশ্নই যেন লাটুয়ার বেঁচে থাকার, তার অস্তিত্বের প্রশ্ন, এইখানেই লাটুয়া ওঝা চরিত্রের ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত।

১৩৬০ বঙ্গাব্দে রচিত রমাপদ চৌধুরীর 'ইম্‌লী' গল্পের আদিবাসী চরিত্রচিত্রণে ইমলী এক অনবদ্য ট্র্যাজিক ভাস্বর নারীচরিত্র। ইমলী জাতিতে বেদিয়া, সেও আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই জীবনের

ঘর বাঁধার রঙিন স্বপ্ন দেখত নিজের মনের মানুষের সঙ্গে। একটা ঘর, যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী জীবন, নিজের একটা কাছের মানুষ এটুকুই, কিন্তু কোনো স্বপ্নই তার পূরণ হয় না। সে যেন অসহায়, বিপর্যস্ত, লাঞ্ছিত মানবতার প্রতিনিধি। সুন্দরবন থেকে শহরে ইমলী ও তার জাতের মানুষেরা মধু বেচতে আসে। সেখানে ইমলীর মন বাঁধা পরে ফালসার কাছে। কিন্তু সে তার নিজের লজ্জা-সংকোচবোধে ফালসার থেকে দূরে থেকে ফালসাকে হারিয়ে ফেলে। এখানে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের, নারীমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফালসার সঙ্গে একরাত কাটানোয়, তার নিজের ডেরায় না ফেরায় একদিকে ইমলীর মনে একটা অন্যরকমের ভালো লাগার পরশ আবার অন্যদিকে সে নিজেকে 'বেশরম' মনে করে আত্মধিক্কার দিতে থাকে। এক অদ্ভুত দ্বিধা-দোলাচলের চিত্র স্পষ্ট। ইমলী গল্পে লেখক শহরের রাতের ছায়াপথের বাস্তবরূপ তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি ইমলীর যন্ত্রণার চিত্র যেন ইমলীর বেদনাকে আরও মর্মস্পর্শী করে তোলে। ইমলী নিজের লজ্জার কারণে ফালসাকে হারিয়ে একাকীত্ব, অসহায়তা এবং চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে সে ভিক্ষা করে, দেহব্যবসা করে দিন কাটায়। সে কোথাও কাজ পায় না, সকলেই চোর ভাবে। কলকাতা শহরের বুকে দাঁড়িয়েও ইমলীর কোনো কাজ না পাওয়ার যে কারণ তা আধুনিক সমাজে আদিবাসী নারীদের অবস্থান, তাদের নিয়ে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের ভাবনা-চিন্তার রূপ লেখক চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। যতই সভ্যসমাজ নারীপ্রগতির, সমানাধিকারের কথা বলুক, মুখের আড়ালে যে এক মুখোশ আছে আর সেই মুখোশের আড়ালে মানুষের মানসিকতা ঠিক এরূপ—

> 'কাজের চেষ্টায় অনেক ঘুরেছে, আর নয়। কেউ সন্দেহ করেছে চুরি করে পালাবে, কেউ ভেবেছে ঘরে উঠতি বয়সের ছেলেটা বিগড়ে যাবে। কলকারখানাতেও কোনও কাজ জোটেনি।'[২৯]

ইমলী যে লজ্জা-সঙ্কোচবোধের কারণে সে তার মনের মানুষকে হারিয়ে ফেলে, পেটের দায়ে সেই লজ্জাকেই তার বিসর্জন দিতে হয় রাতের ছায়াশরীরের কাছে। ইমলী প্রথমে মন থেকে ধাক্কা দিয়ে ছায়াশরীরকে সরিয়ে দিতে চাইলেও পেটের দায়ে তা পারে না। পরে খিদের তাড়নায় সেই ছায়াশরীরেই জন্য সে অপেক্ষা করে। কথাতেই আছে 'খিদের জ্বালা বড় জ্বালা'—একথা যেন ইমলীর গল্পে ভীষণ ভাবে সত্যি। এই সত্যির থেকে বড় যেন আর কিছু নয়। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/ পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'— একথার সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারে ইমলীর মতো মেয়েরা তাদের জীবন দিয়ে। এখানে ইমলীর মানসিকতায় পাভলভীয় 'নিমিত্তবাদ' মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে

আর কোনো উপায় না থাকায় এই ঘৃণ্যপথ, ঘৃণ্যবৃত্তি যা ইমলী নিজেও প্রথমে চায়নি কিন্তু খিদের তাড়নায় বাধ্য হয়ে তাকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। ইমলী কখনই নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে এই পথে আসেনি, সে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে এই বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় খাদ্যসংস্থানের জন্য উদ্বাস্তু শিবিরে গেলে সেখানেও সে লাঞ্ছিত হয়ে যেন সর্বস্বশূন্য হয়ে পড়ে। জীবনের চরম সংকটের লড়াইয়ে জীবনের সর্বস্বশূন্য বোধে ইমলী ট্র্যাজিক চরিত্রটি ভাস্বর।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণকেন্দ্রিক আলোচনায় রমাপদ চৌধুরীর ১৩৬০ বঙ্গাব্দে রচিত 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পের আদিবাসী নারীচরিত্র রূপমতী সোরেনের, রেবেকা সোরেন হয়ে ওঠায় আলোকপাত করা হল। গল্পের প্রথমেই দেখা যায় 'ভিখারিয়ার নাচ' নামক এক আদিবাসী উৎসব, সেখানে উৎসবের নামে মেয়েদের অপমান করা হয়, মেয়েদের নামে নানান অশ্লীল ছড়া বা গান গাওয়া হয় গোটা গ্রামের সামনে। কিন্তু এর কোনো প্রতিবাদ কেউ করে না। এখানে আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান ঠিক কীরূপ তা স্পষ্ট। সমাজের কাছে মেয়েরা কেবল ভোগ্যপণ্য, কেবল 'এন্টারটেইনমেন্ট', গল্পে সেই বাস্তবের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট। এই ভিখারিয়ার নাচে যখন রূপমতীকে নিয়ে অশ্লীল গান-কথা বলে গ্রামের মানুষ, তখন রূপমতীর প্রেমিক লালোয়া কুড়ুখ নিজের রাগ সামলাতে না পারায়, প্রতিবাদ করায় মারামারি শুরু হয়। সেখানে রূপমতীর কোনরকম দোষ না থাকা সত্ত্বেও যেহেতু সে নারী, তাই সমাজের চোখে সে দোষী, পাপী হিসেবেই গণ্য। আদিবাসী আইনানুযায়ী তাদের যে নিজস্ব পঞ্চায়েত থাকে, সেই পঞ্চায়েতে গ্রামের মাতব্বররা রূপমতীকে 'বিট্‌লা' রায় দেয়, যা সাঁওতাল সমাজে এক নারীর জন্য চরম শাস্তি। বিটলা- সাজাপ্রাপ্ত নারীকে সমাজচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পুরুষরা তাদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করে সেই নারীর সম্মান নষ্ট করে। এই বিটলার অমানবিক নির্যাতন-অপমান, আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে ম্যাকুসাহেব রূপমতীকে বিবাহ করে, সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে রূপমতীকে সে রক্ষা করে। রূপমতী সোরেন থেকে সে পরিণত হয় রেবেকা সোরেনে।

রূপমতী ওরফে রেবেকার জীবনের দুটো স্তর দেখা যায়। প্রথমত, লালোয়া কুড়ুখের প্রতি রূপমতির একনিষ্ঠ প্রেম, নিজেদের ঘর বাঁধবার স্বপ্ন। সে ভিখারিয়ার নাচের বাস্তব বর্বরোচিত ব্যবস্থার কথা জানার পরও সে শুধুমাত্র লালোয়ার জন্য সে পথে পা বাড়ায়। এখানে রূপমতীর লালোয়ার প্রতি গভীর প্রেম পরিস্ফুট। পরবর্তীতে আদিবাসী সমাজের চোখে 'বিটলাহা' হওয়ার পর রূপমতী ম্যাকুসাহেবের

স্ত্রী রেবেকা হয়, এক্ষেত্রেও তার স্বামীর প্রতি অটুট বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ছবি ব্যক্ত। ম্যাকুসাহেবকে রেবেকা নিজের চরম দুঃসময়ে পাশে পেয়েছিল, তাকে অপমান-নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, এই কারণে রেবেকার মনের গভীর থেকে ম্যাকুর প্রতি তার যে গভীর বিশ্বাস-শ্রদ্ধাবোধ জন্মেছিল, তার এই বিশ্বাস সে আমৃত্যু দৃঢ় রেখেছে। ম্যাকুসাহেব তার পিতার কথায় রেবেকাকে ফেলে চলে যাওয়ার সময় এক সপ্তাহ পরে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। ম্যাকুর কথায় অটুট বিশ্বাস রেখে রেবেকা তার পুত্রসন্তানকে অবলম্বন করে, ম্যাকুর প্রতি অগাধ আস্থা-বিশ্বাস-ভরসায় আমৃত্যু অপেক্ষা করে গেছে। রেবেকার দৃঢ় নারীসত্তার পাশাপাশি স্বামীর প্রতি, সেই মানুষটার প্রতি যে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছিল তার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-আস্থার মানসচিত্ত স্পষ্টরূপে চিত্রিত।

কালজয়ী প্রেম মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল এই রেবেকা চরিত্রটিকে তার মনোভাবনা দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কী অসম্ভব দৃঢ় চরিত্রের নারী সে। সে মন-প্রাণ দিয়ে যখন লালোয়াকে ভালোবেসেছিল, তখন তার লালোয়ার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম যেমন লক্ষ্যনীয়, তেমনই কিন্তু রূপমতীকে যেদিন বিট্‌লা ঘোষণা করা হয় তখন সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লালোয়া রুখে দাঁড়াতে পারেনি বা তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। সেদিনই যেন রূপমতি লালোয়াকে মন থেকে মুছে ফেলে, তার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে— ‘ওটা মরদ বটেক, না ধুমুড়িয়ার কুড়ী? বিটলার সুময় যাতে পারে নাই টাঙ্গি লিয়ে?’[৩০] এরপর সোনামিরু ও লালোয়ার হাজার মিনতিতেও রূপমতী লালোয়াকে আর কখনও গ্রহণ করেনি। যে পুরুষ তার সম্মান বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি মন থেকে সেই ভালোবাসার সেই পুরুষের প্রতি ধিক্কার, রাগ, প্রতিবাদ ব্যক্ত। অন্যদিকে ফিরবো রে, ফিরে আসব, এই বাক্যের উপর বিশ্বাস, ম্যাকু সাহেবের প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ, শ্রদ্ধা-আস্থা নিয়ে রেবেকা আমৃত্যু অপেক্ষা করে থাকে। যে সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যায়, সেই সম্পর্কে, সেই মানুষের প্রতি আর কোনো ভাবনা আসে না, সেখানে আর কোনো নতুন সম্পর্ক তৈরি হয় না— এর জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি রূপমতি ও লালোয়ার সম্পর্ক। এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং কৃতজ্ঞতাবোধ রূপমতী ও ম্যাকুর সম্পর্কের বুনিয়াদ।

রূপমতী দৃঢ়, প্রতিবাদী নারীসত্তার পাশাপাশি যেমন সে এক প্রেমিকার চিরন্তন মূর্তিতে ভাস্বর, তেমনই তার পিতার প্রতিও তার ভালোবাসা নিখাদ। যখন সে বিটলার ভয়কেও হার মানায়—

> 'হোক বিট্‌লা। পট্টি ভালো ওর।... আর, আর বুড়ো বাপ মাধা সোরেন। তাকে ফেলে কিনা সুখের ঘর বাঁধবে রূপমতী?'[৩১]

রূপমতী চরিত্রের মনোজগৎ বিশ্লেষণে আমরা মানবমনের বিচিত্র স্তরের হদিশ পাই। রূপমতী কন্যা হিসাবে, প্রেমিকা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এক আদর্শ নারী চরিত্র। রূপমতী ওরফে রেবেকাকে ছেড়ে ম্যাকু চলে গেলেও সে তার স্বামীর সম্মানের কথা ভেবে কোলিয়ারির খাদানে কাজে যোগ দেয় না। সমাজের যে মানুষরা তাকে সমাজচ্যুত করার পরিকল্পনা করেছিল, রূপমতী থেকে রেবেকা হতে বাধ্য করেছিল, নিজের পরিবার থেকে দূরে করেছিল রেবেকা যেন তাদের সংস্পর্শে এসে নিজের দৃঢ়চিত্তের নারীসত্তাকে, আত্মসম্মানকে নষ্ট করতে চায় না। সেই কলুষিত সমাজের কাছে ফিরে নিজের নারীসত্তার অপমান সে চায় না, তার থেকে সে খিদেয় না খেতে পেয়ে মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় মনে করেছে। লালোয়া রূপমতী নামের যে প্রদীপ জ্বালাতে ব্যর্থ, সমাজ যে রূপমতীকে রেবেকা বানিয়েছে, সেই রূপমতী-ই নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে গোটা সমাজের বুকে এক নিরুচ্চার প্রতিবাদ রেখে গেছে। তার মৃত্যুকে আত্মহত্যা ও সমাজ দ্বারা হত্যাও বলা যায়। রূপমতী চরিত্রের ন্যায় আদিবাসী অনেক নারীকে সমাজের এরকম কুপ্রথা 'বিট্‌লাহ'-র বলি হতে হয়। সকলের ভাগ্যেই এরূপ নিদারুণ কষ্ট, দুর্ভোগই থাকে। আদিবাসী নারীদের উপর হয়ে চলা বর্বরোচিত অত্যাচারের ছবি এবং আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান রূপমতী চরিত্রে স্পষ্ট। রূপমতী কেবল চরিত্র নয়, তার দৃঢ় নারীচেতনা, প্রতিবাদী-সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী নারীসত্তা, সমাজের অন্যায়ের প্রতি ধিক্কার রূপমণি চরিত্রটিকে অপরাজেয়, অনন্য করে তোলে।

এই গল্পে রূপমতীর পাশাপাশি সাঁওতাল পাড়ার একটি মেয়ে সোনামিরু, যে বরাবর রূপমতীর পাশে থেকেছে, সাহায্য করে গেছে। সোনামিরু এমন এক পার্শ্বচরিত্র যে গল্পে রূপমতী চরিত্রটির দৃঢ়তাকে আরও বলিষ্ঠতা দান করে। সোনামিরু রূপমতী সমাজে বিটলা হওয়ার আগে এবং পরে সবসময়ই তার পাশে থাকার চেষ্টা করেছে। সে রূপমতী বিট্‌লা হওয়ার পরেও রাতের অন্ধকারে পঞ্চায়েতের ভয়কে উপেক্ষা করে রূপমতী ও তার বাবার জন্য খাবার আনে এবং রূপমতীকে গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সোনামিরু এমন এক বন্ধু যে সুখে-দুঃখে রূপমতীর পাশে থেকেছে, সহায়তা করেছে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত। সোনামিরু রূপমতীর জীবনে এমন এক মানুষ, আশ্রয়, যে তাকে কখনও পরিত্যাগ করেনি। সোনামিরু চরিত্রটি সৎ, সাহসী, উপকারী এক মানবচরিত্র।

এই গল্পের অন্য এক কেন্দ্রীয় আদিবাসী পুরুষ চরিত্র লালোয়া কুড়ুখ। সে রূপমতীকে ভালোবাসলেও প্রেমিকার দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াতে সাহস পায় না। যার জন্য রূপমতী সমাজে বিটলা-রূপে ঘোষিত হয়, সেই লালোয়াই রূপমতীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে না। প্রথমে লালোয়া যখন রূপমতীর নামে খারাপ কথা সহ্য করতে না পেরে গ্রামের লোকদের সঙ্গে মারামারি করে, তখন তাকে সাহসী মনে হলেও পরক্ষণে লালোয়া চরিত্রের ভীরুতা প্রকাশ পায়, যা লালোয়ার চরিত্র বিচারে জটিলতার সৃষ্টি করে। সে রূপমতীকে নিয়ে দূরে পালিয়ে যেতে চায় কিন্তু প্রকাশ্যে সে সকলের বিরুদ্ধে, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার সাহস দেখায় না। সে রূপমতীকে আজীবন ভালোবাসে ঠিকই কিন্তু সর্বসম্মুখে সেই ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস, সেই ভালোবাসাকে রক্ষা করার সাহস লালোয়ার চরিত্রে নেই। কাপুরুষতা, ভীরুতা, পালিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি লালোয়া চরিত্রে প্রতীয়মান।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনার ক্ষেত্রে রমাপদ চৌধুরী রচিত ১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'নারীরত্ন' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ময়না কিস্কু, পুরুষ চরিত্র ধুলন টুডু, ময়নার মেয়ে চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করা হল। চরিত্রগুলো পারিপার্শ্বিকতার পরতে পরতে জড়িয়ে তাদের মনোজগৎ কীভাবে উদ্‌ঘাটিত তা আলোচ্য। এর পূর্বে রমাপদ চৌধুরীর যে সমস্ত নারী চরিত্রগুলি দেখে এসেছি ময়না কিস্কু তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের এক নারী। ময়না চরিত্রের মধ্যে যে স্বার্থপরতা, প্রতারক, ক্রূঢ়তা, প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব পাই তা রমাপদ চৌধুরীর সৃষ্ট অন্যান্য আদিবাসী নারীচরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

যৌনানুভূতির তীব্রতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি— এই তীব্র প্রবৃত্তির ক্রিয়াপদ্ধতির যে রূপ অব্যস্ত জীবনযাত্রার পেলব সম্পর্কের অন্তরালে, তার সত্য রূপটি লেখক ছোটগল্পের এই সূক্ষ্ম পরিসরে তুলে ধরেছেন। ভুখন কিস্কুর বউ ময়না কিস্কু, যে তার স্বামীর আড়ালে ধুলন টুডুর সঙ্গে পরকীয়া করে, স্বামীর কাছে ময়নার পরকীয়া ধরা পড়ে গেলে সে নিজের হাতে তার স্বামীকে খুন করে। প্রেমিক ধুলন যখন ময়নার এই অপরাধের কথা জানতে পেরে তার অপরাধের দায় নিতে অস্বীকার করে, ময়নার ভুল কাজের অংশীদারিত্ব হতে চায় না, তখনই ময়নার প্রেমিকাসত্তা বদলে জেগে ওঠে এক স্বার্থপর, প্রতারক সত্তা। ময়না কিস্কু এমন এক নারীচরিত্র, যে চরিত্রের মনের গহনে অপরাধী, খুনী, স্বৈরিনী, প্রতারক সত্তা বিরাজমান। গল্পে সুধীরবাবু চরিত্রের মুখে নারী সম্পর্কে বলতে শোনা যায়— 'নারী নরকের দ্বার'। ময়না কিস্কু সত্যিই নরকের দ্বার-ই, যে তিনটে মানুষের জীবনকে নরকে পর্যবসিত করেছে। এখানে ময়না

কেবল একটা মানুষের জীবনকে নয়, তার মেয়ে, তার স্বামী, তার প্রেমিক– এই তিনটে মানুষ, যারা তার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের প্রত্যেকের জীবনকে নরকে পর্যবসিত করেছে। ময়না চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাকে 'ক্রিমিন্যাল মাইন্ড' বলা যায়। যে তার স্বামীকে হত্যা করতে একবারও দ্বিধাবোধ করে না এবং পরক্ষণে যখন তার প্রেমিক ধুলনের কাছে সে ধরা পড়ে, তখন সে ধুলনকে বলে সে তার জন্যই নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে। আবার পরক্ষণেই সে ধুলনকে তার স্বামীর খুনের ঘটনায় দায়ী করে অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জঘন্য অপরাধ করতেও পিছপা না হওয়া, আদিমতায় পূর্ণ, ক্রূঢ়-স্বার্থপরতা, স্বৈরিণী, অত্যন্ত জটিল মনোভাবাপন্ন এক চরিত্র এই ময়না কিস্কু।

সে তার স্বামীকে খুন করে এসে এমন সুন্দর অভিনয় করে কাঁদে যে দুঁদে পুলিশ অফিসার, গ্রামের লোকজন– সকলেই তার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে। আদ্যোপান্ত এক জটিল নারীচরিত্র, যার মনের পরতে পরতে হিংসাত্মক মনোবৃত্তি। নারী মানেই যে সে কেবল অসহায়, লাঞ্ছিত– এই প্রথাগত ধারণায় সজোরে আঘাত হানে এই ময়না চরিত্রটি। সে গ্রামের হোক; কি শহরের; কি আদিবাসী, মানবমনের রহস্য একই। নারীও রক্তমাংসের মানুষ, কেবল সে লাঞ্ছিত হয়, তা নয়, তার দ্বারা অন্যরাও লাঞ্ছনা-অন্যায়ের শিকার হতে পারে। নারী তার অভিনয়ে এবং মেয়ে হওয়ার সুযোগ সে নিতে পারে, সে কারো মা বা স্ত্রী হলেও তার মনে পাপের বাসা বাঁধতে পারে, নারী নিয়ে মানুষের যে প্রথাগত ধ্যান-ধারণা তা ময়না চরিত্র ভেঙে দেয়। হত্যা সমস্যা সমাজের এক বড়ো সমস্যা। এই সমস্যায় মনের নির্জ্ঞান অংশে বিষয়টির মূল একটিই। ফ্রয়েড মানব প্রবৃত্তিকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছেন– *Eros* এবং *Thanatos*। এই *Eros* হল ভালোবাসার প্রবৃত্তি এবং *thanatos* হল মৃত্যুচেতনা। এই মৃত্যুচেতনা থেকেই মানুষের আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির জন্ম। রমাপদ চৌধুরী রচিত 'নারীরত্ন' গল্পে ময়নার মনোবিশ্লেষণে এই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের হত্যাকেন্দ্রিক সমস্যা পরিলক্ষিত।

গল্পের শুরু থেকে ময়নার প্রতি সহানুভূতি জাগলেও হঠাৎ তার মেয়ের ময়নাকে 'ডাইনি' সম্বোধন করা, নিজের মায়ের কাছে থাকতে না চাওয়া, তার মায়ের অসৎ চরিত্র সকলের সামনে আনায় ময়না চরিত্রের মনস্তত্ত্বের জটিল দিকগুলি প্রকট হয়। মাকে মেয়ের 'ডাইনি' সম্বোধনে 'মা' ভাবনার প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় একটা ধাক্কা লাগে। একটা মেয়ে জনসম্মুখে তার মাকে ডাইনি বলছে, তার মায়ের যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ, কুকীর্তি, মায়ের মিথ্যাচারিতা, কপটতার দিক উন্মোচন করছে, এখানে যেমন ময়না

চরিত্রের কদর্য অপরাধমনস্ক মনের পরিচয় পাই, পাশাপাশি একটি পনেরো বছরের মেয়ের মায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ, সৎ সাহস, প্রতিবাদী দিক পরিস্ফুট। মা-মেয়ে যেন দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমনস্ক নারী। মেয়েটি প্রথমে ভয় পেয়ে চুপ থাকলেও তার বাবার খুনিকে শাস্তি দেওয়া, মায়ের প্রতি প্রবল ঘৃণা, সে তার মা'র কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়াতে সে আওয়াজ তোলে। মেয়েটির ময়নাকে ডাইনি বলার মধ্যে তার পিতার খুনির প্রতি তীব্র ক্ষোভ পরিলক্ষিত।

এই গল্পের অন্য এক আদিবাসী পুরুষ চরিত্র ধুলন টুডু। এই ধুলন টুডু ময়না বিবাহিত জানার পরেও সে তার সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত হয়। গল্পে খুবই স্বল্প পরিসরে ধুলনের দু-এক কথায় ধুলন চরিত্রের মনোভাব, তার অনুভূতি স্পষ্ট। ময়নার নিজ স্বামীকে খুন এবং সেই খুনের দায়ে ধুলনকে মিথ্যাচারে ফাঁসানো, এই গোটা ঘটনায় ধুলন বিহ্বল, হতাশাগ্রস্ত বা প্রবলভাবে মানসিক বিধ্বস্ত। ধুলন ঘটনার আকস্মিকতায়, ময়নার নিজের স্বামীকে খুন করতে দেখে বলে ওঠে— 'আঁতকে উঠেছিল ধুলন, বলে উঠেছিল, 'তুই খুন করেছিস ময়না, নিজের স্বামীকে খুন করেছিস?'[৩২] ধুলন ভাবতেই পারে না তার ভালোবাসার মানুষ অন্য আর এক মানুষের প্রাণ নিতে পারে। সে ভীষণ রকম ধাক্কা খায়, মানসিক আঘাত পায়। সে এই ঘৃণ্য কাজে ময়নার সঙ্গ দিতে পারেনি, সে তার নিজের মনের আবেগকে, সৎ মনোভাবকে ময়নার জন্য বিসর্জন দিতে পারেনি। এখানেই ময়নার ধুলনের প্রতি ভালোবাসার ধারা প্রতিহত হওয়ায় ময়নার আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এই একই কারণে সে তার স্বামীকে হত্যা করে আবার পরক্ষণেই সে আত্মরক্ষার্থে ধুলনকে মিথ্যা খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়ায়। এর প্রতিক্রিয়ায় ধুলনের যে মনোভাব বা মানসিক প্রতিক্রিয়া তা জটিল হলেও বোঝা যায় ধুলন ঠিক কতটা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, আহত। পাশাপাশি ধুলন চরিত্রটি সাহসী ও ভালোবাসার জন্য ত্যাগী হিসাবেও বিবেচিত। তবে মানুষ যখন তার প্রিয়জনের থেকে আঘাত পায়, সেই আঘাত বড়ো বেশি বেদনাদায়ক হয়— 'যাকে সত্যিই ভালোবাসি, সে যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়, তখন মৃত্যু কামনা করাই স্বাভাবিক।'[৩৩] মানুষ যে কীরূপ মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গেলে, নিজে খুন না করেও খুনের দায় স্বীকার করা যায়, সেই স্তরগুলি, সেই যন্ত্রণা ধুলনের অব্যক্ত, নিরুচ্চারিত শব্দেই প্রতিধ্বনিত।

ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পের চরিত্রচিত্রণ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় রমাপদ চৌধুরীর 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পের পুরুষ চরিত্র মিঞা মাঝি, বুধন কিস্কু এবং নারীচরিত্র ঝুমরাবিবি চরিত্রগুলি

বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মানসিক অবস্থা, ভাবনা এবং লেখক তাঁর গল্পে এই চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে কী বার্তা দিয়েছেন তা দেখব। এই গল্প বাৎসল্যের এক আশ্চর্য আখ্যান। ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য, ছেলেকে জীবনে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে ডাকাত বুধনের পিতা বৃদ্ধ মিঞামাঝি নিজে ফাঁসির শাস্তি নিতে চায়, খুনের মিথ্যা দায়ে বিনা অপরাধে। গল্পটিতে আদ্যপান্ত আদিবাসী মানুষদের কুসংস্কার, যুক্তিবুদ্ধিহীন অন্ধবিশ্বাসের কথা, মনগড়া নানান আজগুবি গল্পকথা, যা গ্রামের মানুষদের মনের গহনে নিহিত— সেই সব কিছু বর্ণিত।

প্রথমেই আসা যাক গল্পের মিঞামাঝি চরিত্রটিতে। মিঞামাঝি চরিত্রে আদিম জনজীবনের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের পরিচয় চিত্রিত। মিঞামাঝি চরিত্রে পুত্রস্নেহ প্রবল, পুত্রকে জীবনের সঠিক পথে আনতে, পুত্রের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য মিঞামাঝি নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছে কিন্তু পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় মিঞামাঝি আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

মনোবিজ্ঞানীদের মনস্তত্ত্বের আলোচনার নিরিখে মিঞামাঝি চরিত্রটির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে আমরা সার্ত্রের 'অস্তিত্ববাদী' দর্শনের কথা বলতে পারি। এই দর্শনের মূলকথা অস্তিত্বের সংকটবোধ, যেখানে মানুষ তার জীবনে গভীর সংকটে আবদ্ধ এবং সেখান থেকে যখন তার উত্তরণের ক্ষীণ আশাও থাকে না তখনই দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। জীবনযন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের কাছে যখন 'ইউটোপিয়া'র সত্য প্রতীতি লাভ করে না, তখন মানুষের মনে তৈরি হয় বিষাদময়তা, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা। মিঞামাঝি চরিত্রেও এই অস্তিত্বের সংকট পরিলক্ষিত। চরিত্রটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে মিঞা মাঝির ছেলে ডাকাত এই নিয়ে তার আত্মগ্লানি এবং সমাজের কাছে তার পরিচয় সে ডাকাতের বাবা। এই আত্মগ্লানি থেকে বিষাদময়তার ভাবের উদ্রেক ও তার সন্তান ডাকাত, এই পরিচয়ের কারণে সমাজ থেকে তার একধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ। সে এই জীবনযন্ত্রণা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে না পেয়ে জীবন থেকে পালিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। পাশাপাশি পাভলভের মতানুসারে পারিপার্শ্বক পরিবেশ মানুষের মনের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা মিঞামাঝি চরিত্রে সুস্পষ্ট। মিঞামাঝির পারিপার্শ্বিক সমাজ-পরিবেশ ও অন্ধ কুসংস্কারের ভারে ভারাক্রান্ত। সেই প্রভাব মিঞামাঝির অন্তরের গভীরে নিহিত, যেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং সে আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়। এছাড়াও মিঞামাঝি চরিত্রে

ফ্রয়েডের মৃত্যুমুখীশক্তির রূপ *Thanatos*-এর আত্মঘাতী রূপের প্রভাব স্পষ্ট, সে বারংবার অন্ধ কুসংস্কার, যুক্তিহীন বিশ্বাসের কারণে, বিষাদময়তায় ডুবে সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

মিঞামাঝি চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে আদিবাসী জনজীবনের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের বীজ ঠিক কতটা গভীরে প্রোথিত তা স্পষ্ট। তার বিশ্বাস, তার জীবন গেলে বা ফাঁসি হলে তার দেহজ আত্মা ছেলের দেহে প্রবেশ করলে বুধন সৎ পথে এসে ভালো হয়ে যাবে এবং ঝুমরাবিবি ডাইনি তার ছেলেকে আর বশ করতে পারবে না। শুধুমাত্র এই কারণে সে মিথ্যা খুনের দায়ে ফাঁসির শাস্তি নিতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তার ছেলে বুধন তার কথা রাখেনি, বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা, পিতার যন্ত্রণা এবং অন্ধ কুসংস্কারের কারণে আত্মহনন। মিঞামাঝি ট্র্যাজিক চরিত্রে আদিম জীবন, অন্ধ বিশ্বাস, যন্ত্রণা, অস্তিত্ব সংকটের তীব্রতা ও সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষার নিষ্ফল প্রায়সই গল্পে পরিনামী ব্যঞ্জনার স্বরূপকে মূর্ত করে গল্পে বুধন কিস্কু চরিত্রটি নিরূপণ করলে দেখা যায় চরিত্রটি এমন এক চরিত্র যাকে ঘিরে নানা কথা প্রচলিত আদিবাসী সমাজে, তার নিজের গ্রামে। বুধন আদিম হিংস্র মনোবৃত্তির অধিকারী, নির্মম ও নিষ্ঠুরতাই তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য। সে তার পিতাকে কথা দেয়, সে ডাকাতি ছেড়ে চাষবাস করে সৎ পথে জীবনযাপন করবে। কিন্তু সে তার নিজের পিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, পিতার ভালোবাসার সুযোগ নেয়। বুধন ডাকাতি করে, মানুষ খুন করে। এছাড়াও কামনা বাসনায় উন্মত্ত হয়ে মা-মেয়ে দুজনকেই ভোগ করে। কোনো অপরাধ ছাড়াই সে আসমিনাকে খুন করে। বুধন বিশ্বাসঘাতকতা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি চরম হিংস্র ও কামনা-বাসনায় উন্মত্ত নিম্ন প্রবৃত্তির মানুষ।

বুধন চরিত্রটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের ফ্রয়েডের মানুষ সম্পর্কীয় যে মনস্তত্ত্বের ধারণা— মানুষ সহজাতভাবে হিংস্র প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মায় এবং পরবর্তীতে সমাজ-সভ্যতার কারণে সেই হিংস্র স্বভাব, বর্বর প্রবৃত্তি অবদমিত হয়ে অবস্থান করে এবং পরে তা কোনো ছিদ্রপথে কখনও বেরিয়ে এসে ধ্বংসাত্মক হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপে মানুষকে উৎসাহ দেয়। মানুষ স্বভাব বর্বর। বুধনের মানুষ খুন, কোনো কারণ ছাড়া আসমিনাকে খুন, এক ভয়ংকর পৈশাচিক প্রবৃত্তি বুধন চরিত্রে পরিলক্ষিত। ফ্রয়েড ছাড়াও বুধন চরিত্রে পাভলভীয় মনস্তত্ত্বও কাজ করেছে। প্রক্ষোভতাড়িত বা মাদকদ্রব্যের প্রভাবাধীন মানুষ পশুর মতো আচরণ করে। এই প্রক্ষোভ বা 'এফেক্ট' সম্পর্কে পাভলভ বলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক এই দুই কারণই মানুষের মেজাজকে প্রভাবিত করে। মানুষের মনের আবেগ যখন তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না সেই মুহূর্তে সে

হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অসামাজিক কোন কাজ করে বসে এবং ফলাফল সম্পর্কে কোনো চিন্তাভাবনা থাকে না। এরই স্পষ্টরূপ বুধন চরিত্রে পাওয়া যায়, বুধন সম্পর্কে ঝুমরা বলে- “হাঁড়িয়ে খেলেই মনের ভিতরটা বেয়াদপ হয়ে যায় থানা-হাকিম। ভালো মানুষটা পাপী হয়ে যায়’।৩৪ পাভলভের মনস্তত্ত্ব এখানে কাজ করেছে তা স্পষ্ট। বুধন মদ খেয়েই মাদকদ্রব্যের নেশায় মা-মেয়েকে একসাথে ভোগ করে, অসামাজিক কাজ করে এছাড়া বুধন তাৎক্ষণিকভাবে মেজাজ হারিয়ে পাশবিকভাবে বিনা কারণে প্রক্ষোভের বশবর্তী হয়ে আসমিনাকে খুন করে ।

গল্পের চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে লেখক সমাজ, পরিবেশকেও তুলে ধরেন। একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা এসব কিছুর ক্ষেত্রে তার পারিপার্শ্বিকতা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিঞামাঝি চরিত্রে তা আমরা দেখেছি। গল্পের অন্যতম এক নারীচরিত্র যার নামেই মূল গল্প— ঝুমরা বিবি, যাকে গ্রামের লোক বিনা অপরাধে ডাইনি বলে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করে। ঝুমরাবিবি চরিত্রের পরিণতির মধ্যে দিয়ে লেখক আদিবাসী সমাজের কুসংস্কার, যুক্তিজ্ঞানহীন বিশ্বাসের অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন। ঝুমরা এমন এক নারী চরিত্র যে আদিবাসী সমাজের শোষিত-লাঞ্ছিত, বিনা অপরাধে দোষী ও অপবাদের কারণে নির্যাতিত আদিবাসী নারীদের প্রতিনিধি স্বরূপ। সে তার থেকে দশ বছর ছোট ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বিধবা হয়েও, আবার বেঁচে থাকার দায়ে বাধ্য হয়ে নিজের মেয়ে আসমিনাকেও সে বুধনের হস্তগত করে। পারিপার্শ্বিকতার কারণে ঝুমরা আসমিনাকে বুধনের হাতে সমর্পণ করলেও, সে বুধনকে ভালোবাসত একথার ইঙ্গিত মেলে যখন সে শোনে মিঞামাঝি বুধনকে হত্যা করেছে এবং সেইকারণে সে কেঁদে পড়ে। তবে ঝুমরা চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে ফ্রয়েডের লিবিডোর প্রকাশ অর্থাৎ কমবয়সী পুরুষের সঙ্গে বিধবা হওয়া সত্ত্বেও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সম্পর্ক একথা মনে হতে পারে। কিন্তু আরও তলিয়ে ভাবলে ঝুমরা ও তার মেয়েকে যখন গ্রামছাড়া হতে হয় ডাইনি অপবাদে, সমাজ তাদের সামান্য খাদ্যটুকুর অধিকারও কেড়ে নেয়, তখন বুধন তাদের খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং ঝুমরার মনস্তত্ত্বে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল একথাও বলা সংগত। কারণ ঝুমরা পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে সে নিজে ও তার মেয়েকে বুধনের হাতে সঁপেছিল। এই গল্পে ঝুমরাবিবি, বুধন, মিঞামাঝি চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণে অপার রহস্যময় চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত।

রমাপদ চৌধুরীর 'তিনতারা' গল্পে আদিবাসী রমনী লখিয়া চরিত্রটি অদ্ভুত শক্ত ধাতের, রহস্যময়ী নারী। তার বিয়ে হয় প্রথম তাদের দলের সর্দার বুড়ো রতনলালের সঙ্গে, কিন্তু সে পরে শাঁওনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। গল্পে একদিকে অনুপম-কাবেরীর প্রেম, অপরদিকে লখিয়ার প্রতি অনুপমের দুর্বলতা। হৃদয়াবেগের রঙিন ফানুসের পাশাপাশি বাস্তবের কঠোরতাও চিত্রিত। যৌবনোচ্ছল লখিয়া যেমন ভালোবাসে উদ্দামতার সাথে, তেমনই ঘর ভাঙতেও সময় নেয় না। অনুপমের প্রতিও যেন তার এক অদ্ভুত মোহ-টান, এর অন্তরালে রয়েছে দৈহিক কামনা-বাসনা।

লখিয়া চরিত্রটিতে ভিন্নমাত্রার স্তরীয় বিন্যাস লক্ষণীয়- প্রথমত সে একজনকে বিবাহ করে, আবার তাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সাথে পালিয়ে যায়, দ্বিতীয়ত, সে শাঁওনের কাছে প্রহারিত ও লাঞ্ছিত হলেও শক্তহাতে প্রতিবাদ করে না, তাকে পরিত্যাগও করে না, তৃতীয়ত, সে ইজারাদারদের তার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিকে উপভোগ করে, চতুর্থত, সে অনুপমের কাছেও দৈহিক কামনা-বাসনার তাগিদে এক সম্পর্কে জড়ায়। লখিয়া চরিত্রে মনোজগতের অপ্রকাশ্য জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্যময়তার চিত্র পরিস্ফুট।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল রহস্য উন্মোচনে সমরেশ বসুর 'গুণিন' গল্পের নকুড় দিগর বা নকুড় গুণিনের চরিত্রটি অবলম্বন করা হল। দিগর জাতি আদিবাসী জনসমাজের মানুষকেও বলা হয় এবং এই নিয়ে দ্বিমত আছে। এই আলোচনায় তাদের আদিবাসী হিসাবেই বিবেচনা করা হয়েছে, কারণ আদিবাসী মানুষদের মধ্যেই গুণিনের বহুল প্রচলন রয়েছে। লোধাদের মধ্যে একদল 'দিগর' হিসাবে চিহ্নিত। গল্পে নকুড় দিগর চরিত্রটি একটি প্রেমোন্মত্ত পুরুষ। সে পেশা হিসেবে গুণিন এবং তার এই পেশাই তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়ায়। নকুড় হরিমতির জন্য, তাকে পাওয়ার জন্য সে উন্মাদ হয়ে এমন যুক্তিবুদ্ধিহীন কাজ করে বসে, যার পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। নকুড় কিশোর বয়সে বিবাগী হয়, কিন্তু বহুকাল পরে ঘরে ফিরে তার বিবাগী মন বিধবা হরিমতিকে ভালোবেসে ফেলে। হরিমতির ছেলের মৃত্যুর খবর নকুড়ের মনে খুশির হাওয়া আনে— 'নকুড়ের মনটা 'আহা' করে উঠতে গিয়েও হঠাৎ প্রাণটায় কোথায় যেন খুশির বাজনা বেজে উঠল। হঠাৎই বেনাহাটির আকাশ-বাতাস বড় মিষ্টি হয়ে উঠল'।[৩৫] মানুষের মন বড়ই জটিল ও রহস্যাবৃত। নকুড়ের মনস্তত্ত্বে সেই জটিলতা ধরা পড়ে। নকুড়ের 'আঁট ঘাট বাঁধা' মনটাকে খুলে ফেলে, প্রেমের পরশ আনে। সে অনেকের অনেক চাওয়া-পাওয়া বুঝতে পারলেও হরিমতির মন কী চায় তা নকুড় বুঝতে পারে না। এই না পাওয়া তার মনের

মধ্যে একটা অস্থিরতাবোধ তৈরি করে। নকুড়ের মনে হরিমতির প্রতি যৌনকামনাও জাগে — 'তার শরীরের বন্য ঢেউয়ের উত্তরঙ্গ জলে ফেলে দেয় নকুড়কে'।[৩৬] নকুড়ের এই যৌনচেতনায় কোনো বিকৃতি নেই বরং নর-নারীর জীবনের স্বাভাবিক মিলন-তৃষ্ণার কথা আছে, এই প্রসঙ্গ সমরেশ বসুর অন্যান্য গল্পেও আছে।

হরিমতি যখন নকুড়কে বশীকরণ মন্ত্র শিখিয়ে দিতে বলে, যার দ্বারা সে তার প্রেমিককে বশ করতে পারবে, হরিমতির এই রঙ্গেই নকুড়ের বেদনা জাগে। সে হরিমতিকে হারাবার ভয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। নকুড়ের মনে পাভলভীয় মনস্তত্ত্বের কাজ করেছে- মানুষ প্রক্ষোভ বা মেজাজের বশবর্তী হয়ে যুক্তি-বুদ্ধিহীন আচরণ করে থাকে। তীব্রতম আবেগের কারণে মানুষের সেই মুহূর্তে যুক্তিবুদ্ধি তার নিজস্ব আয়ত্তে থাকে না, সে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত তা নির্ণয় করার অবকাশ পায় না। ফলত মানুষ অসংগত কাজ করে বসে। এছাড়া মানুষ স্বভাবগতভাবে প্রেমের প্রতিদান না পেলে সে হীনমন্যতায় ভোগে। এখানে নকুড়ের ক্ষেত্রেও একই মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। সে যখন হঠাৎ শোনে হরিমতির অন্য প্রেমিককে বশ করার কথা, সে ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে নিজের জীবনই বিপন্ন করে ফেলে। প্রেমের উন্মত্ততা হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে সে নিজের জীবনকে বিপর্যয় ও বিনষ্টির অতল প্রেমের গহ্বরে নিমজ্জিত করে, মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে তোলে। হরিমতির ইশারা, রঙ্গ নকুড় কখনই বুঝতে পারে না, সে হরিমতির কাছে তার ভালোবাসার কথা স্বীকারও করতে পারে না। এই না পারা, না পাওয়ার বোধই নকুড়ের জীবন ওলটপালট করে দেয়। হরিমতিকে লাভের উদ্দেশ্যে তুকতাক, মন্ত্র-টন্ত্র করতে গিয়ে নকুড় দীঘির জলে ডুবে মারা যায়। প্রেমোন্মত্ত হয়ে হঠকারিতায় নকুড়ের জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজেডি।

গল্পের হরিমতি নারীচরিত্রটির চরিত্রচিত্রণ মনোবিশ্লেষণে দেখব হরিমতি বিধবা নারী, সে পুত্রহারা। সেও গুণিন নকুড়কে ভালোবেসে ফেলে কিন্তু সরাসরি তার সামনে সেই ভালোবাসা স্বীকার করতে না পারায় রঙ্গ করে নকুড়ের কাছে বশীকরণ মন্ত্র জানতে চায়। সে নকুড়কে বলে সে অনেক চেষ্টা করেও তার প্রেমিককে বশ করতে পারছে না। হরিমতির মনে একাকীত্ব, সন্তান হারানোর বেদনা থাকলেও সে সর্বদা হাসিমুখে থাকে, নকুড়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও জীবনে অনেক না প্রাপ্তির বেদনাবোধ তা নকুড় বুঝতে পারে না। নকুড় হরিমতিকে প্রেমের প্রস্তাব না দেওয়ায় হরিমতি নকুড়ের সঙ্গে রঙ্গ করে, হাবে-ভাবে, পরোক্ষভাবে নকুড়কে হরিমতি তার ভালোবাসার কথা বোঝানোর চেষ্টা করেও বোঝাতে ব্যর্থ হয়।

হরিমতি নারীসুলভ লজ্জা-সংকোচ ও সমাজের কারণেই সে তার ভালোবাসার কথা নকুড়ের সামনে সরাসরি প্রকাশ করতে পারে না। হরিমতির রঙ্গই তার জীবনে কাল হয়ে আসে, যার কারণে নকুড় ও হরিমতির ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না। হরিমতির মজার ছলে বলা কথাই তার ও নকুড়ের জীবনে ট্র্যাজেডির বিপর্যয় নামিয়ে আনে, আর পরিণামে হরিমতির আজীবন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হওয়া –

> 'গুণীন, তুমি হরিমতির মন বুঝলে নি। ও ছাইবস্তু কে চেয়েছিল? আবার যে জীবনে বাঁচতে চেয়েছিলাম, তুমি তা দিলে নি—দিলে নি!'[৩৭]

হরিমতির অন্তরের বেদনাকাতর হাহাকার বা তার চরিত্রের মধ্যে মানবজীবনের সব হারানোর ব্যথা ও অপচয়বোধের অনুভূতির দ্যোতনা প্রকাশিত।

গল্পে আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় সমরেশ বসুর 'অরণ্যনিশি' গল্পের আদিবাসী নারীচরিত্র মাঞ্জারী চরিত্রটির মনস্তত্ত্ব ও চরিত্রচিত্রণ বিশ্লেষণ করা হল। মাঞ্জারী সারন্দা অরণ্যের মুণ্ডা আদিবাসী জাতির মেয়ে, যে প্রেমে পড়ে এক অ-আদিবাসী যুবকের। মাঞ্জারীর অপরূপ সৌন্দর্যে কথক প্রেমে পড়ে এবং সে পারিপার্শ্বিক আর কোনো কিছু ভাবে না। প্রাকৃতিক সারল্যে পূর্ণ এক নারীচরিত্র মাঞ্জারী। আমাদের আধুনিক সভ্য সমাজের মধ্যে নতুন কারোর সঙ্গে প্রথমে মিশতে যে সংকোচবোধ থাকে মাঞ্জারী চরিত্রে সে সংকোচবোধ নেই। আদিবাসী চাম্পু চরিত্রেও কোনোরকম সংকোচবোধ পাওয়া যায় না, তারা আদিম সারল্যে পূর্ণ মানবচরিত্র। তারা খুশিতেও গান গায়, দুঃখেও গান গায়, গানেই তাদের জীবনের উপলব্ধি-অনুভব প্রকাশিত । তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে তাদের ভাষায় গানের মাধ্যমে। মাঞ্জারী গভীরভাবে নিজের সবটুকু উজাড় করে কথককে ভালোবাসলেও, মাঞ্জারী খুব ভালোভাবেই এই সম্পর্কের পরিণতি, বাস্তবটা বুঝতে পারে। মাঞ্জারী তার নিঃশর্ত ভালোবাসার কোনো প্রতিদান পেতে চায় না, সে কেবল নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে।

মাঞ্জারী জানে যে তার এবং তার ভালোবাসার মানুষের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। সে জঙ্গলবাসী আর তার ভালোবাসার মানুষ শহরবাসী। এই অসম সম্পর্কের মেলবন্ধন হতে পারে না। সে সারল্যে পূর্ণ নারী হলেও তার বাস্তব সচেতনতাবোধ তাকে সৎ, দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী নারীচরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সে আবেগকে ভালোবাসার আগে আসতে দেয় না, তার প্রাণের আবেগ, ভালোবাসা

বাস্তবতার কাছে হেরে যায়। সে চাইলেই তার ভালবাসার মানুষকে বিয়ে করতে পারত, কিন্তু তা সে করেনি। কথকের বন্ধু মনোমোহন তাদের ভালোবাসায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মনোমোহন বোঝে এ তার বন্ধুর প্রেমের, সাময়িক ভালোবাসার নেশা, এটা কাটলে তাদের ভবিষ্যৎ সুখের হবে না। মাঞ্জারীও এই ভবিতব্য মেনে নেয়, সেও বোঝে— 'ঝুট বলিস না, তোরা কখনো জঙ্গলে থাকবি না। তোকে আমার যা দেবার তা দিয়েছি, এবার চলে যা।'[৩৮] এত সহজে কোনো কিছু প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে তার ভালোবাসার মানুষটিকে নির্দ্বিধায় মুক্তি দেওয়ায় মাঞ্জারীকে আবেগহীন মনে হলেও, গল্পের শেষে তার চোখেও জল দেখা যায়, ধরা পড়ে তার হৃদয়ের আবেগ। কিন্তু এক্ষেত্রে মাঞ্জারী হৃদয়ের ভাবালুতায়, আবেগে ভেসে না গিয়ে কঠিন বাস্তবকে স্বীকার করায়, তার সৎ, দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী, বাস্তববাদী, সাহসী প্রেমিকাসত্তার নারীচরিত্রের পাশাপাশি সে মহৎ একথা অনস্বীকার্য। মাঞ্জারী প্রমাণ করে ভালোবাসার সুখ কেবল পাওয়ার মাধ্যমে নয়, ত্যাগের মধ্যেই আসল ভালোবাসা নিহিত।

গল্পের আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে সমরেশ বসুর 'উত্তাপ' গল্পের আদিবাসী যুবতী নারীচরিত্র এবং হরেন চরিত্রটি অবলম্বন করা হল। গল্পে যে মেয়েটির কথা পাওয়া যায় সে সাঁওতাল না বাউরী অথবা বাগ্দী জাতির তা স্পষ্ট নয়। তবে এই মেয়েটি সাঁওতাল কিংবা বাউরি যে জাতিরই হোক সে সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীর। গল্পের পটভূমিতে সাঁওতাল পরগনার চিত্র চিত্রিত। আদিবাসী প্রান্তিক জাতির মানুষদের যৌনচেতনায় কোনো বিকৃতি নেই, বরং তা জীবনবোধের পরিপূরক, সমরেশ বসু তাঁর এই গল্পে নৈপুণ্যর সঙ্গে এই জীবনদর্শনকে ব্যক্ত করেছেন।

প্রবল বর্ষণে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে শহুরে মানুষ কুলিন বংশের পুত্র হরেন রায়। শহুরে তথাকথিত আধুনিক মানুষদের যৌনচেতনা, গ্রাম্য মানুষদের যৌনচেতনার মৌলিক বিভেদ গল্পে লক্ষ্যণীয়। ফ্রয়েডের ভাষায় 'লিবিডো' বা কামের প্রকাশ দেখা যায় হরেন চরিত্রে। হরেনের আদিবাসী মেয়েটির সঙ্গে রওনা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য দৈহিক আকর্ষণ বা কামচেতনা। হরেন যখন অসুস্থ হয়ে যায় আদিবাসী মেয়েটি তাকে তার বুকের উত্তাপে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটির মধ্যে কামচেতনা বা যৌনচেতনার বদলে, তার হারানো ছয়মাসের পুত্রের প্রতি সেই মাতৃস্নেহ যেন পুনরায় মেয়েটির হৃদয়ে জাগরিত হতে দেখা যায়— 'যেন একটুখানি ছেলে, সবটুকু কোলে ধরা যায়।'[৩৯] কিন্তু তার এই ভাবনার আলোয় অন্ধকার

নেমে আসে হরেনের বিকৃত যৌনচেতনার মনস্কতায়। সে তার প্রাণদাত্রীকে তার বাহুবেষ্টনে যৌনচাহিদায় নিষ্পেষিত করতে চায়, তার মনে মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের বদলে যৌনচেতনা প্রাধান্য পায়। গল্পে দুই চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে এবং তাদের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে শহুরে ও গ্রামের দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসংস্কৃত খেটে খাওয়া মানুষদের যৌনবোধের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক প্রভেদটা স্পষ্ট-অস্পষ্টের ছায়ায় দোদুল্য।

হরেনের এই আচরণে মেয়েটি হরেনের প্রতি ঘৃণাবোধ করে, কিন্তু হরেনের মনে তখনও অন্ধকার। এতকিছুর পরেও হরেনের গাড়িতে চলে যাওয়া মেয়েটির মনে অভিমানের সৃষ্টি করে। মানবমন, সেই মনের মধ্যেই রয়েছে আদিম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় নীচতা, কামুকতা, দৈনতা। এই মনস্তত্ত্বের গূঢ় অন্ধকার দিক হরেন চরিত্রে স্পষ্ট। মেয়েটির মনে যৌনবিকৃতি-কামতাড়না হরেনের প্রতি পাওয়া যায় না কিন্তু সে আশা করেছিল হরেনের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাবোধ, কিন্তু তা সে পায়নি। মেয়েটির মনের অতল রহস্যের অবগাহনে ভিন্ন ভিন্ন ‘ডাইমেনশন’ পরিলক্ষিত— একদিকে ক্ষণিকের ভালোলাগা, আবার ঘৃণাবোধ, স্নেহবোধ এবং অভিমানী, প্রত্যাশিত মন।

সমরেশ বসুর ‘অস্তিত্ব’ গল্পের রিয়াং উপজাতির মেয়ে মুসো এবং বনে বসবাসকারী জংলী ছেলে দিবাকর চরিত্রদুটি অবলম্বনে গল্পের আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ আলোচনা করা হল। দিবাকর দু’দিনের মধ্যে অজানা রোগে তার বাবা-মা-ভাই-বোনকে হারায়। বেদনায় ক্লান্ত দিবাকর এক অটলবাবা নামক সন্ন্যাসীর চক্রান্তের শিকার হয়। দিবাকর এক পাহাড়ি প্রস্রবণের মধ্যে পড়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। সেখানেই তার সঙ্গে রিয়াং উপজাতির মেয়ে মুসোর সঙ্গে পরিচয়। তাদের এই প্রথম পরিচয়েই তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক ও প্রেমের সূত্রপাত ঘটায়। মুসোই যেন দিবাকরের মৃত্যুমুখী জীবনকে জীবনমুখিতার দিকে প্রবাহিত করে। মুসো ও দিবাকরের সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বিরাজমান। আমাদের মনের মধ্যে যে জীবনমুখী ভালোবাসার শক্তি আছে, তার মূলে যে ভালোবাসা থাকে তা দেহজ। কাম-বাসনার ঊর্ধ্বে ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না। এখানে দিবাকর ও মুসোর সম্পর্কের সূত্রপাতই হয় দেহজ কামনা-বাসনার সম্পর্কের মাধ্যমে। দিবাকরের জীবন যা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসে, তার শরীরের অজস্র ক্ষতের আঘাতের কষ্ট বিলীন হয় মুসোর স্পর্শে। ‘মুসোই ওর বুকের রক্তের দাগে জিভ দিয়ে চাতে। বুকে, ঘাড়ে, মুখে সব রক্ত চাটে।’[৪০] মুসো এবং দিবাকরের সম্পর্কের মূলে যৌনচেতনা প্রবল, আদিমতায় ভরপুর দৈহিক কামনা-বাসনায় উন্মত্ত দুই নর-নারী।

ইতিহাসচেতনা থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্বেষণ, আদিবাসী সমাজচেতনা, শোষণ, বিদ্রোহ, ভূমি আন্দোলন, রাজনৈতিক চেতনা— এই সবকিছুই অত্যন্ত সুনিপুণভাবে মহেশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে উপস্থিত। আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পের দ্রৌপদী চরিত্রটি অবলম্বন করা হল। তথাকথিত সভ্যসমাজ দ্বারা আদিবাসী শ্রেণিশোষণ ও তার বিরুদ্ধে এক আদিবাসী নারীর রুখে দাঁড়ানো, প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই গল্পের আঙ্গিক বিন্যস্ত। গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র- দোপ্‌দী মেঝেন, যার বয়স সাতাশ এবং স্বামী দুলন্‌ মাঝি যে নিহত। দ্রৌপদী ও তার স্বামী রাজনীতি সচেতন চরিত্র। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি থেকে নকশাল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আর এই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন। নকশাল আন্দোলন যে আদিবাসী মদতপুষ্ট ছিল, তার সাক্ষ্য বহন করে এই গল্প।

দ্রৌপদী তিন পরিচয়ে গল্পে চিত্রিত- সে আদিবাসী সাঁওতাল গোষ্ঠীর প্রতিবাদী নারী, সে স্ত্রী, সে নকশাল আন্দোলনের এক গেরিলা যোদ্ধা। তার চরিত্রে কঠোরতা থাকলেও, সে তার স্বামীকে ভীষণ ভালোবাসে— 'দোপ্‌দী দুল্‌নকে রক্তাধিক ভালোবাসত।'[৪১] এত ভালোবাসার পরও দুলনের মৃতদেহ সে নিতে আসেনি, কোনো আন্দোলনের এটাই নীতি। দ্রৌপদী যে ভীষণ শক্ত, দৃঢ়, প্রতিবাদী, সাহসী তা চিত্রিত। ১৯৭১ সালে বাকুলি অপারেশনে শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন করায়, তখন থেকেই এরা 'ক্রিমিনাল', 'মোস্ট ওয়ান্টেড'। স্বজাতির মানুষদের বিশ্বাসঘাতকতায় দুলন নিহত হয় এবং দ্রৌপদীও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

দ্রৌপদী জানে, এই কেসে ধরা পড়লে তাকে কতটা কষ্ট-অত্যাচার সহ্য করতে হবে—

> 'যদি নির্যাতনে, নির্যাতনে শরীর ও মন ভেঙে পড়ে তখন দোপ্দি নিজের জিভ দাঁতে কেটে ফেলবে। ...শরীরের প্রতিটা হাড় থাকে চূর্ণ, যৌনাঙ্গে ভীষণ ক্ষত— কিলড্‌ বাই পোলিস ইন অ্যান এনকাউন্টার...'।[৪২]

পতিব্রতা গ্রাম্য বধূ, সহজ সরল আদিবাসী মেয়ে দ্রৌপদী এই প্রবল অত্যাচারের কথা জেনে-বুঝেও এই সংগ্রামের পথ নির্বাচন চরিত্রটিকে বিশেষত্বের তকমা এনে দেয়। তার এই সাহসিকতা, ত্যাগ, দৃঢ় প্রত্যয় তা কেবল এই দ্রৌপদীর নয়, সেই সময় নকশালে অংশগ্রহণ করা নারীদের মনোভাব চিত্রিত। আন্দোলনের

পথে এসে সে তার নাম বদল করে ‘উপী মেঝেন’ নামে। দ্রৌপদী নমনীয় নারীচরিত্র নয়, সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, সেই অন্যায়কে পালটাবার মনোভঙ্গি তার আছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, অন্যায়-ভয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে, পলায়নী প্রবৃত্তিকে গ্রহণ না করে যুক্তিবুদ্ধিকে আশ্রয় করে শোষণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থাকে বদলাবার প্রয়াস করাই সর্বতভাবে সব মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য। বস্তুবাদী মনস্তত্ত্ববিদ পাভলভের এই মনোভাব দ্রৌপদীর মনস্তত্ত্বে প্রতিফলিত।

দ্রৌপদী পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর জেরায় তার মুখ থেকে গোপন কোনো কথা, কোনো নাম কেউ জানতে পারে না। এরপর সেনানায়কের আদেশ— “ওকে বানিয়ে নিয়ে এস ডু দি নীডফুল’। বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।”[৪৩] এরপর কেটে যায় ‘এক নিযুত চান্দ্র বৎসর’— একের পর এক অগুণতি লোকের দ্বারা ধর্ষণ, শারীরিক অত্যাচারে দ্রৌপদী অজ্ঞান হয়ে যায়, তার শরীর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়।

মহাভারতের অন্যতম এক নারী চরিত্র ‘দ্রৌপদী’ পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী, যাকে রাজসভায় বিবস্ত্র করেছিল পুরুষজাতি। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করলেও, এই ক্ষেত্রে তাকে কেউ রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি, দ্রৌপদী নিজেই শোষকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক আদিবাসী নারী, পার্থিবসত্তা। লেখিকা দ্রৌপদী নামের ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন বাস্তবের প্রেক্ষিতকে- মহাভারতের যুগেও নারী লাঞ্ছিত, স্বাধীনোত্তর নারী স্বাধীনতার যুগেও নারী লাঞ্ছিত, সময়ের কালান্তরে নারীর অবস্থান সমাজে পরিবর্তন হয়নি। দ্রৌপদী তার ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে সেনানায়কের সামনে দাঁড়ায়। অমানবিক যন্ত্রণা, নির্যাতন, অত্যাচার কোনও কিছুই দ্রৌপদীর বিদ্রোহী প্রতিবাদী চেতনাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি— ‘দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে, এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।’[৪৪] দ্রৌপদীর নির্ভীক, সোচ্চার প্রতিবাদ শাসকদলের কাছে ভয়েরই। প্রতিবাদই শাসকের গদি টলাতে পারে। অত্যাচার সহ্য করতে করতে যখন মানুষের ভয় চলে যায় তখন মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। দ্রৌপদীর ক্রোধ, হাসি, নগ্নতা তা কেবল দ্রৌপদীর নয়, এই নগ্নতা শাসক সমাজের, এই প্রতিবাদ হাজার হাজার প্রান্তিক মানুষের, যাদের অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করতে করতে পিঠ ঠেকে গেছে। দ্রৌপদী চরিত্র এতটাই জীবন্ত, তা নারী বা পুরুষ নয়, মানুষের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করে।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘শিকার’ গল্পে ওঁরাও জাতির মেয়ে মেরী প্রতিবাদী এক নারীচরিত্র। গল্পের এই চরিত্র যে কাল্পনিক নয়, তা *ইমাজিনারি ম্যাপ্স* (১৯৯৩) গ্রন্থে মহাশ্বেতা দেবী ও অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এর একটি কথোপকথন থেকে জানা যায়। মেরীর শরীরে রয়েছে সাহেব রক্ত, সেই কারণে সে তার ওরাওঁ সমাজের অংশ হিসাবে বিবেচিত বা গ্রাহ্য হয় না। এক্ষেত্রে তার মনের গহনে একটা চাপা কষ্ট, আকাঙ্খা আছে। সে চায়-

> ‘শ্বেতাঙ্গ পিতার জারজ মেয়ে বলে ওকে ওরাওঁরা রক্তের মনে করে না এবং স্বয়ং স্ব-সমাজের কঠোর রীতিনীতি ওর ওপর আরোপ করে না।
>
> করলে ও বিদ্রোহ করত। করে না বলে ওর দুঃখ হয়। ওর অন্তরে অন্তরে কোথায় যেন ওরাওঁ সমাজের একজন হবার আকাঙ্খা আছে। খুব খুশি হতো ও। ওর তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে যদি কোনো সাহসী ওরাওঁ ছেলে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করত’।[৪৫]

মেরীর মনে দ্বিবিধ মনোভাব লালিত, একদিকে তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ওঁরাও সমাজ তার উপর রীতিনীতি চাপাক, আকাঙ্খা তার ওঁরাও সমাজের একজন হবার, আবার অন্যদিকে সে এই চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাবও পোষণ করে। তার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে।

মেরীর নিরুপদ্রব জীবনে হঠাৎ হাজির ঠিকাদার তসিলদার সিং। সে যেকোন মূল্যেই মেরীকে পেতে চায়। এই চাওয়ার পিছনে কেবল রয়েছে দৈহিক কামনা বাসনা। সে মেরীকে নানাভাবে প্রলোভন দেখায়, কিন্তু মেরী তাকে বলিষ্ঠভাবে অস্বীকার করায় তসিলদারের মেরীকে পাওয়ার জেদ প্রবল হয়। তসিলদার মেনে নিতে পারে না এক আদিবাসী নারী তাকে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে। তসিলদারের এই লোলুপ দৃষ্টি ও মনোভাব থেকে রক্ষা পেতে মেরী অনেক জোরাজুরির পর, নিজের পরিকল্পনা মতো আদিবাসীদের শিকার উৎসবের দিন মেরী হায়নারূপী তসিলদারকে হত্যা করে। মেয়েদের এই শিকার উৎসবে মেরী আদিবাসী সমাজের নারীদের অমর্যাদা, অবমাননার অপরাধের অবসান ঘটিয়েছে, এই হত্যার মধ্যে দিয়ে মেরি শাসক সমাজের ‘নারী ভোগের বস্তু’ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত প্রতিবাদ করেছে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ধৌলী' গল্পে ধৌলী সহজসরল এক আদিবাসী মেয়ে, যে প্রেমে বঞ্চনার শিকার হয় এবং সমাজ দ্বারাও লাঞ্ছিত হয়। উচ্চবর্ণের মিশ্রিলালের সাথে নিম্নবর্ণের মেয়ে ধৌলীর প্রণয় হয় ও ধৌলী মিশ্রিলালের ভালোবাসায় ভরসা করে এবং সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। মিশ্রিলাল ধৌলীকে প্রথমে সামাজিক পরিচয় দিতে চাইলেও পরিবারের চাপে সে ব্যর্থ হয় এবং অন্যত্র বিবাহ করে। ধৌলী জন্ম দেয় তাদের অবৈধ সন্তানকে। ধৌলীও প্রথম থেকেই সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে জানত যে উচ্চবর্ণের সাথে তার বিবাহ সম্ভব নয়, তাও সে আবেগের বশবর্তী হয়ে মিশ্রিলালকে ভালোবেসে ফেলে, তার সন্তানের জন্ম দেয়। ধৌলী কেবল চেয়েছিল মিশ্রিলালের পরিবার তাকে তার সন্তানের খোরপোষটুকু দিক, কিন্তু ধৌলী এই প্রাপ্যটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়। কেবল পরিবারের দিক থেকে নয়, মিশ্রিলালের কাছ থেকেও ধৌলী কপটতা, অসম্মান ছাড়া কিছু পায়নি। সমাজের চোখেও দোষী ধৌলী। সে কারোর থেকে কোনোরকম সাহায্য না পেয়ে নিজের, নিজের মা'র এবং সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে, জীবনের তাগিদে ধৌলীকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে পাভলভের মনস্তত্ত্বের কথা এসে পড়ে- ধৌলীর যে পরিস্থিতি, সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে তাকে এই দেহব্যবসার পথ বেছে নিতে হয়। এখানে পাভলভের 'নিমিত্তবাদ' মনোভাব ক্রিয়াশীল অর্থাৎ পাভলভ মানুষকে যুক্তিহীন বা উদ্দেশ্যহীন বলে গণ্য করেন না। মানুষের কাজের পিছনে যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে, পাভলভ তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ধৌলী নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য নয়, বাঁচার উপায় হিসাবে এই ঘৃণ্যপথকে বছে নিয়েছে। ধৌলীর মনোবিশ্লেষণে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। এই গল্পে ব্যক্তিমনের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক অবক্ষয়। ধৌলী না পাওয়ার বেদনাবোধে ভাস্বর, সমাজের এক শোষিত, লাঞ্ছিত নারীচরিত্র।

মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' গল্পের অন্ত্যজ দুসাদ রমণী শনিচরী উচ্চবর্ণের দ্বারা শোষিত এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে লাঞ্ছিত এক নারী চরিত্র। কালের গতিতে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিণামে সে স্বামী ও পুত্রহারা হয়। কিন্তু রুক্ষ বাস্তবতায় সে শোকে কাঁদতেও ভুলে যায়। বাস্তবের ভয়ংঙ্করতার কাছে মৃত্যু শোকও যেন হেরে যায় শনিচরীর জীবনে। এরপর তাঁর বাঁচার একমাত্র অবলম্বন তার নাতি, সেও একদিন পালিয়ে যায়। শনিচরী এবারেও কাঁদতে পারে না। প্রকৃতির নির্মমতা ও ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় সে যেন পাথরে পরিণত হয়। যে হাজার শোকেও কাঁদতে পারেনি, সেই শনিচরীকেও বেঁচে থাকার তাগিদে রুদালীর পেশা গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে জীবনযন্ত্রণা ও ভাগ্যের লাঞ্ছনায় শনিচরী চরিত্রের ট্র্যাজেডী ঘণীভূত হলেও

শনিচরী পলায়নবাদী প্রবৃত্তি গ্রহণ না করে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে নিজের পেশার মাধ্যমে হার না মেনে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে। শনিচরী জীবনযুদ্ধে অপরাজেয় এক মানবসত্তা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'সমাজবাদ ববুয়া' গল্পের আদিবাসী জংলী বেরসা সহজ-সরল সাধারণ মানুষ হলেও তার মননের গভীরে সমাজসচেতনতা, প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ-সরল বেরসা দিনের পর দিন খেটে খাওয়া মানুষদের উপর হওয়া অত্যাচার-অবিচার সহ্য করতে করতে, সে একসময় প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সে স্বার্থপর, লোভী মুকুটলালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, তাকে আঘাত করেছে। সহজ-সরল বেরসার প্রতিবাদী চরিত্রে উত্তরণ তার সচেতন দৃঢ় সংগ্রামী সত্তার পরিচয় বহন করে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পের বসাই টুডু চরিত্রটি সৎ, সাহসী, রাজনৈতিক প্রতিবাদী চরিত্র। বসাই টুডু এক খেতমুজুর, দীর্ঘদিন কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে কাজ করে এবং সে বুঝতে পারে পার্টির উচ্চবর্ণ কমরেড ও আদিবাসী কমরেডদের মধ্যে শ্রেণিগত ব্যবধান। সে দল ত্যাগ করে গড়ে তোলে নিজস্ব সংগ্রাম, এই সংগ্রামের পথ ধরেই বসাই টুডু ব্যক্তি থেকে মিথ হয়ে ওঠে। বসাই টুডুর মধ্যে দিয়েই সমগ্র বঞ্চিত আদিবাসী সমাজের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এর ভাষা মূর্ত।

বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তিক জনজাতি চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে 'ঘন্টাবাজে' গল্পের সুবল চরিত্রে আলোকপাত করা হল। সুবলের আত্মহত্যার পিছনে মূল কারণ বিচ্ছিন্নতাবোধ, গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে তার মধ্যে একাকীত্ববোধ, অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। সে কোনোভাবে কোনো ইউটোপিয়ার কল্পনায় নিজের মুক্তি দেখতে পায় না। সে তার নিজের গ্রামবাসীদের কখনও খারাপ চায়নি, কিন্তু বিজিত গুপ্ত ও প্রভাস ভুঞ্যার জালে সে জড়িয়ে পড়ে ও গ্রামবাসী এবং তার নিজের পিতাও তাকে ভুল বোঝে। তাকে বেঈমান, প্রতারক হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অস্তিত্বের সংকটের আবর্তে বিচ্ছিন্নতাবোধ, অপমান ও লাঞ্ছনায় জর্জরিত সুবল আত্মহত্যা করে, জীবনযুদ্ধে সে পরাজিত হয়। তার মৃত্যুর দশবছর পর তার বাবা ভারত তার ছেলের মৃত্যুর সঠিক কারণ ও নিজের ভুল উপলব্ধি করে এবং পূর্বকৃত ভুল সংশোধন করে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলায় প্রয়াসী হন।

মহাশ্বেতা দেবীর 'লাইফার' গল্পে মাগন সাঁওতাল পেশায় লাইফার এবং সহজসরল মনের মানুষ। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় সে তার স্ত্রী দনিকে হত্যা করে রাগের বশে। এক্ষেত্রে মাগনের মনোবিশ্লেষণে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। পাভলভ মনে করেন, মানুষ প্রক্ষোভের বশবর্তী হয়ে যুক্তিহীন ও পাশবিক আচরণ করে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক দু'রকম কারণই আমাদের মেজাজকে প্রভাবিত করে। তীব্রতম আবেগ ভূমিকম্পের মত নাড়া দিলে তখন যুক্তিবুদ্ধি, কোনকিছুই আর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সেই মুহূর্তে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যে কোন অসামাজিক কাজ করে ফেলতে পারে, ফলাফল সম্পর্কে ভাববার অবকাশ থাকে না। এক্ষেত্রেও মাগনের সাথে দনির দাম্পত্যে কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু ঝগড়ার কারণে রাগের বশবর্তী হয়ে মেজাজ হারিয়ে, তাৎক্ষণিক উদ্দীপক দ্বারা পরিচালিত হয়ে মাগন দনিকে হত্যা করে। মাগন হঠাৎ রাগের বশবর্তীতে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ফলাফলের চিন্তাভাবনা না করেই এই অসামাজিক ও পাশবিক আচরণ করে ফেলে।

সে তার এই অপরাধের কথা থানায় গিয়ে নিজে স্বীকার করে এবং মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করে। সে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। এক্ষেত্রে মাগনের সততার পরিচয় পাওয়া যায়। জেল থেকে ফিরে সে স্বাজতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা হয়ে পড়ে। সে তার শিকড়ের সন্ধানে, স্বজাতি-স্বজনের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু জীবন কাটাতে থাকে। হৃদয়োভ্যন্তরের গহনে তার স্বজাতির প্রতি অমোঘ টান, এক আর্তি, তার দনীর প্রতি ভালোবাসার আকুতি মূর্ত। শেষপর্যন্ত মাগনের জীবন ট্র্যাজেডি থেকে বেরিয়ে আসে। সে তার স্বজাতির সন্ধান পায়, তাদের সাথে সে আদিবাসী জীবনে পুনরায় পা বাড়ায়। গল্পে মাগন সততায় পূর্ণ অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী, আত্মানুসন্ধানী জীবন্ত চরিত্র।

আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী গল্পের আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় অসীম রায়ের 'দুই বৃদ্ধের কাহিনি' গল্পের চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণ ও চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল। গল্পের একাশি বছরের সাঁওতাল বৃদ্ধ শম্ভু হেমব্রম রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি এবং সাঁওতালগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়। সে বছর চল্লিশ আগে ঘিয়া নদীর ধারে তাদের এই সাঁওতাল গ্রাম বা বসতি গড়ে তোলে। সে এখন বয়সের ভারে অথর্ব কিন্তু তাও এই বৃদ্ধ বয়সে সে পরিশ্রমী এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্য মানুষদের তুলনায় বেশ আধুনিকমনস্কও বলা যেতে পারে। সে কলকাতায় গেছে, রাজনীতি সম্পর্কেও সে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে। কলকাতায় বসবাসকারী পবিত্রর থেকে নিয়ে হলেও সে সিগারেট খায়।

এই সিগারেট খাওয়া তার কাছে নতুন নয়। শম্ভু চরিত্রটির রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞায় সে বিশিষ্ট এবং অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল। শম্ভুর চিন্তায় নকশাল রাজনীতি-ব্যবস্থার এক বিশেষ ত্রুটির কথা পাওয়া যায় —

> 'শম্ভু হেমব্রম চিন্তা করতে করতে উঠে পড়ে। শহরের বাবুরা এসে জোতদার জোতদার করে চেল্লাচেল্লি করলে কি হবে? বাবুরা তো এসে হুমকি দিয়ে পালিয়ে যাবে। তারা ধান দেবে? কাজ দেবে? এই পবিত্র লোকটার গলাখানা কেটে দিলে ধান পাওয়া যাবে? ধান যদি পাওয়া যায় তা হলে বলো আমিও ভিড়ে যাব। কিন্তু লুটের ধান থাকে না, লুটের ধান বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হাওয়ায় উড়ে যায়'।[৪৬]

সাঁওতাল সমাজে বৃদ্ধ শম্ভু হেমব্রম এই রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, যুক্তিবুদ্ধিপূর্ণ দর্শন তা আদিবাসী কিছু মানুষের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতার ইঙ্গিত বহন করে। এই গল্পের অনাদি সরকার ও শম্ভু হেমব্রম দুজনেই বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে জীবনযুদ্ধে রণক্লান্ত ঠিকই, কিন্তু শম্ভুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তার চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

গল্পের আর এক চরিত্র শিবু হেমব্রম, শম্ভু হেমব্রমের পুত্র। শম্ভুর ন্যায় শিবুও রাজনীতি সচেতন, শিক্ষিত। সে তার আদিবাসী 'সাঁওতাল পাড়ার আদর্শ সন্তান'। সে কবি, তার লেখা পালা হুগলি, বিহারের সাঁওতালি অঞ্চল এবং কলকাতার ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার পালার মূল বিষয় ছিল মা-বাবার প্রতি সন্তানের অনাদর, অবজ্ঞা এবং শেষ পর্যন্ত পরিতাপ। মা-বাবাও বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে ভিক্ষা করছে এবং ছেলেও ভিক্ষা করতে করতে তাদের দেখা হওয়া— এই বিষয়েই শিবুর পালা। অথচ সে তার বাবার প্রতি এমন উদ্ধত আচরণ করে যেখানে শম্ভু ভয় পায় যে এই হয়তো শিবু তার গায়ে হাত তুলল। সত্যি এটাই হয়ত গল্পকথা আর বাস্তবতার পার্থক্য। যেখানে সে নিজে সমাজে সচেতনতার বার্তা দিয়ে পালা লেখে, সেখানে সেই-ই তার পিতার কষ্ট প্রথমে বুঝতে পারে না— 'তার বাবার এত শক্ত সমর্থ শরীর, অথর্ব হয়ে পড়ার মানে কী?'[৪৭] পরে সে বাবার কথায় শম্ভুর প্রতি একটু সহানুভূতি দেখায়। দরিদ্র বাড়িতে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা সেখানে আশি বছরের বৃদ্ধকেও খেটে খেতে হয়। চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে আদিবাসী, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের চিত্র সুস্পষ্ট। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং পিছিয়ে

পড়া সমাজের বাসিন্দা হয়েও শিবু স্থানীয় নেতা, সে পালা লেখে। একটু হলেও অন্যরকম যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবনা-চিন্তা, রাজনীতি সচেতনতা বোধ শম্ভু হেমব্রম ও শিবুর, যা আদিবাসী সমাজের অন্য চরিত্রদের থেকে তাদের স্বতন্ত্র করে। এছাড়াও বোঝা যায় আদিবাসী সমাজেও সত্তরের দশকে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক সচেতনাবোধ তৈরি হচ্ছে।

চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় অসীম রায়ের 'সুন্দর' গল্পের সাঁওতাল পরগনার মডার্ণ মালি সুন্দর চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল। কলকাতায় বসবাসকারী এক বাবুর সাঁওতাল পরগনাস্থিত বাড়ির মালি সুন্দর। প্রায় কুড়ি বছর কেউ এবাড়িতে আসে না, পাঁচবছরে হয়ত একবার বাড়ির কর্তার ছেলে এই বাড়িতে আসে। সেই কারণে সুন্দরই নিজের বাড়ির ন্যায় এই বাড়িতে বসবাস করত। কিন্তু হঠাৎই তার নিরুপদ্রব জীবনে সুধীরের সপরিবারে সেই বাড়িতে ঘুরতে আসায় সে ডাকাতির ভয় দেখায়, এছাড়াও আরও নানান অ-ব্যবস্থার মধ্যে সুধীরদের ফেলে। প্রথম থেকে শেষ গল্পে সুন্দরের মধ্যে এক রহস্যময়তার পরিচয় লভ্য। তার তাকানোয় রহস্যময়তা, ব্যবহারে বিরক্তিভাব এবং সে বারবার তার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে থাকে এই বাড়িতে মানুষ থাকতে পারে না। গল্পের শেষে রাত্রে বাড়িতে ইট পড়ার ঘটনায় অনুমান করাই যায় এ কাজ সুন্দরের। এই কাজের পিছনে থাকা উদ্দেশ্য বোঝাই যায় যে সে কোনভাবেই চায় না এই বাড়িতে কেউ থাকুক, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তার কোনো স্পষ্ট কারণ না থাকলেও এর পিছনে সুন্দরের অধিকারবোধ কাজ করেছে। কোনো একটা জায়গায় অনেকদিন একটানা থাকতে থাকতে মানুষের অধিকারবোধ জমায়, তখন যেন সে ভুলে যায় এ তার অধিকারের জিনিস নয়, এই জিনিস তার নিজের নয়। সুন্দরের রহস্যময় তাকানো, তার ভয়দেখানো, কথাবার্তা এই আচরণের মূলে আছে তার অধিকারবোধ ও বাড়িটার প্রতি অধিকার হারিয়ে ফেলার ভীতি। সুন্দরের সজ্ঞান চৈতন্যের যে রহস্যময়তার আবরণ প্রকাশ পায়, সেই আবরণের অন্তরালের অধিকারবোধ ও অধিকার হারিয়ে ফেলার ভীতি চরিত্রটিকে রহস্যময় করে তুলেছে।

আদিবাসী চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রফুল্ল রায়ের 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী' গল্পে ধুন্নিলাল ও তার মেয়ে মুনিয়া চরিত্র আলোচনা করা হল। গল্পে বিহারের হেকমপুরের উত্তরে দোসাদ, তাৎমা, ধাঙড়, কোয়েরি— আদিবাসী যারা সমাজে অচ্ছুত তাদের বাস। এই অচ্ছুৎ টুলিতেই ধুন্নিলাল আর তার মেয়ে মুনিয়া ও তার দুই সঙ্গী একটা বন্দুক ও একটা ঘোড়া

নিয়ে তার বসতি। সমাজের এই অচ্ছুৎ বর্ণের মানুষ ধুন্নিলাল ও তার মেয়ে মুনিয়া দু'জনেই সাহসী, মহানুভব, উদার চরিত্রের ও পরোপকারী মনের অধিকারী। যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দাঙ্গায় মানুষের প্রাণ বাঁচায়। গল্পে ১৯৪২ এবং তার পরবর্তী ভারতবর্ষের উত্তাল সময়ের খণ্ডচিত্র চিত্রিত। সেই সময়ে সংঘটিত দাঙ্গা কতটা ভয়ানক-বিধ্বংসী, দাঙ্গা মানুষের মনে কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা চিত্রিত। রাজনীতির কারণে সাদাসিধে মানুষ, প্রতিবেশীরা মুহূর্তে কীভাবে বদলে যায়, হিংসার আগুন মানুষকে কতটা হৃদয়হীন পশুতে রূপান্তরিত করে তা চিত্রিত—

> 'এমনিতে ওরা সাদাসিধে ভালোমানুষ, নিরীহ এবং ভীরু। কারুর গায়ে একটা আঙুল ঠেকাবার সাহস ওদের নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকগুলোর দিকে তাকালে সে কথা কে বলবে! চিরকালের শান্তিপ্রিয় আর গরিব হেকমপুরার এই মানুষগুলোর ভেতর থেকে মারাত্মক এক একটি হত্যাকারী যেন বেরিয়ে এসেছে।'[৪৮]

এক্ষেত্রে ফ্রয়েড মানবমনের যে মনস্তত্ত্বের কথা বলেছেন, তা প্রযোজ্য। ফ্রয়েড বলেন মানুষ সহজাত হিংস্র প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় কিন্তু সভ্যতার কারণে মানবমনের এই হিংস্র প্রবৃত্তি অবদমিত অবস্থায় থাকে। এই অবদমিত হিংস্র প্রবৃত্তিই সুযোগ-সুবিধার ছিদ্রপথে বেরিয়ে এসে ধ্বংসাত্মক হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপে মানুষকে উৎসাহিত করে, মানুষ স্বভাববর্বর। এরকমই এক যুদ্ধের মৃত্যুলীলা দেখে ফ্রয়েড মানবমনের মৃত্যুমুখী শক্তির কথা প্রথম বলেন। দাঙ্গার ভয়াবহতা, নির্মমতা, হত্যালীলা, পাশবিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, অমানবিকতার পাশাপাশি ধুন্নিলালদের মতো মানুষও সমাজে বিরাজমান, যারা কেবল মানুষের কথা ভাবে, মানবিকতার প্রতিমূর্তির চরিত্র ধুন্নিলাল ও তার মেয়ে মুনিয়া।

ধুন্নিলাল মুসলিমধর্মাবলম্বী জমিরুদ্দিন ও তার মেয়ে আসমাকে দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করে, নিজেদের বিপদ জেনেও ধুন্নিলাল অসহায় মানুষদের আশ্রয় দেয়। এক্ষেত্রে তার মেয়ে মুনিয়াও সহায়তা করে। মুনিয়া চরিত্রেও পিতার ন্যায় সৎ, মহানুভব সাহসী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধুন্নিলাল যখন শেষমেষ গ্রামের লোকদের কাছে ধরা পড়ে যায়, সে জমিরুদ্দিন ও তার মেয়েকে বাঁচাতে তার দুই সঙ্গী- বন্দুক ও ঘোড়া, তার মেয়ে ও জমিরুদ্দিন, আসমাকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যায়। সে জানে, এক্ষেত্রে তার বিপদ হতে পারে, তারপরেও সে কেবল ওই দুই নিরাপরাধ মানুষের জন্য নিজের ও তার

মেয়ের জীবনও বিপন্ন করতে দ্বিতীয়বার ভাবে না। ধুন্নিলালের কাছে ধর্মের থেকে মানুষ পরিচয় বড়ো। এক্ষেত্রে ধুন্নিলালের চরিত্রে মহানুভবতা, উদারতা, সততা, ন্যায়বোধই তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

প্রফুল্ল রায়ের 'সাতঘরিয়া' গল্পের চাঁপিয়া দোসাদ বিহারের অচ্ছুৎ প্রান্তিক জাতি। এরাও বিহারের সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা জনজাতির সমগোত্রীয়। চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষা আলোচনায় বিহারের মনপাখল গ্রামের চাঁপিয়া দোসাদ নারীচরিত্রটি অবলম্বন করা হল। চাঁপিয়া এক ভাগ্য-বিপর্যস্তা, ভাগ্যহীনা ট্র্যাজিক নারীচরিত্র। গল্পে দেখা যায় চাঁপিয়া 'সাতঘরিয়া' অর্থাৎ তার সাতবার বিবাহ হয়। ছয়বার তার বিয়ে ভেঙে যায়। তার বাবা-মা মারা গেছে, ভাইয়ের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ নেই। সে বরাবরই বিবাহের সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে, এই বিয়ে যেন তার না ভাঙে, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তাকে তার বাবার বাড়িতেই ফিরে আসতে হয়। কোনো কামনা-বাসনার জন্য নয়, কেবল নিরাপত্তার জন্যই সে এতবার বিয়ে করেছে। নারীসুলভ মনোবৃত্তির পাশাপাশি তার প্রতিবাদী সত্তাও পাওয়া যায়—

> 'অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের ঘরের যুবতী মেয়েদের মালিক এবং তাদের লোকেরা চিরদিন ভোগদখল করে এসেছে। আবহমান কাল ধরে এই অঞ্চলে এটা একটা চালু প্রথা। এর বিরুদ্ধে কেউ কখনও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। কিন্তু চাঁপিয়া অন্য ধাতের তেজী মেয়ে।'[৪৯]

এক্ষেত্রে চাঁপিয়া অন্যায় মেনে নেয় নি, সে প্রতিবাদ করেছে। সে মেহনতীও, কারণ প্রত্যেক বিয়ের ক্ষেত্রেই তাদের সমাজে একধরনের নিয়ম আছে– স্বামী, স্ত্রী যে যার পেটের খাবার নিজেরা জোগাড় করবে। চাঁপিয়া দু'বার পেটের সন্তান হারায় কারণ অন্তঃসত্বা অবস্থায় সন্তান হওয়ার আগের মুহূর্ত অবধি তাকে খেটে খেতে হয়েছে। সে যখনই কাজ না পেয়ে বেকার হয়েছে, তখনই তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। বিহারের অচ্ছুৎ সমাজের এক অন্যরকম বিবাহনীতি এই গল্পের মাধ্যমে উন্মোচিত। অচ্ছুৎ ও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা এরা সকলেই বিহারে একই শ্রেণির, তাদের যেন শ্রমিক স্বয়ম্বর সভা বসে সেখান থেকে জমির মালিকরা তাদের মজুর পছন্দ করে। প্রত্যেকবারই চাঁপিয়ার বিবাহের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে এই 'মজুর স্বয়ংবর' সভা। এর মাধ্যমেই সে শেষপর্যন্ত গৈবীনাথকে বিবাহ করে। এই বিবাহে চাঁপিয়া যেন আর গল্পের চরিত্র নয়, তার চরিত্রের উত্তরণ ঘটেছে। সে ট্র্যাজিক বিষণ্ণতায় ভাস্বর হলেও মানবিক ও মহৎ। স্বামীর সঙ্গে সুরক্ষিত খেটে খাওয়া নিতান্ত সাধারণ এক জীবনযাপন করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু তা কখনই পূরণ

হয়নি। যখন সে সমাজের কাছে বাতিল হিসাবে গণ্য হয়ে চরম হতাশার অতলান্তে ডুবে যাচ্ছিল, তখন সে তার পাশে বসা গৈবীনাথ যে তার মতোই সমাজের কাছে বাতিল, ভাগ্যবিপর্যস্ত, রোগগ্রস্ত, সেই পুরুষকে নিরাশ্রয় জীবনের হাত থেকে বাঁচিয়ে আশ্রয় দিয়েছে, স্বামীর পরিচয় দিয়েছে। সমাজের দুই বাতিল মানুষ একসাথে জীবনের পথে পা বাড়ায়। এক্ষেত্রে চাঁপিয়া মানবতায় উজ্জ্বল এক নারী।

প্রফুল্ল রায়ের অন্য আরেকটি গল্প ‘কার্তিকের ঝড়, বন্যা এবং চুনাও’ গল্পের পটভূমি বিহারকেন্দ্রিক ও সেখানকার ভোট রাজনীতি। গল্পের অচ্ছুৎ জাতের ছেলে কোয়েরি রামধনী যে মিশনারিদের পাল্লায় পড়ে রাঁচি গিয়ে ‘লিখিপড়ী আদিমী’। সে শিক্ষিত, বুঝদার। রামধনী সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে মানুষদের কিন্তু ধুরন্ধর কূট রাজনীতিবিদদের কাছে সে পরাজিত হয়। সে পরাজিত হয় সাধারণ মানুষকে ও প্রান্তিক মানুষদের বোঝাতে যে তারা যাদের রক্ষক ভাবছে তারাই আসল ভক্ষক। সমাজের কূটনীতির শিকার ও পরাজিত এক চরিত্র কোয়েরি রামধনী।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় দেবেশ রায়ের ‘মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট’ গল্পের শিশুচরিত্র ভাদুই সে অল্পবয়সেই পেটের দায়ে অর্থ উপার্জনের তাগিদে বার্ণেশ ঘাটে জীবনযাপন করে মাঝি মোল্লার সাথে। সে আশ্রয়হীন, অভিভাবকহীন, অনাথ বালক, সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত। কথাতে বলে বাস্তবতা মানুষকে বয়সের থেকে বড় করে তোলে, বাস্তবতাই ‘ম্যাচিউরিটি’ এনে দেয়। ভাদুই এর ক্ষেত্রে একথা যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সে অল্পবয়সী হলেও তার প্রবল তৎপরতা প্রকাশ পায় বাস এবং নৌকার যাত্রী খোঁজার ক্ষেত্রে এবং এই পেশায় তার বুদ্ধিমত্তা ও বাক্‌পটুতার কাছে পূর্ণবয়স্ক লোকও হার মেনে যায়। ভাদুইকে বাস্তব বয়সের থেকে বড়ো করে তুলেছে তার চরিত্রের পেশাদারীত্ব ও অভিভাবকহীন জীবন। ভাদুই চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা, বাকপটুত্ব, সচেনতাবোধ অন্বিত। তার বাস্তবতাবোধ এবং শিশু সারল্যের সমন্বয়ে সে মৃতজংশনের প্রাণস্পন্দন হয়ে উঠেছে, সে যেন মাঝি মোল্লাদের শত ক্লান্তিকষ্টের মধ্যেও একটুকরো প্রাণের পরশ।

দেবেশ রায়ের ‘রাখি পূর্ণিমার রাত’ গল্পের রথু লোহার সরল সাদাসিধে, জনজাতি মানুষ। তার এই সজহসরলতার বিশ্বাসের মূল্য দিতে হয় তার জীবন দিয়ে। সে রাজনীতির অভ্যন্তরের খেলা বুঝতে পারে না। রাজনৈতিক নেতারা রথুর মতো সহজসরল, বোকা মানুষদের ঘুঁটির ন্যায় ব্যবহার করে ভোটে

জেতার জন্য। তাদের কাছে সাধারণ মানুষের কোনো মূল্য নেই, কেবল স্বার্থসিদ্ধিই উদ্দেশ্য। এই রাজনীতির ষড়যন্ত্রের শিকার রথু লোহার।

চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন আলোচনায় অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ গল্পের সারবান লোহার চরিত্রটিতে আলোকপাত করা হল। সারবান সৎ, দরিদ্র, নরম, সহজ-সরল মনের মানুষ। সমাজের লোক ভাবে তার উপর দেবতা ভর করে, সে দেবতার অংশ, তাই সে সমাজের কাছে ভীষণ দামী। কিন্তু সারবানের শারীরিক, মানসিক কষ্টের কারণে সে ভগবানের কাছে আকুতি জানায়, তাকে এই দেবাংশী থেকে মুক্তি চায়- ‘মাও, মাওরে, মোক্ ই দায় থিকা রেহাই দে মাও! মুই র পারি না, মোক্ ছুটি করাই দে মাও!’[৫০] এক প্রবল আকুতি ঝরে পড়ে সারবানের কণ্ঠে।

সারবানের দশবছর বয়সে শরীরে কম্পন, অচেতন হয়ে যাওয়া, নাভিকুন্ডলীর নীচে এবং শিরদাঁড়া বেয়ে একটা অস্বস্তিকর কম্পন তার সারা শরীরে, বিকট শব্দের কারণে তার শরীরে, মস্তিষ্কে অস্থিরতা, পারিপার্শ্বিক মানুষদের নানান অভিচারিক অঙ্গভঙ্গি-মন্ত্রে সারবানের মধ্যে ভয়ের অনুভূতির উদ্রেক হয়। ভয়ানুভূতি থেকে স্নায়ু নিয়ন্ত্রণহীন অনুভব, তা থেকে শরীরে কম্পন অনুভূত হতে হতে প্রবল উন্মাদনায় সারবান অচেতন হয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়ায় গ্রামবাসীর মনে ধারণা হয় তার উপর দেবতা ভর করেছে। কিন্তু সারবানের আচরণের অসঙ্গতির মূলে আছে নার্ভপ্রক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা। আকস্মিক সামাজিক উত্তেজনা-ক্রিয়াকলাপে সারবানের মধ্যে প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং প্রবল উত্তেজনা প্রক্রিয়ার মাত্রাধিক পীড়নে স্নায়ুতন্ত্রের গতিময়তার উপর বেশি চাপ পড়ায় সারবান যখন এই বর্হিবাস্তবের পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না, তার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত করে যায়, তখন ঘটে নার্ভ প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা। বস্তুবাদীরা মানসিক বিশৃঙ্খলার মূল কারণ হিসবে এই নার্ভ প্রক্রিয়ার বিশৃঙ্খলাকেই চিহ্নিত করে। এই মানসিক বিশৃঙ্খলার ক্ষত্রে মনোবিদ পাভলভের মনস্তত্ত্বানুসারে এবং ফ্রয়েডের কথায় এটা হিস্টিরিয়া রোগেরও লক্ষণ। সারবানের হঠাৎ অচেতন হয়ে যাওয়া, শরীরের কম্পন, স্নায়ুর দুর্বলতা, অসংলগ্ন কথাবার্তা, ঘোরে থাকা এই সবকিছু হিস্টিরিয়ার খুব সাধারণ লক্ষণ। সারবানের এই নিউরোটিক রোগ, হিস্টিরিয়ার কথা সাধারণ গ্রামবাসী বুঝতে পারেনা তাদের এই বিষয়ে জ্ঞান না থাকায়, তারা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে দেবতার ভর বলে মনে করে। কিন্তু তার এই দেবাংশী সত্তা নিয়ে সে সারাজীবন পীড়ন অনুভব করলেও, গল্পের শেষে দেখা যায় এই দেবাংশী হয়েই সে বিনোদের মতো

মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এই দেবাংশীর ভ্রান্ত ধারণার জন্য সে এতদিন পীড়িত হলেও, অসহায়ত্ব বোধ করলেও শেষে সারবান তার দুর্বলতাকেই সে তার অন্যায়ের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। এখানেই সারবানের ট্র্যাজেডির উত্তরণ ঘটেছে। দেবাংশীর অতিলৌকিকতা থেকে রক্তমাংসের মানুষে উন্নীত হয়েছে সারবান।

অভিজিৎ সেনের 'জেহাঙ্গী' গল্পের জেহাঙ্গী মার্ডি, ত্রিশবছর বয়সী, সুন্দরী, সাঁওতাল রমণী। জেহাঙ্গী সমাজের অন্ধবিশ্বাস ডাইনি প্রথার বলি। কবিরাজ ও মাহানের কথায় সকলে বিশ্বাস করে জেহাঙ্গীদের পরিবারের একের পর এক দুভার্গ্যের কারণ জেহাঙ্গী ডাইন। এই ডাইন প্রথায় অন্ধবিশ্বাসের কারণে, জেহাঙ্গীর ভাসুরের ছেলের দ্বারা টাঙির কোপে জেহাঙ্গী আহত হয়। এছাড়া জেহাঙ্গীর এপিলেপ্সি বা হিস্টিরিয়া রোগ থাকায়, তারমধ্যে ফিট্ হওয়া, কম্পন এসমস্ত আরও নানান লক্ষণ প্রকাশ পায়। গ্রামবাসীরা এই সবের কারণে তাকে ডাইনি সাব্যস্ত করায় জেহাঙ্গীর জীবনে নেমে আসে অন্ধকারের হাতছানি। সে জীবন মৃত্যুর লড়াইয়ে শেষমেষ বেঁচে ফিরে এলে আদালতে সে তার ভাসুরের ছেলের দোষ অস্বীকার করে। সে দোষীকে শাস্তি না দেওয়ার পিছনে হয়ত তার কোনো ভয় কাজ করতে পারে নতুবা মানবিকতা, সহানুভূতিশীলতা, মাতৃহৃদয়ের কোমলতার কারণে সে তার পুত্রসমকে ক্ষমা করেছে।

অভিজিৎ সেনের 'মাটির বাড়ি' গল্পে গোহিলাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর চরিত্র। যে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য নিজের বংশধর, নাতিকেও হত্যা করে। একটা সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করতে গোহিলালের বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ হয় না। সম্পত্তি বাড়ানোর লোভে গোহিলাল একাজ করে, সেই সদ্যোজাত শিশুটিকে হত্যার সাথে সাথে তারও জীবনাবসান ঘটে। গোহিলাল প্রাচীন আদিম অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর, মমতাহীন এক চরিত্র।

গল্পে গোহিলালের পুত্র ভামরলাল যে সদ্যোজাতর পিতা সে এক নির্লিপ্ত, মেরুদন্ডহীন পিতা ও পুরুষ। যে পিতার অন্ধকুসংস্কারের সামনে নত হয়ে নিজের বহু প্রতীক্ষিত সন্তানকে বলি দেয়। তার মধ্যেও কোনো অনুশোচনা, দ্বিধা বা প্রতিবাদের লেশমাত্র নেই। পিতার প্রতি আনুগত্যের সামনে ব্যক্তিত্বহীন, নির্লিপ্ত এক পুরুষ ভামরলাল। যার নিজস্ব কোনো অনুভূতি, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা-

সংবেদনশীলতা তা লেশমাত্র দেখা যায় না। ভামর চরিত্রে প্রতিরোধকামী কোনো ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায় না।

চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে চরিত্রের স্বরূপ আলোচনায় 'পাথরে জলের বিন্দু' গল্পে দানী চরিত্রে আলোকপাত করা হল। কৈলাস পাহান একটি সুন্দরী মেয়ে পুষ্পাকে বিয়ে করে আনলে গ্রামে কিছুদিনের মধ্যেই রটে পুষ্পার সৌন্দর্যর রহস্য সে ডাইনি কিংবা ফোকসিনী। কৈলাসও কিছু তুকতাক জানায় গ্রামের মানুষের পুষ্পা ও কৈলাসের প্রতি সন্দেহ প্রবল হয়। এইসময় গ্রামের দু-তিনটি শিশুমৃত্যু ঘটলে এবং মুখে ঘা, খুরাই রোগে কয়েকটি গরু-মোষ মারা যাওয়ায় তাদের সন্দেহ দৃঢ় ভিত্তি পায়। এছাড়া কৈলাসের অনুপস্থিতিতে পুষ্পা বলপূর্বক দানীকে ধর্ষণ করে এবং এরপর দানীর শরীরে যৌনরোগের উপসর্গ দেখা দিলে গ্রামবাসী ও দানীর মনের ধারণা দৃঢ়তা পায়। কৈলাস এরপরই খুন হয় দানীর হাতে।

মানুষের এই হনন প্রবৃত্তির গভীরে কী মনোবৃত্তি লালিত হয়, কোন উৎকণ্ঠায় মানুষ এমন নিষ্ঠুর কাজ করে, এই সর্বনাশা আদিম অন্ধকারের উত্তর দানীর মনোবিশ্লেষণেই পাওয়া যাবে। দানীর কৈলাসকে হত্যার পিছনে ফ্রয়েড ও পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। পুষ্পার সাথে দানীর শারীরিক সম্পর্কের উদ্দেশ্য কেবল লিবিডো অর্থাৎ কাম, যৌন আকর্ষণ। এক্ষেত্রে লিবিডোর কোনো ব্যাপক অর্থ নেই। দানী পুষ্পার কাছে যে যৌনসুখ পেয়েছে তা তার স্ত্রীর কাছেও পায়নি। কিন্তু এরপরে দানীর মধ্যে যৌনরোগের উপসর্গ দেখা দিলে সে মনে করে পুষ্পা ডাইনি, তাই তার দেহের সার টেনে নিচ্ছে। তার মনে ভয়, বিপন্নতাবোধ জাগ্রত হয় এবং এই ভয়ানুভূতি পরে তার ক্ষোভ ও ক্রোধে পরিণত হয়। ফ্রয়েডের মতে মানুষের মধ্যে থ্যানাটস্ বা মৃত্যুমুখী শক্তিপ্রবাহ আছে, তা দুরকমের আত্মঘাতী ও পরঘাতী। দানী প্রথমে কৈলাসকে হত্যা করেছে এবং শেষে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় ভয়ে, তার অস্তিত্বের বিপন্নবোধে সে আত্মহত্যা করে।

কৈলাসকে হত্যার পিছনে দানীর মনে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। কৈলাস যখন বুঝতে পারে গ্রামবাসী তাকে ও পুষ্পাকে ডাইনি সন্দেহ করেছে, সে থানায় গিয়ে এবং গ্রাম প্রধানের কাছে এর বিচার চাওয়ায় কৈলাসকে দানী হত্যা করে। দানী ক্রোধে প্রক্ষোভের বশবর্তী হয়ে তীব্র আবেগে

যুক্তিহীনভাবে কৈলাসকে হত্যা করে। প্রথমে পুষ্পার প্রতি আকর্ষণে দানীর মনে তৈরি হয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, এরপর তার যৌনরোগ দেখা দিলে প্রথমে তা থেকে উদ্রেক হয় ভয়ের এবং পরে এই ভয়ই তার ক্রোধে পরিণত হয়। আর এই ক্রোধের কারণেই দানীর হঠকারী সিদ্ধান্ত। এরপরও তার মধ্যে হতাশা রয়েই যায়। এক্ষেত্রে দানী চরিত্রে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের তত্ত্বও ক্রিয়াশীল। অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল কথা নায়কের পাপচেতনা ও আত্মবিশ্লেষণ ও বিষাদময়তা। জীবন যেখানে গভীর সংকটে আবদ্ধ সেখান থেকে উত্তরণের ক্ষীণ আশা যখন বিলীন হয়ে যায় তখন দেখা দেয় অস্তিত্ব সংকট। বিচ্ছিন্ন শূন্যতার অতলান্ত গহ্বর তাদের কাছে প্রাধান্য লাভ করে, মননে গুরুত্ব পায় বিষাদময়তা, তখনই দেখা যায় ব্যক্তির মধ্যে আত্মহননের চেষ্টা। দানীর হতাশা, পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় তার মধ্যে অস্তিত্বের সংকটবোধ হয়, ফলত চরিত্রের অস্তিত্ব রক্ষাজনিত সংকটের তীব্রতা ও অস্তিত্বরক্ষার অক্ষম নিষ্ফল প্রয়াসই দানী চরিত্রের পরিণামী ব্যঞ্জনার দিক।

ভগীরথ মিশ্রের 'দৃষ্টি' গল্পে কৈলাস শিকারী, ঝড়েশ্বর লুহার ও তার স্ত্রী লৈতনের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে চরিত্র ত্রয়ীর স্বরূপ প্রকাশ করা হল। কৈলাস শিকারী দৃষ্টিহীন, প্রখর অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। কৈলাস তার অন্ধত্বের জন্য অত্যাচার ও লাঞ্ছনার শিকার। রাস্তার কিছু বিকৃতমনস্ক ছেলেরা কৈলাসের দৃষ্টিহীনতার সুযোগে তাকে নানাভাবে অত্যাচার ও উত্যক্ত করতে থাকে দিনের পর দিন। অত্যাচারের মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে তার প্রাণ আশঙ্কাও দেখা যায়। এই কারণে কৈলাসের মনে প্রবল ভয়, দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। তার এই দুর্বলতায়, অত্যাচারে পাশে এসে দাঁড়ায় ঝড়েশ্বরের স্ত্রী লৈতন। কৈলাসের মধ্যে লৈতনের প্রতি কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি ভালোবাসাও তৈরি হয়। কিন্তু লৈতন তার নিজ স্বার্থে কৈলাসকে সাহায্য করে। লৈতন চরিত্রে পরোপকারী সত্তার পরিচয় লভ্য- কৈলাসকে সাহায্য করে রোজ নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ায় তার মহানুভবতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে কৈলাসের অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে তার ভিক্ষার চাল চুরি করে নেওয়ায় তার স্বার্থপরতা, সুযোগসন্ধানী মনোভাবও স্পষ্ট।

কৈলাস যখন লৈতনকে তার সাথে থাকার প্রস্তাব দেয় এবং লৈতনের চুরি সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করে, লৈতন কৈলাসের প্রস্তাব স্বীকার করতে পারে না। সে ঝড়েশ্বরের সাথে সন্দেহময় দাম্পত্যজীবন থেকে বেরিয়ে আসার সাহস পায় ন। ঝড়েশ্বরের মধ্যে এক অদ্ভুত সন্দেহের বীজ রয়েছে লৈতনের প্রতি যা তার বিকৃতমনস্কতার পরিচয়। ঝড়েশ্বরের লৈতনের প্রতি অকারণ সন্দেহ ও সেইকারণে নানান অশালীন

কথার মধ্যে দিয়ে লৈতনকে আক্রমণ, মৌখিক অপভাষার (*verbal abuse*) শিকার হতে হয় লৈতনকে, এই সবকিছুর অন্তরালে ঝড়েশ্বর এর মননে ফ্রয়েডবাদীদের মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। ফ্রয়েডেবাদীদের মতে মানুষের আচরণ স্বভাবত আত্মবঞ্চনাকারী ও যুক্তিহীন। ঝড়েশ্বরের যুক্তিহীন সন্দেহে সে তার ও লৈতনের দাম্পত্যের মধুরতা নষ্ট করে সবথেকে আগে বঞ্চনা করেছে নিজের সাথে।

লৈতন এই অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্যজীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি শুধু তার ভয়ের কারণে। সে মনে করেছে ঝড়েশ্বরের কেবল দুটো চোখ কিন্তু কৈলাসের সর্বাঙ্গে চোখ, সে দৃষ্টিহীন হলেও তার প্রখর অনুভূতি দিয়ে সে লৈতনক সবসময় যেন দেখতে পায়। লৈতনের মনে চুরির অপরাধবোধ, ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা থেকে ভয়ের মনোভাব তৈরি হয়েছে। গল্পের চরিত্র ত্রয়ীর মনের গভীরতা মানবমনের অতল রহস্যের সন্ধান দিয়েছে।

অমর মিত্রের 'দানপত্র' গল্পে সাহেবমারি বাস্কে চরিত্রটি ব্যক্তি থেকে শ্রেণিতে উত্তরিত এক চরিত্র। সাহেবমারির দানপত্রের মধ্যে যে আকাঙ্খা, তার মধ্যে আদিবাসী স্ববৈশিষ্ট্যের সরলতার গন্ডি পেরিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান নিহিত। সাঁওতাল পুরুষের সাহেবমারি পরিচিত হওয়ার যে পথ, প্রতিবাদের পথ যেন প্রত্যেক আদিবাসী ও অন্ত্যজ মানুষরা গ্রহণ করে, এই আকাঙ্খাতেই সাহেবমারি চরিত্রটির ব্যক্তি থেকে শ্রেণীতে উত্তরণ ঘটেছে।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ কেন্দ্রিক আলোচনায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যভিচারিণী' গল্পের লখিন্দর চরিত্রটির পদ্ম গোখরো সাপিনীর প্রতি প্রেম ও তার স্ত্রী গোলাপীর প্রতি ভালোবাসার সম্পৃক্তি এবং নারী ও নাগিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। লখিন্দর তার স্ত্রী গোলাপিকে সে খুবই ভালোবাসত, কিন্তু গোলাপি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য এক পুরুষের সাথে পালিয়ে যায়। লখিন্দর তার একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে পদ্মগোখরো সাপটিকে নিজের স্ত্রী ভেবে নেয়। লখিন্দর পদ্মগোখরো সাপটির স্পর্শে যৌনানুভূতির সুখ পায়, সাপটির শরীরের পিচ্ছিল স্পর্শে তার শরীরে কাম এর আবেশ দেয় এবং সে এক অদ্ভুত সুখানুভূতি অনুভব করে। প্রাচীন বিভিন্ন সাহিত্যে পশু বা মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের যৌন অনুভূতি বা আকর্ষণ, সংগমকে 'পশুকামিতা' বা *zoophilia* বলে। এটা একপ্রকার যৌন বিকৃতি। বিভিন্ন মন্দির গাত্রেও এই পশুকামিতার ভাস্কর্য দেখা

যায়। সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ও বেআইনি হলেও মানুষের মধ্যে এরূপ যৌন বিকৃতির লক্ষণ পাওয়া যায়। সাপিনীর প্রতি পুরুষের জৈব আসক্তির এক নতুন স্তর গল্পে লেখক দেখিয়েছেন লখিন্দর চরিত্রটির মাধ্যমে।

এই যৌনবিকৃতি, আসক্তি, অধিকারবোধ থেকেই লখিন্দর যখন পদ্মকে অন্য আর একটি সাপের সাথে সংগমে লিপ্ত দেখে, সে প্রক্ষোভের বশবর্তী হয়ে তীব্রতম আবেগে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে অকস্মাৎ দুটি সাপকেই হত্যা করে। এক্ষেত্রে লখিন্দরের মনে পাভলভীয় মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। লখিন্দরের যৌনবিকৃতি-ক্ষোভ এই সবকিছুর অন্তরালে রয়েছে তার ও গোলাপির অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্যজীবন, শূন্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সৃষ্ট হীনমন্যতা, একাকীত্ববোধ। প্রেমের সঠিক প্রতিদান না পেলে মানুষের মনে হীনমন্যতা কাজ করে। লখিন্দরের ক্ষেত্রেও এই মনোভাবই ক্রিয়াশীল। স্ত্রী ও সাপিনীর প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাসঘাতকতার জ্বালায় দগ্ধ লখিন্দর চরিত্রটি বাংলা ছোটগল্পের স্বতন্ত্র এক চরিত্র।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিষয় যখন গনা’ গল্পের গনা মুর্মু শোষিত, লাঞ্ছিত, যন্ত্রণাদগ্ধ সহজসরল আদিবাসী মানুষ। রাজনীতিবিদরা রাজনীতির নামে আদিবাসী মানুষদের উপর কতটা অত্যাচার করে এবং পরিণতিতে গনার মতো মানুষরাই যূপকাষ্ঠে বলির শিকার হয়। ভোটের যুদ্ধে রাজনীতিবিদরা কেবল তাদের স্বার্থসিদ্ধির কারণে, তাদের হার-জিত দেখতে ব্যস্ত থাকে। গনার মতো আদিবাসী মানুষরা কেবল দিনান্তে রাজনীতির শিকার হয় ও তাদের প্রাণ যায়। আগাগোড়া গনা মুর্মু এক লাঞ্ছিত, বঞ্চিত সমাজের প্রতিভূ, যাদের মৃত্যু নিয়েও রাজনীতিবিদরা ভোটের জন্য সহানুভূতি অর্জন করে। যন্ত্রণায় নিমজ্জিত, ভাগ্য ও বিত্তশালী লোকদের দ্বারা বিপর্যস্ত চরিত্র গনা মুর্মু।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আলোচনাচক্র’ গল্পে ঈশানচন্দ্র দিগর লোধা জাতির প্রতিবাদী, স্পষ্টবাদী এক মানুষ। গ্রামে আদিবাসীদের নিয়ে আলোচনাচক্রে যেখানে কিন্তু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীরা কেবল লোক দেখানো নানান বক্তব্য ও বই পড়া জ্ঞান দিতে থাকে আদিবাসীদের নিয়ে, ঈশানচন্দ্র তখন স্টেজে উঠে আদিবাসীদের সাথে হওয়া অন্যায়, আদিবাসীদের বাস্তব পরিস্থিতি সর্বসম্মুখে উদ্ঘাটন করে। সে অফিসারদের কেবল কথার কথা, খাতায়-কলমের আইন ও বাস্তবের পার্থক্যটা প্রতিবাদী সত্তার জয়। সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সরকারী অফিসারবাবুরা আদিবাসীদের নিয়ে যে চিন্তা, যে আলোচনাচক্র,

যে নিয়ম বা বক্তৃতা দিচ্ছে তা আসলে সবটাই ফাঁকি। সোচ্চার প্রতিবাদ, সচেতনতার দৃঢ়তাবোধ, বাস্তবের সত্যতা প্রকাশে ঈশানচন্দ্র দিগর চরিত্রটিকে স্পষ্টবাদী করে তুলেছে।

চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় নলিনী বেরার ‘ঝাঁটার কাঠি’ গল্পের সুনি সাঁওতাল শোষিত লাঞ্ছিত এক নারী চরিত্র। আদিবাসী জীবনের নানান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের যুপকাষ্ঠে বলি হতে হয় আদিবাসী নারীদের। আদিবাসী সমাজের ‘সিঁদুর বাপ্‌লা’ বিবাহরীতিতে সুনির বিবাহ হয়। সিঁদুর বাপলা হল পুরুষ জোড়্পূর্বক মেয়ের মাথায় সিঁদুর ঘসে বিয়ে, অর্থাৎ এই বিবাহে মেয়ের মত কোনোরকম গুরত্ব পায়না। সুনির শ্বশুরবাড়ির গ্রামের লোক কোনো কারণ ছাড়া রটিয়ে দেয় রাকা টুডু সুনিকে গুণ তুক করে ধরে এনেছে, সুনি চিড়কিন ভূত। অন্ধ, যুক্তিহীন চিড়কিন ভূত বিশ্বাসের কারণে সুনির জীবন বিপর্যয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। গ্রামের লোকের ধারণা চিড়কিন ভূতের গায়ে ঝাঁটার কাঠি লাগলে সে আর থাকবে না, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এই কারণে সুনির চোখে তার শ্বশুরবাড়ির লোক ঝাঁটাকাঠি বিদ্ধ করে। সুনির চোখ ঠিক হলেও, শেষে তার হাসি ও ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে তার অস্থিরতা, নিদারুণ যন্ত্রণার মনোভাব পরিস্ফুট।

চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে নলিনী বেরার ‘খোরপোষ’ গল্পে সুনা সাঁওতাল চরিত্রে দিকপাত করা হল। সুনা সৎ, অনুগত, পরিশ্রমী, সহজসরল, আত্মসম্মানবোধ প্রবল মানুষ। সে সারাবছর বাড়িতে খাটে, শ্রম দেয়, মালিকদের প্রতি আনুগত্য, নির্বিবাদী স্বভাব তার চরিত্রে সততার উদাহরণ। কিন্তু ধান তুলতে গিয়ে পায়ের নীচে পচা খিল ঢুকে গিয়ে সেপটিক হয়ে সুনার পা নষ্ট হয়ে যায়, সে পঙ্গু হয়ে যায়। এখানেই সুনার জীবনের ট্র্যাজেডি। সে যে বাড়িতে পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছে, সেখান থেকে তাকে খোরপোষ দাবি করতে বলায় তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। সুনার মনের সততা, আত্মমর্যাদাবোধের কারণে খোরপোষ দাবির কথায় তার মনে বেদনাবোধ জাগ্রত, যা সুনা চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে তরান্বিত করে।

সৈকত রক্ষিতের গল্পগুলির চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে চরিত্রে বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে, সেই বিদ্রোহের বদলে অধিকাংশ চরিত্র আত্মসমর্পণ করেছে অথবা ‘সমাজে তাদের বিপ্রতীপ অবস্থার কথা বলেছে’’। যেমন, লেখকের ‘মাড়াইকল’ গল্পের চেপুলাল বেসরা চরিত্রটি। সে সাঁওতালি জনজাতিগোষ্ঠীর

মেহনতী, সহজসরল, সাদাসিধে মানুষ। সে কুঞ্জ মোদকের অধীন কাজ করে, তার গুড় বানায়, শালঘরে থেকে রাত্রে গুড় পাহাড়া দেয়, এছাড়াও কুঞ্জ মোদক কাজে কোথাও গেলে গরুর গাড়ির চালক হিসাবেও চেপুলাল কাজ করে। চেপুলাল তার মৃত্যুর আগেই যেন সে তার মৃত্যু যে আসন্ন তা যেন বুঝতে পারে। সে বারবার এক অজানা আশঙ্কায় কুঞ্জকে জিজ্ঞেস করতে থাকে- 'হামি আর কৎদিন বাঁচব, হ্যাঁ কুঞ্জখুড়া? বাঁচন হামি?'[৫১] সে যেন কুঞ্জর মুখের কথায় ভরসা পায়। অত্যন্তই সহজ-সরল, নির্বিবাদী মানুষ চেপুলাল। যে তার শরীর অসুস্থ হলেও, শীতে ঠান্ডা লাগলেও জোড় গলায় তার হকের জিনিস নিতে পারে না। সে একবার কম্বল চাইলেও কুঞ্জ তাকে না দেওয়ায় চেপুলাল কোনো প্রতিবাদ বা অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেনি, সে বিদ্রোহ করেনি বরং নিয়তির কাছে, অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। চেপুলালের মধ্যে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বদলানোর কোনো প্রয়াস দেখা যায়না। সে নীরবেই তার মৃত্যুর অতলে তলিয়ে যায়। সে সাঁওতাল, আদিবাসী তাই তার জীবনে শীত সহ্য করা, কষ্ট করা দরকার- কুঞ্জর এই অমানবিক ধারণাই চেপুলালের জীবন কেড়ে নেয় এবং চেপুলালও এই অন্যায় নীরবে মেনে নেয়। চেপুলাল তার মালিকের প্রতি আনুগত্যে কোনো মূল্য পায়নি। চেপুলাল যেন এক ট্র্যাজিক বিষন্নতায় ভাস্বর আদিবাসী সমাজের অত্যাচারিত মানুষদের প্রতিভূ।

সৈকত রক্ষিতের 'উৎখাতের পটভূমি' গল্পে সিমতি বেসরা ও মড়েয়া হাঁসদার মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের চারিত্রিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল। সিমতির স্বামী সামান্য জ্বরে মারা যাওয়ায় এবং সে সন্তানধারণ না করতে পারায় গ্রামের লোক তাকে ডাইনি সাব্যস্ত করে। তাই সিমতি গ্রাম পরিত্যাগ করে, সমাজের লোকেদের ভয়ে সে অরণ্যে একাকী বসবাস করে। সিমতির মধ্যে ভয়ের কারণে পলায়নী প্রবৃত্তি কাজ করে। সে সমাজ দ্বারা লাঞ্ছিত এবং সমাজের সাথে সাথে সে যেন নিজেও বিশ্বাস করে তার জীবনে ঘটে যাওয়া অমঙ্গলের জন্য সে হয়ত নিজেই দায়ী। সিমতি সাহসী হলেও তার আত্মবিশ্বাসের প্রবল অভাব দেখা যায়।

সিমতির সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানার পরেও মড়েয়া সিমতিকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়। প্রথম মড়েয়ার ক্ষেত্রে আবেগ কাজ করলেও গ্রামবাসীর সামনে তার সিমতিকে বিবাহ করার পণের মাধ্যমে তার দৃঢ়সত্তার এবং ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। মড়েয়া কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই সিমতির হাত ছাড়ে না। মড়েয়ার গভীর প্রেম ও প্রেমাস্পদের কারণেই সে তার মা ও সিমতিকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে অজানা

আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। মড়েয়া এক দৃঢ়, প্রেমিক সত্তার পুরুষ, যে কোনো পরিস্থিতিতেই সমাজের অন্যায় মেনে নেয়নি এবং সমাজের চোখ রাঙানিতে দুর্বল-ভীত হয়ে পড়েনি।

চরিত্রচিত্রায়ণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ কেন্দ্রিক আলোচনায় সৈকত রক্ষিতের 'বশীকরণ' গল্পের হংস মোদক চরিত্রটি আদিবাসী না হলেও, যে গ্রামে তার বসতি সেই গ্রাম মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত। আদিবাসী ও এই অন্ত্যজ মানুষদের একত্রে সহাবস্থানের ফলে তাদের জীবনযাত্রা, ভাবনা-চিন্তা সমভাবাপন্ন। এই প্রান্তিক জনজীবন নানান লোকবিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন, তার প্রভাব আমরা দুই সতীনের ঝগড়া এবং দাম্পত্য কলহ, হীনমন্যতা তা থেকে অচলার মধ্যে হিস্টিরিয়া রোগ দেখা যায়। কিন্তু গ্রামের লোক ভাবে তার মধ্যে দেবতা ভর করেছে কারণ, অচলা অসংলগ্ন ঘোরের মধ্যে নিজেকে 'মা কালী' বলে। এই হিস্টিরিয়া একধরণের মানসিক বিকার, এই রোগে মানুষ সবসময়ই একটা ঘোরে থাকে। ১৮৯৫ সালে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড প্রথম এই রোগকে মানসিক রোগ হিসাবে চিহ্নিত করে। ফ্রয়েডীয় মতে অপরিতৃপ্ত কামনা-বাসনা মনের অবচেতন স্তরে দীর্ঘসময় অবদমিত হয়ে থাকার ফলে তা বিকৃত এবং সাংকেতিক আকারে বিভিন্নভাবে রোগের লক্ষণের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তীব্র আবেগ বা প্রক্ষোভ চেপে রাখার চেষ্টার ফলে মানসিক অসুখের জন্ম ও নানান শারীরিক উপসর্গ দেখা যায়। অতিরিক্ত পারিবারিক ও মানসিক চাপ, ভয় থেকে, হতাশা, মানসিক দ্বন্দ্ব, অবসাদ থেকে হিস্টিরিয়া রোগ হয়। অচলার ক্ষেত্রেও সতীনের প্রতি ঈর্ষা-ক্ষোভ ও স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়ায় তার মনে প্রবল চাপ পড়ে, স্বামীর অবহেলায় স্বামীকে হারানোর ভয়, হতাশা থেকে সে এই হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এই রোগ মূলত 'নিউরেসিস জাতীয় মানসিক রোগ।' তার মাথা ঘুরে পরে যাওয়া, ঘোরের মধ্যে থাকা, অসংলগ্ন কথা বলা, এই সবকিছুই হিস্টিরিয়া রোগের উপসর্গ। অচলার মধ্যে তাদের অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্যই মানসিক উদ্বেগের কারণ আর সেই মানসিক চাপ, অবসাদ, হতাশা, ভয় থেকেই সে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এর পিছনে দায়ী মূলত তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক, যে কারণে সে মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে যায়। অচলার সাথে হংসর সুসম্পর্ক যখন ছিল তখন সে করুণাকে মূল্য দেয়নি, কিন্তু করুণার প্রতি হংসর ভালোবাসা অচলা মেনে নিতে পারেনি। সে তার অধিকারবোধ হারানোর ভয়ে, ঈর্ষাজনিত কারণে প্রবল অবসাদ ও মানসিক চাপে মানসিক রোগীতে পরিণত হয়।

সৈকর রক্ষিতের ‘যশোমণি মুর্মু’ গল্পে যশোমণি বিধবা এক আদিবাসী নারী। তার এক পুত্র জাগরণ, যে যশোমণির সাথে ঝগড়া হলেই সে বলে যশোমণির মৃত্যুর পর সে তার দেহকে শকুন, শিয়ালকে খাওয়াবে। যশোমণি বেঁচে থাকাকালীন আদিবাসী জীবনে দারিদ্র-কষ্ট ব্যাতীত কোন সুখ-শান্তি পায়নি। তাই যশোমণি মৃত্যুর পরবর্তীতে তার আত্মা যাতে শান্তি পায়, সেই ভাবনায় সে আগাম নিজ মৃত্যু পরবর্তী ব্যবস্থা করে রাখতে চায়। সে এই জীবনের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে ভরসা করে। আদিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে নানান লোকবিশ্বাসের চল আছে। সে তাই বেঁচে থাকাকালীন তার সঠিকভাবে শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করে যেতে চায়। যশোমণির মধ্যে জীবন নশ্বরতার মনোভাব কাজ করার পাশাপাশি পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব- পলায়নপ্রবৃত্তি ও ক্রিয়াশীল। সে এই দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবন থেকে, দুঃখকষ্ট থেকে পালিয়ে যেতে চায়, যশোমণির জীবনের ইউটোপিয়া তার মৃত্যু পরবর্তী জীবন।

যশোমণির মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ও তার মৃত্যু আসন্ন আরও দৃঢ়তা পায় গুণিনের ভবিষ্যৎবাণীতে। তার নিজের ছেলের উপর বিশ্বাস না থাকায় সে গ্রামবাসীকে ডেকে আগাম তার শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকলাপ করে ফেলে কিন্তু গুনীনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসলেও যশোমণির মধ্যে মৃত্যুর কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। যশোমণির মধ্যে প্রবল মানসিক চাপের কারণে বিকারগ্রস্থের লক্ষণ দেখা যায়। অতিরিক্ত অন্ধবিশ্বাসের ফলে সে মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ে, রোগা হয়ে যায় এবং তার মৃত্যু না হলে গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভেবে যশোমণি ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে। সে বারবার মৃত্যু চাইলেও, মৃত্যু তার কাছে অধরা থেকেই যায় এবং যশোমণির বেঁচে থাকায় তার মনে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়। যশোমণির মনোবিশ্লেষণে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূলভাব- অস্তিত্বের সংকট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জীবনে-মননে আনন্দানুভূতির চেয়ে বিষাদময়বোধ প্রাধান্য পায়। জীবন যেখানে এক গভীর সংকটের আবর্তে আবদ্ধ, সেখান থেকে উত্তরণেরে ক্ষীণ আশাও যখন থাকে না তখনই অস্তিত্বের সংকট তীব্রতা পায়। এই মানুষগুলোর মুক্তির স্বপ্ন, ইউটোপিয়ার সত্য যখন প্রতীতি লাভ করে না, তখন মানুষ বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা ও অস্তিত্বের সংকটের অতলান্তে তলিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও যশোমণি তার জীবন থেকে মুক্তি হিসাবে মৃত্যুকেই দেখছিল, সে তার কল্পনায় মৃত্যু নিয়ে নানা কথা ভাবলেও বাস্তবে তা প্রতীতি লাভ ন করায় সে অস্তিত্বের সংকটের গহ্বরে তলিয়ে যায়।

গল্পের প্রান্তিক ও জনজাতি চরিত্রচিত্রণে অনিল ঘড়াইয়ের 'বীজ' গল্পের গমিয়া একজন দৃঢ়সত্তার সংগ্রামী, সৎ ও সাহসী, প্রতিবাদী চরিত্র। পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা না থাকায় ফসল হয় না, এই খরায় তাদের দাম্পত্যেও খরা দেখা যায়। একজন কৃষকের কাছে মাঠের ফসলই তার প্রাণপ্রিয়, গমিয়ার ক্ষেত্রেও তাই। অনেক প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বর্ষা নামলে গমিয়া বিডিও থেকে পাওয়া সরকারী বীজ ধান রোপন করে। এক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা নানান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংসস্কারে আচ্ছন্ন হওয়ায় তারা কোনোভাবেই সরকারী বীজধান দিয়ে জমি চাষ করতে রাজী হয় না। একমাত্র গমিয়াই পুরো সাঁওতাল গ্রামের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এখানেই আদিবাসীদের মধ্যে সে এক উজ্জ্বল, দৃঢ় সত্তার প্রতিবাদী চরিত্র।

গ্রামের মুখিয়া তার ব্যক্তিস্বার্থে যখন গ্রামবাসীকে বিভ্রান্ত করে সরকারী বীজধান ব্যবহারের পরিবর্তে নিজের গোলার বীজধান ব্যবহারে উৎসাহী করে, তখন গমিয়া তার যুক্তিবুদ্ধির কারণে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং পরিণতিতে সেই বিজয়ী হয়। তার এই বিজয়ে সামারুবুড়াও পাশে এসে দাঁড়ায়। গমিয়ার ন্যায় সামারুবুড়াও স্বজাতির কল্যাণ যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এবং ভয়ংঙ্কর ষড়যন্ত্রকারী মুখিয়াকে হত্যা করে, মুখিয়ার হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করে। গল্পে লেখক গমিয়া ও সামারুবুড়ার হাত দিয়ে যেন শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের সঠিকভাবে বাঁচার পথের সন্ধান দিয়েছেন। পাভলভীয় মনস্তত্ত্বানুসারে, মানুষ শর্তাধীন কিন্তু তা সত্ত্বেও তার নিজের ভালোমন্দ বিচারের, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবার স্বাধীনতা আছে। প্রকৃতির নিয়ম ও সমাজের সাময়িক সীমাবদ্ধতা ও আরোপিত শর্তলঙ্ঘনের স্বাধীনতা মানুষের না থাকলেও নিজের যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রতিনিয়ত সমাজকে পরিবর্তন করে চলেছে। এই গল্পেও গমিয়া ও সামারুবুড়ার মনোবিশ্লেষণে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল, তাদের মধ্যে সাহসী দৃঢ় সত্তা এবং যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা শোষণভিত্তিক সমাজকে পরিবর্তনের প্রয়াস দেখা গেছে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'উরাংগাড়া' গল্প বুদ্‌নী এক চিরদুঃখী, শান্ত, সহজসরল আদিবাসী রমণী। মাতৃহীন দরিদ্র লাঞ্ছিত এই আদিবাসী কন্যাকে তার বাবা ভাকুয়া তাকে আশ্রয়ের জন্য, কাজের জন্য, এক শহুরে বাবু স্নেহময়ের বাংলোয় কাজে রাখে। বুদ্‌নী যেন সুবর্ণরেখার শাখানদী উরাংগাঢ়ার ন্যায়, শান্ত, যার চোরাস্রোত নেই, টান নেই, সকলকে আশ্রয় দেয়। যে শত অত্যাচারেও প্রতিবাদ করে না। তার মোহময়ী শান্ত স্বভাবে, যৌবনের মোহে স্নেহময় বুদ্‌নীর প্রতি প্রথম থেকেই আকৃষ্ট হয় এবং মুহূর্তের

আবেগে তারা ঘনিষ্ঠ হলে বুদ্‌নী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বুদ্‌নী স্নেহময়কে কোনো বাঁধা দেয় ন, সে যেন নিজেকে নিবেদন করে, সে যেন ভাতের মূল্য পরিশোধ করে তার শরীর দিয়ে। উরাংগাঢ়া নদীও যেমন শত আঘাতেও প্রতিশোধ নেয় না, প্রতিবাদ করে না, তেমনই বুদ্‌নীও সবটা মেনে নেয় ও স্নেহময়কে ক্ষমা করে দেয়।

স্নেহময়ের মনস্তত্ত্বে বুদ্‌নীকে দেখার প্রথম থেকেই কেবল যৌন আকর্ষণ কাজ করেছে। বুদ্‌নীর প্রতি যৌন আকর্ষণ প্রথম থেকেই স্নেহময় অনুভব করছে, তার মনের গহনে বুদ্‌নীর প্রতি প্রবল কামেচ্ছা, যৌন অনুভূতি ক্রিয়াশীল ছিল। স্নেহময়ের এই যৌন আদিম প্রবৃত্তির শিকার বুদ্‌নী, সে সেই মুহূর্তে কোনো প্রতিবাদ না করলেও গল্পের শেষে সে যেন তার ছেলেকে তার পিতার সামনে এনে, তার গায়ের রং এর সাথে স্নেহময়ের গায়ের রং এক, একথা বলে সে স্নেহময় ও তার স্ত্রী সায়ন্তনীকে বুঝিয়ে দিয়েছে বুদ্‌নীর সন্তানের পিতা স্নেহময়। বুদ্‌নীর স্বামীর আত্মহত্যা, শ্বশুর বাড়ি থেকে পরিত্যক্ত হওয়া, এই সবকিছুর জন্য সে স্নেহময়কেই দোষী করেছে, দায়ী করেছে তার কামুকতাকে। বুদ্‌নী তার জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার, স্নেহময়ের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার প্রতিবাদে তার সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের শেষে বুদ্‌নী তার সন্তানের পিতার আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে স্নেহময়ের থেকে তার বঞ্চনা-অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে, তার সাথে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'আকাশ-মাটির খেলা' গল্পের চরিত্রের স্বরূপ ও মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আলোচনায় সুদামা কঙ্কল, বাসমতি ও কুনু সাংগি এই চরিত্র ত্রয়ীর মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল।

বাসমতি চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে বারবার অত্যাচার-লাঞ্ছনার শিকার- (১) সে ডাইনি অপবাদে স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত এক নারী, (২) সমাজের বহু কামুক, লোভী মানুষ দ্বারা কামনার পাত্রী সে, (৩) সে সুদামাকে ভালোবাসলেও সে কুনুর দ্বারা ধর্ষিত হয়। ব্যর্থতা, লাঞ্ছনার প্রবাদ যেন সদা সচল বাসমতির জীবনের প্রতিটা ধাপে জড়িত ।

সুদামা শিল্পীমানুষ, গান গাইত কিন্তু পেটের দায়ে মেদিনীপুর যায় ইটভাটায় কাজের জন্য। বাসমতি ও কুনু একই সাথে পেটের দায়ে ইটভাটায় কাজ করে, বাসমতি হাঁড়িয়া বিক্রি করে, কুনু সাংগি

দালালি করে। প্রথম থেকে বাসমতির প্রতি কুনুর কামুক মনোভাব ছিল। কুনু কখনই মেনে নিতে পারে না সুদামা ও বাসমতির প্রেম। বাসমতি যে কুনুকে ভালোবাসে না, এই বোধ কুনুর মনে প্রতিশোধস্পৃহা জাগায় এবং কুনুর মধ্যে ফ্রয়েডের 'থ্যানাটস্' অর্থাৎ পরঘাতী মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কুনুর ভালোবাসার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষোভে সে সুদামাকে হত্যার চেষ্টা করে এবং তার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষোভে সে বাসমতিকে ধর্ষণ করে। এক্ষেত্রে তার মধ্যে পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। পাভলভীয় মনস্তত্ত্বানুসারে মানুষ প্রক্ষোভের বশবর্তী হয়ে যুক্তিহীন ও পাশবিক আচরণ করে এবং তীব্রতম আবেগ যখন ভূমিকম্পের ন্যায় নাড়া দেয় মানুষ তখন হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে যুক্তিবুদ্ধিহীন ভাবে, ফলাফলের কথা চিন্তা না করে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ করে ফেলে। প্রেমের প্রতিদান না পেলে মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে। এক্ষেত্রেও কুনুর মধ্যে হীনমন্যতা, না পাওয়া থেকেই ক্ষোভের সৃষ্টি এবং তার পাশবিক আচরণ। তার এই আচরণে সুদামা ও বাসমতির ভালোবাসা কাচের চুড়ির ন্যায় ভেঙে যায় কিন্তু পরিণামে প্রকৃতিই যেন কুনুকে নির্মল ভালোবাসাকে কালিমালিপ্ত করার, তার পাপের শাস্তি দেয়। কুনু বাসমতিকে ধর্ষণ করার পর তার মধ্যে ভয়ে পলায়নী প্রবৃত্তি কাজ করে, কিন্তু প্রকৃতি তাকে পালানোর সুযোগ দেয় না, প্রকৃতি পাপের প্রতিশোধ নেয়।

অনিল ঘড়াইয়ের 'টিকলি' গল্পে পালো ওরফে টিকলি এবং তার মা চাঁদমণি দুজনেই প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের নারী। চাঁদমণি গ্রামের মুখিয়ার কামনা, কুপ্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করায়, তার অন্যায় আব্দার মেনে না নেওয়ায়, প্রতিবাদ করায় তাকে ডাইনি অপবাদ পেতে হয়, জ্যান্ত পুড়ে মরতে হয়। চাঁদমণি জানত যে সে মুখিয়ার প্রস্তাব ফেরালে তকে শত ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, কিন্তু তাও তার কাছে সম্মান ও আত্মমর্যাদা মূল্যবান ছিল। চাঁদমণির এই দৃঢ়, সাহসী, প্রতিবাদী সত্তা তার মেয়ে পালো বা টিকলির মধ্যেও বর্তমান।

টিকলির তার পালিত পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা দেখে বোঝা যায় তার প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের অন্তরালে কোমলতা, মার্জিতভাব, দৃঢ়সত্তা বর্তমান। সে তার জন্মদাতা পিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় প্রতিবাদ করেছে। যে গ্রামবাসী তার মাকে জীবিত পুড়িয়ে মেরেছে, সেই গ্রামে পা না দেওয়ার অঙ্গীকারে টিকলির মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও প্রতিবাদের বাণী মূর্ত। কিন্তু টিকলির জন্মদাতা পিতার জন্য সে সমাজের কিছু লম্পট দ্বারা ধর্ষিত হয় ও লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু টিকলি চুপ থাকেনি, সে বারবার প্রতিবাদ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে-

(১) 'রাগে ফুঁসে উঠে বলল, কেউ আমাকে ছোঁবে না। আমাকে ছুঁলে পাথর ছুঁড়ে তোমাদের মাথা আমি থেঁতলে দেব। ... তোমরা ভেবেছোটা কি, শক্তি কি শুধু তোমাদের একারই আছে। আমিও আদিবাসী মেয়ে, জীবন দেব কিন্তু ধরম দেব না'।[৫২]

(২) 'এ বাবা তার মেয়েকে মাত্র পাঁচশ টাকায় একটা লম্পট, চরিত্রহীনের হাতে বিক্রি করে দেয় তার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া আদৌ উচিত নয়'।[৫৩]

টিকলির সোচ্চার প্রতিবাদ বারবার পাওয়া যায়। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তাকে তার জন্মদাতা পিতার সাথে যেতে হলেও সে অসুরের বিনাশ ঘটিয়েছে। অসুররূপী মানুষদের মেরে নিজে মরছে। সে তার নিজের মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে, পাশাপাশি তার নিজের জীবন এবং তার মতো আরও এরকম মেয়েদের জীবন বিপর্যস্ত হওয়ার প্রতিশোধ টিকলি নিয়েছে। প্রতিবাদ, প্রতিশোধ এবং প্রতিরোধ এর মাধ্যমে টিকলি চরিত্রটি স্বমহিমায় অন্বিত।

অনিল ঘড়াইয়ের 'বনের মানুষ বনে' গল্পে যোগী দাস ও হাড়িয়াওয়ালী রানী চরিত্রদ্বয় প্রেমমাহাত্ম্যে উজ্জ্বল কালজয়ী চরিত্র। যোগী দাস সংসারী, সরকারী চাকুরীওয়ালা, স্ত্রী-সন্তান থাকা সত্ত্বেও তার করমপদা নামক গ্রাম্য অরণ্যময় প্রকৃতির প্রতি এক আত্মিক টান রয়েছে। সংসারের কোলাহলময় জীবনে সে জীবনের আসল অর্থ, বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায় না। শহরের কৃত্রিমতা থেকে বহু যোজন দূরে, সাংসারিক বন্দী জীবন থেকে দূরে প্রকৃতির মাঝে এবং হাঁড়িয়াওয়ালী রানীর সংস্পর্শে যোগী দাস বেঁচে থাকার আনন্দ পায়, তার চিত্ত হর্ষিত হয়। যোগী দাস তার স্ত্রী যমুনার কাছে রানীর কথা বলে, সে কোনো কিছু গোপন করে না, এতে তার সততার পরিচয় লভ্য। এই সহজসরল মানুষটার রানীর প্রতি যে হৃদয়ের টান, সেখানে রানীর প্রতি তার শারীরিক আকর্ষণকে অতিক্রম করে যায় তার হৃদয়ানুভাব। এই মনের টানেই জীবনের মুক্তির স্বাদ পেতে মৃত্যুর আগে অসুস্থতায় সে ছুটে গেছে করমপদায়, রানীর কাছে। প্রকৃতির মাঝে, উন্মুক্ততায় যোগী দাস মৃত্যুবরণ করেছে, যেন বনের মানুষ বনেই লীন।

গল্পের আর এক চরিত্র হাঁড়িয়াওয়ালী রানী, ত্যাগী প্রেমময়ী এক নারী চরিত্র। সে নিঃস্বার্থভাবে যোগীকে কেবল ভালোবেসেছে। যোগী কেবল তার শরীরকে নয় মনকে ভালোবেসেছে, এই নির্মল অনুভব-ভালোবাসাই তার পরমপ্রাপ্তি। তার যেন যোগীর প্রতি কোনো চাওয়া-পাওয়া ছিল না, কারণ যোগী সংসার

ছেড়ে তার কাছে এলেও সে যমুনার কাছে, সংসারে যোগীকে ফিরিয়ে দেয়। নিঃস্বার্থ ভালোবেসে, সৎ সত্তার পাশাপাশি রানী চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। যোগী দাস মারা যাবার সংবাদে রানী যোগীর মৃতদেহ দেখতে এসে তার বুকের উপর মাথা রেখেই মৃত্যুবরণ করে। ভালোবাসা কতটা গভীর হলে এরূপ মৃত্যু বরণ করা যায়। মৃত্যুর অবগাহনে, প্রকৃতির নিবিড়তায় দুই বনের মানুষের নির্মল ভালোবাসার মিলন ঘটেছে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'হাতিছাপ' গল্পে ভীমাবুড়ো চরিত্রে নানান স্তরীয় বিন্যাস দেখা যায়। তার ছেলে মারা যায় হাতির পদপিষ্ট হয়ে, ভীমবুড়ো শোকাহত হলেও সময়ের সাথে এই শোক ফিকে হয়ে যায়। তখন পুত্রশোকের থেকে ভীমাবুড়োর কাছে উপার্জন বড় হয়ে যায়। ভীমাবুড়ো বারবার সমাজে ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। তার উপলব্ধি, দূরদৃষ্টিতাও চরিত্রে লক্ষ্যণীয়। সচেতন, প্রতিবাদী ব্যক্তিসত্তার অধিকারী ভীমাবুড়োর পেশার অভিনবত্ব ও কৌশল তাকে স্বতন্ত্র করে তোলে। তার পেশার-বিদ্যার সুফল ও কুফল দুই-ই সে উপলব্ধি করে, সে তার দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারে তার বিদ্যার অপব্যবহার ভবিষ্যতে সমাজে বেশী হবে, তাই সে তার বিদ্যার কৌশল কাউকে শেখাতে চায় না। কিন্তু সন্তানসম বালক রাখালের প্রতি ভালোবাসা-স্নেহ তার এই মনোভাবের বদল ঘটায়। ভীমাবুড়ো রাখাল বিষহরিকে তার বিদ্যার কৌশল শেখায়, কিন্তু সহজ-সরল বালকের হাতে মিথ্যা নকশার বদলে ফুটে ওঠে বাস্তবের সত্যতা। ভীমাবুড়ো বিদ্যা প্রাণ পায় বিষহরির হাতে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'অরণ্যের জীবন' গল্পের গুরুবারি ও সোমরা চরিত্রদ্বয়ে আলোকপাত করা হল। গুরুবারি ও সোমরার বিবাহের প্রায় ছয়বছর পর ডাক্তারের চিকিৎসায় তাদের বহুকাঙ্খিত সন্তান হয়। অরণ্যের মাঝে বস্তিতে তাদের বাস। গুরুবারি ও সোমরা মহুয়া শুকিয়ে হাঁড়িয়া বানায় আর এই মহুয়ার গন্ধেই তাদের জীবনে বিপদ নেমে আসে। মহুয়ার গন্ধে বুনো হাতি সোমরার বাড়িতে আক্রমণ করলে সোমরা টাঙি নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে গেলে হাতি প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে গিয়ে, সোমরা ও গুরুবারির তিন বছরের সন্তান মানুয়াকে পদপিষ্ট করে। এই ঘটনার পর থেকে সোমরা চরিত্রে এই উন্মাদ ক্রোধ ও বুনো হাতির প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। গুরুবারি যখন মানুয়াকে বাড়িতে রেখে জঙ্গলে কোনো কাজে যেতে দ্বিধাবোধ করত, সেক্ষেত্রে সোমরা তাকে আশ্বাস দিতে মানুয়াকে দেখে রাখবার, পিতার প্রতি ভরসা রাখার কথা বলেছিল। কিন্তু গুরুবারির অবর্তমানে সোমরা তার দেওয়া কথা-

আশ্বাস রাখতে পারে না, সে পিতার দায়িত্ব পালন করতে না পারার অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। তার অবচেতন মনের অপরাধবোধ, গ্লানি পরিণত হয় উন্মত্ত ক্রোধে।

পুত্রের মৃত্যুশোকে গুরুবারির সাথে সোমরার দাম্পত্যজীবন ও যৌনসম্পর্ক ব্যাহত হয়। সোমরা তার স্ত্রী গুরুবারির শরীরের প্রতি আকর্ষণবোধ করলেও সে এটাকে পাপ মনে করে এবং গুরুবারিকে তিরস্কার করে। কোনোভাবেই সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না। প্রবল সন্তানশোক ও অপরাধবোধে, গ্লানিতে সোমরা দগ্ধ হতে থাকে। হাতিটাকে হত্যা করে মানুয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়াই সোমরার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। সময়ের প্রলেপে তার ক্ষতে একটু মলম লাগলে সে হাঁড়িয়া তৈরির পেশার বদলে কাঠুরে পেশা গ্রহণ করে। গল্পের শেষে গুরুবারিকে যখন অরণ্যে হ্যাটা বাঘ আক্রমণ করে তখন সেই মানুয়াকে হত্যাকারী হাতিটিই গুরুবারির প্রাণ বাঁচায়। হাতিটিও যেন তার অসাবধানবশত পূর্বকৃত কাজের জন্য এক শোকস্তব্ধ সন্তানহারা পিতা-মাতার কাছে নতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। গুরুবারির প্রাণ বাঁচানো এবং অবলাপ্রাণীর এই আন্তরিকতায় সোমরা চরিত্রেও স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে, খরায় পোড়া জীবনে অরণ্যের ছায়ার শান্তি নেমে আসে।

সাহিত্যিকরা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা সমাজ ও সমাজের মানুষকে, তাদের গতিপ্রকৃতি ও ব্যবহারকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সমাজ, মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত পারিবারিক যে জীবন, সামাজিক অবক্ষয়, যুগবদল, সময়ের ভাষা— এই সামগ্রিকতা গল্পকারের মানসিকতায় যে চেতনা কাজ করে তা এবং আমরা যাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি তার আবরণ ছিন্ন করে প্রকৃত চেহারাটি বের করে আনার তাগিদে গল্পকার সুতীক্ষ্ণ ও সচেতনভাবে ছোটগল্পকে বেছে নেয়। জীবনের স্বাভাবিক সম্পর্ক— স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, প্রেমিক-প্রেমিকা এছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রে তৈরি নানা সম্পর্কের কাঠামো, যা অপরিচিত, কিন্তু এই সম্পর্ক, এই মানবচরিত্রের অন্তরালে উদ্‌ঘাটিত এক অনাবিষ্কৃত জগৎ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক শাসন-শোষণ, পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা, ব্যক্তিসংশয় এই সবকিছুকে আশ্রয় করে রচিত প্রান্তিক ও জনজাতি জীবননির্ভর গল্পগুলির চরিত্র, তাদের মনস্তত্ত্ব, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরগুলো উন্মোচিত। আমাদের আলোচিত আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলিতে সর্বোপরি দেখা যায় সামাজিকভাবে 'অবহেলিত', 'অচ্ছ্যুত', 'বুনো', 'জংলি' মানুষগুলি

জীবনধারণের ক্ষেত্রে নানা অত্যাচার সহ্য করে, প্রতিকূলতার সঙ্গে, ভাগ্যের সঙ্গে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার যে অধিকার তাও তাদের স্বপ্নাতীত।

প্রান্তিক জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের শেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় আদিবাসী চরিত্রগুলি তাদের স্ববৈশিষ্ট্যে জীবন্ত ও উজ্জ্বল। সামাজিক ও আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের বাইরেও মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্কও সাহিত্যে গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপিত, আবার কখনো-কখনো প্রকৃতিও যেন মানবচরিত্রকে নিয়ন্ত্রন করে। আন্তর্জগৎ কখনোই আসলে বহির্জগত নিরপেক্ষ নয়। সমাজ-মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এমনই সব বিচিত্র অভিমুখ ছোটগল্পে প্রতিফলিত, রূপায়িত। আলোচিত গল্পগুলির চরিত্রচিত্রণে সূক্ষ্মতা ও গভীরতা অনেক বেশি সঞ্চারিত। আদিম মানুষদের আপাত সরল জীবনযাত্রার ভগ্নাংশ চয়ন করে তার অন্তরালে চলা জটিল জীবনসত্যকে গল্পকার চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তাদের অভিনব মনোজগৎ- ভাবভঙ্গি, যার সূত্র ধরে আবিষ্কৃত মানবচরিত্রের, মানবমনের অপরিচিত জগৎ।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা, *মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব* , কলকাতা: অলকা, শ্রাবণ ১৪০৮, পৃ. ৪২

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৩. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড)* , কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৯১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭২

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৪

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯

১০. মুখোপাধ্যায়, চিরন্তন (সঙ্ক.), *বনফুলের ছোটগল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: বাণীশিল্প, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯, পৃ. ১৯৪

১১. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪২৪, পৃ. ১৯০

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

১৭. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ২১৪

১৮. ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *সতীনাথ রচনাবলী ১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৪২৪, পৃ. ২৬০

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

২১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *গল্পসমগ্র* , কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ২৯০

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

২৩. চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ২১৭

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

২৬.. পূর্বোক্ত. পৃ. ২১৭

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

৩৫. বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র ১*, কলকাতা: মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৮৮

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৫

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

৪০. বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র ২*, কলকাতা: মৌসুমি প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৩৭৭

৪১. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ৮*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ: শ্রাবণ ১৪২৩, পৃ. ৪১৩

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮

৪৫. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ১০*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০৯, পৃ. ৩৫৪

৪৬. রায়, অসীম, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ২৩৬

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

৪৮. রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র ১,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩৭

৪৯. রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪২৭, পৃ. ২৮১

৫০. সেন, অভিজিৎ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ মে: ২০১৬, পৃ. ২৮

৫১. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা, পারুল প্রকাশনী, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ৩৭

৫২. ঘড়াই, অনিল, *শ্রেষ্ঠ গল্প* , কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, পৃ. ২৩৯-২৪০

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১

সপ্তম অধ্যায়

জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পে (নির্বাচিত) লোকায়ত জীবন ও লোকঐতিহ্য

আর্যদের ভারতে আগমন এবং তাদের বসতি স্থাপনের পর ভারতের আদিম বাসিন্দা যারা তারা আর্যদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নেয় এবং নিজেদের স্বতন্ত্র এক জগৎ নির্মাণ করে। ফলত আর্য সংস্কার-সংস্কৃতি জনজাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিমন্ডলকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেনি। একটি জাতি বা গোষ্ঠীর পরিচয়ের অন্যতম উপদান সেই জাতির সংস্কৃতি, সংস্কার। সংস্কৃতি-সংস্কার এই বিষয়গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়, এটি একটি জটিল ধারণা। প্রত্যেকটি সমাজগোষ্ঠীর বা জাতির বিশিষ্ট সামাজিক প্রথা, সংস্কার-সংস্কৃতি, আচার-রীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, তাদের লোকায়তজীবন, ঐতিহ্য, তাদের বিচিত্র খাদ্যাভাস, বস্ত্র, বাসস্থান, বাক্‌সংস্কৃতি এই নিজস্বতাই অন্য জাতিগোষ্ঠীর থকে স্বতন্ত্রতা দান করে। বিশিষ্ট জাতিগোষ্ঠী হিসাবে স্বতন্ত্রতার স্বীকৃতি দাবি নির্ভর করে মূলত সেই জাতির লোকয়তজীবন লোকঐতিহ্য সর্বোপরি লোকসংস্কৃতির উপর।

১৮৪৬ সালের ‘লোকসংস্কৃতি’ বোঝাতে *Popular Antiquities* এবং *Popular Literature* পরিভাষা ইংল্যান্ডে ব্যবহার হত। ১৮৬৫ সালে শ্রী এডওয়ার্ড টাইলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন। লোকসংস্কৃতি হলো কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসরত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস, আচার, রীতি-নীতি ও তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টিই হল লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদদের মতামত নিম্নে আলোচনা করা হল-

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

> ‘লোকসংস্কৃতি হল এই জৈবিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-গোষ্ঠীভুক্ত সকলের প্রত্যক্ষ মানবিক সম্পর্ক, আত্মিক সংযোগ ও গভীর আন্তরিকতা থেকে উৎসারিত। তার পরিধি সংকীর্ণ, কিন্তু প্রাণশক্তি প্রাকৃতিক প্রস্রবণের মতো চিরপ্রবাহমান’।[১]

লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন-

> ‘লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা মূলত বুঝেছি অনাগরিক সংস্কৃতিকে। সামন্ততান্ত্রিক বা আদি সাম্যবাদী কৌম সমাজে তার জন্ম’।[২]

লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন–

'আর্থসামাজিক জীবন প্রবাহ ও সমাজ সংগঠনের পটভূমিকায় সংস্কৃতি যে বৈচিত্র্যময় বিকাশ তার বিশিষ্টরূপ লোকসংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি'।[৩]

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমেদ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন-

'লোকজীবনকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে'[৪]

বস্তুত লোকায়ত জীবন, লোকসমাজের নানান লোকঐতিহ্য, রীতি-নীতি, আচার-বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মীয়ভাবনা সমস্ত কিছুই লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। লোকসংস্কৃতি শব্দের ইংরেজি পরিভাষা *Folklore*। এই 'ফোকলোর' শব্দটিকে বিভিন্ন গুণী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফোকলোর অর্থে 'লোককৃষ্টি' বলেছেন, সুকুমার সেন বলেছেন 'লোকচর্যা', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'লোকযান'।[৫]

লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসাবে যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয় -

(১) বস্তুকেন্দ্রিক উপাদান- লোকশিল্প, কুটিরশিল্প, অলংকার পরিচ্ছদ, লোকভাস্কর্য ইত্যাদি।

(২) লোকাচার, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার।

(৩) অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি অর্থাৎ লোকনাটক, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া।

(৪) বাক্‌কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অর্থাৎ লোকসংগীত, লোককথা, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি।

(৫) লোকপ্রযুক্তি (৬) অঙ্কন-লিখনকেন্দ্রিক সংস্কৃতি।

লোকায়ত জীবন-ঐতিহ্যের বিকাশ ব্যতীত লোকসংস্কৃতি অসম্পূর্ণ। এই লোকজীবন, একটা জাতির সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিকাঠামো নির্ভর করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের উপর। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে একটি জাতির খাদ্যাভাস, শিক্ষা-দীক্ষা, বাসস্থান, জীবিকা ও জীবনসংগ্রাম। আর্থিক অবস্থার সাথে মানুষের সামাজিক অবস্থানের যোগ নিবিড়। একথা বলাই যায় লোকসংস্কৃতির বিকাশ আর্থ-সামাজিক ও সমাজ সংগঠনের মধ্যে দিয়ে বৈচিত্র্যময় রূপ লাভ করে। খুব সহজ ভাষায় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বলা যায়- গ্রামীণ জীবন বা গ্রামীণ

মানুষদের দ্বারা সৃষ্ট অলিখিত মৌখিক এক মাধ্যম। বিবর্তনধর্মী, নমনীয়, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে সৃষ্ট অকৃত্রিম, আটপৌরে, মানুষের মুখে মুখে লালিত কৃষ্টি লোকসংস্কৃতি।

যেকোনো দেশের যেকোনো জাতির সংস্কৃতিধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে- তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি (persistence), সৃষ্টি (invention), ও লয় (loss) বলে অভিহিত করেছেন।[৬] প্রথমত, অতীতকালের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আমরা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল বহন করে চলি, সহজে তা ত্যাগ করতে পারিনা, এমনকি সজ্ঞানে-চেষ্টাতেও তার থেকে প্রভাবমুক্ত হতে ব্যর্থ হই। মনের অবচেতনে সেগুলি অবদমিত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে, সুযোগ মতো তা বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের অভ্যাস, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, উৎসব-পার্বণ, অনুষ্ঠান বিশ্লেষণে অতীত সংস্কৃতির মৃত উপাদানের সন্ধান মেলে। সংস্কৃতির এই দীর্ঘস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে বলে 'পার্সিস্টেন্স'। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি, নতুনের উদ্ভাবন। যুগের তাগিদে সময়ের কালান্তরে নব নব সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয়। নতুন-পুরাতন উপাদানের মিলন-মিশ্রনে নতুন 'কালচার কমপ্লেক্স' সৃষ্টি হয়। নতুন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক অনাবশ্যকীয় উপাদান লোপ পেয়ে যায়। এই লয়শীলতা সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। স্থিতিশীলতা, লয়শীলতা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত শক্তি, যা তৃতীয় বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল।

সাংস্কৃতিক স্থিতির একটা বড় দিক হল ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য, যা সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ। কালিক প্রবাহ ব্যতীত সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহও বর্তমান, যাকে বলে ডিফিউসান (Diffusion)। সংস্কৃতির গভীরতা হল ট্র্যাডিশন, প্রসার হল ডিফিউসান। বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক প্রসারণ বা ডিফিউসানকে বলেন Intersocietal transmisssion of culture in space এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশনকে বলেন- Intra societal transmission of culture in time.[৭] সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগলিক বিস্তারই 'ডিফিউসান'। যান্ত্রিক যানবাহনের উন্নতি ও বিজ্ঞানের প্রগতির উপর এই ভৌগলিক বিস্তার নির্ভরশীল। এই সংস্কৃতি রূপায়ণের আরও একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল- দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিধারার বাহক বা দুটি ততধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য বা কাছাকাছি বসবাসের ফলে দুই সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাতের মিলন ও মিশ্রণের দিক। দুই সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত এই মিলন-মিশ্রণ ও সমন্বয়কে বিজ্ঞানীরা বলেন 'অ্যাকালচারেশন' (aculturation)। 'অ্যাকালচারেশন' ও 'ডিফিউসান' এর সাদৃশ্য আছে, কারণ-

উভয়ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ আবশ্যক। কিন্তু ডিফিউসানের জন্য সান্নিধ্যের বা পাশাপাশি অবস্থানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। একটা নতুন আদর্শ অথবা সংস্কৃতির কোনো নতুন প্রযুক্তিগত উপাদান এক কেন্দ্র থেকে বহু দূর কেন্দ্রস্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনের জন্য ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য একান্ত আবশ্যক, যেমন- দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এছাড়াও ভিন্ দেশাগত লোকেরা স্থায়ী বসতি স্থাপনের ফলে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ও মিলন-মিশ্রণ ঘটে। এছাড়াও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব অর্থাৎ বিদেশীরা দেশী মানুষদের যখন নিজেদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়, ফলত সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাতের নিদর্শন পাওয়া যায় বাঙালি খ্রিস্টান, সাঁওতালি খ্রিস্টান, মুণ্ডা খ্রিস্টানদের মধ্যে। বঙ্গের উপজাতি সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। এই 'অ্যাকালচারেশন'এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী', 'বেদের মেয়ে', 'নারী ও নাগিনী' প্রভৃতি বাংলা ছোটগল্পে। বাংলায় সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ইতিহাসে এই সংমিশ্রণ বা 'অ্যাকালচারেশনে'র গুরত্ব অপরিসীম।

বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তিক জনজাতি গোষ্ঠীর লোকায়ত জীবন ও ঐতিহ্যর স্বরূপ নির্মাণে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি কেবল আঞ্চলিক শর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি, তা লেখকের অভিপ্রায় ও অনুসন্ধিৎসু মননের উপলব্ধি এবং বঞ্চিত আদিবাসীদের প্রতিরোধের কণ্ঠস্বররূপেও প্রতিধ্বনিত। 'বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)'- এই গবষণাকার্যে নির্বাচিত জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পে লিপিবদ্ধ জনজাতি গোষ্ঠীর লোকায়তজীবন, লোকসংস্কৃতি, লোকঐতিহ্যের গতিপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হল।

৭.ক| জনজাতির লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকউৎসব ও লোকদেবতা:

আদিবাসী মানুষদের জীবন আগাগোড়া নানান লোকবিশ্বাস-সংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এই সংস্কার হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষাহীন, যুক্তিহীনতায় মগ্ন কুসংস্কার। আদিবাসীদের মধ্যে নানান অলৌকিক বিশ্বাসের প্রতি অগাধ আস্থা, যা তাদের জীবনকে আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। গল্পগুলি আলোচনায় দেখা যায় আদিবাসী মানুষরা কতটা যুক্তিবুদ্ধিহীন কুসংস্কার দ্বারা পরিচালিত। নিম্নে আদিবাসী মানুষদের লোকাচার, নানান সংস্কার, ধর্মীয় ভাবনা, লোকউৎসব ও লোকাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সিঁদুরচরণ’ গল্পে দেখা যায় রাঁচি, হাজারিবাগ, গিরিডি, মধুপুর থেকে এদেশে কর্মসূত্রে আসা আদিবাসী মানুষগুলি স্থায়ী বসতি গড়ে তাদের নিজস্ব সংস্কার-সংস্কৃতি ভুলে গেছে-

> ‘এখন তারা বেমালুম বাঙালি হয়ে গিয়েচে- ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার সব রকমে। পূর্বপুরুষের বোংগা পুজো ভুলে গিয়েচে কতকাল, এখন হরিসংকীর্তন করে ঘরে-ঘরে, মনসা-পুজো, ষষ্ঠী পুজো করে, কালীতলায় মানত করে’।[৮]

দীর্ঘদিন অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে থাকার দরুন নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলে বাঙালী সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়ার চিত্র পরিস্ফুট, এক্ষেত্রে নতুন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির উপাদান লোপ পাওয়ার পরিচয় লভ্য।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বোতাম’ গল্পে আদিবাসীদের ধর্মাচরণের কিছু চিত্র চিত্রিত- তারা বড় শাল গাছ দেখে অরণ্যদেবতা অর্থাৎ মারাং বোঙার উদ্দেশে পূজা করে। বড় পাহাড় দেখে পাহাড়দেবতা অর্থাৎ জিয়াং বোঙ্গার উদ্দেশে পাহাড়তলে পূজা করে। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে, প্রকৃতির যাবতীয় নৈসর্গিক ঘটনা ও বস্তুর অন্তরালেই লুকিয়ে থাকে অলক্ষ্য শক্তি। এই ব্যাপারটিকে ই. বি. টাইলর (১৮৩২-১৯১৭) ‘অ্যানিমিজ্‌ম’ তথা ‘সর্বপ্রাণবাদ’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, পরবর্তীতে আর. আর. ম্যাবেট নাম দিয়েছেন ‘অ্যানিমেটিজম’ তথা জড়সত্তাবাদ।[৯] এই ধারণা থেকেই মানুষ কল্পনা করেছে মৃত্যুর পর অন্য আরেকটি সত্তা বা আত্মা আছে এবং প্রাণী বা কোনো বস্তুর অন্তরেও আরেকটি সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে, এই ধারণা থেকেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানেও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পূজা, পাহাড়-অরণ্যকে পূজার সূচনা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিকারী’ গল্পে কোল ও মুন্ডা গোষ্ঠীর লোকেদের ধর্মীয় মনোভাব, ধর্মাচরণের চিত্র প্রতীয়মান- গ্রামের বাইরে শাল গাছের নীচে বোঙ্গাপূজার স্থান, তারা এখানে মারাং বোঙ্গার উদ্দেশে মুরগী বলি দেয়, পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের সবাই বছরে একদিন একসাথে এখানে রান্না করে খাওয়ার কথা পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে আদিবাসীদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের চিত্র পরিস্ফুট।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বেদেনী’ গল্পে বেদিয়া জনজতির ধর্মাচরণ, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার ফুটে উঠেছে-

‘শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আরও একটু দূরে আর একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কিষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করলে বলে বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরো হিন্দু, মনসাপূজা করে, মঙ্গলচন্ডী, ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দুপুরাণ কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। ... বিবাহ আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায়ের হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না কবর দেয়’।[১০]

গল্পে বেদিয়া জনজাতির মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় লভ্য। বেদিয়াদের নৃতাত্ত্বিক আলোচনা অংশে দেখা যায়, বেদিয়ারা মূলত যাযাবর জীবনযাপন করে, এছাড়াও বাংলা কথাসাহিত্যের প্রায় সবক্ষেত্রেই বেদিয়াদের যাযাবর রূপেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বেদিয়ারা যাযাবর জীবনযাপন করায় তারা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকায় দুই সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ও সমন্বয় ঘটে, এই সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ ও সমন্বয়কে ‘অ্যাকালচারেশন’ বলা হয়। বেদিয়া জনজাতির সংস্কৃতির রূপায়ণে এই ‘অ্যাকালচারেশন’ এর দৃষ্টান্ত অন্বিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যাদুকরী’ গল্পে বশীকরণের কথা, নানা যাদুবিদ্যার কথা পাওয়া যায়-

‘তোমাকে কাপড় পরতে হবে, কেশবিন্যাস করতে হবে, ঢলকো করে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা। গায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা, খোঁপারে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। ভেব্যা দেখ, এসব পারতো এলাচ আন, আমি মন্তর দিয়া পড়ে দি। ...

তবে আন, এলাচ আন, ছোট এলাচ, দারচিনি, বড় এলাচ, মন্তর পড় দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি করে পান সাজবা, নিজে খাবা, খেয়ে কর্তাকে দিবা’।[১১]

কার্যকারণ সূত্রে এই সমস্ত বিশ্বাস যুক্তিহীন হলেও আদিবাসী মানুষরা এবং গ্রামের মানুষজন মনে প্রাণে এই জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করে। সমাজবিজ্ঞানীরা লোকসংস্কৃতির চারটি বর্গের কথা বলেন- ‘মান্যা’ অর্থাৎ অলক্ষ্য শক্তি, ‘ম্যাজিক’ অর্থাৎ জাদু, ‘টোটেম’ অর্থাৎ কুল প্রতীক, ‘ট্যাবু’ অর্থাৎ নিষেধ-সংস্কার।[১২] প্রকৃতির বিচিত্র সব রহস্য উদ্‌ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মিথের উদ্ভব ও তার বিবর্তন। জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণশক্তির

অস্তিত্ব কল্পনা এবং মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব, 'সর্বপ্রাণবাদ' এর ধারণা থেকেই আদিবাসী, প্রান্তিক মানুষদের মন ধীরে ধীরে জাদু সংস্কারের দিকে প্রবাহিত হয়। জাদুবিশ্বাস মূলত দুইপ্রকার- 'শুভকারী জাদু', 'অশুভকারী জাদু'। এই গল্পে যে জাদুবিশ্বাসের কথা পাওয়া যায়, তা শুভকারী জাদুবিশ্বাসের অন্তর্গত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী' গল্পে সাপের দংশনে জোবেদার মৃত্যুতে এক অদ্ভুত লোকবিশ্বাসের কথা পাওয়া যায়-

> 'জোবেদা কিন্তু বাঁচিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মাথার চুল টানিতেই খসখস করিয়া উঠিয়া আসিল'।[১৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিলাসন' গল্পে নানান প্রাচীন সংস্কার, লোকবিশ্বাসের উল্লেখ পাওয়া যায়-

> 'মধু এবং ক্ষীর পরিতোষের সামগ্রী, পরিতোষ সহকারে পান করলাম। না করলে ওদের সর্বনাশ হবে, কাঁদনের নরক হব, গ্রামের সর্বনাশ হবে; ওই পাহাড়ের মাথায় সদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে; পাথর খানি কালো হলে আকাশের সুনীল-সুষমা কঠিন তাম্রবর্ণে রূপান্তরিত হবে; বাতাস শবগন্ধে পরিপূর্ণ হবে, এমন কি সূর্যদীপ্তিও নিভে যাবে'।[১৪]

এরকম আরও নানান বিশ্বাস, আদিবাসীদের যুক্তিহীন সংস্কারের অন্তরালে যে ভাবনা ক্রিয়াশীল- প্রকৃতির সুবিশাল রহস্যময়তার উদ্ঘাটন না করতে পারায়, নিজেদের অসহায়ত্বের কারণেই মনে উদ্রেক হয় এক অনির্দেশ্য ভয়ের, সেই ভীতি-ভাবনার কোনো ব্যাখা না থাকলেও মানুষ অজ্ঞেয়, অলক্ষিত মহাশক্তিধর শক্তির কল্পনা করে নেয় এবং এখান থেকেই জন্ম হয় নানান সংস্কার-বিশ্বাসের।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাপুড়ের গল্প' গল্পে বেদে জাতির লোককথা, লোকসংস্কার, তাদের সমাজ রীতি ও বিশ্বাসের চিত্র পরিস্ফুট-

> (১) 'ভোরবেলায় আগে কেউ বাইরিবি না। দিনমণি চাকিতে থাকতি থাকতি ডেরায় ফিরবা। সিঁধেল চোর লয়রে মানিক, ডাকাত আছে ওৎ পেত্যা'।
>
> (২) 'আঁধার নামলে বন থেকে লাল গামছা মাথায় বেঁধ্যা পথের ধারে বস্যা হাই তুলবে, এই লম্বা জিব বার কর্যা আপন মুখ চাটবে। শিয়াল ডাকিলে পরে-বেদেরা লিবে না ঘরে'।[১৫]

এছাড়াও বেদিয়া নারীরা মোহিনী জানে অর্থাৎ তারা জাদুবিদ্যায় ও গুনতুকে পারদর্শী, এই প্রকার লোকবিশ্বাসের চল আছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরমলাগের মাঠ' গল্পে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের যুক্তিহীন সংস্কারাচ্ছন্ন নানা বিশ্বাসের চিত্র প্রতিফলিত। বাউরিদের মনে ব্রহ্মানাগকে নিয়ে নানান লোককথা ও বিশ্বাসের সংস্কারের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া তাদের গ্রামের নটবর বাউরির এক বেদের মেয়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। বেদের মেয়ের 'কাঁউরের বিদ্যে' নামক এক জাদুবিদ্যার কথা পাওয়া যায়। পাশাপাশি বাণ মেরে মানুষ মেরে ফেলা, ব্রক্ষনাগের বিষে মাঠে ঘসা না গজানো, ডাকিনী বাউড়ির চোখের জলের নুন বরমলাগের মাঠে জমে থাকার কারণে বর্ষাতেও মাঠে নোনা না লাগা, এরকম আরও নানান যুক্তিহীন লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কারে জর্জরিত সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের জীবন। যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা যখন মানুষ কোনো বিষয়ের মীমাংসা করতে পারে না এবং মানুষের মধ্যে আদিমতার বীজ যত বেশি গভীরভাবে প্রোথিত থাকবে, ততই জাদুবিশ্বাসের প্রতি ঝোঁক বাড়ার প্রবণতা দেখা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অক্ষয়বটোপাখ্যানম্' গল্পে 'শিডিউলড্ দেবতা' অর্থাৎ ট্রাইবাল দেবতাদের কথা, নানান ধর্মাচরণ লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যঞ্জনা পেয়েছে দেবতার বর্গীকরণ- উচ্চবর্গের দেবতা, নিম্নবর্গের দেবতা এই বিষয়টি। লেখক সুচারুভাবে সামজিক বৈষম্যকে গল্পে লোকসংস্কৃতির মোড়কে তুলে ধরেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষ ও আদিবাসী মানুষদের নানান লোকসংস্কার, বিশ্বাস-আচারের কথা লিপিবদ্ধ। ছেলেকে বাণ মারার কথা, মন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের কথা পাওয়া যায়-

> (১) 'বাণ মেরে মানুষের জানসুদ্ধা মেরে দিতে পারে- আচ্ছা, সে আর একদিন বুলব আজ্ঞা। সাপে কাটা রুগী, বুঝলেন তো, শিয়য়ে যম এসে বসে আছে'।
>
> (২) 'সাপের বিষ, ও হল যমের অগ্নিবাণ, ও কাটা কি সোজা কথা! ওষুধ দিলাম, মাথার চামড়া চিরে মুরগীর বাচ্চা লাগালাম, পদ্মের ডাঁটি দিয়ে ঝাড়লাম, শেষ করলাম 'জলসার', একশো আট ঘড়া জলে চান করালাম রুগীকে'।[১৬]

এছাড়াও প্রান্তিক, জনজাতি মানুষদের ‘কাঁউরের বিদ্যা’, আরও নানান ডাকিনী সংক্রান্ত নানান বিশ্বাস, কুসংস্কারের চিত্র গল্পে প্রতীয়মান। যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা যখন মানুষ কোনো বিষয়ের মীমাংসা করতে পারে না এবং মানুষের মধ্যে আদিমতার বীজ যত বেশি গভীরভাবে প্রোথিত থাকবে, ততই মানুষের মধ্যে নানা অযৌক্তিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার দেখা যায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘সাঁওতাল’ গল্পে জনজাতি সমাজের অদ্ভুত নিয়ম, প্রথা, রীতির রূপ রেখায়িত। গল্পে জমিদার দ্বারা আদিবাসী মেয়ে টেবি ধর্ষিত হলে আদিবাসী সমাজের মুরুব্বি তাদের সমাজের নিয়মানুসারে তাকে দন্ড দেয়- টেবিকে সন্ধ্যার পর একট প্রকান্ড বৃক্ষে বেঁধে তীর-ধনুক দিয়ে টেবির বুকে বিষবাণ বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়। আদিবাসী সমাজ তাদের নিজেদের বানানো নিজস্ব নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়, এক্ষেত্রে পরিবারের কেউ কোনো মতপ্রকাশ করার অধিকার নেই। গল্পে আদিবাসী সমাজের নিজস্ব নিয়ম-কানুন, আইন-প্রথার, তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যারা অন্যায় করল তারা শাস্তি না পেয়ে সমাজের অদ্ভুত প্রথার কারণে যে অত্যাচারিত তাকেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘পৌষ-পার্বণ’ গল্পে সাঁওতাল কুলিদের তিনদিনের ‘বাঁদনা’ উৎসবের কথা পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে এইদিন দামোদর নদীতে স্নান করলে তাদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, তাই আদিবাসী দলের স্নান করার দৃশ্য পাওয়া যায়। এই পরবে আদিবাসীদের নাচ-গান-মদ খাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের আমোদ-আহ্লাদের ছবি প্রস্ফুটিত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘সাঁওতালপল্লী’ এবং ‘পলহানের বিহা’ গল্পদ্বয়ে সাঁওতাল বিবাহরীতি এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে মাংস ও মদ, নানা খাদ্য-পানীয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘বলিদান’ গল্পে সাঁওতালদের কিছু লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়- টগরী মনে করে তাদের খেতের বোঙা রাগ করায় কোনো গাছে গুটি আসে নি। বোঙাকে মুরগি বলি না দিলে বোঙা শান্ত হবে না। আদিবাসীদের মনে প্রকৃতির সবকিছুর অন্তরালে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা এবং দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রতীয়মান।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বীতংস’ গল্পে দেখা যায়, সহজ-সরল জনজাতি মানুষদের মধ্যে নানান লোকবিশ্বাস, সংস্কার প্রোথিত। এই বিশ্বাস সংস্কারের পিছনে থাকে নানান ভয়, যে ভয় দেখিয়ে সমাজের কিছু স্বার্থন্বেষী মানুষ তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে। ‘বাণ মারা’, ‘পিশাচ চালানো’ এই সমস্ত নানান অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার এবং এর উপাচারের প্রতিফলিত রূপ পাওয়া যায় এই গল্পে। পিশাচ চালান বা পিশাচ পুজোর উপাচার –

> ‘পরশু শনিবার, কয়েকটা ফুল আর সিঁদুর নিয়ে আসবি, আমি তিনটে নরমুন্ড জোগাড় করে রাখব। তাই দিয়ে পিশাচ পুজো করতে হবে’।[১৭]

এই পুজো সঠিকভাবে না করতে পারলে সুন্দরলালদের মতো স্বার্থান্বেষী মানুষরা আদিবাসী মানুষদের সরলতার সুযোগ নিয়ে অযৌক্তিক অদ্ভুতুড়ে কথা বলে তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক ঘটায়-

> ‘তা হলে রোজ রাত্তিরে সে যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন প্রকান্ড একটা কালো পিশাচ সে চেপে বসবে তার গায়ের ওপর। তারপর সেই পিশাচটা তার মুখখানাকে নলের মতো ছুঁচালো করে দিয়ে তার মাথার ভেতর থেকে চোঁ চোঁ করে রক্ত আর ঘিলু শুষে খাবে’।[১৮]

এইসমস্ত যুক্তিহীন, কাল্পনিক কথার দ্বারা আদিবাসী মানুষদের মনে ভীতির সঞ্চার করে সুন্দরলালদের মতো সমাজের একদল স্বার্থন্বেষী মানুষ তারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। গল্পের পরিণতিতেও দেখা যায় একইভাবে সুন্দরলাল এই সহল-সরল, দরিদ্র আদিবাসীদের ভয় দেখায়-

> ‘তোদের গায়ে মড়ক লাগবে ‘হয়জা’র মড়ক একটি প্রাণীও বাঁচবে না, মরে সবশেষ হয়ে যাবে। ‘করম’ দেবতার রাজ পড়েছে তোদের ওপর- তোদের কাউকেই রাখবে না, কাউকেই নয়’।[১৯]

এই যুক্তিহীন ভয় সৃষ্টির দ্বারা অর্থলোভী মানুষের দল শিক্ষার আলো থেকে দূরে অবস্থিত আদিবাসীদের বীতংসের জালে খুব সহজেই ফেলতে পারে। এগুলো লোকবিশ্বাস। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভেদ আছে। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের কোনো যোগ নেই কিন্তু লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে লোকবিশ্বাসই কালক্রমে লোকসংস্কারে পরিণত হয়। আদিবাসী মানুষদের ধর্মীয় উপাচারের ক্ষেত্রে সংস্কারের পরিচয়ও গল্পে পাওয়া যায়, মানসিকের পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম-

> ‘শালবনের মাঝখানে সিঁদুরমাখা ওই যে বড় কালো পাথরটা- ওখানে শিং বোঙার পুজো। উপাচার মুরগি আর মহুয়ার মদ’।[২০]

লোকসংস্কারের মূলে থাকে ধর্মবোধ। গল্পে লেখক খুব সুন্দরভাবে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে তুলে ধরেছেন। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও তা এক নয়। তবে একথা ঠিক যে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উভয়ের মূলেই কাজ করে মূলত ঐহিক শুভাশুভ বোধ। লোকবিশ্বাস একান্তভাবে একটি ধ্যানধারণা, যেমন- পিশাচ চালানি বা ডাইনিভাবনা। লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তা আমরা এই গল্প আলোচনাতেই দেখেছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পে আদিবাসীদের যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার চিত্র এবং তাদের লোকসংস্কৃতির অঙ্গ- নাগাড়া বাজানো, নাগাড়া বাজিয়ে বাঘ শিকার করা, যুদ্ধ করা এবং বাঁশি বাজিয়ে প্রেম করার চিত্র মূর্ত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভোগবতী' গল্পে চাষী সাঁওতাল, খেড়ে সাঁওতালদের নানান লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় -

(১) 'পাহাড়ের নীচে প্রতিহারি হয়ে আছেন বাবাঠাকুর। চওড়া একখানা শিলাপট্ট-মাটির ভেতর আধাআধি পরিমাণে সমাহিত। তার মাথার ওপর ছেনি দিয়ে কাটা একটা সিংহের আকৃতি। নিচে অশ্বারোহী একটি বীর পুরুষের মূর্তি - তার প্রসারিত হাতে খোলা একখানা সুদীর্ঘ তরবারি, বোঝা যায় কোনো দ্বিগিজয়ী রাজা নিজের শৌর্য-বীর্যকে অক্ষয় করে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন'।

(২) 'গাছতলায় একটা বড় পাথর দেখলেই তারা সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করে, একটা ভাঙা মূর্তি দেখলেই থান বসিয়ে দেয় মুরগী বলি। তাই এখনকার বিস্মৃতিনামা রাজা রূপান্তরিত হয়েছেন পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা ভৈরব ঠাকুর'।[২১]

উপরিউক্ত দুটি দৃষ্টান্তের প্রথমটি তাদের জাতির ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতিমূর্তি এবং দ্বিতীয়টি ধর্মীয় সংস্কারের উদাহরণ। গল্পে আদিবাসীদের দেবতা, তাদের ধর্মীয় আচরণ, লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কারের চিত্র প্রস্ফুটিত। পাশাপাশি এইসব সংস্কৃতি-সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থার স্বরূপও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনি' গল্পে আদিবাসী মানুষ এবং গ্রামের মানুষদের মধ্যে নানান সংস্কার, অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসের চিত্র মূর্ত[২২] -

(১) 'মুর্দার বুকে প্রাণ বসাতে পারে সে, সাপকে মন্ত্র দিয়ে এমন বশ করে যে চুমুক দিয়ে নিজের বিষ নিজেই টেনে নেয়'।

(২) 'আপাঙের মূলে ফুঁ দিয়ে আপনার হাতে দিয়ে দেবে লাটুয়া ওঝা, কাঁকড়াবিছের গর্তে হাত দিলেও কিচ্ছু হবে না আপনার'।

(৩) 'লাটুয়া ওঝার মন্ত্রপড়া পাতা দিয়ে মারাং গাড়ায় মাছ ধরি বাবু আমরা। জলে পাতা বিছিয়ে দিলে সব মাছ মড়ার মতো পড়ে থাকে তার ওপর'।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভয়-ভক্তি নিয়েই মানুষের মনের বিশ্বাস-সংস্কার। মানবসভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশে জাদুমন্ত্র, ঝাঁড়ফুক, শিকড়বাকড়ের প্রতি আস্থা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। যেকোনো ধরনের অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাসের অন্তরালে জাদুশক্তির বিশ্বাসের ঘনীভূত উপাদান লুকিয়ে থাকে। মানুষ যখন কোনো ঘটনার যুক্তিযুক্ত ব্যাখা, কার্যকারণ সম্পর্ক বা অর্থ খুঁজে পায়না তখনই তা মানুষের কাছে জাদু বলে প্রতিপন্ন হয়। এমনকি শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের পরিশীলনও অনেকক্ষেত্রে মানুষের মন থেকে জাদুপ্রত্যয়কে উৎপাটিত করতে পারেনা, তাইতো গল্পে দেখা যায় শহুরে বাবু লাটুয়া ওঝার কাছে কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ আনতে এসেছে। এই জাদুবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আদিম-আধুনিক, সভ্য-অসভ্যের ভেদাভেদ যে খুব একটা নেই তা এই গল্পে প্রতীয়মান। এই লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কারগুলো আদিবাসী লোকসংস্কৃতির অঙ্গ।

রমাপদ চৌধুরীর 'ইম্‌লী' গল্পে বেদিয়া জনজাতির ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়- তারা আচার ব্যবহার কিছুটা হিন্দুর রীতি পালন করে, কিছুটা মুসলমানী রীতি পালন করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী' গল্পেও বেদিয়া জনজাতির মিশ্র ধর্মাচরণের কথা পাওয়া যায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বেদিয়ারা যাযাবর জীবনযাপন করায় তাদের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতির সমন্বয় বা 'অ্যাকালচারেশন' এর প্রতিফলন ঘটে।

রমাপদ চৌধুরীর 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে আদিবাসীদের প্রথার কথা পাওয়া যায়- তা হল 'ভিখারিয়ার নাচ'- যেখানে তোতা পাখি আর ময়ূর সেজে দুজন লোক মেয়েদের নামে নানান খারাপ কথা বলে ছড়া বেঁধে গান গায়। এছাড়া সাঁওতালদের 'চান্দো বোঙা' নামক আদিবাসী দেবতার কথা পাওয়া

যায়। সাঁওতাল সমাজের সবচেয়ে বড় কুপ্রথার উদাহরণ এই গল্পে পাওয়া যায়- 'বিট্‌লা' প্রথা। আদিবাসী সমাজের পঞ্চায়েত যখন কোনো নারীকে বিট্‌লাহা ঘোষণা করে, তখন তাকে গ্রামের সব ছেলেরা ধর্ষণ করে এবং তাকে সমাজে একঘরে করে দেওয়া হয়, কোনো দোকান থেকে সে কিছু কিনতে পারে না, সমাজের কেউ তাকে কোনরকম সাহায্য করতেও পারে না। একটা নারীর উপর চরম অত্যাচার-লাঞ্ছনা করা হয়। আদিবাসী সমাজে প্রথার নামে নিদারুণ নারী অত্যাচারের চিত্র প্রায়শই দেখা যায়।

রমাপদ চৌধুরীর 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে তুড়ুক জাতির কথা পাওয়া যায়, যারা আচারে-বিচারে সিকিভাগ মুসলমান ধর্ম রীতি পালন করে, কিন্তু তারা জাতে বারোআনা সাঁওতালী। এক্ষেত্রে দুই ধর্ম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বা 'অ্যাকালচারেশন' এর দৃষ্টান্ত লভ্য। এই তুড়ুক জাতির লোকেদের দেবতা-

> 'দেবদেবী সেই কিঁমার বোঙা, হাড়াম বোঙা, রামসালগি লিটা, জমসিম বোঙা। কিন্তু ওপারের লোক যমন বলত সবচেয়ে বুড়া হল সিঙে বোঙা, তেমনি তুড়ুকদের সবচেয়ে বড় দেবতা এল্লা বোঙা!'[২৩]

এই তুড়ুক জনসমাজ জীবন আগাগোড়া নানা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্তী। তুড়ুক সমাজে ডাইনি প্রথার চিত্র, লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়[২৪]-

(১) 'গাঁয়ের সাঁওতালরা বলত, নো হুজুর ডাইনের মন্ত্র শিখেছে ঝুমরা বিবির কাছে। মারাং বুরুর নাম করে এখনই মানুষ আবার এখনই হরিণ, নয়তো পাখি। হাওয়ায় নাকি উড়ে যেতে পারে বুধন, সোনাতুলসীর জলে মিশে যেতে পারে'।

(২) 'নির্মল সিংও নাকি মন্ত্র শিখেছিল ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনার কাছে ঝুমুর ঝুম্‌ ঝুমর ঝুম্‌ শব্দ করে হাওয়ায় উড়ে যেত সে'।

(৩) 'গায়ের লোক বললে, ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনা। মায়ের মতো মেয়েও ছিল ডাইনি। নির্মল সিংকে বশ করেছিল মেয়েটা, লোভ দেখিয়েছিল, তারপর সুযোগ দেখে কলিজা বের করে খেয়ে নিয়েছে, তাই নির্মল সিং বাতাসে মিশে গেছে। ডাইনিরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখে না'।

(৪) 'বেটার কলিজা খেয়ে মিঠা লেগেছিল ডাইনিটার, তো বাপের কলিজাও খেয়ে নিয়েছে'

এছাড়াও গল্পে এরূপ আরও নানান যুক্তিবুদ্ধিহীন লোকবিশ্বাসের চল পাওয়া যায়- ডাইনিরা রাতে ঝাঁটা করে উড়ে বেড়ায়, ঝুমরা বিবি তার স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে একটা ঝাঁটা স্বামীর কাছে রেখে কুলোর উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে রাতের বেলা পুরুষের কলিজা খেতে বেড়ত। এই সমস্ত আদিবাসী মানুষদের জীবনসত্য তাদের আজীবন লালিত অন্ধ কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাস- বোঙা এবং ডাইনি। আদিবাসীদের আদিমতম ভাবনায় 'মান্যা', 'ম্যাজিক', 'দেবতা', 'প্রেত' সবকিছু এক বুননে গাঁথা। আদিবাসী মানুষদের মনে যে 'ডাইনি' বিশ্বাস, তা অশুভকারী জাদুবিশ্বাসের অন্তর্গত। গল্পে লেখক আদিবাসী মানুষদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বীজ তদের মনে কতটা গভীরে প্রোথিত তা তুলে ধরেছেন। মানুষ যখন কোনো ঘটনার যুক্তিযুক্ত ব্যাখা, কার্যকারণ সম্পর্ক বা অর্থ খুঁজে পায়না তখনই তা মানুষের কাছে অলৌকিক, জাদু বলে প্রতিপন্ন হয়। মনের মধ্যে আদিমতার বীজ যত বেশী গভীর হবে জাদুর উপর আস্থা-বিশ্বাসের পরিমাণটাও ততই প্রগাঢ় হয়।

সমরেশ বসুর 'গুণিন' গল্পে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার পরিচয় লভ্য। গুণিন নকুড় গ্রামবাসীদেরকে বহুবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য কাউকে মাদুলি, কাউকে জলপড়া দেয়। কেউ বশীকরণ বিদ্যা শিখতে চায়। সেক্ষেত্রে নকুড় তাদের বশীকরণের প্রক্রিয়া বলে-

> 'প্রথমে ছোট পেতলের বাটিতে একটু তেল নেবে। সে তেল আমি দেব, গুণ তেল! নেয়ে শুদ্ধ হয়ে না খেয়ে ভোরবেলা পুবমুখো বসবে। সামনে তেল রেখে, সূর্যের দিকে চেয়ে এক হাজার আটবার এই বলবে'।[২৫]

সে এভাবেই আরও নানান আদেশ দেয়, কখনও সিঁদুর টিপ দেয় জন্মশত্রুকে বশ করতে। এরকমই দুঃসাহসিক অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ করতে গিয়ে নকুড়ের প্রাণ যায়। মানুষের জাদুবিশ্বাসের সূত্রেই 'ওঝাতন্ত্র' বা 'শামান্‌ইজম' এর ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় সামাজিক জীবনে। ওঝাদের আয়ত্তগত জাদুবিদ্যা এবং সুদক্ষ কলাকৌশলের কারণে তারা সমাজে বেশ সুবিধাবাদী জীবনযাপন করে। কিন্তু নকুড়ের নিজের আয়ত্তিত বিদ্যার কারণেই তার মৃত্যু ঘটে। সমাজের এই প্রান্তবাসী মানুষরা সমস্যা জর্জরিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে তারা এইসমস্ত বশীকরণ মন্ত্র, জাদুবিশ্বাসের আশ্রয় নেয় এবং শিক্ষাহীনতার কারণে তারা নানান যুক্তিহীন অন্ধ লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সমরেশ বসু'র 'অরণ্যনিশি' গল্পে মুন্ডা জনজাতির নানা সংস্কারের কথা চিত্রিত। তাদের অপদেবতা 'বাগিয়া বোঙ্গা'। মুন্ডা জনজাতির মানুষদের মনের বিশ্বাস এই বাগিয়া বোঙ্গা লোকদের ভুলিয়ে ভুল রাস্তায়, কোথায় নিয়ে যায় তা কেউ জানে না। যাকে বাগিয়ায় ধরবে সে বাঁচবে না মরবে তা কেউ জানে না। গল্পে আদিবাসীদের মনের লোকবিশ্বাস ফুটে ওঠে।

সমরেশ বসু'র 'নির্বাসিতা' গল্পে আদিবাসীদের লোকবিশ্বাস, কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়-

> 'এখানে 'সাত কাহিনির' একটু উৎপাত আছে ... সাতটি অপদেবী। মুন্ডাদের জগতে দেবতা কেউ আছে কী না জানি না, অপদেবতা প্রচুর এবং তারা অপদেবতাদের পুজো দিয়ে সব সময়ে ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করে। সাত কাহিনি এবং অপদেবী, তারা যুবক-যুবতীদের মন ভুলিয়ে নিয়ে, জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়। হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, পাওয়ায়, দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী করে তোলে, তারপরে কোনো উঁচু জায়গা থেকে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করে, অথবা বন্য ক্ষ্যাপা হাতির সামনে ছেড়ে দেয়, কিংবা বাঘের মুখে তুলে দেয় বা অজগরের গ্রাসে'।[২৬]

গল্পে মূর্ত জনজাতিদের এই লোকবিশ্বাসের অন্তরালে সমাজতাত্ত্বিক দিকটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ধারণা নৈসর্গিক ঘটনাবলীর অন্তরালেই লুকিয়ে থাকে অলক্ষ্য শক্তি। মাঝে মাঝে এই অলক্ষ্য শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে তার অস্তিত্বের উপস্থিতি জানান দেয়, যা 'মান্যা' সংস্কারের প্রাথমিক ধাপ। এই নৈসর্গিক ঘটনাবলীর অন্তরালের সংঘটক 'মান্যা' অজস্র, অসংখ্য। মানুষের মনে যে ভীতি তার কারণস্বরূপ কেবল একটিমাত্র মহাশক্তির কল্পনা ছিল না, সেক্ষেত্রেও শুভমহাশক্তি এবং অশুভমহাশক্তি- এই দ্বিবিধ অতিলৌকিক শক্তির কল্পনা থেকেই প্রসূত 'পলিথীইজম্' বা বহুদেবতার ধারণা। গল্পেও জনজাতি মানুষদের এই বহুদৈবিক ধারণাই মূর্ত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ডাইনি' গল্পে আদিবাসী ডাইনি প্রথা সংক্রান্ত নানান বিশ্বাস কুসংস্কারের পরিচয় লভ্য। গোটা গল্পের মূল কাহিনিই আবর্তিত আদিবাসীদের এই নানান অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারকে ঘিরে। এর কয়েকটি জ্বলন্ত উদাহরণ দেওয়া হল- 'রোতো মুন্ডার বিধবা বউ ডাইনি হয়েছিল। সুখের বিষয়, নাক কেটে রক্ত ঝরিয়ে দিতেই সে মানুষ হয়ে যায়। তকে প্রাণে মারতে হয়নি'।[২৭] এই সমস্ত অদ্ভুত নিয়ম, বিশ্বাস আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। তার মনে করে একটা শকুন নাকি কথা বাতাস থেকে তুলে ডাইনির কাছে পৌঁছে দেয়। ডাইনি হবার কোনো সঠিক কারণ নেই, যে কেউ যখন তখন ডাইনি হতে পারে।

শিক্ষাহীনতার কারণে এরকম নানান যুক্তিবুদ্ধিহীন বিশ্বাস, সংস্কার, নিয়ম আদিবাসীদের মধ্যে পাওয়া যায়। আদিবাসীদের সংস্কৃতির অঙ্গই এইসমস্ত যুক্তিহীন লোকবিশ্বাস-সংস্কার।

মহাশ্বেতা দেবীর 'লাইফার' গল্পে সাঁওতাল সমাজের এক বিশেষ আচার-সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। সাঁওতাল সমাজের নিয়মানুসারে কোনো বিপন্ন মানুষ শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পনের ইঙ্গিত হিসাবে হাতে শালপত্র ডাল তুলে নেয়। গল্পে মাগন এভাবেই তার জীবনভিক্ষা চায়।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বড়াম মায়ের থানে' গল্পে সাঁওতাল গোষ্ঠীর অন্তর্গত হেমব্রমদের ধর্মাচরণ, ধর্ম বিশ্বাস, লোকসংস্কার চিত্র চিত্রিত। এই হেমব্রম জনগোষ্ঠীর মানুষেরা দেবতা বড়াম মাকে খুব বিশ্বাস করে এবং বড়াম মা কেন্দ্রিক নানা লোকবিশ্বাস ও লোককাহিনি গল্পে পাওয়া যায়। মুরগি, আতপচাল, ধুপ-ধুনো দিয়ে তারা খুব ভক্তি ভরে বড়াম মায়ের থানে পূজা দেয়। এই বিশ্বাসের পাশাপাশি গল্পে আবার রতন বড়াম মায়ের বিষয়ে প্রশ্ন তোলে এবং এক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চিত্রিত।

প্রফুল্ল রায়ের 'সাতঘরিয়া' গল্পে বিহারের প্রান্তিক জনজীবন ও তাদের বিবাহরীতির একটা অদ্ভুত দিক ফুটে ওঠে। বিয়ে করার শর্ত থাকে যে নিজের পেটের জোগান নিজেকেই করতে হবে। যদি কোনো কারণবশত কাজ চলে যায় তাহলে বিয়েও ভেঙে যায়। চাঁপিয়ার জীবনেও এরকম বারবার হয়েছে, সে সাতবার এভাবেই বিবাহ করে ও ছয়বার তার কাজ চলে যাওয়ায় বিয়ে ভেঙে যায়। গল্পে বহির্বঙ্গের এক অভিনব বিবাহরীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' গল্পে লোহার জনজাতি ও সমাজের অন্যান্য নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষদের কিছু কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় উন্মোচিত। এর পাশাপাশি গল্পে নানা লোকাচার ও চিত্রিত। গল্পে দেখা বিরাম গুণমান কীরকম চালাকিভাবে সারবানকে গ্রামবাসীর সামনে দেবাংশী ঘোষণা করে এবং মানুষের মনের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগে সারবানার মাধ্যমে উপার্জন করে। গল্পে নানারকম অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন সাধারণ মানুষ তাদের নানা সমস্যা সমাধানের আশায় সারবানের কাছে আসে, সে বলে-

> 'সারবান তখন এক চিমটি থানের মাটি তুলে দিত জলে গুলে খাওয়ার জন্য। অথবা হাতের চামরের দুগাছা পাটের ফেঁসো ছিঁড়ে দিত মাদুলি করে ধারণ করার জন্য। কাউকে 'হাঁ' বলত,

কাউকে 'না'। সেই অবসন্ন ইন্দ্রিয়ে তার যা মনে আসত তাই সে করত। কোনোটা লাগত আর কোনোটা লাগত না। নিদান যদি ফলত, তার মাহাত্ম্যের কথা দশ-বিশ গ্রামে নতুন করে ছড়াত। যদি না ফলত, মানুষ প্রার্থনাকারীর কোনো ত্রুটি খুঁজে বার করত। বিশ্বাস এমনই'।[২৮]

মানুষের অন্ধবিশ্বাস, তাদের ভয়মিশ্রিত ভক্তির কারণে তাদের যুক্তিবুদ্ধি লোপ পায়, গল্পে এই সারসত্য উন্মোচিত।

অভিজিৎ সেন 'জেহাঙ্গী' গল্পে আদিবাসী সমাজের গহনে প্রোথিত কুসংস্কার 'ডাইনি' প্রথার মর্মান্তিক চিত্র পরিস্ফুট। প্রথমে বাড়িতে ডাকাতি হওয়া, ডাকাতদের সাথে লড়াইয়ে রেংটার বড় ভাই মারা যায়। ডাকাত তাদের সর্বস্ব লুট করে নেয়। এইসব ক্ষতির কারণ এবং কবিরাজ ও গুণিনের কথায় এই সমস্ত ক্ষতি কেউ বোঙ্গাচালান করেছে তাই তাদের এত ক্ষতি হয়েছে। এই কথার প্রেক্ষিতে জেহাঙ্গীকে ডাইনি ভেবে, রেংটার টাঙি দিয়ে কোপানোর পিছনে আদিবাসীদের মনে ডাইনি সংক্রান্ত যে অন্ধবিশ্বাসের বীজ প্রোথিত তা স্পষ্ট। আদিবাসীরা মনে করে যে ডাইনি বিদ্যা শেখে, তার শরীরের শক্তি ও তেজ কয়েকগুণ বেড়ে যায়, সেই কারণে কখনো-কখনো নিজের থেকেই ফিট এবং তড়কা হয়ে তা প্রকাশ পায়। জেহাঙ্গীর যে এপিলেপ্সি রোগ ছিল তা তারা বুঝতে পারেনি। এছাড়া তাদের বিশ্বাস-

'ডাইনি মানুষকে এমনভাবে খায় যে সেই মানুষটা টেরও পায় না। তারপর একদিন শুকিয়ে, অথবা গলা থেকে রক্তবমি করে অথবা অন্য কোনো রোগে ভুগে সে মারা যায়'।[২৯]

গল্পে এই সমস্ত নানান অযৌক্তিক, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের চিত্র প্রতীয়মান। একইভাবে 'পাথরে জলের বিন্দু' গল্পেও কৈলাস পাহানের স্ত্রী পুষ্পাকে গ্রামবাসী ডাইন সাব্যস্ত করে। আদিবাসীদের ধারণা তাদের গ্রামে শিশুমৃত্যুর কারণ পুষ্পা, সে ডাইন, 'ডাইন' মানুষের কোনো লাভে আসে না, উপকারে লাগে না। ডাইন শুধু ক্ষতিই করে।" অনুরূপভাবে এই গল্পেও আদিবাসীদের পরম্পরায় ঐতিহ্যগত ভাবে চলা অন্ধ লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার চিত্রিত। আদিবাসীদের মনের এই 'ডাইনি' বিশ্বাসের অন্তরালে অশুভকারী জাদুবিশ্বাস ক্রিয়াশীল।

অভিজিৎ সেনের 'মাটির বাড়ি' গল্পে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, নানা আচার, প্রথার বীভৎসতা রূপায়িত হয়েছে। প্রাচীনকালে

বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল, যেমন খোন্দ জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্বে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। আদিবাসী ধর্মসংস্কার, ধর্মাচরণের প্রথার মধ্যে বৃক্ষপূজা, বলিদান, পাথরপূজা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকাল থেকেই ঊর্বরতা তত্ত্ব ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে বহমান। এই ঊর্বরতাবাদের আচারের অন্যতম অঙ্গ বলিদান, বিশেষত নরবলি, পরবর্তীতে তা পশুবলিতে রূপান্তরিত হয়।

লেখকের এই 'মাটির বাড়ি' গল্পে এই ঊর্বরতাবাদের কুসংস্কার, অন্ধাবিশ্বাস চিত্রায়িত হয়েছে। গোহিলাল কুর্মি সম্প্রদায়ের, সে মনে করে-

> 'তার সমাজের সেই প্রাচীন ধারার অনুসারী যা সম্পত্তির বর্ধমানতা এবং সম্পত্তি রক্ষা এই পৃথিবীর একজন কুর্মীর একমাত্র পবিত্র কাজ বলে মনে করে'।[৩০]

জমি রক্ষা ও সম্পত্তি বাড়ানোর অভীপ্সায় গোহিলাল কুসংস্কারের পৈশাচিক, নিষ্ঠুর ভাবনায় আচ্ছন্ন। কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে গোহিলাল ও তার পরিবারের সকলে, এমনকি ভামরও তার নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে বলি দেয়। এক্ষেত্রে তারা নানান রীতি পালন করে[৩১]-

> (১) 'মাহাতো একপাশে কাঠের আগুনের কুন্ড তৈরি করেছে। তার একধারে চারহাত গভীর একটা মাটির গর্ত অন্যধারে কাঠে আগুন। আগুনের রং কখনো স্তিমিত হয়ে আসে, তখন মাহাতো কাঠ ঠেলে দেয় এবং কোনও দাহ্য তরল নিক্ষেপ করে। আগুন কুন্ডের ঠিক উপরের কার্বনের স্তরকে একটা অদৃশ্য লাফে অতিক্রম করে গিয়ে উপরের বাতাসে মুক্তি পায় হুতাশনে। মাহাতোর সামনে একটা পিঁড়িতে ভামর বসে আছে। ভামরের সামনে নতুন কুলোয় দীপ, ধূপ, সিঁদুর, তেল, আতপচালের আয়োজন'।
>
> (২) 'সব রীতিরকম ঠিক-ঠিক করলে দেবতা আর প্রেতাত্মা তোমাদের আরও শক্তিশালী, আরও সম্পদশালী করবে। মন শক্ত রাখো আর রীতির বাইরে কাজ কোরো না।
>
> ... একটা রঙিন শোলার ঘোড়া সে রাখে কুলোর উপর একটা নতুন মাটির হাঁড়ির গলায় সে পাটের দড়িবাঁধে। মন্ত্র পড়ে, গর্তের চাপাশে প্রদীপের আলোয় প্রতীকী চিহ্ন আঁকে তেল সিঁদুর দিয়ে। প্রতীক আঁকে মাটির হাঁড়ির গায়ে। ভিজে চাল ছড়ায় এখানে সেখানে। তারপর সে নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে থাকে'।

আকাঙ্ক্ষিত সাফল্যলাভের আশায় আদিম মানবদের মধ্যে নানারকম অন্ধবিশ্বাস-সংস্কার চলে আসছে। বিভিন্ন কারণ বিশেষে, যেমন- মৃত্যু, খরা, সম্পত্তির প্রাপ্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন শক্তিকে দায়ী বলে মনে করে আসছে। আদিম মানব বিশ্বাস করতো ব্যক্তির জীবন ব্যক্তির দেহ মধ্যস্থিত আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এখান থেকেই সৃষ্টি হয় 'সর্বাত্মাবাদ তত্ত্ব।' এভাবেই আদিবাসীরা সবকিছুর পিছনে এক বিশেষ শক্তি ক্রিয়াশীল এই ধারণার, বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পড়ে। এরপর শিক্ষার অজ্ঞতার কারণে এই সংস্কার পরিণত হয় কুসংস্কারে, বিশ্বাস পরিণত হয় যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসে। 'মাটির বাড়ি' গল্পে এই বিষয়টি লেখক সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছে। মানুষ তার বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের খাতিরে এতটাই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে কোনো যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়াই নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে সম্পত্তি প্রাপ্তির আশায় মাটির হাঁড়িতে করে মাটিতে পুঁতে দেয়। মনে করে শিশুটির আত্মা তাদের বংশের সম্পত্তি রক্ষা করবে। গল্পে আদিবাসী মানুষদের অন্ধবিশ্বাস, বীভৎস কুসংস্কারের চিত্র প্রতীয়মান।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'রেখে আসা গল্পে লোধা জনজাতির বিবাহরীতি উল্লিখিত- তাদের বিয়েতে বরপক্ষের তরফ থেকে কনেপক্ষকে পণ দেওয়া হয়। বড় বয়সের মেয়েদের তুলনায় ছোট বয়সের মেয়েদের যাদের ঋতু শুরু হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে পণ বেশি দেওয়া হয়। কন্যাপণ ১২৫ টাকা, এই টাকাটা মেয়ের বাবাকে দেওয়া হয়। আদিবাসী সমাজের বিবাহরীতির অন্যতম অঙ্গ বরপক্ষের কন্যাপণ দেওয়া।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কল' গল্পে কোড়া জনজাতির পার্বণের কথা পাওয়া যায়, যা ১০ই ফাল্গুন অনুষ্ঠিত হয়। এই পার্বণের নাম মা মনসার জাগান, এই উৎসবকে ঘিরে বাড়িতে অতিথি আসার কথাও পাওয়াও যায়। গল্পে একটি বিষয় লক্ষণীয়- জনজাতির মানুষদের হিন্দু দেবী মনসার পূজা করার কথা পাওয়া যায়। এমনকি জনজাতিদের গোষ্ঠী পরিচয় অংশেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে হিন্দু দেবতা- মনসা, চণ্ডী পূজার প্রচলন আছে। গল্পেও সেই দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। হিন্দু সংস্কৃতির সান্নিধ্যে দীর্ঘকালীন বসবাসের ফলে দুই জাতির সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ বা 'অ্যাকালচারেশন' ঘটে।

নলিনী বেরার 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে 'চিড়কিন ভূত' নিয়ে নানা লোকবিশ্বাস আছে। এই লোকবিশ্বাস কেবল আদিবাসীদের মধ্যে প্রোথিত নয়, পাশাপাশি অন্য প্রান্তিক জাতির লোকেদের মধ্যেও প্রোথিত। আদিবাসীদের মধ্যে ধারণা চিড়কিন ভূত হল কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারী মারা গেলে তাকে পুঁতে দেওয়ার পর

গুণিনরা মন্ত্র দ্বারা তার আত্মাকে বশ করে, সব কাজ করিয়ে নিতে পারে, বাড়ির বউ বানিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু তার গায়ে ঝাঁটার কাঠি লাগালে যে আর থাকবে না। আদিবাসীদের মধ্যে এইসমস্ত অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীনতার কারণে অনেক আদিবাসী মেয়েদের জীবন বিপন্ন হয়, গল্পে সুনিকে চিড়াকিন ভূত বলে গ্রামবাসী ও তার পরিবার মনে করে এবং তার চোখে ঝাঁটার কাঠি বিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় আদিবাসীদের অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষা প্রকট।

এই গল্পে এই সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, লোকসংস্কারের পাশাপাশি আদিবাসীদের বহুবিবাহরীতির মধ্যে 'সিন্দুর-বাপলা' নামক বিবাহরীতি অর্থাৎ জোড়পূর্বক মাথায় সিঁদুর ঘষে বিবাহ করা। আদিবাসী সমাজে এরূপ বিবাহরীতির প্রচলন আছে।

নলিনী বেরার 'খোরপোষ' গল্পে আদিবাসী জনসমাজের লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বিচিত্র নামের সমাহার, তাদের ধর্মাচরণ, উৎসব, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের চিত্র পরিস্ফুট। গল্পে আদিবাসীদের বিচিত্র নামের সমাহার পাওয়া যায়- 'রাইবু, চামটু, গুড়গুড়িয়া, সামাই, সোমবারি, ঢালো, খেকরে, কুলাই, ছোটরাই, পিথো, কাঁদুরা, পিলচু, পিতাম, গুরা, বড়কাই, সুনি, ভুসকি, ধনু, গুরভা'।[৩২]

গল্পে সাঁওতালদের পরব ও ধর্মীয় উপাচারের নানান রীতি পাওয়া যায়- দুর্গা পুজোর দশমীর দিন তারা পালন করে 'দাঁশাই' উৎসব। সেদিন লাউ দিয়ে বানানো একরকমের বাদ্যযন্ত্র যাকে 'ভুয়াঙ' বলা হয়, তা বাজিয়ে সঙের সাজ সেজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে নানা খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়। এটা আদিবাসীদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। এরপর আদিবাসীদের পরব 'বাঁধনা পরব' পালন করা হয়। এই পরবে বুনো বাঁওলা সিদ্ধ খাবার নিয়ম, আলপনা দেবার নিয়মও আছে। গরু জাগরণে গ্রামের 'ঢ্যাঙুয়ানের দল' এসে গৃহস্থের বাড়িতে গান গেয়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও মদের বোতল তাদের প্রাপ্য হিসাবে নিয়ে যায়। এই পরবের পর ভাইফোঁটার দিন পালন করা হয় 'বুড়ি বাঁধনা'। এই পরবের নিয়ম-

> "বিলজঙ্গল ঢুড়ে লম্বা-লম্বা বেনাঘাস, কুশগাছ দা দিয়ে কেটে আনলাম, আমাদের ঘরের নাচদুয়ারে, 'পইড়ান' গাড়ব। 'পইড়ান' হল বেনাঘাসের বিনুনি, চুলের মতো পাকিয়ে অনেকটা মাটি খুঁড়ে সেই বিনুনির গোড়া পার্শ্ববর্তী কোনো শক্ত গাছের শিকড়ে অথবা অন্য কোনো ভারী জিনিসের সঙ্গে বেঁধে দিতে হয় মাটি চাপা। মাটির ওপরে বড়জোর একহাত কী দেড় হাত- বাকি সব মাটির ভিতর। বিকেলবেলা গরু খেলিয়ে ফেরার সময় ঢ্যাঙুয়ানের দল গায়ের জোরে 'পইড়ান' তুলবে

আস্ত, যদি না পারে তো দিতে হবে জরিমানা আর পারে যদি তো ঢ্যাঙুয়ানদের খাওয়াতে হবে রসবেশে -”

গল্পে এরকম আরও বহুবিচিত্র লোকসংস্কৃতির চিত্র প্রতীয়মান।

নলিনী বেরার ‘টি.আই. প্যারেড’ গল্পে আদিবাসীদের নানা উৎসবের কথা লিপিবদ্ধ। সাঁওতালদের বিভিন্ন উৎসব-পরব, তাদের ধর্মাচরণ, লোকসংস্কার, রীতি-নীতির কথা গল্পে চিত্রিত। ‘বাঁউড়ির রাত’, ‘মকর সংক্রান্তি’, ১লা মাঘ, সাঁওতালদের ‘ভেজাবিঁধা’ বা ‘আ-খাঁজ্-যুতরা’ পরব পালন করা হয়। ‘মাঘসিম’ বা মাঘপূজায় মুরগির বাচ্চা বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হয় আদিবাসীদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে। ‘জমসিম বোঙা’, ‘মারাংবুরু’, ‘রংগিরুজি বোঙা’, ‘বাঘুৎবোঙা’ ইত্যাদি যত বোঙা বা দেবতা আছে সবার উদ্দেশ্যে মুরগী উৎসর্গ করা হয়। পূজা শেষে খাওয়া দাওয়া। তারপর শুরু হয় ‘ভেজাবিঁধা’, গল্পে আদিবাসীদের এইসমস্ত উৎসবের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মীয় আচরণ আদিবাসীদের একান্তই নিজস্ব ও তাদের লোকসংস্কৃতি-লোকায়তজীবন ও লোকঐতিহ্যের অঙ্গ। তাদের লোকায়তজীবনের পরিচয় এই সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

নলিনী বেরার ‘নুয়াসাহীর বটতলা’ গল্পে ভূমিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় লোকসংস্কার, ধর্মীয় উপাচারের চিত্র জীবন্তভাবে চিত্রিত- জোরা শাল-মহুলের তলায় ‘গরাম-থান’। শাল-মহুল ফুলের মরশুমে চৈত্র সংক্রান্তির পরে ১লা বৈশাখে গরামথানে ‘গরাম-পূজা’ হয়- ‘খুকড়া-বলি পাঁঠা-বলি কাড়া-কাটার রক্ত মাখা মাটির হাতি-ঘোড়া ‘থান’-টিকে অষ্টপ্রহর ঘিরে রেখে পাহাড়া দেয়’।[৩৪] এই স্থানে পাশ দিয়ে যাওয়া প্রত্যেক আদিবাসী মানুষ দু-দুবার হাতজোড় করে গরাম ঠাকুর উদ্দেশ্যে ‘গড়-জোহাড়’ করে। গল্পে আদিবাসী মানুষদের ধর্মাচরণ, সংস্কারের পরিচয় লভ্য।

সৈকত রক্ষিতের ‘মাড়াইকল’ গল্পে দেখা যায় গ্রামবাসীদের কাছে হাতি কেবল একটা পশু নয়, হাতি তাদের কাছে ঠাকুর। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নিজের এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে অন্য আরও একটি সত্তার অস্তিত্বের কল্পনা করে, এর পরিণামেই শুরু পশু পূজার। অতীতকালের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আমরা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল বহন করে চলি, সংস্কৃতির দীর্ঘস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে বলে ‘পার্সিস্টেন্স’। এই গল্পে আদিবাসী, প্রান্তিক মানুষদের হাতির প্রতি লোকবিশ্বাসের অন্তরালে ভয় ও শ্রদ্ধা দুই-ই বর্তমান।

সৈকত রক্ষিতের 'পট' গল্পে আদিবাসীদের মৃত্যু পরবর্তী নানা সংস্কার-বিশ্বাস মূর্ত। সাঁওতাল জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষরা বিশ্বাস করে পরিবারের কেউ মারা গেলে দৈবনির্দেশে পাইট্‌কাররা মৃতের বাড়িতে আসে। তারা বিশ্বাস করে যে অশরীরীর সঙ্গে পাইট্‌কারের সরাসরি সাক্ষাৎ হয় এবং সে মৃত ব্যক্তির বার্তা পরিবারের কাছে পৌঁছায়। এছাড়া গল্পে পাইট্‌কারদের লোকসংস্কারের কথাও পাওয়া যায়- পাইট্‌কার পরিবারের কেউ মারা গেলে, সে যদি শিশু বা নাবালক না হয় তাহলে তাকে বাড়ির উঠোনে তুলসী থানের সামনেই পুঁতে ফেলা হয়। শশ্মানে নিয়ে গিয়ে দাহকার্যের কোনো নিয়ম নেই। গল্পে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কারের পাশাপাশি পেশা চিত্রিত।

সৈকত রক্ষিতের 'রাঙামাটি' গল্পে লোকালয় থেকে দূরে বসবাসকারী সাঁওতালদের নানা অন্ধবিশ্বাস, কু-সংস্কারের ছবি মূর্ত[৩৫]-

(১) 'ডানভূত ঠেকাতে কেউ-কেউ, গা-বাঁধা মন্ত্রের ফুঁক নিয়ে অঙ্গে ধারণ করে তাগা-তাবিজ'। (পৃঃ ১৬৬)

(২) 'শালপাড়ার বংশী ঠাকুর বাটি চালানোতে সিদ্ধহস্ত। সে ঘটনার আগাপাস্তলা আগে জেনে নেয়। কার প্রতি গ্রামের অধিকাংশ লোকের সন্দেহ, তাকে মনে রেখে সে বাটি নিয়ে বসে। বাটিতে রাখে সামান্য ইঁদুর মাটি, কিছু দুর্বাঘাস। একমুঠো ধানের ওপর সেই বাটি রেখে সে ভিড়ের মধ্যে তার নির্বাচিত লোককে সেটা ছুঁয়ে থাকতে বলে এবং নিজে জ্বলন্ত ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে মন্ত্র পড়তে থাকে আর থেকে-থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, চল, 'চল মা সিংহবাহিনী', তখন দেখা যায়- বাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। সরতে-সরতে শেষমেষ তা কোনো একজনের দিকে ধাবিত হয়'।

এক্ষেত্রে গ্রামের আদিবাসী মানুষরা ওঝার কারসাজির সূক্ষ্ম কৌশল বুঝতে না পারায় এবং বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ না জানায় তারা এই 'বাটি চালা' পদ্ধতিকেই চোর ধরবার বা কোনো কিছুর গণনার ক্ষেত্রে অব্যর্থ বলে মনে করে। আদিবাসীদের এই লোকবিশ্বাস বা জাদুবিশ্বাসের পিছনে মূল কারণ তাদের শিক্ষাহীনতা। গল্পে এই আদিবাসীদের অশিক্ষা, কু-সংস্কাররের আরও অনেক নজির রয়েছে, তাদের গবাদি পশুর রোগ হলে তারা চিকিৎসা কেন্দ্রে না নিয়ে গিয়ে গুণিন বা ওঝা দেখায়। ওঝা গরুকে দেখে বলে তার 'বেঙিরোগ হয়েছে। এই বেঙিরোগের দাওয়াই-

'দাওয়াই তৈরির মাল-মশলা জোগাড় করার জন্য নন্দলাল ছুটোছুটি করে। কখনো সে দক্ষিণে যায়, তো কখনো পশ্চিম। জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে নানা শিকড়-বাকড়। সীতা চুল, রাম চুল, লক্ষণ চুল এমনি সব নামের লতা-পাতা চাটান পাথর থেতো করে নেয়। মানবাজারের পাদু ঠাকুরের মুদিখানা থেকে আনে কাগজের পোঁটলা করা বেণ্ডি মশলা। বাটনার সঙ্গে মশলা দিয়ে সে এক জামবাটি মিশ্রণ বানায়। আর পুকুরঘাট থেকে নিয়ে আসে একটা কোলাব্যাঙ।

এখন, জ্যান্ত ব্যাঙসহ এই দাওয়াই গাইকে খাওয়ানোর জন্য সে তার বউকে ডাকে'।[৩৬]

এমন অদ্ভুত ওষুধ বা রোগের নাম ওঝারা খুব চালাকি ও সতর্কতার সাথে এই সহজ-সরল আদিবাসী মানুষগুলি কে বোঝায় ও বিশ্বাস করায়। গরুটি বিষক্রিয়ায় মারা গেলে তৎক্ষণাৎ ওঝা বলে 'ইয়াকে জড়ুর ডানয়ে খাঁইয়েছে। দাওয়াইয়ে কাম হবেক ক্যানে?'[৩৭] এভাবেই তারা এরপর সমাজের এক নারীকে ডাইনি অপবাদে অত্যাচারিত করে। আদিবাসীদের এইসমস্ত অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ, কু-সংস্কার, অবিশ্বাসের মূল কারণ শিক্ষাহীনতা, জ্ঞানের অভাব।

সৈকত রক্ষিতের 'উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা' গল্পে আদিবাসীদের লোকায়ত জীবন এবং আদিবাসীদের এক বিশিষ্ট পেশা ঝাঙ্গেড়াদের বিচিত্রতা রূপায়িত। গল্পে আদিবাসীদের পরব- বাঁধনা পরব এবং এই পরবের নানান আচার-রীতি, লোককথা গল্পে চিত্রিত। এই পরবে বাড়ির মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপেরবাড়ি আসে, আত্মীয়স্বজনে বাড়ি মুখরিত থাকে। বাঁধনার পরদিন ঝাঙ্গেড়াদের গ্রামের গৃহস্থের বাড়ি-বাড়ি গোবন্দনা ও ভিক্ষামাঙনের সংস্কৃতি গল্পে পরিস্ফুট।

সৈকত রক্ষিতের 'উৎখাতের পটভূমি' গল্পে আদিবাসী নারী সিমতি বেসরাকে ডাইনি অপবাদে গ্রামত্যাগ করতে হয়। এই গল্পেও আদিবাসীদের 'ডাইনী' প্রথার অন্ধকারময় দিক, আদিবাসীদের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ, তাদের লোকবিশ্বাস, কু-সংস্কার ফুটে উঠেছে। গল্পে সিমতিকে ডাইনি অপবাদে এবং গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে, ছ'হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। প্রথার নামে আদিবাসীদের মধ্যে নারীদের প্রতি অত্যাচারের চিত্র লিপিবদ্ধ গল্পে। একইরকম উদাহরণ 'ছল' গল্পেও পাওয়া যায়। কালিন্দীকে ডাইনি প্রথার শিকার হতে হয় এবং গল্পেও আদিবাসীদের মধ্যে মনের কু-সংস্কার, যুক্তিহীন বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়-

“কিন্তুক ডাইন্? কুথায় গেল ডাইনটা?” এর উত্তরে গ্রামবাসীরা বলে- “ডাইন কি আর থাকে? রামলালকে খাঁইয়ে উ কুথায় ছন্ন হয়ে গেছে!”[৩৮]

প্রান্তিক ও আদিবাসী মানুষরা বিশ্বাস করে সবকিছুর অন্তরালেই লুকিয়ে থাকে এক অলক্ষ্য শক্তি বা ‘মান্যা’। এই ‘মান্যা’ বা অলক্ষ্য সত্তা অনির্দেশ্য এবং নিরাকার- সে ভাল বা মন্দ সবকিছুই সংঘটনের ক্ষমতা রাখে। ‘মান্যা’ কেন্দ্রিক ধারণাপোষণে মানুষের মধ্যে মূলত তিনটি প্রত্যয় ক্রিয়াশীল- ১. জড়বস্তু এবং নিসর্গবস্তুর অন্তরালে অবস্থিত অলক্ষ্য শক্তি, ২. মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের জীবিত অথবা মৃত অবস্থার অন্তরালে এক/ একাধিক সত্তা কিংবা আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা, বিশ্বাস, ৩. অনির্দেশ্য–কিছুর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস।[৩৯] এই ত্রিবিধ প্রত্যয়ের সমন্বয়ের মূলকথা ‘সর্বপ্রাণবাদ’। বেশিরভাগ জনজাতি, প্রান্তিক জীবনাশ্রয়ী গল্পেই প্রান্তিক, জনজাতি মানুষদের মধ্যে এই ‘ডাইনি’ প্রত্যয় লক্ষণীয়। এই ডাইনি বিশ্বাসের অন্তরালে অনির্দেশ্য কিছু অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস ক্রিয়াশীল। আর এই বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষের জাদুবিশ্বাস। এই মান্যার ধারণার মধ্যেই নিহিত জাদু এবং ধর্মসংস্কারের রূপ। জাদুবিশ্বাসের অশুভকারী রূপ হল- ডাইনি সংস্কার-বিশ্বাস।

লেখকের ‘বশীকরণ’ গল্পেও দেখা যায় প্রান্তিক মানুষ হংসর তিনবছর বয়সের মেয়ে যক্ষ্মায় মারা গেলে, গ্রামের মানুষ এবং হংসর বিশ্বাস- মেয়েটি দেখতে সুন্দর, আকর্ষণীয় বলে তাকে কোন ডাইনি খেয়েছে। এক্ষেত্রে তারা ডাক্তারের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। প্রান্তিকজীবন এরকম নানান যুক্তিহীন অন্ধ লোকবিশ্বাস এবং ডাইনি সংস্কারে আবদ্ধ।

সৈকত রক্ষিতের ‘যশোমণি মুর্মু’ গল্পে দেখা যায়, গুণিনের উপর অন্ধবিশ্বাসের কারণে যশোমণির জীবন বিপর্যস্ত। গুণিন তাকে বলে- ‘নাহ্, তুঁই আর ঢেরদিন নাই বাঁচবিস গো বুড়ি। এই আসছে সহরায় পরব বাদেই মরবিস তুঁই? এই আসছে সহরায় পরব বাদেই মরবিস তুঁই?’[৪০] একুশে কার্তিক, সহরায় পরবের বারোদিন পর যশোমণির মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করে। গুণিনের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকায় এই ভবিষ্যৎবাণীর উপর বিশ্বাস করে যশোমনি মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের সামাজিক জীবন বিপন্ন করে।

অনিল ঘড়াই ‘উরাংগাঢ়া’ গল্পে আদিবাসীদের করম পূজা ও সেই পূজার রীতি সম্পর্কীয় বিবরণ ভাকুয়ার মুখে পাওয়া যায়। কারণ গাছের ডাল কেটে নিয়ে এসে বাড়ির উঠোনে পুজো করে, ভাদ্রমাসে

ধানক্ষেতে সেই ডাল পুঁতে দিয়ে আসত। এই পুজো সম্বন্ধীয় লোকাচার নিয়ে আদিবাসী মানুষদের মধ্যে নানা লোকবিশ্বাসের প্রচলন আছে- করমা পুজোর সেই করণ ডাল পোঁতার দৌলতে ধান গাছে থোড় আসে। এছাড়া লোহার, ছুতার, লাকড়া, সামাট, দোংগোহোর পূজা যদি ঠিক না হয় তাহলে ক্ষেতিবাড়ি শুকিয়ে, ধান না হয়ে আকাল নামবে, মানুষজন দুধি লতার মতো শুকিয়ে যাবে। আদিবাসীদের মধ্যে এরকম নানান যুক্তি-বুদ্ধি বর্জিত লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'টিকলি' গল্পে আদিবাসীদের লোকবিশ্বাসের, কুসংস্কারের এক জঘন্য অংশ ডাইনি প্রথার বীভৎসা, নিষ্ঠুরতা, রাজনীতি পরিস্ফুট। ঝগড়ুর স্ত্রী চাঁদমণি আদিবাসী দেবতা রোহিনী পুজো করে, বদা বলি চড়িয়ে তার মাংস গ্রামের সকলকে দিয়ে তারপর চাষবাস করত। এই চাষবাসের কারণে এবং গাঁয়ের মুখিয়ার নজর চাঁদমণির উপর থাকায় এবং চাঁদমণি অন্যায় আবদার নস্যাৎ করার ক্ষোভে গ্রামের মুখিয়া তাকে ডাইনি অপবাদ দেয়, গ্রামছাড়া করতে চায় এবং শেষমেষ তাকে রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে মারে। গল্পে একদিকে আদিবাসীদের ধর্মাচরণ চিত্রিত অন্যদিকে আদিবাসীদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের সুযোগে সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ তাদের স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য নানা ষড়যন্ত্র রচনা করে।

অলিন ঘড়াইয়ের 'অরণ্যের জীবন' গল্পে জনজাতিদের মধ্যে নানান যে লোকবিশ্বাস, সংস্কার আছে, সেই সংস্কারের জাল ছিন্ন করে তা থেকে আস্তে-আস্তে তাদের বেরিয়ে আসার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুরুবারির বিয়ের ছয়বছর অবধি বাচ্চা না এলে বস্তির গুণিন বুড়ো তাকে মুরগি বলি দিয়ে পূজাপাঠ করতে বলে। কিন্তু এইক্ষেত্রে দেখা যায় গুরুবারী ও সোমরা গুণিনের থেকে ডাক্তারকে ভরসা করেছে। তারা ডাক্তারের ওষুধ খেয়েছে, কোলজুড়ে তাদের সন্তান হয়েছে। আদিবাসীদের উত্তরণের আলো প্রতিফলিত এই গল্পে ।

অনিল ঘড়াইয়ের 'বীজ' গল্পে আদিবাসীদের মধ্যে বিডিও থেকে পাওয়া বীজধান নিয়ে নানা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস দেখা যায়। তারা মনে করে- সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত বীজধান হল পরদেশী, সেই পরদেশী ধান ছড়ালে মাতৃতুল্য জমি অর্থাৎ তাদের মা রুষ্ট হবে। মা রুষ্ট হলে ভালো ফসলই হবে না, তারা না খেয়ে মরবে। গ্রামের এই আদিবাসী মানুষগুলি মনে করে শহুরে বাবুরা জাদু জানে। এই যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের মাধ্যমে যে তারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করছে সেই বিষয়টা তারা অনুধাবন

করতে পারে না। এই আদিবাসী মানুষগুলির জীবন অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজালে আবদ্ধ। গমিয়া, সামারু বুড়োর ন্যায় একজন একজন করেই এই প্রান্তিক জনজাতি মানুষগুলি একদিন অন্ধবিশ্বাসের জাল ছিন্ন করে, ভ্রান্তধারণার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার ইতিবাচক ইঙ্গিত বর্তমান।

৭.খ| বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: লোকগান, লোককথা, লোকসংগীত, প্রবাদ-ধাঁধা-ছড়া-মন্ত্র, লোকশ্রুতি:

জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি বিশ্লেষণে যে লোকায়তজীবন ও লোকঐতিহ্যের ছবি ফুটে ওঠে, তারই একটা বড় অংশ এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি অর্থাৎ আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব পরম্পরার ছড়া, গান, প্রবাদ, ধাঁধা, নানা লোককথা, লোকশ্রুতি। মানুষ যখনই কোনোকিছুর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করতে অপারগ বোধ করত, তখনই তার পিছনে অলৌকিক শক্তির প্রভাব আছে এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে নতুন-নতুন কাহিনি গড়ে তুলত। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকেই 'মিথ' বলা হয়। এই মিথ বা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে, নিত্যনতুন কাহিনির সাহায্যে আদিম মানবরা জগতের নানান অবোধ্য বিষয়ের রহস্য সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন। লৌকিক কাহিনির প্রাচীনতম প্রকরণ মিথ। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই মিথ বা লোককথাকে যতই অযৌক্তিক বলে মনে হোক না কেন, এই মিথের মধ্যেই নিহিত থাকে অতীতের সংস্কৃতি ভাবনার উপাদান।

আদিবাসীরা পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ায়, বর্ণ পরিচয় না থাকায় তাদের মধ্যে লেখালিখির চল প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাদের সকল স্মৃতি, অনুভব ধরা থাকে গানে- কথায়। যখন যা ঘটে, যা মনে হয় তাই প্রকাশিত হয় গানের মাধ্যমে। আদিবাসীদের জীবনে গান ভীষণই গুরত্বপূর্ণ অংশ। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সুখ-দুঃখ-প্রেম, সবকিছুই তারা ধরে রাখে গানে। নিম্নে আদিবাসী গল্পাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদিবাসী বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির রূপরেখা নির্মাণ করা হল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' গল্পে রুদ্ধশ্বাস সাংসারিক পরিবেশের কোলাহল থেকে কবির মন কাব্যের উৎসসন্ধানে, আত্মপ্রকাশের অস্থিরতায় বেছে নিয়েছে নিবিড় প্রকৃতির ছায়াময় শান্ত পরিবেশ। একান্ত নিভৃতে কৃত্তিমতাহীন অরণ্যের পরিবেশে অবগাহন করে কবি সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন। কবির ঘরে একটা লেখা টাঙানো ছিল, যা জনজাতি গোষ্ঠীর বাক্‌সংস্কৃতির অঙ্গ- 'সংসারের কোলাহল নাহি পশে

কানে/ তাই ভালো লাগে মোর থাকিতে এখানে'।[৪১] এছাড়া কবির নিজের লেখা কবিতা পাওয়া যায়- 'মত্ত ধরা রেরেং পোকার গানে'[৪২] এগুলি বাক্‌সংস্কৃতির পাশাপাশি লোকসাহিত্য রূপেও বিবেচিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী' গল্পের নায়ক খোঁড়া শেখ তার সাপিনী বিবিকে নাকে সোনার মিনি ও সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে আনন্দিত হয়ে গান গায়-

'জানি নাগো এমন যে হবে/ গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরাতে যাবে/ ও জানি না গো-'

গল্পে গানে নিহিত এক ব্যঞ্জনার আবহ, তা যেন গল্পের পরিণতির পূর্বাভাস। লেখকের 'ঘাসের ফুল' গল্পে আদিবাসী শ্রমিকদের দিনরাত অরিবাম খাটুনির শ্রম লাঘবের জন্য তাদের নিজস্ব গান গাওয়া, বাঁশি বাজানোর কথা পাওয়া যায়। 'বেদেনী' গল্পেও রাধিকা বেদেনীর সাপখেলা দেখিয়ে, গান গেয়ে উপার্জনের চিত্র পাওয়া যায়- 'রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশি বাজাইত।'[৪৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরী' গল্পে বাজিকর নারীদের গলায় বেশ কয়েকটি লোকগান পাওয়া যায়-

(১) 'হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ি ঝম্‌ঝমানি/ উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা-/ জার ঘিনিনা-/ চুড়ির ওপর রোদের ছটা/ হায় মরি কি রঙের ঘটা/ সোনারূপো বাতিল হল কাঁদছে বসে স্যাকরাণী।/ বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই/ হল চুড়ির আমদানী/ উ-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা- / জার ঘিনিনা'-[৪৪]

(২) 'পাড়ায় যত এয়োন্তীরি- শাঁখা ফেলে পরছে চুড়ি-/ লালপরী সবুজপরী-মাঝখানে হলুদ পারা- / ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা তোরা-/ এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যজ্য করব/ এ ঘর বাড়ি/ নয়কো দোব গলায় দড়ি/ তবু চুড়ি পড়ব গো/ হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙে ফেলব চোখের/ নোনাপানি। / উ-র-র- জাগ জাগ'[৪৫]

(৩) 'উর-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা জারঘিনি না- / সরু কাপড় নক্সিপেড়ে-মাকড়ী চুড়ি গহনা-/ গোটা পাটা সাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয়না'[৪৬]-

(৪) 'হায়রে মরি গলায় দড়ি/ তুমি হরি লাজ দিবা/ হায়রে মরি গলায় দড়ি/ তুমি হরি লাজ দিবা / তুমার লাজেই আমি মরি/ নইলে আমার লাজ কিবা/ কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম/ কলঙ্কেরই কাজল নিলাম- / হায়রে মরি বস্ত্র নিয়া/ তুমি আমায় লাজ দিবা! / উর-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা'-[৪৭]

গল্পে এই লোকগানগুলি ছাড়াও বাজিকর জনজাতির মানুষ ভাটরাজা নামক রাজাকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। গল্পে তাকে নিয়ে লোককথা বা কাহিনি লিপিবদ্ধ -

'রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট- গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। নটী ও রূপোজীবিনীদের সন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে দেশান্তরে সংবাদ গ্রহণ করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে'-[৪৮]

'যাদুকরী' গল্পটিতে বাজিকর জাতির এরূপ নানান বাক্‌সংস্কৃতির পরিচয় লভ্য। এই গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে জনজাতি গোষ্ঠীগুলির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অংশে দেখেছি ডালটন সাহেব বেদিয়াদেরই একটি শাখারূপে বাজিকরদের চিহ্নিত করেছেন এবং এর পাশাপাশি বেদিয়া জনজাতিদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অংশে জানা যায় বেদিয়ারা জাদুমন্ত্র, তুকতাকে পারদর্শী। গল্পেও তার পরিচয় পাওয়া যায়, বাজিকর জনজাতির নারীরা তারা নানা বশীকরণ মন্ত্রের কথাও বলে, এছাড়াও তাদের মুখে এক অদ্ভুত মিষ্টি টানের ভাষা আছে যা দ্বারা তাদের স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিলাসন' গল্পটিতেও আদিবাসীদের লোকগান পাওয়া যায়- 'এস মেঘ বস মেঘ আমার ভুঁয়ের শিয়রে/ গলে নাম ভিজায় হে/ টিলা খানা টিকরে/ তোমার বরণ আমার কেশে- / যতন করে মাখি হে'।[৪৯] এর পাশাপাশি নানান লোককথারও পরিচয় পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কমল মাঝির গল্প' গল্পে সাঁওতালদের চিরকালের গানের প্রথা উল্লিখিত- 'হায়রে হায়রে কুঁইডি মিরু তিঞ দ'।[৫০] এছাড়াও সৃষ্টিতত্ত্বের কথায় লোকগানও পাওয়া যায়- 'হায় হায় জলাপুরির/ হায় হায় নুকিন মেনেয়া/ হায় হায় বুসি আকান্‌ কিন্/ হায় হায় নুকিন মেনেয়া'।[৫১]

গল্পে কালকেপুর ডাঙ্গার সাঁওতালদের সমাজপতি কমল মাঝির মুখে সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্বর কথা, লোককথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গল্পে কমলমাঝি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক লোককথা বলেন। লোকসংস্কৃতিবিদরা চোদ্দটি প্রকরণের মিথের কথা বলেন- '১. সৃষ্টিরহস্য ২. মহাপ্লাবন ৩. আত্মা ৪. দেবতার জন্ম ৫. মানুষের উদ্ভব ৬. দেব-দানবের দ্বন্দ্ব ৭. চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ৮. দিন-রাত্রি ৯. বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ১০. স্বর্গ-নরক-পাপ-পুণ্য ১১. জন্ম-মৃত্যু ১২. আচার- সংস্কার-রীতি-নীতি ১৩. অগ্নি ১৪. বিভিন্ন শিল্পবস্তুর উৎপত্তি'।[৫২] 'কমল মাঝির গল্প' গল্পে কমল মাঝির মুখে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক লোককথা পাওয়া যায়, তা লোকসংস্কৃতিবিদগণ চিহ্নিত যে 'সৃষ্টিরহস্য' মিথ বা লোককাহিনির প্রকরণের কথা বলেছেন তার অন্তর্ভুক্ত। এই কাহিনির মধ্যে মানব সমাজের বিবর্তনশীল প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাপুড়ের গল্প' গল্পে একটি লোকগানের উল্লেখ পাওয়া যায়-

> 'আয় চাঁদ আয় চাঁদ আর চাঁদ- / আরে-রে! আয় আয় আ-রে! / চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যারে!'[৫৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের গল্প' গল্পে সাঁওতালী আদিবাসী মেয়ের গলায় লোকগানের উল্লেখ আছে-

> 'উপর কুলি-নামো কুলি মিলিন গা-/ সিখানে সি জোড়া কদমগাছ। / কদমতলা যেয়ো না রে যেয়ো না- / তুমারো বিয়া হবে না! / তুমারো বিয়া চুড়া হব না রে হবে না-/ কদম্ব গাছে ফুল ফুটিছে! / কদম ফুলে হলুদ রঙে সাদা দাগ- / গায়ে লেগে বিয়া হবে!'[৫৪]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অক্ষয়বটোপাখ্যানম্' গল্পে একটি লোকগানের উল্লেখ পাওয়া যায়-

> 'জলে ভেসে যায় রে - সো-নার কমলা-।" / আর দলসুদ্ধ সুরে ধুয়ো গেয়ে উঠত- "অ- গ-অ।" / "কলার মান্দাসখানি নঈ সে উচ্ছলা/ মান্দাস উলটি দিতে হাসে খলখলা-"/-অ-গ- অ। জলে ভেসে যায় রে- এঃ'।[৫৫]

এছাড়াও গল্পে একটি মন্ত্রের উল্লেখও পাওয়া যায়- 'ববম্ ববম্ ভোলা- জয় কালী জয় কালী-/ ধিতাং ধিতাং নাচি-হাতে দিয়ে তালি!'[৫৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে বেদিয়াদের লোকগানের উল্লেখ পাওয়া যায়-

'যেমন গিন্নী চাঁদবুদনী তেমনি শাড়ি লিব গো!- / ও কালিদহে ঝম্প দিল কে? / সাজ সাজ নাগিনী লো, খোল বিষের ঘরের চাবি- / মাথায় মানিক পরি কেশ বান্ধিলে/ ও নাগিনী, কালিদহে ঝম্প দিল কে?'[৫৭]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদের মেয়ে' গল্পে বেদে জাতির মেয়ে শিবির গলায় স্বজাতির একটি লোকগান পাওয়া যায়[৫৮]-

(১) 'বাবু তোমায় দেখাই দেখো; / কাঁউরের ভেলকিবাজী, / বেদের মেয়ের ভেলকি খেলা/ তোমারে দেখাই দেখো; / তুমি শুধু চেয়ে থাকো/ বেদের মেয়ের মুখের দিকে- / চোখে চোখ মিলিয়ে রেখে/ তুমি শুধু চেয়ে থাকো/ দেখাই দেখো! / নিজে তুমি সামলে থেকো/ তোমায় হারিয়ে দোব উড়িয়ে দোব/ আকাশে উড়িয়ে দোব/ নিজেকে সামলে রেখো/ চেয়ে থাকো!'

(২) 'এবারে কাজল পরো/ আমার চোখের কাজল নিয়ে/ তোমার চোখে কাজল দিয়ে/ তাকিয়ে দেখ দেখি, ফুটল নাকি- / দেখে তো ফুটল নাইকি/ আকাশের তারাগুলান/ ফুল হয়ে ফুটল নাকি/ দেখ দেখি!'

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লা-কুঠি' গল্পে মাইনুকে নিয়ে নান্‌কু পালিয়ে গেলে, সেই বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণা বিলাসীর কণ্ঠে ঝরে পরে গান হয়ে[৫৯]-

১) 'কোন্ সাঁঝে তুই গেছিস্ চলে আমার পিয়ারী, / আমি যে তার কিছুই জানি না লো/ কিছুই জানি না।/ বল দেখি ভাই, আসবে কি সে ছাতা পরবে'?

(২) 'আয় রে আমার, আয় রে আমার/ খোকন ঘুম যায় রে, / আয় রে আমার, আয় রে আমার'।

(৩) 'নদীতে পড়েছে বান্ পার কর ভগবান/ বল দাদা কতদূরে জামতারা'-

(৪) 'তুমি এসেছো কি এসো না, এখনো ন-জরে দেখি নাই গো'

মুখে ব্যক্ত না করলেও প্রত্যেকটি গানে বিলাসীর নান্‌কুর প্রতি অগাধ ভালোবাসা-অপেক্ষা মূর্ত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পৌষ-পার্বণ' গল্পে বাঁদনা পরব উপলক্ষ্যে আদিবাসীদের মাদল বাজিয়ে গান গাওয়ার চিত্র চিত্রায়িত-

‘বোম্ ভোলা ভোলানাথ, / সব কাজেই করে বসে ভুল রে/ সব কাজেই করে বসে ভুল! / ... বেশা ঘেঁইয়ে আঁখি ঢুলু ঢুল!’[৬০]

গানের মধ্যে আদিবাসী উৎসব উপলক্ষে গাওয়া গানে হিন্দু দেবতা ‘ভোলানাথ’ অর্থাৎ শিবের উল্লেখ থেকে হিন্দু ও আদিবাসী সংস্কৃতির সংমিশ্রণের সমন্বয় প্রতীয়মান। গল্পে বাউরি ও আদিবাসীদের পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে দুই সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত এই মিলন-মিশ্রণের সমন্বয় অর্থাৎ ‘অ্যাকালচারেশন’ সংঘটিত। তারই দৃষ্টান্ত প্রতিবিম্বিত উক্ত লোকগানে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘নারীর মন’ গল্পে আদিবাসী নারীদের কাজ যাওয়ার পথে সমবেত কণ্ঠে গান পাওয়া যায় – ‘কেসো ফুলে বন করেছে আলা লো, /কেসো ফুলে বন করেছে আলা! / ও ছুঁড়িরা! ঝড়িয়ে দে গা সকল যাবে জ্বালা লো, / সকল যাবে জ্বালা!’[৬১]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘মা’ গল্পে আদিবাসীদের লোকগানের উল্লেখ আছে- ‘সে এলে মারবো কুঁকুড়ি গো- / মারবে কুঁকুড়ি-! / তাকে আমি খেতে দিব, পায়রা ঘুঘুড়ি গো-/ পায়রা ঘুঘুড়ি-! / পিয়ারী-আসবি কবে? / ও পিয়ারী আসবি কবে-? / আ-মার পি-য়া-রী!’[৬২] গানের মধ্যে অপেক্ষার আর্তি ব্যাক্ত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘ঝুমরু’ গল্পে বনযাত্রী সাঁওতাল নারী-পুরুষ উভয়ে সমবেত কণ্ঠে বনপথে যাওয়ার সময় বর্ষার গান গায়–

‘মাদল বাজা লো, বাদল নামে/ দ্যাখ বাদল নামে! / তুর চোখের জলে/ কেনে কাজল ঘামে’।[৬৩]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘রেজিং রিপোর্ট’ গল্পেও কুলিধাওড়ার আদিবাসীদের মাদল বাজিয়ে নেচে-নেচে গান গাওয়ার কথা পাওয়া যায়-

‘পরে আছেন বাঘের চাম, / মুখে বলেন হরির নাম, / বাজে শিঙ্গা ডিমিকি ডিমিকি রে-/ বাজে শিঙ্গা ডিমিকি ডিমিকি রে!’[৬৪]

এই গানটার অন্তর্নিহিত অর্থে শোষকশ্রেণির ছদ্মবেশী রূপ, বাস্তবতা, নিষ্ঠুরতা ফুটে ওঠে। এই গান যেন চঞ্চলকুমারকেই বিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গাওয়া। কুইলার মৃত্যুর প্রতিবাদের সুর এই গানের মধ্যে প্রতিধ্বনিত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘রহস্যময়ী’ গল্পে মইনুর গলায় সাঁওতালি সুরে সাঁওতালি গান উল্লিখিত- ‘নদীতে পড়েছে বান, পার করো ভগবান। / ওপারে আমার ইয়ে / ডাকে হাতছানি দিয়ে/ (বলে) এসো তুমি এসো আমার কাছে। / কতদিনের কত আশা / ভালো লা গা ভালোবাসা/ (শুধু) মুখের কথা নয় রে বঁধু / আমার বুকে ভরা আছে’।[৬৫]

গানের মধ্যে দিয়ে ভগবানের কাছে ব্যাথামাখা, আকুল আর্তি ঝরে পড়েছে। মইনুর মুখে না বলা বেদনা, সাহেবের প্রতি ভালোবাসা, অপেক্ষা, অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা মইনুর গানে ব্যক্ত।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘রথের তলে’ গল্পে নাটজাতির মেয়েদের নাচের পাশাপাশি গানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, যা তাদের জাতির বাক্‌সংস্কৃতির অঙ্গ-

> ‘রামগড়ের জোড়া কেল্লা ভেঙে গড়েছে, / বললেন, ভেঙে গড়েছে, / গুরুজী বললেন, ভেঙে গড়েছে, / বললেন, গুরুজী, আরও মজা আরও মজা’।[৬৬]

সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পে টুডুর গলায় আদিবাসীদের লোকগান পাওয়া যায়–

> ‘রাতা মাতা বির্‌কো তালা / রে নালো হোম নির্‌জা / রাগাইংগা ...’[৬৭]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বীতংস’ গল্পে আদিবাসীদের বিচিত্র গুঞ্জনের, বিচিত্র ধ্বনির, বিচিত্র ভাষার মাদল বাজিয়ে গান গাওয়ার কথা পাওয়া যায়।

রমাপদ চৌধুরীর ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ গল্পে ‘ভিখারিয়ার নাচ’ উৎসব উপলক্ষে গ্রামের নাটুয়ারা গায়েনরা গান বাঁধে-

> ‘ বাঁশরিয়ার রূপমতী, মোতির মত রূপ। ঝিনুকের ভেতর যেমন আড়াল থাকে মোতিয়া, তেমনি চুপছাপ মন রূপমতীর। গরিবে কুড়িয়ে পায়, তারপর হাতে-হাতে ঘুরে রাজার আঙুলে গিয়ে শোভা পায় সে মোতিয়া। মন-চুপছাপ রূপমতী হাতে হাতেই ঘুরছে এখন, কিন্তু মন জানে ওর রাজার হদিস।’[৬৮]

এইসমস্ত লোকগানের মধ্যে আদিবাসীদের বাক্‌সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে, পাশাপাশি এই গানের মধ্যে প্রতিফলিত হয় জনগোষ্ঠীর মানসিকতা।

রমাপদ চৌধুরীর 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে তুড়ুক জাতির লোকেদের মুখের ভাষা সাঁওতালি ও ঊর্দু মেশানো। এই ভাষার সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে 'ডিফিউসান' ও 'অ্যাকালচারেশন' এর দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

রমাপদ চৌধুরীর 'মানুষ অমানুষের গল্প' গল্পে বাঁদর শিকারী দলের মেয়েদের গলায় তাদের একটি লোকগান পাওয়া যায়-

> 'বাণ মার্ বাণ রাম বান্দর- মার আইল গো- / ঘর-ঘরানী কল্যা কাঁঠার জিয়াইল গো- / নাউ কুমড়া জিয়াইল গো- / মাঠের বাগুন শাকপাতা গুড়কুমড়া জিয়াইল গো- / মিঠাকুমড়া জিয়াইল গো- / বাণ মার্ বাণ রাম বান্দর-মার আইল গো'-[৬৯]

গানের মধ্যে দিয়ে বাঁদর মারার দল তাদের গ্রামে আগমনবার্তা দিয়েছে। আদিবাসীদের জীবনচর্যার প্রাত্যহিক রূপ বর্তমান এই লোকগানে।

সমরেশ বসুর 'গুণিন' গল্পে নকুড় গুণিনের মুখে গ্রামবাসীকে শেখানোর এবং পয়সা উপার্জনের উদ্দেশে বশীকরণ মন্ত্র পাওয়া যায়-

> 'শিবঠাকুরে পাথর ঘষে, / গৌরী ছোটে কৈলাসে। বাঁশি বাজায় কেষ্ট বসে, / আয়ানের বউ ছুটে আসে। / আমি ভূতের মাথার ঘিলু নিয়ে, / ছিটা দিলাম অমুকের গায়ে'।[৭০]

গল্পে ব্রাত্যসমাজের নানারকমের মন্ত্র, বাক্সংস্কৃতি, তাদের লোকবিশ্বাসের পরিচয় লভ্য।

সমরেশ বসুর 'অরণ্যনিশি' গল্পে দেখা যায় মুন্ডা যুবক যুবতীরা তাদের মনের ভাব গান গেয়ে প্রকাশ করে, গানের মাধ্যমে বাঙালি বাবুকে তাদের বক্তব্য তুলে ধরে-

> 'বলছে তুই দীখু, তোর চোখ নাকি আঁতুড়ের ছেলের মতো। জিজ্ঞেস করছে, 'তোর কি তেষ্টা পেয়েছে? তুই কি তোয়া (দুধ এবং স্তন দুই-ই বোঝায়) খাবি? কিন্তু তাই যদি তোর অবস্থা, তবে সিগারেট ধরিয়ে, অমন নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিস কেমন করে। আর তাই যদি দুই ছাড়াছিস, তবে আমাদের নাকে কেন গন্ধ আসে। আমাদের কি নাক নেই, আমরাও কি ধোঁয়া ছাড়তে পারি না?'[৭১]

বাঙালি বাবুদের গাইড সোমরা, সে নিজে মুন্ডা গোষ্ঠীর হলেও সে বাংলা জানে এবং সেই মুন্ডা যুবক-যুবতীর গানের অর্থ বলে। আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে গান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের জীবনের সব কথা গানের মাধ্যমেই ব্যক্ত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পে দেখা যায় দুই কৃষ্ণাঙ্গ নরনারী দুর্বোধ্য ভাষায় নিহতদের ঘিরে উল্লাস সংগীত গায়-

> (১) 'সামারে হিজুলেনাকো মার্ গোয়েকোপে' এবং (২) 'হেন্দে রামব্রা কেচে কেচে / পুনডি রামব্রা কেচে কেচে'।[৭২]

গল্পটি মূলত নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকেন্দ্রিক। এই গানের ভাষা, আক্ষরিক অর্থ বোঝা না গেলেও এতটুকু স্পষ্ট শাসকদের অত্যাচারের প্রাপ্য শাস্তি তারা পাওয়ায়, এই রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের গানের মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করেছে। এই গান সাঁওতালীদের কাছেও দুর্বোধ্য, কারণ নকশাল আন্দোলনের গরিলা যোদ্ধাদের নিজেদের সাংকেতিক ভাষা থাকে, এ হয়ত তারই উদাহরণ। এরকমই এক সাংকেতিক ভাষা পাওয়া যায় যখন দুলন্ মাঝি হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় সে বলে- 'মা - হো'। এটা একান্তই তাদের সাংকেতিক ভাষা, যার অর্থ অভিধান বিশেষজ্ঞরাও বলতে পারে না। গল্পে এই নকশাল আন্দোলনের আবহ সৃষ্টিতে লেখিকা নকশালকর্মীদের দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' গল্পে হোলি ও হোলির পরদিন বারো বছর অন্তর মেয়েদের শিকার খেলাকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের যে উৎসব হয়, তাতে আদিবাসীদের নাচ-গানের কথা লিপিবদ্ধ-

> (১) 'হোলিতে আগুন রে হোলিতে আগুন/ তুমি দেখে দেখে ঘরে এসো ভুলে থেকো' না'[৭৩]-
>
> (২) 'হে হরম্‌দেও, / এমন হোলি বছর বছর হোক- / এমনি শিকার বছর বছর করি- / মদ দিব তোমাকে / মদ দিব'-[৭৪]

গল্পে গানের মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের দেবতা 'হরম্ দেও'-কে মদ উৎসর্গ করার উপাচার-রীতি পরিলক্ষিত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' গল্পে হোলির দিন মৌয়ামাতাল, ধাতুয়া, টুইলা বাজিয়ে লোকগানের উল্লেখ পাওয়া যায়[৭৫]–

'কোথা গেল করণ? / বুলাকি কোথায়? / কেউ তাদের খোঁজ দেয় না কেন? / তার ভাই মোহর? / মহুবন আর পারশ কোথায়? / কেউ তাদের খোঁজ দেয় না কেন? / তারা পুলিশের খাতায় হারিয়ে গেছে। / ... ওরা সবাই পুলিশের খাতায় হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে'। গল্পে আরও একটি ঘুমপাড়ানি লোকগান পাওয়া যায়- 'কে কেড়ে নিয়েছে দুলনের ঘুম? / ঘুম পুলিশের খাতায় হারিয়ে গেছে।'

গল্পে উল্লিখিত লোকগান কেবল লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির কারণে ব্যবহৃত হয়নি, গানের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের হাহাকার, মর্মান্তিক বেদনা, কাছের মানুষদের হারিয়ে যাওয়ার মর্মস্পর্শী যন্ত্রণা ব্যক্ত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'সমাজবাদ ববুয়া' গল্পে সমাজবাদী চেতনার গান অন্বিত হয়েছে জংলী বেরসার কণ্ঠ। তার গানের মধ্যে জীবনের সাফল্য, ব্যর্থতা, প্রতিবাদের স্বর মূর্ত। বেরসার হবু বউ তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলে সে গায়- 'রেলগাড়ি ঝমাঝম। রেলগাড়ি ঝমাঝম। সমাজবাদ ববুয়া। ধীরে ধীরে আই। মেঘরাইসে আই। কোসোম সে আই। কয়লা খাদানের খবর - সে আই, সমাজবাদ'।[৭৬] এছাড়াও কয়লা খাদানে আহত হলে তখন সে গায়[৭৭]-

(১) 'সমাজববুয়া। ... লাঠিসে আই ... মামাসে আই ... / জেলে জেলে ঘুরি খানি ঘুরাই, সমাজবাদ হে'।

(২) 'ও সমাজবাদ ... বারণ সে আই। শাসন সে আই। মস্তানদের লাঠি আর লাল চোখে আই। সমাজবাদ হে'।

এছাড়া বেরসার কণ্ঠে মালিক ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর গানের কথায় ব্যক্ত- 'সমাজবাদ ববুয়া, ধীরে ধী রে আই/ জড়াসে আই/ পানিএ আই/ চাষীকো কাঁদাইসে ঝামেলা পাকাই/ সমাজবাদ ববুয়া'।[৭৮] এই গানের মধ্যে দিয়ে বেরসার উত্তরণ ঘটেছে। বেরসার কণ্ঠের গান একদিকে তার জনজাতির বাক্‌সংস্কৃতির অঙ্গরূপে শোভিত, অন্যদিকে এই গান তার চারিত্রিক গঠন নির্মাণের আধার ।

দেবেশ রায়ের 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পে ভাদুই এর গলায় বিষহরার বারমাস্যার নকলে ভাদুই গান লিপিবদ্ধ- 'এলা কী কহসেন বাবু? হামরালা ত/ বর্ষাকালত লৌকার মাঝি / জাড়ের

কালত বাসের চাকা/ ওদত পুড়ি এলগাড়িত চড়ি/ তিস্তাবড়ির মুখত ঝাঁটা/ মা মনসা-আ-রে-এ-এ-এ?'[৭৯] গানের ভাষায় ঋতু পরিবর্তনের সাথে পেশা পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ভগীরথ মিশ্রের 'সন্তান ও সন্ততি' গল্পে আদিবাসী গ্রামে মাদল বাজিয়ে গান গাওয়ার কথা পাওয়া যায়। আদিবাসীদের গান শুনে মনে হয় যেন আদিন প্রকৃতির বুক জুড়ে একটা একঘেঁয়ে করুণ সুর গুমরে-গুমরে উঠছে আঁধারে।

ভগীরথ মিশ্রের 'পৌষ পরবের কুশীলব' গল্পেও গানের ভাষায় ব্যক্ত মনের কথা-মস্করা। তিলক লোহার গায়-

'আহা, মন সরে না শ্বশুরঘর য্যাতে / ও তুই কি দিলি ভাই পানপাতে মন / সরে না শ্বশুরঘর য্যাতে'।[৮০]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'রেখে আসা' গল্পে লোধা, খেড়িয়া জনজাতির লোকগান পাওয়া যায়-

(১) 'সরু সরু কানালী/ ধান লাগা করালি/ জিলপি দিব কল্যে/ জুনার পড়ায় ভুলালি'।[৮১]

(২) 'ঝিকাশুলি মামাঘর কুকুড়া টাঁড় বাপঘর। / হল হল ধনি তর সিরাডহে শ্বশুরঘর/ তাড়ুলে তর মাসিঘর বিড়াশুলি পিসিঘর/ হল হল ধনি তর সিরাডহে শুশুরঘর/ বাঘমুন্ডির হলুদ মশলা বড় বড় ধনা গো/ দর শুধালে বলে দিব সিরাডহে বর গো'।[৮২]

গানের মধ্যে আদিবাসী মানুষদের ব্যবহারিক জীবন, মানসিকতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থাচিত্র প্রতীয়মান।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কল' গল্পে বাউরি সমাজের দুটি লোকগানের উল্লেখ আছে[৮৩]-

১. 'ওরে ফের শুতে যাস যদি তু পর মরদের ঘর/ তোর পাছাতে নোহার সেঁকা জেনে লে খবর/ তুর গায়েতে পেসাব তুর মুখে ছাগের মল/ মা মনসার সাপ দেবে তুর মাথাতে ছোবল'।

২.'কেলে যারে যারে তুই চম্পাই নগর/ দংশি এসো গা বালা লখিন্দর/ যেতে লারব লারব চম্পাইনগর/ চম্পাইনগরে আছে লোহারই বাসর'।

প্রথম গানে সুবলের বউকে পুনর্বার সংসারে ফিরিয়ে নেওয়া উপলক্ষ্যে এই গানের অবতারণা। গানের প্রতিটা কথায় সুবলের স্ত্রী পালং এর প্রতি সাবধানবাণী বর্ষিত, এবং পাপের শাস্তি স্বরূপ মা মনসার

কোপের কথা চিত্রিত। দ্বিতীয় গানটি মনসার গান, যা মনসা ও লখিন্দর-বেহুলা কেন্দ্রিক। মা মনসার জাগান পরব আদিবাসীদের হলেও, বাউরি সমাজের লোকেরা আদিবাসীদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে তারাও এই উৎসব পালন করে। এক্ষেত্রে সমাজের হিন্দু প্রান্তিক জাতি এবং আদিবাসী, দুই জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণ বা 'অ্যাকালচারেশন'-এর রূপ প্রতিফলিত।

নলিনী বেরার 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব গান অনুরাগী, তারা 'সেরেঞ' অর্থাৎ গান নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। তারা বিভিন্ন নাচের তালে-তালে গান করে। গল্পে তাদের নিজস্ব ভাষায় এমনই এক লোকগানের উল্লেখ গল্পে পাওয়া যায়- 'গাডা নারে নাড়েতে, তিরিয়ো বদন রে নালম নরং, / ধীরি মাগাড় রে, দাঃ ক দ বদন রে নালম বড়ে'।[৮৪]

নলিনী বেরার 'খোরপোষ' গল্পে 'ঢ্যাঙুয়ানের দল' মাদল বাজিয়ে 'গরু-জাগরণ' উৎসবে গান গায়[৮৫]-

(১) 'হাম্‌রা তো যাতেছিলি কুল্‌হি ন কুল্‌হি যে বাবু হো/ তোরই গিরিহায় ডাকিয়েঁ ঘুরালো'-

(২) 'অহিরে-সবু দিন তো মাগে ডালা ভাটো-ভিখারি যে/ ললিনবাবু হো- / আজি তো মাঙ্গে ধেঙ্গুয়ান'-

এছাড়াও 'গরু-খুঁটানো' খেলায় মাদলের বোল আর কুলকুলির সাথে সাঁওতালরা তাদের লোকগান গায়-

'অহিরে ... সবুদিন তো চঁরাই ভালা/ বিরি-মুগো ক্ষেতে যে বাবু হো/ আজি তোরো দেখিব বলিয়নি- / আজি কারো রণে ভালা হারি যদি যাও গো/ তোরো ছালে বরদা খুঁটাবো'।।[৮৬]

আদিবাসী প্রান্তিক মানুষগুলি সারাবছর ভ্যালো-মন্দ তো দূর পেটভরা খাবারও খেতে পায় না, গানের গেয়ে উৎসবের দিনে বছরে একবার এই গানের দল সম্ভ্রান্ত গৃহস্ত বাড়ি থেকে ভিক্ষা করে পেটভরে খাবারের আশায়। গানের মধ্যে দরিদ্র মানুষগুলির আবেদনই ব্যক্ত।

নলিনী বেরার 'ঝরা পালকের জাদু' গল্পে বুধনের মায়ের মুখে শকুনের ঝরা পালক নিয়ে এক লোককথা পাওয়া যায়। শকুনের ঝরা পালক দিয়ে এক ব্রাহ্মণ কে মানুষ, কে পশু এরকম এক রূপকথা বা লোককথা গল্পে পাওয়া যায়। এধরনের বহু লোককথা ছড়িয়ে আছে, বেশিরভাগ লোককথায় বা লোককাহিনিতে শ্রেণির বৈষম্যজাত চেতনা প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত। উক্ত লোককাহিনিতে প্রতীক বা

রূপকের মোড়কে ফুটে উঠেছে শ্রেণিবৈষম্যের বাস্তব। মানুষের মতো দেখতে হলেই মানবিকগুণ, মনুষ্যত্ব বোধ ব্যতীত সে আসলে মানুষের পর্যায়ে পড়েনা, এই মতাদর্শই গল্পে ঝরা পালকের জাদু রূপে ব্যঞ্জিত। এক্ষেত্রে সমাজ-মনস্তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

এছাড়া এই গল্পে আরও একটি লোককথা আছে গল্পে- পূর্বে সাঁওতালরা মাথার উকুন বাছতে কারও সাহায্য না নিয়ে মাথার খুলিটা মোচড় দিয়ে খুলে উকুন বেছে ফের যথাস্থানে পাগড়ির মতো বসিয়ে নিত। আদিবাসীদের মধ্যে এরূপ নানান উপকথা, লোককথা প্রচলিত, এগুলোই তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এই লোককথা কিছুটা পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঠাকুমার ঝুলির রূপকথা, উপকথার মতো।

নলিনী বেরার 'টি. আই. প্যারেড' গল্পে টুসুগানের কথা পাওয়া যায়-

> 'টুসুর মাকে বলেছিলাম টুসুর বেহা দাও না গো। / বেহা দিলে ছ্যাইলা হৈল লাতি কোলে নাও না গো।/ লাতি লিলে বেশ করিলে কী কী গয়না দিলে গো।/ হাতে দিলম চুর-বালা পায়ে দিলম আঙট গো।। / আর কী দিব বল গো।/ লাতি খুঁজে হাতি লিতে হাতি কুথায় পাবো গো'।[৮৭]

টুসু গান মূলত আদিবাসী নারীরাই গায় অনেকক্ষেত্রে পুরুষরাও অংশ নেয়, এই গানে মূলত নিহিত থাকে কুমারী ও বিবাহিত মেয়েদের সাংসারিক কথা, থাকে অসীম সৃষ্টিশীলতা-সৃজনশীলতা, এই সৃজনশীলতার মধ্যে নিহিত তাদের জীবনবোধ। টুসুগান গানের মধ্যে আগামী প্রজন্মের কথা, ঐতিহ্য ব্যক্ত। এই গল্পে উল্লেখিত টুসু গানেও টুসুর বিবাহ, তার ছেলে হওয়া এবং তাকে উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। গানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা, অনাবিল আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশিত।

নলিনী বেরার 'নুয়াসাহীর বটতলা' গল্পে ভূমিজ সম্প্রদায়ের নুয়াসাহীর বটতলায় আসর জমার চিত্র লিপিবদ্ধ। তারা ভোর থেকে কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দলবদ্ধভাবে নিজেদের জীবন লেখা-গান-মজার মধ্যে দিয়ে উপভোগ করে। গল্পে এই ভূমিজ গোষ্ঠীর একটি লোকগান পাওয়া যায় –

> 'সখি হে আয় ন যাব দুধিলতার বন্ কে/ দুধিলতার বনে আইলি, নাকফুলে তোর লাগাইলি/ এখন কী করে বুঝবি তোর মন্ কে/ হামাকে- / সখি হে আয় ন যাব দুধিলতার বন্ কে'।[৮৮]

এছাড়াও লোক কবিতার অংশও পাওয়া যায়- "একটি তারা দুটি তারা, কোন্ তারাটি আর ঝারা। আন দেখি গ' কাঁড়বাঁশটা বিঁধে দেব ভুরভুরাটা'।[৮৯] কাজে যাওয়ার জন্য ভূমিজানী মহিলারা বাড়ির লোককে

তাড়া দেয়- 'বাহিরা ন চাড়ে খালভরিয়া'।[৯০] চলৎশক্তিহীণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সিজাধানে গজমুখী কাক এসে মুখ দিলে তারা তাড়ানোর জন্য বলে- 'হায় যে গ ঝিঙা কুঁদ্রির মা! দেখন মার, বেধুয়মরার 'বাবা' আসিন্ গসা গসা খাঁইয় যাচ্ছে যে গ!'[৯১] গল্পে এছাড়াও আদিবাসী গোষ্ঠীর নানা নাটকের কথাও বলা হয়েছে। গল্পে ভূমিজ গোষ্ঠীর বাক্‌সংস্কৃতির চিত্র স্বমহিমায় প্রতীয়মান।

সৈকত রক্ষিতের 'মাড়াই কল' গল্পেও মাদলা ঘোরাতে ঘোরাতে চেপুলালের গান গাওয়ার কথা পাওয়া যায়। লেখকের 'আঁকশি' গল্পে সাঁওতালদের ধামসা এবং নাকাড়া ও আঁড়বাঁশি বাজিয়ে তারা নাচে গান গায়। মাগারামের গলায় একটা লোকগান পাওয়া যায়-

> 'গ্যানঘ্যাটাগ্যান .../ গ্যানঘ্যাটাগ্যান .../ জঙ্গলকে ভালু জঙ্গলকে এ এ এ .../ জঙ্গলকে ভালু ... জঙ্গলকে'।[৯২]

সৈকত রক্ষিতের 'পট' গল্পে আদিবাসী শিশুদের গল্পে বন্দনার কলরোল পাওয়া যায়- 'গনেশ নাচে থাপাক থুপুক/ কাৎতিক যায় উড়ে/ পর্শুরামের বুচা টাঙি/ দাদা, কার ঘাড়ে পড়ে'[৯৩] এই গল্পেই পাইটকার আদিবাসীদের বাড়ি গিয়ে যে পট দেখায়, তার মর্ম ব্যাখ্যা করে সুর করে গানের তালে- 'মর্তে সুভদ্রা আছে/ বমভা বিষ্ণু আছে পিথিরি ধারণ কৈরেছে/ আর কী হছে? / সোব পাপীদের শাস্তি হছে[৯৪]- এটা তাদের বাক্‌সংস্কৃতির অঙ্গ। এই লোকগানগুলিতে হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির ধর্মীয় ভাবাচরণের সংমিশ্রণের আভাস পরিলক্ষিত।

সৈকত রক্ষিতের 'উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা' গল্পে জনজাতি, প্রান্তিক জীবনে ব্যবহৃত প্রবাদ পাওয়া যায়[৯৫]-

(১) 'আইল রে বাঁধনা/ মুরগি ছা ঈর কাঁদনা!' (২) 'ফুরাল রে বাঁধনা/ বিটিছেল্যার কাঁদনা'। এছাড়া তাদের বাকসংস্কৃতির অঙ্গ কয়েকটি লোকগানেরও উল্লেখ আছে[৯৬]-

> (১) 'শাগ রাঁধতে বলেছিলি/ কচু রাঁইন্ধেছে/ সুয়াদে সুয়াদে বাঁদরি/ খাঁইয়ে নিয়েছে'।
>
> (২) 'ছল করে যায় গো জলে/ শাম ডাঁড়ায়ে কদম-তলে/ নারী কতই না ছল জানে গো ... / হেন রসিক নেবুলালে কয়/ মুখের কথা চৈখে হয়/ রসিক হয়ে রস বুঝে না/ ধিক থাক জীবনে ...'

(৩) 'জাগো মা লক্ষ্মী জাগো মা ভববতী/ জাগো ত অমাবস্যার রাইত রে/ জাগাকে পতিফল দেবে মা লছমী/ পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাইরে ...'

(৪) 'অহিরে, হামরা য্যা যাইতে ছিলি/ কুলহির ল্যা কুলহি রে/ তরী দিয়া আ-ন-ল খুরায়/ বসিতে দিল ভাই /অলগ-অলগ মচিলা/ খাইতে দিল গুয়াপান ...'

(৫) 'অহিরে, কেহু ত লেগে ভালা/ গুড়খি গুড়খি রে ... / বুকে টাড়া দিয়া রে/ কেহু ত লেগে রে বুঝাঁয়'

(৬) 'শিয়াল ত লেগে ভাই/ শুড়খি গুড়খি রে/ চিলহে ত লেগে উপর ফাঁইন্দ ... / ঝাঙ্গেড়া ত লেগে রে বুঝাঁয়/ অহিরে ...'

(৭) 'চন্দ্রমা দপদপ ভুড়কা উঠিল রে/ সুরঙ্গী ত ঠুঁকে রে কাঠাড়। ... / মাথায় ত লিব ভালা বাঁশরি কা ছাতা রে/ তবে হামে সুরঙ্গী করব মইলান'।

আদিবাসী পরবের পরের দিন ঝাঙ্গেড়ারা গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গো-ধন লাভের সম্ভাবনায়, কখনও আহার্য সম্পদ সংগ্রহের বিচিত্র কৌশল উল্লেখে, কখনও এই কৌশল অবলম্বনকারী বিভিন্ন জীবদের নাম উল্লেখ করে, কখনও নিজের সন্তান মনে করে উপরিউক্ত নানান লোকগান গেয়ে থাকে। এই গানগুলির গহনে মানুষের ব্যবহারিক জীবনচর্যা প্রতীয়মান।

সৈকত রক্ষিতের 'বয়ার কাড়া' গল্পেও কয়েকটি লোকগান পাওয়া যায়-

(১) 'পরব ত পরব ভাই রে/ ঘুরি ফিরি আসে রে/ মানুষ মরিলে নাহি ঘুরে/ আর বসসর দিন বাঁচোবি/ তবে এইসন্ গা হবি/ মরিলে ত মাটিতে মি-ল-ন রে ...'[৯৭]

কাড়া-লড়াই এ খেলার মাঠে খেলা শুরুর আগে সাগরাম গায়- (২) 'বঁধু, হামার কথা চলে নণ/ কবৌ মনের কথা বলে না/ হামি হলি চৈখের বালি হামাকে রা কাড়ে না / চতুদ্দিগে ভালে বঁধু হামার দিগে ভালে না/ সাগরাম বলে বিজলি বাতি ক্যারাসিনে জ্বলে না!"[৯৮]

কাড়া-লড়াই খেলার শেষে মাদল বাজিয়ে সাগরাম গেয়ে ওঠে- (৩) "খিলি খিলি পান লিলি/ পিরিতি না দিলি/ ইলিক-ঝিলিক সিলিক শাড়ি/ ক্যানে দেখালি ..."[৯৯] এই লোকগানগুলোর মধ্যে কৌতুক অন্তর্নিহিত।

সৈকত রক্ষিতের 'যশোমণি মুর্মু' গল্পে সাঁওতাল, শবর, মুন্ডা, ভূমিজ আদিবাসীরা ঘাসের জঙ্গলে ঘাস কাটতে-কাটতে ঝুমুর গান গায়, এছাড়াও গল্পে আরও কয়েকটি ঝুমুর গানেরও উল্লেখ আছে[১০০]-

(১) 'না চাষ না ক্ষেতিকাম ক্ষিয়ায় গেল হাতের চাম/ বাবোই বুনে লাভলুট না হৈল/ দাদা হে, ঘাস কাইটে-কাইটেই জীবন গেল ...'

(২) 'আমার মনের কথা বলব কাকে/ হামি মনে মনে বিহা করেছি তুমাকে/ তুমার উঁ - চ কমর বুকের লহর করছ শাসনভাঙা- ডহর/ হামি মনে মনে মন সঁপেছি তুমার মনের কাছে/ তুমার - নাকের লুলুক উলুক - ঝুলুক হামার মনকে সাঁতাছে ...'

(৩) 'কেহু ত কাঁদে ভালা বছর বছর রে/ কেহু ত কাঁদে দেড় পহড় রাতি/ মাঈ ত কাঁদে ভালা বছর বছর রে/ বহুই ত কাঁদে দেড় পহররাতি ...'

গানের মধ্যে আদিবাসীদের জীবনের নির্মমতা, বাস্তব রুক্ষতার বিষাদের সুর ফুটে ওঠে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'আকাশ-মাটির খেলা' গল্পে সুদামা কুঙ্কল তার আদিবাসী ভাষা ছাড়াও বাংলা ভাষাতেও গান গায়- 'ও ননদি আর দুমুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে, ঠাকুরজামাই এল বাড়িতে'।[১০১] আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষা ছাড়া বাংলা ভাষাতেও কথা বলে এরূপ দৃষ্টান্ত বহু গল্পেই পাওয়া যায়।

উক্ত গল্পগুলি আলোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুই জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান এবং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে জনজাতি সংস্কৃতির সাথে বাঙালি সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিচয় ও সংমিশ্রণ ঘটে, যা 'অ্যাকালচারেশনের' পরিচয় বহন করে। এব্যতীত লোকগান, লোককথা বা মিথকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার অন্তস্থলে লুকায়িত ইতিহাসের টুকরো ছবি।

৭.গ| লোকক্রীড়া এবং লোকনৃত্য:

আদিবাসী মানুষদের মধ্যে তাদের নিজস্ব নানান লোকক্রীড়া যেমন- সাপ খেলা, বাঁদর খেলা, মোরগ লড়াই প্রচলন আছে। পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক সংস্কৃতির অন্তর্গত লোকনৃত্য ও হাতের ব্যঞ্জনাধর্মী নানান ইশারা অর্থাৎ দৈহিক কৌশল কুস্তি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই আদিম মানবরা নাচে-গানে অভ্যস্ত ছিল, বিভিন্ন গুহাচিত্রে তার প্রমাণ মেলে। আদিমমানবের এই নৃত্যচর্চার ধারা আজও অব্যাহত, যা আদিবাসীদের সামাজিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। এক্ষেত্রে নৃত্য সংস্কৃতিধারার ইতিহাস বিশ্লেষণে একদিকে

সংস্কৃতির দীর্ঘস্থিতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত, আবার অনেকক্ষেত্রে নৃত্য সংস্কৃতি ধারায় নতুন-পুরাতন উপাদানের সংমিশ্রণে সৃষ্টিশীলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। আদিবাসী নৃত্যের ধারাটি বিবর্তিত হয়েছে লোকনৃত্যে। গবেষণাপত্রে নির্বাচিত জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলির বিশ্লেষণে লোকায়তজীবনের লোকক্রীড়া ও লোকনৃত্যের নানা প্রকার সাংস্কৃতিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়, নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী' গল্পে বাজিকর, বেদিয়া জনজাতির নারী ও পুরুষ উভয়েই জীবিকা নির্বাহের জন্য নানান অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক ক্রীড়া প্রদর্শন করে, যা তাদের লোকসংস্কৃতির অঙ্গ।[১০২]

(১) শম্ভু লোহার রিং এর খেলা দেখায়। বাঘের খেলা দেখায়।

(২) 'বেদেনীর নিজের খেলাও আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটি বাঁদর, আর গোটা কয়েক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করে আনে'।

(৩) 'কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরৎ দেখাইতেছে'।

(৪) 'ওদিকে টিয়া পাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাড়া মাথায় দিয়ে নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল',

গল্পে দেখা যায় বেদিয়া জনজাতির রাধিকা, শম্ভু, কিষ্টোর পেশা সার্কাসে খেলা দেখানো, সেই সার্কাসে খেলা দেখানোর সূত্রে গল্পে উক্ত খেলাগুলির প্রসঙ্গ এসেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরী' গল্পের বাজিকর জাতির মেয়েদের বিশিষ্টতা তাদের স্বতন্ত্র নাচ, যা তাদের জাতির লোকসংস্কৃতির, লোকায়ত জীবন ও ঐতিহ্যের বড় অঙ্গ –

'মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান নিজেদের বিশিষ্ট সুর, নাচও তাই - বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না'।[১০৩]

বাজিকরদের এই নিজস্ব নাচ-গান, তাদের বিশিষ্ট সুরই তাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক, যা তাদের স্বতন্ত্র, অনন্য করে তোলে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘একটি প্রেমের গল্প’ গল্পে বুধনের নানান কসরত, নাচের ও মাদল বাজানোর কথা পাওয়া যায়– ‘অনেক কসরত করে বুধন। নাচের সময় ওদের পাড়ায় ও যখন মাদল বাজায়, তখন অন্য পাড়ার লোক বুঝতে পারে যে বুধন মাদল নিয়েছে। বুধনের মাদল - বাজানো এবং চান দেখতে যায় সকলে। বুধনের হাতে মাদলে আওয়াজ যেমন বের হয়, তেমনি তার বুকের হাতে পেশী, হাতের পেশী নাচে - তেমনি সে লাফ দিয়ে পাক ফেরে’।[১০৪]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যাদুকরের মৃত্যু’ গল্পে জনজাতিদের নিজস্ব খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়- ‘তুমড়ির খেলা’ কাঠপিঁপড়া-মৌমছি-বোলতা-ভীমরুল মারামারি, কালকেউটে মারার খেলা, ‘মিতালীর খেলা’ ইত্যাদি। এই সমস্ত খেলা যা তথাকথিত সভ্য এবং শহুরে মানুষরা কল্পনাতেই আনতে পারেনা। এই লোকক্রীড়ার মধ্যে দিয়ে নাগরিক সভ্যতাহীন গ্রামীন জীবনের স্বতন্ত্র রূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘নারীর মন’ গল্পে মেলায় ‘ঝান্ডি খেলা’-র কথা পাওয়া যায়। গল্পে আদিবাসী মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপের পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘রথের তলে’ গল্পে নাটজাতির পেশা এবং তাদের সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ হল নাচ। নাটজাতির মেয়েরা অল্পবয়স থেকেই নাচ-গান করে উপার্জন করে।

সুবোধ ঘোষের ‘উচলে চড়িনু’ গল্পে বেদিয়া পুরুষদের জুয়া খেলার কথা পাওয়া যায়। লেখকের ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পে হকি খেলার কথা পাওয়া যায়। স্টিফান হোরোর স্কুলে অ-আদিবাসীদের ছেলেদের হকিস্টিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার খালি পায়ে হকি খেলার কথা পাওয়া যায়। এছাড়া তার টেনিস খেলার কথাও পাওয়া যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সৈনিক’ গল্পেও আদিবাসীদের মাদল বাজিয়ে নাচের কথা পাওয়া যায়। লেখকের ‘বীতংস’ গল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক সংস্কৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়[১০৫]-

(১) ‘কষ্টিপাথরের তৈরি কালো চেহারার দুজন পুরুষের দুলে-দুলে মাদলে ঘা দিচ্ছে, আর সেই মাদলের তালে-তালে ঝুঁকে-ঝুঁকে কয়েকটি মেয়ে নৃত্য করছে। পরস্পরের বাহুতে তারা আবদ্ধ, মুখে অস্ফুট গানের উচ্ছ্বাস’।

(২) 'দশ-বারোটি মেয়ে একসঙ্গে নাচছিল। তাদের ভেতর প্রায় প্রৌঢ়া থেকে নিতান্ত বালিকা পর্যন্ত সব স্তরের মেয়েই বেশি'।

(৩) 'মাদল বাজছে তার সঙ্গে চলেছে নাচ, কিন্তু জ্যোৎস্নারাতের মহুয়ামদির অসংযত নাচের দোলা এ নয়। সে নাচে রক্তে রক্তে একটা তরল নেশা ঘনিয়ে আসে, আর এ নাচে যেন মনের ওপর একটা অস্বস্তির আমেজ দেয়'।

রমাপদ চৌধুরীর 'বনবাতাস' গল্পে ওঁরাও ও মুন্ডা জনজাতির বাঁশি, ভেঁপু ও ঢোলক বাজিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে নাচের কথা পাওয়া যায়। মাদল-মৃদঙ্গের তালে তালে ওঁরাও মুন্ডাদের নাচ-গান হয়।

রমাপদ চৌধুরীর 'দরবারী' গল্পে জোনাথান ম্যাকল্লাস্কি এবং শনিচরির বিবাহতে মুন্ডা মেয়েরা খোঁপায় পলাশ গুঁজে, মাথায় ঘটি নিয়ে দলবদ্ধভাবে নাচের চিত্র পাওয়া যায়। আদিবাসী বিয়ে বা তাদের যে কোনো পরবে তাদের নিজস্ব নাচ-গান তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

রমাপদ চৌধুরীর 'ইম্‌লী' গল্পে উল্লিখিত বেদিয়া জাতির পূর্বপুরুষরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে হাতে ঢোলক বাজিয়ে নেচে গেয়ে বেড়াত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' গল্পে আদিবাসীদের হোলির দিন শিকার খেলার কথা পাওয়া যায়। এই খেলার নিয়ম বারো বছর পুরুষরা এই দিনে শিকারে যাবে, তারপর আসে মেয়েদের শিকারে যাওয়ার পালা। সজারু-খরগোশ পাখি যা পায়, তাই শিকার করে এবং মেয়েরা ছেলেদের ন্যায় তীরধনুক নিয়ে শিকারে যায়। এরপর ওই শিকার দিয়ে বনভোজন হয়, মদ-গান-আড্ডা হয়। এই শিকার খেলা প্রাচীনকাল থেকে কালিক প্রবাহে আদিবাসী জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে বিবেচিত।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কল' গল্পে সাঁওতালদের নাচের খেলা, কোড়াদের লাঠিখেলার কথা পাওয়া যায়। এইসমস্ত আদিবাসীদের লোকক্রীড়ার অন্তর্গত।

নলিনী বেরার 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে আদিবাসীরা যে তাদের বিভিন্ন উৎসবে গানের তালে নাচ করতে ভালোবাসে, সেকথা স্পষ্ট। গল্পে দেখা যায় তারা 'দাঁশায়', 'সহরায়', নানা উৎসবে 'দঃ লাগড়ে ঝিকা' ইত্যাদি নাচের তালে-তালে তারা গান করে।

নলিনী বেরার ‘খোরপোষ’ গল্পে ‘গরু খুটানো’ নামক আদিবাসী ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। লেখকের ‘নুয়াসাহীর বটতলা’ গল্পে ‘ফরিখেলা’, লাঠিতে-লাঠিতে মারামারির খেলা লাঠি খেলা এবং ‘দু-ডুল লু-ডুল’ করে ছক্কা পাঞ্জার ঘুটি দিয়ে ঢেন্ডি-পালী খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও গল্পে আদিবাসীদের মহড়ানাচের কথা উল্লেখিত– ‘সে আলোয় ‘গাছতলে’ খেজুর পাতার ‘পাটিয়া’ পেতেই চলে ‘মহড়া নাচ’ এর মহড়া! ‘ফুলেট’ বাজে, বাজে ‘তিরিয়ো’ আড়বাঁশি, বাজে পেল’।[১০৬]

সৈকত রক্ষিতের ‘আঁকশি’ গল্পে সাঁওতালদের ধামসা, নাকাড়া বাজিয়ে আঁড়বাঁশির সুরে নাচের কথা লিপিকৃত। এছাড়া সাঁওতাল বস্তিতে ভালুকের নাচের কথা এবং সেই নাচ দেখে মাগারাম ও পরিবারের শত কষ্ট থাকা সত্ত্বেও যে অনাবিল আনন্দ, তা এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়। আদিবাসীরা এই নাচ-গানের সুরের মধ্যেই শত অত্যাচার-কষ্ট-দারিদ্র ভুলে যাওয়ার যেন শক্তি পায়।

সৈকত রক্ষিতের ‘পট’ গল্পে আদিবাসীদের ছৌনাচের কথা পাওয়া যায়। ‘উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা’ গল্পে আদিবাসীদের বাঁধনা পরব, বা যেকোনো পরবেই ক্যানেস্তারা, চ্যাড়পেটি, বাজনা, ঢোলক বাজিয়ে ঝাঙ্গেড়াদের দল গান গেয়ে, নেচে খাদ্য-বস্ত্র-পয়সা উপার্জন করে।

সৈকত রক্ষিতের ‘বয়ার কাড়া’ গল্পে মোষে মোষে লড়াইয়ের কথা পাওয়া যায়। এই লড়াইয়ের যে মোষের শিং দুটো ছোট ও অর্ধবৃত্তকার হবে, এমন দুটো মোষের লড়াই, যাকে ‘কাড়া লড়াই’ বলা হয়। আদিবাসীদের লোকক্রীড়ার অঙ্গ ‘কাড়া লড়াই’।

অনিল ঘড়াইয়ের ‘আকাশ মাটির খেলা’ গল্পে কুলিকামিনদের মাদল বাজিয়ে নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জনজাতি প্রান্তিক মানুষরা তাদের জীবনের বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, অত্যাচার, না-পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে ক্ষণিকের মুক্তি পায় এই নাচ-গান-খেলার আনন্দে। এই লোকক্রীড়া, লোকনৃত্যর মধ্যে অতীতকালের সংস্কৃতির উপাদান নিহিত।

৭.ঘ| পেশা ও লোকপ্রযুক্তি:

লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ পেশা ও লোকপ্রযুক্তি। আদিবাসী মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় নিরানব্বই শতাংশ মানুষই নানান অত্যাচারের শিকার হয়। জীবন নির্বাহের তাগিদে, বেঁচে থাকার দায়ে

তারা নানাধরনের কর্মকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। এই পেশার সাথেই লোকপ্রযুক্তি সম্পর্কযুক্ত, লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত কারিগরী কৌশলই লোকপ্রযুক্তি নামে পরিচিত। কখনও প্রয়োজন আবার কখনও শৈল্পিক সামগ্রী হিসাবে লোকপ্রযুক্তির উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মই, ঝুড়ি, গরুর গাড়ি, বঁড়শি, ইত্যাদি। নিম্নে জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি আলোচনার মাধ্যমে বৈচিত্র্যমন্ডিত আদিবাসী মানুষদের পেশাচিত্র এবং লোকপ্রযুক্তি পরিচয় দেওয়া হল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ' গল্পে সিঁদুরচরণের পেশা চাষবাস, পাট বিক্রি করা। লেখকের 'বোতাম' গল্পের এলিশাবা কুই চরিত্রটি একেবারে আলাদা। এলিশাবার পেশাও স্বতন্ত্র, সে আদিবাসী নারী নেত্রী, সচরাচর আদিবাসীদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এলিশাবা রাঁচি ও সিংভূমের স্বাধীন গর্ভমেন্টের পক্ষ থেকে প্রান্তিক মানুষদের স্বার্থে জনদরদী কাজ করে, মানুষদের জন্য গ্রামে-গ্রামে স্কুল তৈরি করেছে, হাতের কাজও শেখায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালচিতি' গল্পে মুন্ডা জনজাতির মানুষদের পেশা চাষবাস, তাদের মেয়েরা মকাই ক্ষেতে কাজ করে। লেখকের 'মাগনিরাম' গল্পে দেখা যায় মাগনিরাম স্বভাবত কবি, কিন্তু সে শিকারী হয়ে বাবার স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে তার ট্রাজিক পরিণতি। গল্পে ঢেমন সাঁওতাল পেশায় শিকারী। গল্পে মাত্র একশো টাকার লোভ দেখিয়ে এই আদিবাসী মানুষগুলিকে পাগলা হাতি মারার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করার পিছনে প্রসাশনের দায়ভার, ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' গল্পে একজন সাঁওতাল কবির কথা পাওয়া যায়। যিনি সাংসারিক কোলাহল থেকে দূরে সাহিত্যসাধনা করে, সাহিত্যসাধনার পাশাপাশি চাষবাস করেও জীবিকা নির্বাহ করে। কবি টুসু পরবের সময় টুসুর গান ও ছড়া ছাপিয়ে বিক্রি করে ত্রিশ টাকা উপার্জন করে। সাহিত্যসাধনা কবির জীবনের নেশা ও পেশা দুইই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী' গল্পে খোঁড়া শেখ সাপের ওঝা বৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি সে দিনমজুরিও খাটে। সাপখেলা দেখানোর প্রয়োজনে খোঁড়ার বিভিন্ন লোকপ্রযুক্তি ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়- 'বিষম পাক ও তুবড়ি বাঁশী লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে'।[১০৭] খোঁড়া শেখের এই সাপখেলা দেখানো তার পেশা হলেও এই সাপের খেলা লোকক্রীড়ার অন্তর্গত। লেখকের 'সাপুড়ের গল্প' গল্পেও সাপুড়ে আদিম জাতির পেশা গ্রামে-গ্রামে সাপ নাচিয়ে ভিক্ষা করা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাসের ফুল' গল্পে আদিবাসী নারী ও পুরুষরা কয়লা খাদানের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত। এই পেশা এমনই যেখানে আদিবাসী মানুষগুলির প্রাণের কোনো মূল্য নেই, তবু অর্থের তাগিদে তাদের এই বিপজ্জনক কাজকেই পেশা হিসাবে বেছে নিতে হয়েছে।

তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পে শম্ভু বাজিকর, কিষ্টো ও রাধিকা প্রত্যেকে মেলায় সার্কাসে নানা ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এর পাশাপাশি রাধিকা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি সাপ, বাঁদর ও ছাগল নিয়ে খেলা দেখিয়ে, গান গেয়ে উপার্জন করে। রাধিকার প্রথম স্বামী শিবপদ বেদে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল বেতের কাজ-' সে করিত বেতের কাজ, ধামা বুনিত, চেয়ার পাল্কীর ছাউনি করত, ফুলের সৌখিন সাজি তৈয়ারি করিত'।[১০৮] এছাড়া 'বেদেনী' গল্পে পটুয়া সম্পদায় ও সমগ্র বেদিয়া সম্প্রদায়ের জীবিকার কথা চিত্রিত[১০৯]-

১. 'এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু পৌরাণিক গান করে, তাহারা নিজেদের বলে পটুয়া, পট তাহারা নিজেরাই আঁকে'।

২. 'জীবিকায় বাজিকর, সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখ্য, অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়'।

এছাড়া গল্পে সার্কাসের খেলায় 'গোলকধামের'র খেলায় লোকপ্রযুক্তির কৌশল পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরী' গল্পে এই বাজিকর জাতির পুরুষদের পেশা- তারা ঢোলক বাজিয়ে গান করে নানান জাদুবিদ্যার বাজী দেখায়। মেয়েরা গান-নাচ করে, সাপের খেলা দেখিয়ে, ভিক্ষা করে উপার্জন করে। পাশাপাশি তারা নানা বশীকরণ মন্ত্র, নানান যাদুবিদ্যার দ্বারা গৃহস্থদের থেকে পয়সা উপার্জন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এই জীবিকা নির্বাহের কারণে তারা গোবরমাটি লেপিত বিচিত্রগঠন এক ঝুড়ি ব্যবহার করে যা লোকপ্রযুক্তির অন্তর্গত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিলাসন' গল্পের আদিবাসীদের পেশা অনেক স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। এদের পেশা মাটির পাত্র ও পুতুল তৈরী করা এবং কাঠের কাজ- একাধারে কুম্ভকার ও সূত্রধর। এর পাশাপাশি তারা চাষবাসও করে। আদিবাসীদের গ্রাম শিল্পীর গ্রাম বলে খ্যাত। এই পেশার কারণে তারা লোকপ্রযুক্তির ব্যবহারও করে- কুম্ভকারের চাক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের গল্প' গল্পে আদিবাসীরা পেশা হিসাবে দিনমজুরী ঘাটে, শ্রমিকের কাজ করে। এব্যতীত তারা জমি ভাগে নিয়ে ভাগচাষী হিসাবে চাষ করা, মাটি কাটার কাজ করার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বন্যার পর তারা শিকারেও যেত। এই শিকার যাওয়া একাধারে আদিমবাসীদের পেশা, আবার সংস্কৃতির অঙ্গ রূপেও চিহ্নিত। গল্পের শেষে ফুলমনির জীবনের পরিবর্তনের সাথে তার পেশারও পরিবর্তন ঘটে। সে আর মজুর খাটা সাঁওতাল মেয়ে নয়, সে লেখাপড়া শিখে নাসিং পড়ে পেশা হিসাবে নার্সিংকে বেছে নবিয়ে সে নার্স হয়েছে। ফুলমনির এই পরিবর্তিত পেশাই তার জীবনের উত্তরণের পথ নির্মাণ করে। গল্পে আদিবাসীদের বিচিত্র পেশা তাদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্রকে সুস্পষ্ট করে। ফুলমনির পেশার বদল, তার জীবন বদলের, উত্তরণের চিত্র বহন করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে বেদিয়াদের পেশা- সাপধরা, এটা তাদের জাতব্যবসা। তারা বছরের প্রথম মেদিনীপুরে সাপের বিষ বেচতে যায়, আশ্বিন মাসে তারা আবার ফেরে। বেদিয়া জনজাতির যাযাবর জীবনের অন্তরালে তাদের পেশারও একটা ভূমিকা রয়েছে। তারা যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হত, তাদের এই যাযাবর জীবনযাপন স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে কয়লাকুঠি', 'নারীর মন', 'রাঙাশাড়ি', 'সবভূতুড়ে', 'ঝুমরু', 'রেজিং রিপোর্ট', 'বলিদান', 'প্রতিবন্ধক,' গল্পগুলিতে আদিবাসী মানুষরা কয়লাখাদানে শ্রমিকের কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এই পেশা অত্যন্ত বিপজ্জজক, কিন্তু পেটের তাগিদে তাদের এই কাজ করতেই হয়। লেখকই প্রথম বাংলাসাহিত্যে কয়লাখানে কাজ করা আদিবাসী কুলি-কামিনদের জীবনচর্যার স্বরূপ, তাদের উপর হয়ে চলা অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'সাঁওতাল' গল্পে আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ হয় চাষবাস করে। এছাড়াও তারা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে, শুকনো পাতা কুড়িয়ে বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আন্টাবাংলা' গল্পে দেখা যায় বিরসা ওরাওঁ বেঞ্জামিনদের তিন পুরুষের 'আধিয়াদার'। তারা তিনপুরুষ ধরে বেঞ্জামিন পরিবারের থেকে দাদন হিসাবে ধান নেয়, চারবিঘা জমির তিন বিঘা নীলচাষ করে। বোঝাই যায় এদের পেশা মূলত চাষবাস। এছাড়া সাহেবদের ফাইফরমাশ খাটা, আরও নানান কাজ তাদের করতে হত। যেমন, সাহেবদের বাররুম নির্মাণের কাজে বিরসা ওরাওঁ মিস্ত্রিকে ইট কাদার জোগান দেয়, বিরসার পুত্রবধূও সাহায্য করে। এভাবেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

পরবর্তীতে বোটরাও সাহেবদের কাছেই ফাইফরমাশ খাটার কাজ নেয়। বংশানুক্রমিকভাবে দাসত্ব করার চিত্র প্রতীয়মান।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘রথের তলে’ গল্পে নাটজাতির মেয়েদের পেশা নাচ-গান করে উপার্জন করা। নাটজাতির মেয়েরা চোদ্দ বছর বয়সের আগে থেকেই নাচ-গান শিখে উপার্জন করা আরম্ভ করে দেয়। এথেকে স্পষ্ট নাটজাতির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়েই উপার্জন করে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘মহিলা-ইন-চার্জ’ গল্পে সাঁওতালীরা আসামে চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করে। আদিবাসীদের পেটের তাগিদে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার তথ্য গল্পে লিপিবদ্ধ।

সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ গল্পে আদিবাসী মানুষের জীবিকা অভ্রখনিতে কুলির কাজ। লেখকের ‘উচলে চড়িনু’ গল্পে সমাজের ব্রাত্য মানুষদের পেশা ‘ফসিল’ গল্পের ন্যায় একই, অভ্রখনিতে কুলির কাজ। ফসিলের কুর্মি, ভীল জনজাতির মানুষেরা অভ্রখনিতে কাজের পাশাপাশি চাষবাসের কাজও করে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ লেখকদের লেখায় জনজাতি প্রান্তিক মানুষদের কয়লাখাদানে কাজ করার কথা পাওয়া গেলেও অভ্রখনিতে কাজ করার প্রসঙ্গ সুবোধ ঘোষ ব্যতীত অন্য লেখকদের ছোটগল্পে পাওয়া যায়না। তবে শ্রমিকদের জীবন কয়লাখাদান, অভ্রখনি সব জায়গাতেই সমরূপে নিপীড়িত-বঞ্চিত।

সুবোধ ঘোষের ‘লঘু আরণ্যক’ গল্পে আদিবাসী ভিখন ও তার স্ত্রী মিঠির পেশা খোঁজির কাজ। প্রসাদবাবুকে শিকারের জন্য জঙ্গলে জানোয়ারের সন্ধান দিয়ে মিঠি উপার্জন করে। তারা জন্ম থেকেই অরণ্যে বড়ো হওয়ায়, জঙ্গল আদিবাসী মানুষদের নখদর্পণে। এই কাজ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এই খোঁজির কাজ মিঠি দক্ষতা-আনুগত্যের সাথে করায় সে ভালোই বকশিস পায়। ঘুমন্ত অথবা জাগন্ত জানোয়ারের ডেরার নিকট পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পথ খুঁজে দেওয়ার কাজ করে এই খোঁজীরা।

কমলকুমার মজুমদারের ‘বাগান কেয়ারি’ গল্পে সাঁওতাল লোধা মানুষরা শ্রমিকের কাজ করেছে। তারা বাগান কেটে নগর পত্তনের কাজে লিপ্ত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সৈনিক’ গল্পের সাঁওতাল আদিবাসীদের পেশা শিকার এবং চাষবাস। শিকার এদের প্রধান জীবিকা হলেও কালক্রমে তারা ধানচাষ, আখচাষ, ভুট্টাচাষ করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস' গল্পে আদিবাসী মানুষদের চাষবাস জীবিকা হিসাবে উল্লেখ থাকলেও, গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় তাদের আসামে চা'বাগানের শ্রমিক হিসাবে দেশান্তরিত করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আদিবাসীদের দারিদ্র-অশিক্ষা, সহজ-সরলতার সুযোগ নিয়ে সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ তাদের এভাবেই দেশান্তরিত করে, শ্রমিকরূপে চালান করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভোগবতী' গল্পের সাঁওতালদের পেশা- চাষবাস, গাছকাটা অর্থাৎ কাঠুরে, মাটি কাটা। চাষী সাঁওতালরা চাষ করে সবজি লাগায়। পেশার কারণে তারা লাঙল, ধনুক, শাবল, কুড়ুল, কোদাল এইসমস্ত লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকে। গল্পে দেখা যায় পুঁজিবাদী শাসকদের জন্য বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে, সভ্যতার স্বার্থে আদিবাসী মানুষগুলির পেশার পরিবর্তন ঘটে-

> 'চাষি সাঁওতালদের লাঙল খসে পড়ল, খেড়ে সাঁওতালদের ধনুক আর রইল না, মরচে ধরল কাঠুরেদের কুড়ুল। তার জায়গায় চকচকে হয়ে উঠল শাবল, ঝকঝকে হল কোদাল।'[১১০]

রমাপদ চৌধুরীর 'জলরঙ' গল্পে আদিবাসীরা কয়লাখানাদের শ্রমিক হিসাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের এই পেশায় একটু অসাবধানতাতেই জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। জীবনের এত ঝুঁকি নিয়ে কাজ তাদের অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থাকে পরিস্ফুট করে।

রমাপদ চৌধুরীর 'ইম্‌লী' গল্পে বেদে জনজতির ইজারাদারদের দ্বারা চাষের জমি থেকে বিতাড়িত হয়ে, শহরে মধু বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া কেউ কেউ দিনমজুরীকেও পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। আদিবাসীদের মূল পেশা চাষবাস এবং শিকার, কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই মানুষগুলো অন্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়, তাদের দেশান্তরিত হতে হয়।

রমাপদ চৌধুরীর 'ঝুমরাবিবির মেলা' গল্পে বুধন কিস্কু ডাকাতিকে তার পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এছাড়া গ্রামের তুড়ুক জনজাতির মানুষদের পেশা মূলত চাষবাস।

রমাপদ চৌধুরীর 'নারীরত্ন' গল্পে ময়না কিস্কুর স্বামী ভুখনের পেশা ছিল হরকরা, পরবর্তীতে সে রানার বৃত্তি পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল।

রমাপদ চৌধুরীর 'মানুষ অমানুষের গল্প' গল্পের আদিম বানর মারার দলের জীবিকাই গ্রামে বাঁদর তাড়িয়ে বেড়ানো, বাঁদর মারা৷ বাঁদর তাড়ানোর জন্য তারা তিন জোড়া গামছা, সাত টাকা নগদ নেয়। এছাড়াও তারা মৃত পশুদের চামড়া বিক্রি করে উপার্জন করে৷

রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনি' গল্পে লাটুয়ার জীবিকা গুণিনবৃত্তি। সে নানারকম শিকড়বাকড়, মন্ত্র দিয়ে নানারোগের ওষুধ দেয়। লাটুয়া ওঝার ওষুধে দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যাবার লোকবিশ্বাস আছে গ্রামবাসীর মধ্যে।

সমরেশ বসু'র 'গুণিন' গল্পে নকুড় দিগরের পেশা সে গুণিন। সে ওঝাবৃত্তির দ্বারা পয়সা উপার্জন করে। নকুড়ের মা রেললাইনে কয়লা কুড়িয়ে, ঘুটে দিয়ে, বাজারে কলমী-হিংচে শাক বিক্রি করে নিজের খাদ্যের সংস্থান করে।

সমরেশ বসু'র 'আইন নেই' গল্পে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষ কুঁচলাল দাসের পেশা বাঁদর মেরে তার লেজ কেটে এনে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ, মহকুমা অফিস'-এ জমা দেওয়া প্রত্যেক বাঁদর পিছু দু'টাকা পারিশ্রমিক।

মহাশ্বেতা দেবী'র 'এম. ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ', 'অপারেশন? বসাই টুডু', 'দ্রৌপদী' গল্পের আদিবাসী নায়ক-নায়িকারা পেশাগতভাবে রাজনৈতিক কর্মী। কালী সাঁতরা, বসাই টুডু, দ্রৌপদী তিনজনেই রাজনীতির সচেতন কর্মী।

মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' গল্পে মেরি ওঁরাও মহুয়া ফল কুড়িয়ে তা বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে। এছাড়া সে গ্রামের বিত্তশালী বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে সারাদিন পরিশ্রম করে এই মহুয়া ফলের জন্য, কারণ এই মহুয়া ফলই তার আয়ের উৎস। মহুয়া থেকে মদ তৈরি হয়। মহুয়া ফলের কালো বিচির তেল থেকে কাপড়কাচার সাবান তৈরি হয়। এছাড়াও সে বাজারে গিয়ে ফল, সবজি, বাদাম বিক্রি করে উপার্জন করে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'নুন' গল্পে আদিবাসীদের জীবিকা গাই, ছাগল, মোষ চড়ানো এবং জঙ্গলে পড়ে থাকা কাঠ সংগ্রহ করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। এছাড়া ওরা বাঁশের কোঁড়, কন্দ, তেঁতুল পাতা বনবিভাগ থেকে লুকিয়ে চুরি করে আদিবাসী মানুষগুলি নিজেদের জীবনের তাগিদে। এছাড়া তারা নিজস্ব

জমিতে নয় ভাগচাষী হিসাবে চাষবাস করে। আসলে আদিবাসীদের পেশা সেইভাবে নির্দিষ্ট কিছু নয়। তারা তাদের খাদ্যের জোগানের জন্য যা কাজ পায় তাই করে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' গল্পে বিষয়বস্তুর সাথে পেশা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রুদালী শব্দের অর্থ পেশাদার কাঁদিয়ে অর্থাৎ উচ্চবিত্ত পরিবারে কেউ মারা গেলে কাঁদবার জন্য লোক ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অভিনব, ব্যতিক্রমী পেশার উল্লেখ নানা চলচ্চিত্রেও পাওয়া যায়। কাঁদার রীতির উপর এদের পারিশ্রমিক নির্ভর করে। শনিচরী জীবনে তার কাছের মানুষদের হারিয়েও সে কাঁদতে পারেনা, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে পরবর্তীতে শনিচরীর পেশা হয় রুদালী।

অসীম রায়ের 'দুই বৃদ্ধের কাহিনি' গল্পে শম্ভু হেমব্রম ও তার ছেলে শিবু হেমব্রম দুজনেরই জীবিকা কৃষিকাজ। তবে শিবু হেমব্রম চাষাবাদের পাশাপাশি সে সাঁওতাল ভাষার একজন কবিও।

প্রফুল্ল রায়ের 'সাতঘরিয়া' গল্পে আদিবাসী, দোসাদ, গঞ্জু, ধাঙড় সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের জীবিকা বিচিত্ররকমের। কেউ চাষবাস করে, কেউ মাটি কাটার কাজ করে, কেউ রিক্সা চলায়। এদের নারী ও পুরুষ উভয়েই নিজের জীবনের প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেরাই উপার্জন করে।

দেবেশ রায়ের 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পে রাজবংশী আদিবাসীদের জীবিকা তিস্তা নদীতে মাঝিবৃত্তি। বার্ণেশ ঘাট থেকে জলপাইগুড়ি শহর পর্যন্ত নৌকা করে মাঝিরা যাত্রী পারাপার করে। তবে এই রাজবংশীদের কেউ-কেউ ক্ষেতমজুরের কাজও করে। লেখকের 'রাখী পূর্ণিমার রাত' গল্পে রথু লোহার পেশায় একজন কৃষিজীবী।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যাভিচারিণী' গল্পে লখিন্দরের বাবার পেশা ছিল সাপের গুণিন। লখিন্দরও পেশা হিসাবে বেছে নেয় সাপধরা পেশাকে, সে জড়িবুটির মন্ত্রও শেখে। লখিন্দরের কাছ থেকে শহরের বাবুরা সপ্তাহে একদিন এসে সাপের বিষ কিনে নিয়ে যায়। এটাই লখিন্দরের পেশা।

নলিনী বেরার 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পের আদিবাসীরা কুলিকামিনের কাজ, দিনমজুরির কাজ করে। তারা নানারকম জাল ফেলে মাছ ধরে- 'ঝুলি জাল, গাঁতিজাল, মাথা ফাব্‌ড়ি জাল, চার গোড়িয়া জাল'। আদিবাসীরা এইসমস্ত নানা লোকপ্রযুক্তির ব্যবহারও করে থাকে। গল্পে লোধা-সাঁওতালদের আরও নানান লোকপ্রযুক্তির কথা, তাদের কৌশলের কথা পাওয়া যায়- "লোধা-সাঁওতালরা 'আঠাকাঠি', তারের ফাঁস,

সাতনলা, কাঁড়-কাঁড়বাঁশ দিয়ে কতরকম ‘পাখ’ মারে। কয়ের কপতি ট্যাঁসা-ক্যারকেটা গোবরা-চড়ৈ ঢ্যাপচু –সিমফুচি’।[১১১] তারা শিকারও করে। এই শিকার করা আদিবাসীদের প্রাচীন থেকে বর্তমান কালিক প্রবাহে বহমান ঐতিহ্য এবং লোকসংস্কৃতির অঙ্গ।

নলিনী বেরার ‘খোরপোষ’ গল্পে আদিবাসীদের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর পেশা দিনমজুর খাটা সারাবছর, মাটিকাম করা, চাষাবাদ করা অন্যের জমিতে। আদিবাসীদের নিজস্ব জমি খুব কমই আছে। গল্পে সুনা সাঁওতাল ও তার মা দুজনেই গ্রামের বিত্তশালী বাড়িতে সারাবছর নানারকমের কাজ করে, ফাইফরমাশ খাটে এবং পরিবর্তে দুবেলা দুমুঠো ভাত এবং পোশাক পারিশ্রমিক হিসাবে পায়।

নলিনী বেরার ‘ঝরাপালকের জাদু’ গল্পে বুধন মুর্মুর পেশা- সে মিলিটারি, সরকারি চাকরিজীবী। আদিবাসীদের মধ্যে খুবই কমসংখ্যক মানুষ এই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সরকারি চাকরি করে। বুধন মুর্মু আদিবাসী সমাজের ব্যতিক্রমী, অনুপ্রেরনাদায়ক চরিত্র।

নলিনী বেরার ‘টি. আই. প্যারেড’ গল্পে ইরানি বেদিয়াদের পেশা তারা বাজিকর, যাযাবর। তাদের সঙ্গে তারা উট, কখনো ঘোড়টা, খচ্চর, হনুমান বিভিন্ন প্রজাতির এক-দুটো পাখি, ভিনজাতের মুরগি এইসব নিয়ে আসে। তারা গ্রামে-গ্রামে জড়িবুটি, স্বামীর মন পাওয়া, বশীকরণ ইত্যাদির ওষুধ ফেরি করে। তারা এভাবেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

নলিনী বেরার ‘নুয়াসাহীর বটতলা’ গল্পে ভূমিজদের পেশা চাষবাস, ক্ষেতখামারে কাজ করা, এছাড়া অনেকে ঢেন্ডিপালী, মহড়ানাচ, ফড়িখেলাকেও পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। গল্পে মুতুরা সিং কাঁথুয়া অর্থাৎ কাঁথ বা মাটির দেওয়াল তৈরির কাজ করে। ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের নির্দিষ্ট কোনো পেশা নেই, তারা বিচিত্র পেশার সাথে যুক্ত।

সৈকত রক্ষিতের ‘আঁকশি’ গল্পে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের বাইরে জগত, আধুনিক সভ্যজগতের সাথে খুব বেশি যোগাযোগ নেই। তারা কেবল তাদের জীবিকা নির্বাহের খাতিরে কখনো-কখনো ঝুড়িভর্তি ক্যান্দপাকা নিয়ে বাইরের অর্থাৎ যানবাজারে বিক্রি করতে যায়। গল্পে সাগারাম ও তার স্ত্রী বেদেনীর পেশা গ্রামের শিমূল গাছ চুক্ত করে তুলো বিক্রি করে তারা তাদের জীবিকানির্বাহ করে।

সৈকত রক্ষিতের ‘মাড়াই কল’ গল্পে দেখা যায় আদিবাসী মানুষদের বংশ পরম্পরায় আখচাষের জীবিকা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। গল্পে চেপুলাল বেসরার পেশা হয়েছে- গুড় বানানো, গুড় পাহাড়া দেওয়া এবং কুঞ্জ মোদকের বাড়ির কাজ করা। চেপুলাল আনুগত্যের সাথে তার কাজ করলেও সে তার আনুগত্যের মূল্য পায়না।

সৈকত রক্ষিতের ‘পট’ গল্পে পাইট্‌কারদের পেশা, আদিবাসী পরিবারে কেউ মারা গেলে, পাইট্‌কাররা সেই মৃত বাড়ির সন্ধান-সংবাদ দূরদূরান্ত থেকে নিয়ে মৃতের বাড়ি গিয়ে তাদের জানায় যে, সে দৈবনির্দেশে এসেছে এবং সে মৃতের বার্তা নিয়ে এসেছে। তারা এইভাবেই উপার্জন করে। আদিবাসীরা মূল শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর হওয়ায় এবং তারা নানান অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত ও কুসংস্কারমনা হওয়ায় পাইট্‌কাররা এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করে, কথার জাদুকরীতে মৃতের পরিবারের থেকে তারা পয়সা-সামগ্রী উপার্জন করে। এই পাইট্‌কাররা আদিবাসীদের মনে দুর্বলতাকে জেনে কথার পিঠে কথা চাপিয়ে অধার্মিককে ধার্মিক, অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী বানায়। এই পাইট্‌কাররা-

> “একসময় চিত্রকর হিসেবে তারা প্রসিদ্ধ ছিল। ঘরে-ঘরে একেকটি পরিবার পট বানাত। ছবি আঁকত এবং এটাই তাদের বৃত্তি ও পরিচয় ছিল। সেই থেকে আজও তারা সাধারণ মানুষের কাছে ‘পটিকার’ বা ‘পাইট্‌কার’ হিসেবে পরিচিত। যদিও আজ আর সেই অর্থে তারা এই শিল্পকর্মের সঙ্গে জড়িত নয়। দারিদ্র ও অনটনে পড়ে প্রাচীন শৈল্পিক নৈপুণ্যতাকে হারিয়েছে। তবু এখনও পাইট্‌কার।” (পৃঃ ৮৮, উত্তর কথা)

এই পাইট্‌কারদের পেশায় সংবাদপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সামান্য ভুলেই পরিণতি ট্র্যাজিক মর্মান্তিক হতে পারে।

সৈকত রক্ষিতের ‘মূলুন’ গল্পে মাঝি-সাওঁতালরা মূলুন খন্ড-খন্ড করে কেটে আঁটি বেঁধে তার বিক্রি করে উপার্জন করে। এছাড়া বেশিভাগেরই অল্পস্বল্প চাষজমি আছে, কারোর আবার শুয়োরের খোঁয়াড়ও আছে। আদিবাসীরা এভাবেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ‘রাঙামাটি’ গল্পেও আদিবাসীদের জীবিকা চাষবাস। যাদের নিজস্ব চাষের জমি আছে তারা নিজের জমিতে চাষ করে আর না হলে অন্যের দাসত্ব করতে হয়।

সৈকত রক্ষিতের ‘শবরচরিত’ গল্পে আদিবাসী সাঁওতালী, শবরদের পেশা- বন-জঙ্গলে পাতা-কুঁড়ি কুড়ানো, শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা। ভক্ত দাসদের মতো ব্যবসায়ী লোকদের কাছে তারা নানা জংলী গাছের ছাল, মূল, পাতা-পালহা, কোনো জংলী ফল বিক্রি করে আদিবাসীরা যৎসামান্য উপার্জন করে। এদের নির্দিষ্ট সেরকম তথাকথিত কোনো পেশা নেই।

সৈকত রক্ষিতের ‘উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা’ গল্পে আদিবাসীদের পেশা ঝাঙ্গেড়া, গ্রামীণ উৎসব আচারের দিনগুলোতে গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করা। তারা গোরুর দীর্ঘায়ু, বংশবৃদ্ধি কামনা করে, গৃহস্থের সুখশান্তি ও গো সম্পদের প্রার্থনা জানিয়ে তবেই তারা পাবে পার্বণী অর্থাৎ তাদের পারিশ্রমিক, খাদ্যদ্রব্য। এর পাশাপাশি তারা চাষবাস করেও জীবিকা নির্বাহ কোরে। লেখকের ‘বয়ার কাড়া’ গল্পে লোধা শবরদের পেশাও মূলত কৃষিভিত্তিক।

অনিল ঘড়াইয়ের ‘নুনা সামাডের গল্প’ গল্পে দেখা যায় নুনা সামাড চাষবাস করে জীবিকা পালন করে। লেখকের ‘উরাংগাঢ়া’ গল্পে ভাকুয়া ও বুদ্‌নী এক বাঙালী বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

অনিল ঘড়াইয়ের ‘আকাশ মাটির খেলা’ গল্পে দেখা যায় আদিবাসী মানুষদের পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হচ্ছে। সুদামা কুঙ্কল গান গেয়ে উপার্জন করত, কিন্তু সে ভিখারি নয়, সে শিল্পী। পরে পেটের দায়ে সে ইট ভাড়ায় শ্রমিকের কাজ করে, মাটি কাটার কাজ করে।

অনিল ঘড়াইয়ের ‘টিকলি’ গল্পে আদিবাসীদের পেশা দেখা যায়- চাষবাস। লেখকের ‘পুনশ্চ পরশুরাম’ গল্পে দেখা যায় সুনার বাজারে শালপাতার দোনা বানিয়ে বিক্রি করে সে হাঁড়িয়া, চাল, আর মিট্টিতেল, তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে আনার চিত্র চিত্রায়িত।

অনিল ঘড়াইয়ের ‘হাতিছাপ’ গল্পে ভীমাবুড়োর পেশায় অভিনবত্ব আছে- সে হাতির পায়ের ছাপ নকল করে পয়সা উপার্জন করে। বছর-বছর ধান পাকার সময় হলে হাতির পাল নেমে ধান খেয়ে, ফসল নষ্ট করে পালায়। ভীমাবুড়োর কাজ হল হাতির পায়ের ছাপ নকল করে জমির মধ্যে হুবহু এঁকে দেওয়া। এইভাবে চাষীরা সরকারের থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা পায়। ভীমাবুড়োর পেশার অভিনবত্বই তাকে স্বতন্ত্র করে তোলে।

অনিল ঘড়াইয়ের 'অরণ্যের জীবন' গল্পে গুরুবারি সোমরার পেশা মহুয়া দিয়ে মদ বানিয়ে তা বিক্রি করা। এই মদ সংগ্রহ করতে শহরের মানুষরাও সোমবার বাড়িতে ভিড় জমায়। সোমরার পেশাই তাদের সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

৭. ঙ| খাদ্য-বস্ত্র-অলংকার:

বিভিন্ন জনজাতির জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি বিশ্লেষণে আদিবাসী মানুষদের যে খাদ্য-বস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তা কেবল প্রয়োজনের তাগিদে, আড়ম্বরহীন। মানুষের পেশা, তাদের আর্থিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে তাদের খাদ্য-বস্ত্র-অলংকার। আমরা আদিবাসী গোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষদের পেশা দেখেছি ভাগচাষ, শ্রমিক, অন্যের বাড়িতে শ্রমের বদলে যৎসামান্য পারিশ্রমিক ইত্যাদি। কিন্তু কোনো পেশাতেই তাদের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় আদিবাসী মানুষদের বেশিরভাগেরই পেটভরা খাবার পায় না, তার অনাহারে দিন কাটায়। যেখানে ভাতই তাদের কাছে বিলাসিতা, সেখানে মাছ-মাংস তাদের কাছে স্বপ্নের ন্যায়। 'জলের অপর নাম জীবন' সেই জলের জন্য আদিবাসী মানুষদের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতে, নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপেক্ষা করে তিন-চার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হয়। জীবনধারণের জন্য আদিবাসী প্রান্তিক মানুষদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। জনজাতির মানুষদের বেশিরভাগের পোশাক-পরিচ্ছদ কেবলই লজ্জা নিবারণের প্রয়োজনে, তাও অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা তাদের প্রয়োজনীয় টুকুও পায়নি। আদিবাসীদের খাদ্যতালিকার ক্ষেত্রে প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত খাবার বা শিকারজাত মাংসই বেশী এবং অলংকারের ক্ষেত্রেও তারা ফুলকেই অলংকার হিসাবে পরতে দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে অরণ্য মাতৃরূপে তার সন্তানদের, অরণ্যবাসীদের পালন করে চলেছে, কিন্তু এই অরণ্যকে নির্বিচারে নিধন করার ফলে, অরণ্যবাসীদের উচ্ছেদ এবং অরণ্যকেন্দ্রিক নানা আইনকানুনের জালে জনজাতি প্রান্তিক মানুষদের জীবন বিপন্ন। বিভিন্ন গল্প আলোচনার মাধ্যমে জনজাতি মানুষদের খাদ্য-বস্ত্র ও অলংকারের পরিচয় তুলে ধরা হল। লোকায়তজীবন ও লোকঐতিহ্যের একটা গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ খাদ্য-বস্ত্র এবং অলংকার।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ' গল্পে বস্ত্র হিসাবে আদিবাসীদের পোশাকের ক্ষেত্রে কার্ত্যায়নীকে সিঁদুরচরণ একটা ফুলন শাড়ি আর নিজের জন্য সবুজ রঙের গামছা কেনার কথা পাওয়া যায়। সিঁদুরচরণ যখন ভ্রমণে বেরোয় পথে খাবার জন্য ক্যাত্যায়নী তাকে ধুপি-পিঠে বানিয়ে দেয়। যা চালের গুঁড়ো দিয়ে জলে সিদ্ধ করে গুড় দিয়ে খাওয়া হয়। এই ধুপিপিঠা আদিবাসীদের নিজস্ব খাদ্য

সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। লেখকের 'কবি' গল্পে কবির খাদ্যতালিকায় ভুট্টাপোড়া, জংলী আলু, সকরকন্দ আলু, ভাত, মুড়ি, আলুসিদ্ধ পাওয়া যায়। নিতান্তই সাদামাঠা খাবারের পরিচয় লভ্য।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালচিতি' গল্পে টেরাপানি গ্রামের আদিবাসীদের খাদ্য-বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিবাসীদের কাঠ কাটার জীবিকার পাশাপাশি তাদের বস্ত্র বলতে কেবল দুই ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের কৌপীন। এদের খাদ্য- 'ভিজে ভাত' অর্থাৎ পান্তা ভাত আর নুন। এইসব দেশের মানুষদের কাছে আটা, ছাতু এসব বিলাসী খাদ্য। ভাতই প্রধান খাদ্য, তরকারি পর্যন্ত এরা পায় না। ভাত শুধুমাত্র নুন ও একটু শাকভাজা দিয়েই এদের খাওয়া হয়ে যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিন্দুমাত্রও এদের জীবনযাপনে পাওয়া যায় না।

এই গল্পে পাহাড়ের একদিকে টেরাপানি ও অপরদিকে কালচিতি গ্রাম। দুই গ্রামের খাদ্য-বস্ত্র-অলংকার এর মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। কালচিতি গ্রামের আদিবাসীদের পোশাক মার্জিত ও সভ্য, তাদের পরনে পরিষ্কার ফর্সা শাড়ি ও গায়ে ব্লাউজ। এই আদিবাসীরা অতিথি আপ্যায়নে চা, তালের পরোটা, গরম ভাজা মুটি, তালের ক্ষীর, মর্তমান কলা, শশা নুন, লেবু মাখানো খাদ্য পরিবেশন করে। কালচিতি গ্রামের আদিবাসীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যতালিকা, অতিথি আপ্যায়ন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা দেখে বোঝা যায় অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় তারা অনেক আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। লেখক খুব সন্তর্পণেই দুই বৈসাদৃশ্যমূলক জীবনচর্যার অবতারণা করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাসফুল' গল্পে মেয়েদের নানা অলংকারের কথা পাওয়া যায়- 'মেয়েদের অঙ্গে মোটা-মোটা রূপা, দস্তার গহনা, হাতে তাগা, গলায় হাঁসুলি, পায়ে বাঁক, নাকে বেসর, একহাত কাঁসার চুড়ি।'[১১৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী' গল্পে শম্ভু ও রাধিকা সার্কাসে খেলা দেখানোর জন্য যে পোশাক ব্যবহার করে তাদের পেশাদারিত্বের কারণে-

> 'শম্ভু আপনার জীর্ণ পোষাকটা বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙয়ের চোঙার মত সরু প্যান্টালুন, আর একটা কালো রঙেয়েরই খাটো হাতা কোট। রাধিকার পরণে পুরানো রঙিন ঘাখরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস।'[১১৪]

রাধিকার প্রথম স্বামী শিবপদ’র সাথে সংসারকালীন রাধিকার নিত্যদিনের যে পোশাক-পরিচ্ছদের কথা পাওয়া যায়, তাতে তাদের স্বচ্ছলতার আভাস বর্তমান-

> ‘তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির উপর সাদা সূতার খুব ঘন-ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালোবাসিত,’[১১৫]

এই গল্পে বস্ত্র, অলংকারের পাশাপাশি বেদিয়া জনজাতির জাতিগত স্বভাব মদ খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি পাখির মাংস, মুড়ি-পেঁয়াজ-লঙ্কা-নুন এইসব খাদ্যাভাসের কথা পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পে খোঁড়ার ইচ্ছা যে তার স্ত্রী জোবেদাকে কাপড় কিনে দেবে কিন্তু তা তার সাধ্যে আসে না- ‘একজোড়া লতুন কানি কখন দিতে লারলাম। পুরানো তেনা পরেই তো দিন গেল।’[১১৬] এক্ষেত্রে খোঁড়া ও জোবেদার আর্থিক অবস্থানচিত্র সুস্পষ্ট। সে তার স্ত্রীকে শাড়ি কিনে দিতে না পারলেও গল্পে খোঁড়া তার সাপিনী বিবির জন্য একটি নাকে পরবার অলংকার ছোট একটি মিনি আনে। এখানেই যেন বিবির কাছে জোবেদার প্রথম পরাজয় ঘটে। গল্পে বস্ত্র, অলংকারের পাশাপাশি তাদের খাদ্যাভাস পান্তভাতের কথাও পাওয়া যায়। এই খাদ্য-বস্ত্র-অলংকারের মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থান চিত্র পরিস্ফুট।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যাদুকরী’ গল্পে পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ বর্ণনায় পাওয়া যায়- তাদের গলায় থাকে তুলসীর মালা, পরণে মোটা তাঁতের কাপড় এবং দুই কাঁধে দুটি ঝোলা। বাজীকর নারীরা অনেক সৌখিন –

> ‘পরণে সৌখিন পাড় শাড়ি, হাতে একহাত করিয়া কাচের রেশমী অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী কাকড়ী এখন পরে গিলটির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশনের কর্ণভূষা’।[১১৭]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিলাসন’ গল্পে আদিবাসী গ্রামে অতিথি আপ্যায়নে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছে- ঘন করে জ্বাল দিয়ে অনেকটা মোষের দুধ, চিঁড়ে ও গুড়। তাদের মধ্যে চিনি খাওয়ার চল নেই, তারা গুড় খায়। এছাড়াও দুধ জ্বাল দিয়ে বন থেকে সংগ্রহ করা মধু দিয়ে ক্ষীর পায়েস খাওয়ার কথা পাওয়া যায়।

জনজাতি মানুষদের মধ্যে বাজারজাত দ্রব্যের থেকে বেশী অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা জিনিস ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। বিভূতিভূষণের 'কালচিতি' গল্পেও এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাপুড়ের গল্প' গল্পে বেদে জাতির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মদ খাওয়া, ধুম্রপানের দৃশ্য দেখা যায়। এছাড়া নেশার জন্য ভৈরব গাঁজা ও সাপের বিষও খায়। লেখকের 'সুকু ও ভুকু' গল্পে সাঁওতাল জোয়ানের দৈহিক বর্ণনায় আদিবাসীদের দৈহিক রূপ ও অলংকারের কথা পাওয়া যায়- 'নিকষ ধনুক, হাতে তীর, চোখে ব্যগ্র চকিত চাহনি'-[১১৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের গল্প' গল্পে দেখা যায়, সাঁওতালী আদিবাসী মেয়েরা মাথায় নানারকমের ফুল পরতে ভালোবাসে। গোলাপ থেকে বোগেনভেলিয়া, সব ফুলই তারা অলংকার হিসাবে পরতে ভালোবাসে। খাদ্য-অলংকার, জীবনধারণ সর্বক্ষেত্রেই প্রকৃতির সাথে আদিবাসীদের যোগ নিবিড়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নারীর মন' গল্পে সাঁওতাল যুবতী ভুলির যে পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনা পাওয়া যায়- পরনে চওড়া-পেড়ে তাঁতের মোটা শাড়ি, মাথায় দোলন-খোঁপার মাঝে রক্ত পলাশ ফুল গোঁজা। প্রকৃতির সাজে সজ্জিত খুবই সাধারণ পরিধানের সন্ধান পাওয়া যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পে আদিবাসীদের সাপ মেরে খাওয়া, শুয়োরের মাংস খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। এছাড়াও তারা বুনো ওল সেদ্ধ করে খেয়েই একবেলা কাটিয়ে দিতে পারে, তারা ক্ষিদের জ্বালায় গোসাপের পোড়া মাংসও খায়। আদিবাসীদের খাদ্যতালিকায় যে মাংস খাওয়ার কথা পাওয়া যায় তা মূলত শিকারজাত পশুর মাংস। কিনে খাবার সামর্থ্য তাদের নেই এবং তারা সাধারণত মাংস পুড়িয়ে খেতেই অভ্যস্ত। তাদের এই খাদ্যাভাসে আদিম জীবনের ছাপ বর্তমান। অতীতকালের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আমরা দীর্ঘকাল বহন করে চলি, আদিবাসী মানুষদের খাদ্যাভাসে যে পোড়া মাংস খাওয়ার কথা পাওয়া যায় তা সংস্কৃতির দীর্ঘস্থিতি বা 'পার্সিস্টেন্স'-এর পরিচয় বহন করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস' গল্পে আদিবাসী রমণীর গলায় রূপোর হাঁসুলী অলংকারের উল্লেখ আছে। লেখকের 'ভোগবতী' গল্পে চাষী সাঁওতালরা ভদ্রপাড়ার কাছাকাছি থেকে থাকায় তাদের পোশাক পরিচ্ছদেরও পরিবর্তন এসেছে- 'জামা কাপড় পরে তারা, কখনো-কখনো কাঁচা চামড়ার ফাটা-ফাটা মোটা

জুতোও'।[১১৯] এক্ষেত্রে দুই জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি বসবাস এবং প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের ফলে দুই সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে, যা 'অ্যাকালচারেশন'-এর দৃষ্টান্ত। আর খেড়ে সাঁওতালরা- 'কোমরে এখনো লেংটি, কানে ফুল গোঁজা, মাথায় বাবরি, হাতে কাঁড় বাঁশ'।[১২০] চাষী ও খেড়ে সাঁওতালদের পোশাকের বিচিত্রতায় স্পষ্ট একদল সভ্যতার আলোর পথে, আর একদল এখনও আদিমতায় নিমজ্জিত।

এই আদিবাসীরা খাদ্যের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি 'ভেতো' এখনও হয়ে ওঠেনি। তারা বনে-জঙ্গলে যে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য্য আছে তা খেয়েই তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে। পাশাপাশি আদিবাসী মেয়েরা মাথায় ফুল পরতে ভালোবাসে, এ একান্তই আদিবাসী সংস্কৃতির অঙ্গ। গল্পেও দেখা যায় সোনাই কাঠ কাটতে গিয়ে কাজের ফাঁকে সংসারের জন্য গুলঞ্চ লতা, ধুধুঁল সংগ্রহের পাশাপাশি মাথার খোঁপায় কাঠগোলাপ ফুল সাজিয়ে নেয়। তাদের অভাবের জীবনে এই ফুলের সাজ যেন বেরঙিন জীবনে ক্ষণিকের আনন্দ আনে, এইটুকুই তাদের শ্রমশক্তি।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'রথের তলে' গল্পে নাট জাতির মেয়েদের সেরা পান সাজিয়ে হিসাবে খ্যাতি আছে। এছাড়া ভৈরো নাটের 'গয়ার মাঘী পান' খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। ভৈরোর জেল থেকে গ্রামে ফেরবার সময় গ্রামের বাচ্ছাদের জন্য বাতাসা কিনবার কথা পাওয়া যায়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'মহিলা ইন-চার্জ' গল্পে সাঁওতাল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নেশার জন্য শালপাতার বিড়ি খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। বেশিরভাগ গল্পেই আদিবাসী নারী-পুরুষের ধুম্রপানের কথা লিপিবদ্ধ।

সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িনু' গল্পে বেদের মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণে পাওয়া যায়- তাদের পরণে থাকে খাট লাল ঘাঘরা। রুক্ষ চুলের বেণী কোমর পর্যন্ত। গায়ে বেগুনী রঙের জামা, চুড়িদার আস্তিন কবজি পর্যন্ত। লেখকের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে স্টিফান হোরোর মুখে কাঠবিড়ালির মাংস খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। এছাড়াও তার ইলি খেয়ে নেশা করার চিত্রও পাওয়া যায়। আদিবাসীদের মধ্যেই এই ইলির চল আছে, যা সম্পর্কে অ-অদিবাসী মানুষদের খুব একটা ধারণা নেই। ইলি, কাঠবিড়ালির মাংস একান্তই আদিবাসী খাদ্য-পানীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'গ্রাম প্রধানের ছেলে' গল্পেও আদিবাসীদের কাঠবিড়ালির বাচ্চা খাওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়-

'ওরা ঝাও ট্রাইব। গাছে উঠে মধু পাড়ার জাত। ওদের বিশ্বাস, যদি কোনও গর্ভিণী মহিলা কাঠবিড়ালির বাচ্চা খায় তবে আগামী সন্তান কাঠবিড়ালির মতোই গাছ বাইতে পারবে'।[১২১]

কমলকুমার মজুমদারের 'বাগান কেয়ারি' গল্পে আদিবাসী মানুষদের খাদ্য তালিকায় আছে ভাতের সঙ্গে ডাল, শাকের তরকারি, এছাড়াও ছাতু খাওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

সমরেশ বসু'র 'আইন নেই' গল্পে আদিবাসীদের মরা বাঁদর পুড়িয়ে খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। 'অরণ্যনিশি' গল্পে মুন্ডা মেয়েদের পরণে রয়েছে ''কিচ্রি'- আদিবাসীদের তাঁতির তাঁতেই তৈরি। সাদা মোটা খাটো কাপড়ের গায়ে লাল পাড় বোনা ছোট-ছোট দুটি টুকরো পোশাক, একটি কোমরে জড়ানো, আর একটি বুকে ঢাকা। ছেলেটি প্রায় উলঙ্গ, নিতান্ত সামনে একফালি কাপড় আছে মাত্র।''[১২২] প্রকৃতি সন্তানদের পোশাক নিতান্তই সাধারণ ন্যূনতম বাহুল্যতা নেই। অলংকারের ক্ষেত্রেও তাই, শুধু মেয়েদের কানে দুটি কাঠের অলংকার আর নাকের ছিদ্রে একটা সরু কাঠি।

সমরেশ বসু'র 'নির্বাসিতা' গল্পে আদিবাসীদের খাদ্য সংস্কৃতির পরিচয় লভ্য- মহুয়া আদিবাসীদের কাছে দ্বিতীয় অন্নের সমান। মহুয়ার তরকারি তাদের প্রিয়। মহুয়া শুকিয়ে গুঁড়িয়ে রুটি করেও খায় তারা। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় যেদিন তারা খাবার জোগাড় করতে পারে না, সেইদিনগুলো তারা ঝাঁপি থেকে শুকনো মহুয়া বার করে চিবিয়ে জল খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। গল্পে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা চিত্র তাদের খাদ্য-বস্ত্র পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' গল্পে মেরী আদিবাসী হয়েও সে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও তার অধিকার বুঝে নেওয়ায় সে তার হকের পারিশ্রমিক অর্থাৎ পরনে ভালো কাপড় পরে, তেল-সাবান মাখে। সে গ্রামের উচ্চবিত্ত প্রসাদবাবুর বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিককে সমস্ত কাজ করে, তার পরিবর্তে সে সস্তা শাড়ির বদলে ভালো শাড়ি ও সাবান-তেল নেয়। এই কারণেই মেরীর পোশাক পরিচ্ছদ অন্য আদিবাসীদের তুলনায় উন্নত। তার গ্রামেরই আদিবাসীদের দুপুরের খাবার মকাইয়ের ছাতু, নুন, লঙ্কা। ভাত যেন তদের কাছে বিলাসিতা। এক্ষেত্রে মেরী প্রতিবাদী ও অধিকার সচেতন হওয়ায়, সে তার অধিকার বুঝে নেওয়ায় ভালো পরিধেয় বস্ত্র পায় কিন্তু আদিবাসী মানুষের বেশিরভাগই প্রতিবাদী ও অধিকার সচেতন না হওয়ায় তারা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর 'নুন' গল্পের কাহিনি উত্তমচাঁদ বনিয়া মহাজন, যে আদিবাসীদের নুন কিনতে না দিয়ে তাদের 'নুনে মারার' পরিকল্পনা করে। নুন বাজারে সব থেকে সস্তা ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উপকরণ। নুনবিহীন কোনো খাবারই খাওয়া যায়না, তা যতই যৎসামান্য হোক না কেন। আদিবাসীরা শুধু নুন-ভাত খেয়েও তাদের খিদে নিবারণ করে। নুনের প্রয়োজনীয়তা বুঝেই খুবই চালাকির সাথে উত্তমচাঁদের মতো লোকেরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আদিবাসীদের নুন দেয় না। গল্পের কাহিনি এই 'নুন' না পাওয়া কেন্দ্রিকই। গল্পে আদিবাসীদের খাদ্যতালিকায় পাওয়া যায়- ঘাটো বা মাড়োয়া বা ভুট্টা সেদ্ধ, মাছ, মাংস।

মহাশ্বেতা দেবীর 'লাইফার' গল্পে মাগন সাঁওতালের শীতের দিনে ভাতের সাথে ডাল, শুয়োরের মাংস খাওয়ার কথা পাওয়া যায়।

অসীম রায়ের 'দুই বৃদ্ধের কাহিনি' গল্পের সাঁওতালিদের খাদ্য হয়েছে- ফ্যানভাত, যা কলাইয়ের থালায় পরিবেশিত। তবে গল্পে শম্ভু হেমব্রমকে শহুরে মানুষের সংস্পর্শে এসে সিগারেট খেতে দেখা যায়। সাধারণত আদিবাসীদের মধ্যে এই দৃশ্য বিরল।

দেবেশ রায়ের 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী আদিবাসী মাঝিদের পরিধানের বর্ণনায় পাওয়া যায় তাদের প্রত্যেকের খালি গা, পরনে কেবলমাত্র একটি নেংটি। নৌকার মহাজন রাবণের পোশাক মাঝিদের থেকে উন্নত, রাবণের পরণে লুঙ্গি ও জামা। রাজবংশী কিশোর ভাদুইয়ের পরিধান হাফপ্যান্ট ও ছবিওয়ালা গেঞ্জি। আদিবাসী মানুষদের পোশাকের বর্ণনা থেকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

দেবেশ রায়ের 'রাখি পূর্ণিমার রাত' গল্পে রথু লোহারের পোশাক শতচ্ছিন্ন। তার জামার পিছনের অংশ প্রায় পুরোই ছেঁড়া, সেখানে অনেক গিঁটবাঁধা। সে তার সাত বছরের ছেলের জন্য কেনা ছিটের হাফশার্ট পরার চেষ্টায় বৃথা হয়। আদিবাসী মানুষদের পোশাকের, খাদ্যের নগণ্যতাই তাদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সাক্ষ্য বহন করে।

ভগীরথ মিশ্রের 'নেশা' গল্পে পাহাড়ের কোলে, জঙ্গলের ধারে বসবাসকারী আদিবাসীরা খিদে মেটায় ভাত দিয়ে নয়, সেঁ-উ ঘাসের বীজ মহুয়া মিশিয়ে খেয়ে। তেষ্টা মেটায় নদীর কিংবা ঝর্ণার জলে। পেশায় তারা শুয়োরের মাংস কেটে বিক্রি করে। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও বহির্জগতের আলো এদের

জীবনে প্রবেশ করেনি, তা খাদ্যতালিকা, পেশার দিকে আলোকপাত করলেই বোঝা যায়। গল্পে দেখা যায় আদিম গোষ্ঠী জীবনের ছাপ বর্তমানেও অমলিন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কল' গল্পে কোড়া জনজাতির খাদ্যাভাসে ইঁদুরের মাংস খাওয়ার কথা এবং সুবলের স্ত্রী পালং এর মদ খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। বাচ্চা জন্মানোর পর পালং এর বুকের দুধ না হওয়ায় সদ্যোজাত সন্তানকে হাঁড়িয়ার সাথের ভাতের মাড় মিশিয়ে খাওয়ানোর কথায় স্পষ্ট তাদের আর্থিক অবস্থা। এছাড়া ভাদ্রমাস বা খরার অনটনে কেবল গেঁড়োকচু ছাড়া আর কিছু তারা খেতে পায় না। গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় খাদ্যের অভাবে ফলিডল খাওয়া মরা ইঁদুর খেয়ে সুবলের স্ত্রী পালং ও পালং এর ভাই মুরাইয়ের সংকটজনক অবস্থা। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার স্বরূপ প্রকট হয় তাদের খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনায়।

নলিনী বেরার 'খোরপোষ' গল্পে আদিবাসীদের খাদ্য-বস্ত্র-অলংকারের পরিচয় পাওয়া যায়। সুনা সাঁওতালের গায়ের রং ফর্সা, শালপ্রাংশু, মাথার চুল পিঙ্গল বর্ণ, দাঁড়ি গোফও তাই। তার হাতে লোহার বালা, কানে মাকড়ি। আদিবাসীদের পুরুষদের মধ্যে এরূপ অলংকার পরার চল আছে।

এই গল্পে দেখা যায় সুনা সাঁওতাল ও তার মা সারাবছর বিত্তশালী বাড়িতে শ্রম করার পর দিনে দু'বার ভাত খেতে পেত। এছাড়া বিভিন্ন পার্বণে কাঁচা অথবা সিদ্ধ বাঁওলা মূল খাওয়ার নিয়ম আছে। 'গরু-জাগরণ' উৎসবে ঢ্যাঙুয়ানের দল খাদ্য হিসাবে পাঁচ-সাত গন্ডা ছাঁকা খাপরা পিঠে আর মহুয়ার মদ খাওয়ার রীতি আছে।

নলিনী বেরার 'ঝরাপালকের জাদু' গল্পে বুধন মুর্মু সরকারী চাকুরীজীবী হওয়ায়, শহরে থাকায় সে শহর থেকে গ্রামবাসীর জন্য স্লাইস পাঁউরুটি আর রঙিন বোঁদে কিনে আনে। এছাড়া আদিবাসীদের নিজস্ব খাদ্যসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়- 'ঘুসুরের মাস' অর্থাৎ শুয়োরের মাংস খাওয়ার চল তাদের আছে।

নলিনী বেরার টি.আই. প্যারেড' গল্পে ইরানি বেদিয়াদের পোশাক ও অলংকারের প্রতিচ্ছবি মূর্ত- 'কানের ফুটোয় গুচ্ছের মাকড়ি আর কানপাশা, গহনার ভারে কানের লতি ছিঁড়ে পড়ার জোগাড়'।[১২৩] তারা ঘাঘরা পরে। খাদ্য হিসাবে আদিবাসীদের 'উদিপিঠা'র কথা পাওয়া যায়।

নলিনী বেরার ‘নুয়াসাহীর বটতলা’ গল্পে ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের পরিধেয় বস্ত্র অত্যন্তই সাধারণ[১২৪]-

(১) ‘পরনে প্রায় ‘লেঙ্গট’ তুল্য একটা ধুতি কী গামছা! একটা হাত ঘুরিয়ে পিঠের উপর রাখা, আরেকটা হাতে নামমাত্র একটি লিক্‌লিকে ছিপ্‌টি।’

(২) ‘‘শতচ্ছিন্ন থান - কাপড়ে কোনও মতে মাথায় ঘোমটা টেনে খরা থেকে বাঁচতে রৌদ্রে আকাট দেয়ালের দিকেই মুখ করে ‘জরু থুবু’ বসে।’’

এই পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান ভূমিজ জনজাতির মানুষদের আর্থিক অনটন, দুরাবস্থা।

সৈকত রক্ষিতের ‘আঁকশি’ গল্পে আদিবাসীদের নুন গুড় দিয়ে ভুট্টা সিদ্ধ, গুন্দলু ঘাঁটা, কোদো খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। মাগারাম তার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে গাছ চুক্তার উদ্দেশ্যে বেরোলে পথে খেঁজুর খাওয়ার কথা পাওয়া যায় এবং শেষে কোলের শিশু খিদের তাড়নায় কাঁদলে কেবল ভাতের মাড় খাইয়ে ক্ষুধা নিবারণের কথা পাওয়া যায়।

সৈকত রক্ষিতের ‘মূলুন’ গল্পে মাঝি সাঁওতালদের দারিদ্রে অনাহারে দিন কাটনোর চিত্র লিপিবদ্ধ। তারা খিদের তাড়নায় মূলুন খায়- ‘সে দেখে পদ্মের পাতাগুলো কেমন শুকিয়ে শুকিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। পোকা ধরেছে অধিকাংশ পাতায়। তারই মধ্যে যদি কোনো অঙ্কুরিত মুখ, যা পাঁকের ওপরে সামান্য বেরিয়ে থাকে, দুয়ারা দেখতে পায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটাকে সে উৎস থেকে টেনে তোলে। তখন ওই অঙ্কুরিত শীর্ষটুকুর সূত্রে, সে, বিস্ময়কর ভানে পেয়ে যায় তিন-চার হাতের একটা রসালো পদ্মমূল। পাঁচকের ভেতরে ডুবে থাকা এই মূল দেখতে ঈষৎ হলদেটে এবং সতেজও’।[১২৫] এই মূলুন সেদ্ধ করে, ভেজে খেয়ে তারা তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে। কিন্তু এমনও অনেক সময় আসে যখন তারা এইটুকুও পায়না।

সৈকত রক্ষিতের ‘রাঙামাটি’ গল্পে দেখা যায় জরিমানা হিসাবে আদায় করা দশ পাই চালের ভাত করে ‘সহরাই’ পরবে তা পচিয়ে হাঁড়িয়া করে খাওয়া। এই হাঁড়িয়া খাওয়া আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতির খাদ্যতালিকার এক বড় অঙ্গ। মহুয়া ও হাঁড়িয়াই আদিবাসীদের প্রাণভোমরা বলা চলে।

সৈকত রক্ষিতের ‘শবরচরিত’ গল্পে নারী ও পুরুষদের পোশাক ও তাদের খাদ্যের যে চিত্র রূপায়িত তা এরূপ- শবর শিশুরা অনেক বয়স পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পুরষদের কোমরে জড়ানো

থাকে মোটা ও ঠেঁটি ধুতি, মেয়েদেরও তেমনি এক শাড়ি থাকে গায়ে জড়ানো। তাদের জীবনে অতিরিক্ত কিছু নেই, যতটুকু না হলে নয় ঠিক ততটুকুই। এমনকি তারা প্রয়োজনের থেকেও কম পায়। খাদ্যের ক্ষেত্রেও তাই। তারা হাঁড়িয়া, মহুল মদের পাশাপাশি সারাবছরই প্রায় মাড়ভাত এবং আমানি খেয়ে দিন কাটায়।

অনিল ঘড়াইয়ের 'উরাংগাড়া' গল্পে চিত্রিত আদিবাসী মেয়েদের সাজসজ্জার অঙ্গ ফুল। আদিবাসী মেয়েরা মহুয়া ধুতে এসে আগুনরাঙা পলাশফুল খোঁপায় লাগায়, মেয়েরা হাঁটু অবধি উঁচু করে শাড়ি পরে। ভাকুয়ার পোশাক বলতে নিতান্তই সামান্য, সে পরণে কেবল 'লুগা' অর্থাৎ একটা লেংটি কাপড় পরে। তাদের খাদ্যের তালিকায় পাওয়া যায়- হাঁড়িয়া, মান্ডিয়া, রুটি, শালবিচি সিজান, মকাইপোড়া ইত্যাদি।

অনিল ঘড়াইয়ের 'অরণ্যের জীবন' গল্পে আদিবাসীদের মাটির হাঁড়িতে লাল চাল ফুটিয়ে মাড়ভাত, মুঙ্গাশাক ভাজা, হাঁড়িয়া খাওয়া, খুব মাঝে মধ্যে মাছ-মাংস খাওয়ার কথা পাওয়া যায়।

অনিল ঘড়াইয়ের 'আকাশ মাটির খেলা', 'বীজ', 'টিকলি' প্রতিটা গল্পেই আদিবাসীদের হাঁড়িয়া খেয়ে দিনযাপনের কথা পাওয়া যায়। 'টিকলি' গল্পে দেখা যায় ঝগড়ুর সকাল শুরু হত হাঁড়িয়া দিয়ে মুখ ধুয়ে। আদিবাসীদের জীবনে দুধের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হাঁড়িয়া। হাঁড়িয়াতে ইউরিয়া মিশিয়ে দেওয়া হয় যাতে নেশাও ব্যবসা দুই-ই ভালো হয়। আদিবাসীদের অনেকেই মনে করে থাকে আদিবাসীরা হাঁড়িয়া না খেলে তাদের ধর্ম নষ্ট হবে। মূলকথা হাঁড়িয়া আদিবাসীদের খাদ্য সংস্কৃতির একটা বড় অঙ্গ।

আদিবাসীদের লোকায়তজীবনের একটা বড় অঙ্গ তাদের খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ। লোকসংস্কৃতির এই উপাদানগুলির মধ্যেই নিহিত থাকে অতীতকালের সংস্কৃতির উপাদান, যা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল বহমান। আদিবাসীদের খাদ্যাভাস, পোশাকপরিচ্ছদে, লোকসংস্কৃতির এই কালিক প্রবাহ, আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্য বর্তমান।

৭.চ| অঙ্কন-লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:

জনজাতিকর্তৃক সৃজিত নানা পটচিত্র, দেওয়াল চিত্রণ, আলপনা, লিখিত কবিতা, গান-পালা, ছড়া ইত্যাদি অঙ্কন-লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। বেশকিছু গল্পে জনজাতিদের অঙ্কন-লিখনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালচিতি’ গল্পে আদিবাসীদের অঙ্কনসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়-

> ‘রাস্তার দুধারে অবস্থিত সারবন্দী ওদের বাঁশ-খড়ের ছোট নিচু ঘরগুলির মেঝে ও দাওয়া এলা মাটির রং করা, নিকানো মোছানো, দেওয়ালের বাইরে ধনেশপাখির ছবি আঁকা, ভালুকের, পাহাড়ের ও ফুলগাছের ছবি আঁকা’।[১২৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিলাসন’ গল্পে আদিবাসীদের বাড়ির গায়ের দেওয়ালে উন্নত শিল্পরীতির, চিত্ররেখার কথা পাওয়া যায়।

নলিনী বেরার ‘খোরপোষ’ গল্পে বাড়ির দেওয়ালে নানা দেওয়ালচিত্রণের কথা লিপিবদ্ধ-

> (১) ‘কখনও কখনও সাদা ‘ছুঁচমাটির’ সঙ্গে সে নিয়ে আসত হলদে তিলকমাটি, লালরঙের গিরিমাটি- আর তাই দিয়ে মাটিকাম করা দেওয়ালের ওপর লতা-পাতা, ফুল-পাখি আঁকতে বসত’।[১২৭]
>
> (২) ‘ঢ্যাঁড়শের রসের সঙ্গে চালের গুঁড়ি মিশিয়ে গোবর লেপা উঠোনে ওবেলা আঁকা হবে, আলপনা’[১২৮]
>
> (৩) ‘আধবালতি সেই রসের সঙ্গে চালের গুঁড়ি মিশিয়ে সদ্য গোবর লেপা উঠোনে আলপনা আঁকল। ডান হাতের পাঁচ আঙুল ডুবিয়ে হড়হড়ে গুঁড়িজল ছিটিয়ে আঁকা হল চৌকো চৌকো ‘রম্বস’ ’ট্রাপিজিয়ামের’ মতো আলপনা। আপলনার চৌখুপিতে দেওয়া হল সিঁদুর টিপ, তার ওপর রাখা হল গোল গোল গুঁড়ি প্রদীপ।[১২৯]

আদিবাসীদের বাড়িতে এই দেওয়ালচিত্রণ তাদের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে। এই দেওয়াল চিত্রণের মধ্যে আদিবাসী সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ বর্তমান।

সৈকত রক্ষিতের ‘উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা’ গল্পে দেখা যায়, আদিবাসীদের বাঁধনা পরব উপলক্ষ্যে আদিবাসীদের ভাঙা ফাটল ধরা দেওয়াল গোবর মাটির লেপন দিয়ে তার গায়ে আঁকা হয়, লতাপাতা, ফুল, গরু, তিরধনুক ইত্যাদি শিল্পকর্ম। এই উৎসব-পার্বণকে ঘিরে যে অভ্যাস, রীতি-নীতি প্রচলিত, যে সংস্কৃতির উপাদান তা মূলত অতীত থেকে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত।

অনিল ঘড়াইয়ের ‘হাতিছাপ’ গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র ভীমা বুড়ো হাতির পায়ের ছাপ দেখে নকল করে আঁকার কথা পাওয়া যায় এবং এটাই তার পেশা। লেখকের ‘অরণ্যের জীবন’ গল্পেও আদিবাসীরা নিজেরাই নিজেদের ঘর মাটির রং দিয়ে রং করে। এটাই জনজাতি গোষ্ঠীর অঙ্কন সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

বাংলা ছোটগল্পকারগণ তাঁদের ছোটগল্পে প্রান্তিক জনজাতি জীবনচর্যার রূপায়ণে এবং লোকসাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টির কারণে যে লোকায়ত জীবনের উপাদান ও ঐতিহ্যের রূপরেখা নির্মাণ করেছেন, তার অন্তরালে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় তাদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিপন্নতার চিত্র ব্যক্ত। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে জাতি বা গোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসকে প্রতিভাত করে। জনজাতি গোষ্ঠীর প্রাচীন জীবনের স্বভাবচিহ্ন মণিমুক্তের ন্যায় ছড়িয়ে আছে তাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পকলা, ব্যবহৃত সামগ্রীর মধ্যে। লোকসমাজের সামগ্রিক লালন-পালনে বেড়ে ওঠা এই ধরনের শিল্প-প্রকরণগুলির সৃষ্টি ও অস্তিত্বের অন্তরালে মানুষের সামাজিক মনই ক্রিয়াশীল। লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত লোকায়ত জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, বিনয়, *বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব,* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৮৬, পৃ. ১

২. সরকার, পবিত্র, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি,* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩৫

৩. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, *লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০০১, পৃ. ৫৮

৪. আহমেদ, ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধবলি,* ঢাকা: গতিধারা, আগস্ট ২০০৫, পৃ. ২৫৬

৫. রায়, দীপককুমার, *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা এবং আন্তর্বিদ্যা শৃঙ্খলা,* কোচবিহার, কালবৈশাখী পত্রিকা (লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা), ২০১১, পৃ. ৬

৬. ঘোষ, বিনয়, *বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব,* কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, আশ্বিন ১৩৮৬, পৃ. ৬৪

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস, শ্রী সবিতেন্দ্র রায়, শ্রী মনীশ চক্রবর্তী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* ২, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪২৭, পৃ. ২১

৯. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৫৯, পৃ. ৪৪

১০. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ: মে ২০১৯, পৃ. ২৩৭

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

১২. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৫৯, পৃ. ৪৩

১৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩৭২

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২১

১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ২৩৬

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫

২২. চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ২৩৩

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫-২৯৯

২৫. বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৯০

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৫

২৭. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র তৃতীয় খণ্ড,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ৩২৮

২৮. সেন, অভিজিৎ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ২০১৬, পৃ. ২৯

২৯. সেন, অভিজিৎ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ২২০

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫

৩২. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৯৫

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

৩৫. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ১৬৬

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯

৩৯. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৫৯, পৃ. ৪৪

৪০. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ৩৮৪

৪১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস, শ্রী সবিতেন্দ্র রায়, শ্রী মনীশ চক্রবর্তী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪২৭ব, পৃ. ৬০৭

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৮

৪৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ: মে ২০১৯, পৃ. ২৩৮

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

৪৫. পূর্বোক্ত

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১

৪৭. পূর্বোক্ত

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪

৪৯. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ১৪৬

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

৫২. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৫৯, পৃ. ১০৭

৫৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩৬৪

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৪

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৩

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৮২৪

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৫৯. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ২১৭-২২১

৬০. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪২৪, পৃ. ১৫৬

৬১. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ২৩৯

৬২. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪২৪, পৃ. ১৯২

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

৬৬. ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *সতীনাথ রচনাবলী ১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১৮, পৃ. ৩৪৩

৬৭. ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ২*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪, পৃ. ২৬৫

৬৮. চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ২৭১

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

৭০. বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৯০

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩২

৭২. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ১৮১

৭৩. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দশম খণ্ড,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০৯, পৃ. ৩৬২

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

৭৬. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ১৪,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৩৯১

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২-৩৯৩

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২-৩৯৩

৭৯. রায়, দেবেশ, *গল্পসমগ্র* ২, কলকাতা: দে' জ পাবলিশার্স, আগস্ট ১৯৯২, পৃ. ৫৭

৮০. মিশ্র, ভগীরথ, *আমার একান্নটি গল্প,* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, আষাঢ় ১৩৬৫, পৃ. ২৬৯

৮১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৬, পঞ্চম মুদ্রণ: মার্চ ২০১৬, পৃ. ১৩৭

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯-৩৫১

৮৪. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৪৫

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

৯২. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ১৫

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০-২৪২

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

১০০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮৫

১০১. ঘড়াই, অনিল, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪১০, পৃ. ১৬৯

১০২. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পঞ্চম মুদ্রণ, মে ২০১৯, পৃ. ২৩৪-২৩৯

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬

১০৪. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৪৬৬

১০৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ২৩৪-২৩৮

১০৬. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২৯২

১০৭. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, চতুর্দশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩৬৮

১০৮. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ: মে ২০১৯, পৃ. ২৩৮

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

১১০. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, গল্পসমগ্র, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪১৬, চতুর্থ মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ২৮৮

১১১. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৪৭

১১২. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ৮৮

১১৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩৯৯

১১৪. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ: মে ২০১৯, পৃ. ২৮০

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১১৬. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, চতুর্দশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩৬৯

১১৭. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ: মে ২০১৯, পৃ. ৩৬৬

১১৮. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩৭১

১১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ২৮৪

১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪

১২১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ: মার্চ ২০১৬, পৃ. ৭৭

১২২. বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৫৩১

১২৩. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১৮৩

১২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

১২৫. রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা*, কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ১১৬

১২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস, শ্রী সবিতেন্দ্র রায়, শ্রী মনীশ চক্রবর্তী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* ২, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বাদশ মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪২৭, পৃ. ৫৭৯

১২৭. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৯৬

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

উপসংহার

আমরা গবেষণার অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। 'বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)'- শীর্ষক গবেষণাপত্রের সামগ্রিক গবেষণালব্ধ চিন্তাভাবনার আলোকে প্রতিফলিত কল্লোলযুগ ১৯২৩ থেকে প্রাক্-বিশ্বায়ন পর্ব ১৯৯০, এই বিস্তৃত কালপর্বে পঁচিশ জন বাংলা ছোটগল্পকারের একশো সত্তরটি বাংলা ছোটগল্পের ক্যানভাসে চিত্রিত কথাসাহিত্যিকদের আদিবাসী চেতনার স্বরূপ ও আদিবাসী বিশ্ব নির্মাণের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতার রূপরেখা। ছোটগল্পকারদের অভিজ্ঞতার উৎস, আদিবাসী চর্চার পরিপ্রেক্ষিত এবং আদিবাসী জীবনবীক্ষা ভিন্ন। লেখকদের শিল্পসৃষ্টির অভিজ্ঞতার উৎসগুলিকে বর্গীকরণ করলে দেখা যায়, কোনো লেখক জন্মসূত্রে বা আশৈশব গ্রাম্য পরিবেশে বসবাসের সূত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, যেমন- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ। আবার কোনো লেখক শহরবাসী, যিনি কর্মসূত্রে বা ভ্রমণসূত্রে গ্রামে গিয়ে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের সংস্পর্শে থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, যেমন- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিজিৎ সেন প্রমুখ। আবার কেউ সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় যুক্ত থাকার কারণে প্রান্তিক হতদরিদ্র জনজাতি মানুষগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যেমন- মহাশ্বেতা দেবী। এই পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বেশিরভাগ ছোটগল্পকারেরই কর্মসূত্রে বা ভ্রমণসূত্রে আদিবাসী জীবন, আদিবাসী বিশ্বের সাথে পরিচয় ঘটেছিল। কর্মসূত্রে যে সমস্ত লেখকদের লেখার মধ্যে যে গবেষণালব্ধ দৃষ্টি পাই, তা থেকে আশৈশব প্রান্তজন মানুষদের সাথে বেড়ে ওঠা লেখকদের আদিবাসী বীক্ষা, সহমর্মিতা তা অনেকটাই পৃথক। তবে এই গবেষণাপত্রে আলোচিত সমস্ত ছোটগল্পকারদের বেশিরভাগ লেখাতেই প্রায় সমাজের প্রান্তিক জীবন, জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজচিত্র এবং প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের প্রতি সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের শোষণ-অত্যাচারের চিত্র, আধুনিক সমাজের মুখোশের অন্তরালে থাকা বাস্তবিক স্বরূপ উন্মোচিত। তবে বেশ কিছু গল্পে আদিবাসী মানুষদের মনে ধীরে ধীরে অধিকার সচেতনতাবোধ, শ্রেণিবোধের জাগরণ, প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ ঘটেছে, যেমন- অনিল ঘড়াই এর গল্প 'বীজ', 'অরণ্যের জীবন', নলিনীর বেরার 'ঝরাপালকের জাদু' ইত্যাদি বেশ কিছু গল্পে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল ছিন্ন করে আলোর পথে পা বাড়ানোর ইতিবাচক ইঙ্গিত এবং মহাশ্বেতা দেবী, অমর মিত্রের গল্পে শ্রেণি সচেতনতাবোধ, প্রতিরোধ-প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ পরিলক্ষিত। এব্যতীত বেশ

কিছু গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতি, কিছু ক্ষেত্রে নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তি সংকট, প্রণয়, তাদের মনস্তত্ত্ব।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে নতুন ধাঁচের সাহিত্য নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় বাংলা কথাসাহিত্যে জনজাতি জীবনচর্যার নিবিড় রূপ অনুসন্ধানের সূত্রপাত ঘটলেও, কালান্তরে লেখকদের আদিবাসী ভাবনার পরিবর্তনশীল রূপ প্রতীয়মান। স্বাধীনোত্তর পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ ও দায় লেখকদের মধ্যে পরিলক্ষিত। বিশেষত সত্তরদশক পরবর্তী সময়ে নিম্নবর্গচর্চা এবং গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা'র প্রবণতার কারণে, এই সময়ের সাহিত্যে জনজাতি জীবনের গভীর রূপ প্রতিবিম্বিত। এই গবেষণাপত্রের মূল অনুসন্ধান ছিল, নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে বহু রক্তক্ষয়ের পর যে স্বাধীনতা এসেছিল, সেই স্বাধীনতার সত্যতা সুখভোগ, অধিকার আদৌ কি প্রান্তিক জনজাতি সমাজ পেয়েছিল? আমরা আমাদের গবেষণার শেষ পর্যায়ে এসে এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, স্বাধীনতার সুখভোগ তো দূর স্বাধীনতার অর্থ উপলব্ধি করতেই সমাজের প্রান্তিক, জনজাতি মানুষদের প্রায় তিন-চার দশক লেগে গেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে তারা ইংরেজ সাহেব, জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হয়েছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় পীড়নে বিনা কারণে কেবল সরকারি নানান আইনের নিয়মে আদিবাসী মানুষদের ক্রমাগত অরণ্য থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের নিত্যসঙ্গী চূড়ান্ত দারিদ্র-অনাহার। বেশিরভাগ গল্পেই জনজাতি মানুষদের অরণ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আধুনিক সময় ও সভ্যতার চাপে দ্রুত অরণ্যের নির্মূল, চোরাকারবারিদের বাড়বাড়ন্ত রূপ এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার আগ্রাসনে জনজাতিদের সংকট এবং তাদের শিক্ষাহীনতা, সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন ও সহজ সরলতার কারণে সর্বহারার যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ। আমাদের গবেষণাপত্রের অন্বেষণ ছিল, নির্বাচিত ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে দেখা যে, প্রাচীন থেকে বর্তমান সময়ে শাসক ও শোষিতের চরিত্রের কি কোনো চরিত্রগত হেরফের ঘটেছিল? আমাদের গল্পগুলি পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয় যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন সমাজ, অর্থনৈতিক পরিবেশে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের শোষণের কৌশলও নতুন নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত। এছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আদিবাসী স্বার্থে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানান আইন-প্রকল্প তা কতটা আদিবাসীজীবনে বাস্তবায়িত হয়েছিল? এর উত্তরে গবেষণাপত্রের সামগ্রিক আলোচনা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর বলা যায়, পার্লামেন্টে আদিবাসীদের স্বার্থে গৃহীত নানা আইন খাতায় কলমে পাশ হলেও

বাস্তবজীবনে তা সফলভাবে রূপায়িত হয়নি। বংশপরম্পরায় ভূমিদাসপ্রথা, বেঠবেগারী প্রথা, লোধা-শবর জাতিকে যে 'অপরাধ প্রবণ জাতি' রূপে তকমা দেওয়া হয়েছিল, তা আইনত খারিজ করা হলেও বাস্তবে জনজাতি মানুষরা এইসব কোনোকিছুর থেকেই মুক্তি পায়নি। তবে আশির দশকের শেষদিক থেকে আদিবাসীদের মধ্যে অধিকারবোধ, শ্রেণিচেতনা গড়ে ওঠার ইতিবাচক ইঙ্গিত আভাসিত। সরকারি আইন-প্রকল্পগুলি যে জনজাতি জীবনচর্চা ও তাদের প্রাতিস্বিক মূল্যবোধকে ছুঁয়ে তৈরি হয়নি, তা আমরা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁড়িয়ার কবিতা', 'আলোচনাচক্র', মহাশ্বেতা দেবীর 'জগমোহনের মৃত্যু', 'জল', 'নুন', রমাপদ চৌধুরীর 'জলরঙ' প্রভৃতি বহু গল্পেই বিস্তারিত আলোচনা ও দৃষ্টান্তসহ দেখেছি।

বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্রের সর্বোপরি আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় সর্বক্ষেত্রেই আদিবাসীদের বিচিত্রজীবন, স্বভাববৈশিষ্ট্য এবং তাদের আদিম সংস্কারগ্রস্থ জীবনযাপন, তদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চিত অবস্থানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। আদিবাসীবিশ্ব সম্পর্কে বাংলা ছোটগল্পে মূলত যে প্রত্যয়-বীক্ষা উদ্‌ঘাটিত তা হল- ভূমি-কৃষিজমি ও অরণ্যের সঙ্গে জনজাতি মানুষদের সম্পর্ক, মূলস্রোতের তথাকথিত সভ্য-আধুনিক-শিক্ষিত মানুষদের সমাজের এই প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের প্রতি অবহেলা, উন্নাসিকতার কারণে আদিবাসী প্রান্তিকগোষ্ঠীর মানুষরা সামাজিক ও রাজনৈতিক মূলকর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কারের কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে এনেছে এবং আদিবাসীদের প্রতি প্রশাসনের নিপীড়ন ও দায়মুক্ত ব্যবহার, স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে আদিবাসীসমাজের বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত রূপ। গল্পে উন্মোচিত আদিবাসী জীবনস্বরূপ তা কেবল স্থানিক গন্ডীতে আবদ্ধ নয়, তা গোটা ভারতবর্ষের প্রান্তিক জনজাতির মানুষদের জীবনসত্য। বাংলা ছোটগল্পকারগণ যেন এক ভারতবর্ষের অন্তরে লুকায়িত আর এক ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্যরূপের সন্ধান দিয়েছেন। সর্বোপরি আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা ১৯২৩-১৯৯০ কালপর্বের প্রেক্ষিতানুসারে নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প আলোচনার মাধ্যমে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র বিশ্লেষণে সচেষ্ট থেকেছি।

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকার- ১

নাম- মনিলা তামাং। বাড়ি- কালিম্পং। বয়স- ৩০। লিঙ্গ- মহিলা। পেশা- শিক্ষক।

১. তোমার বাড়ি কী দিয়ে তৈরী? মাটির নাকি পাকা বাড়ি?

~ বাড়ি সমতলের ন্যায় সিমেন্ট বালি দিয়েই তৈরী, তবে আশেপাশে অনেকের কাঠের বাড়িও আছে।

২. তোমাদের জাতির নিজস্ব খাদ্যাভাস কীরকম?

~ বর্তমানে আমাদের নিজেদের ট্রাইবাল কমিউনিটির যে খাদ্যাভাস সেটা থেকে বাইরে এসে এখন আমাদের নতুন প্রজন্ম এখন অন্য কালচারের মতো হয়ে গেছে। তাই আমি খুব একটা আমার নিজের কমিউটির খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ জানি না। আমরা ঘরে সাধারণত ভাত, ডাল, রুটি, সবজি খাই।

৩. বাচ্চা জন্মানোর পরে কী কী নিয়ম পালন করা হয়?

~ বাচ্ছা যখন জন্মায় তখন হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরে আমদের যে 'মঙ্ক' বা গুরু হয় তিনি এসে বাড়িতে একটা পুজো করে এবং বাচ্চার নামরকণ করা হয়, অনুষ্ঠানটিকে 'মোক্তান' বলে। বাচ্চা জন্মানোর ৭-১০ দিন পর এই নিয়ম পালন করা হয়। ছয়মাস পরে মুখেভাত হয়, তবে এটা এখন অন্য কালচারের সংস্পর্শে এসে এসব হচ্ছে। আমাদের নিজেদের কমিউনিটিতে সবসময় মুখেভাত অনুষ্ঠান হয় না। আগে হত না, এখন প্রায় সবাই করে।

৪. তোমাদের বিয়েতে কী কী নিয়ম, আচার, রীতি পালন করা হয়?

~ আমাদের তামাং বিয়েতে বিয়ের পূর্বে যে দেখাশোনা সেক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয়কেই চেনে এরকম একজন বাড়িতে মূলত কথা বলে। আমাদের কমিউনিটিতে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ খুব কম হয়। বেশিরভাগ সবাই প্রায় লাভম্যারেজ করে।

বিয়েতে কোনো পণ দেওয়ার নিয়ম নেই। মেয়ের বাড়ি থেকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কেউ কিছু দিতে পারে। কিন্তু পণের কোনো নিয়ম নেই।

আমাদের বিয়েতে সিঁদুর বা মঙ্গলসূত্র পরানোর কোনো নিয়ম নেই। আমাদের বিয়েতে ‘পাংদেন’ নামে একটা কাপড় দেওয়ার নিয়ম আছে। এটা আমাদের ট্র্যাডিশানাল কাপড়। তামাং জাতির একটা ছেলের সাথে তামাং জাতির একটা মেয়ের যখন বিয়ে হয় তখন এই পাংদেন কাপড়টি ছেলের বাড়ি থেকে মেয়েকে দেওয়া হয়। আমাদের নিজেদের কমিউনিটির মধ্যে যখন বিয়ে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল– ‘চারদাম’ রীতি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বিয়ের রিচুয়ালে। চারদাম হল– মেয়ের বাড়ির পক্ষ থেকে বলা হয় ছেলের বাড়িতে যে আজ থেকে আমাদের মেয়েকে তোমাদের হাতে দেওয়া হল কিন্তু আমাদের মেয়ের হাড় আমাদেরই হবে। সে আমাদের থেকে দূরে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার হাড় আমাদেরই থাকবে। এই রিচুয়ালটার মাধ্যমে আসলে বোঝানো হয় মেয়ের বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেও বাড়ির মেয়ে কখনোই অন্যের হয়ে যাবে না (her bones will always belongs to her father’s family)। এই রিচুয়ালটা যদি তামাং মেয়ে অন্য জাতির কারোর সাথে বিয়ে করে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা পালন করা হয় না। কেবল তামাং এর সাথে তামাং এর বিয়ে হলেই এই রীতি পালন করা হয়। বিয়েটা মঙ্ক দেয় এছাড়াও আরও একজন সমাজের মাননীয় জ্ঞানী সদস্য থাকেন যিনি বিয়ে দেন।

৫. বিয়েটা দিনে না রাতে কোন সময় হয়? কোনো বিশেষ সময় থাকে কি?

~ আমাদের বিয়ে সকালে হয়। পাহাড়ি জায়গা বলেই রাতের দিকে বিয়ে হয় না। স্বামী-স্ত্রী একসাথে বিকালে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়।

৬. তোমাদের বিধাবাবিবাহ ও ডিভোর্সের ক্ষেত্রে কী নিয়ম?

~ হ্যাঁ বিধবা বিবাহ আছে। ডির্ভোসের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের আইনত ডিভোর্স হয় না এখনও। এমনি সমাজের মূল সদস্যরা মিলে একটা সমাধানে এসে ছাড়াছাড়ি হয়।

৭. মৃত্যুর পরে কী কী নিয়ম পালন করা হয়?

~ মৃত্যুর ক্ষেত্রে একটা কথা প্রথমেই বলি– মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের সময় যে চারদাম রীতিটা পালন করা হয়, সেই কারণে মেয়েদের মৃত্যুর পর তাকে দাহ করার পর যে ছাইভস্ম থাকে তা তার বাপের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ, বিয়ের সময় যেহেতু বলা হয় মেয়েটির হাড় তার বাবার বাড়িরই থাকল সেই কারণে মেয়েটির মৃত্যুর পর তার ছাইভস্ম বাপের বাড়িতে দেওয়া হয়।

কোনো পরিবারে কারো মৃত্যু হলে ঊনপঞ্চাশ দিন আমরা চুল কাটি না, তেল, নুন, হলুদ- মশলা খাই না। সিদ্ধ নিরামিষ খেতে হয়। ঊনপঞ্চাশ দিন হয় গেলে একটা বড়ো করে পুজো করে আমাদের নিয়ম শেষ হয়। এছাড়াও ঊনপঞ্চাশ দিন প্রতি সপ্তাহে পুজো করা হয়। আমরা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে খুব বিশ্বাস করি।

৮. মৃত্যুর পর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার কে হয়?

~ ছেলে-মেয়ে উভয়েই সমানভাবে সম্পত্তি পায়।

৯. তোমাদের নিজেদের তামাং কমিউনিটির অলংকার ও পোশাক কী আছে?

~ আমাদের অলংকার নিজস্ব – 'খউ' বলে একটা অলংকার আছে। এটা তিব্বত থেকে এসেছে ধারণাটা। তিব্বতীদের সাথে আমাদের পোশাক অলংকার এর অর্থাৎ বেশভূষার খুব মিল আছে।

পোশাকের ক্ষেত্রে আমরা মেয়েরা উপরে যে শার্ট পড়ি তাকে 'খেনজা' বলে। নীচ যে স্কার্ট পড়ি তাকে 'শামা' বলে। ছেলেদের শার্টকে 'তিতুম' বলে।

১০. তোমাদের উৎসব কী কী আছে? তার একটু বর্ণনা দাও।

~ 'সোনাম-লোঝার'– নামে আমাদের উৎসব আছে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পালন করা হয়। এটার বিশেষ কোনো দিন নেই। শীতকালেই পালন করা হয়। এটা আমাদের তামাং কমিউনিটির নিউইয়ার পালন। নতুন বছরকে আহ্বান করা যায়। এই সময় নতুন চাষ করা হয়।

উৎসবে 'খাপসে' নামক ময়দা দিয়ে একরকম খাবার বানানো হয়। এটা বানাতেই হয়। এছাড়া বুদ্ধপূর্ণিমা পালন করা হয়।

১১. তোমদের পরিবারে শিক্ষার হার কেমন? এলাকায় শিক্ষার হার কেমন?

~ বাবা গ্র্যাজুয়েট, মা উচ্চমাধ্যমিক, পরিবারের বাকি লোক মাধ্যমিক পাশ। এলাকাতেও সবাই পড়াশোনা করে।

১২. তোমার সাবকাস্ট?

~ 'ঘিসিং' (Ghising)। গোত্র- লাসা। আমাদের আরও অনেক গোত্র আছে- গ্লান, ইয়ংজান, বংজান, মোক্তান। কিন্তু আমি সব নামগুলি জানি না।

১৩. তোমাদের জাতিতে বিধিনিষেধ কী কী আছে?

~ আমাদের পাহাড়ের উপর একটা জাতি আছে নেওয়ার প্রধান। বিশ্বাস আছে তামাং আর প্রধানের বিয়ে হতে পারবে না। কারণ বলা হয় এরা একই পরিবারের। অর্থাৎ পূর্বপুরুষরা একই। এছাড়া ঘিসিং ও গ্লান, সাবকাস্ট ইয়ংজান ও বংজান এর মধ্যে বিয়ে হয় না।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে মোক্তান সাবকাস্টরা পর্ক খায় না।

১৪. তোমার ধর্ম?

- বৌদ্ধধর্ম। আমাদের মধ্যে অনেকে খ্রিস্টানও আছে আবার অনেকে হিন্দু হয়ে গেছে। ব্রিটিশ আমলে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। সব মিক্সড হয়ে গেছে এখন।

১৫. তোমাদের মাতৃভাষা কী? এর পাশাপাশি আর কী কী ভাষা ব্যবহার কর?

~ কাজের সূত্রে নেপালি, ইংলিশ, হিন্দি ও বাংলা ব্যবহারিক ভাষা। মাতৃভাষা তামাং। কিন্তু তা এখন কেউ ব্যবহার করে না। আমাদের বেশিরভাগ নেপালি ভাষাতে কথা বলে।

১৬. তোমাদের ধর্মে কী কী দেবতাকে মান্য করা হয়?

~ আমরা মূলত প্রকৃতির পূজারী। *natural healer* যাকে *Bongo* বলা হয়। এটা সবাই বিশ্বাস করে প্রকৃতি শক্তিশালী, প্রকৃতি আমাদের রক্ষা করে সব বিপদ থেকে। তবে এখন সবাই মিশ্র সংস্কৃতি। কেউ হিন্দু, কেউ বুদ্ধিস্ট, সব মিশ্র।

বাড়িতে বুদ্ধদেবের মূর্তির পাশে 'কুন-জু-সুম' (*kun-ju-sum*) থাকে। 'সুম' মানে তিন। অর্থাৎ তিনরত্নের মাঝে বুদ্ধদেবের মূর্তি থাকে, পাশে গুরু পদ্মসম্ভবা থাকবে আর একদিকে চেঙ্গরেসি থাকবে। প্রত্যেক বুদ্ধিস্ট এর বাড়িতে এটা থাকবেই।

(সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-১৫.২.২৩)

সাক্ষাৎকার- ২

১. তোমার নাম?- করিশ্মা সুব্বা। বাড়ি- দার্জিলিং। বয়স– ৩০। লিঙ্গ– মহিলা। পেশা- ছাত্রী।

২. তোমাদের বাড়ি কী পাকা?

~ সিমেন্ট এর পাকা বাড়ি, কিছু অংশ বাড়ির কাঠ দিয়ে বানানো।

৩. তোমাদের জাতির নিজস্ব খাদ্যাভাস?

~ আমরা মূলত ভাতই খাই। রাত্রের দিকে মোমো, আটার থুকপা, ভাত খাই। আমাদের একটা বিশেষ খাবার গুন্দ্রুক, কিনেমা।

*কিনেমা- সয়াবিনকে ফার্মেন্ট করে তাকে খাওয়া হয়।

*গুন্দ্রুক– রায়া শাক, মূলো শাককে ভালো করে কেটে শুকাতে হয়। এরপর শাকে টকভাব এসে যাওয়ার পর সেটা রান্না করে খাওয়া হয়। রাতে রুটি কম খাওয়া হয়, ভাতই বেশি খাওয়া হয়। জলখাবারে অনেক সময় রুটি খাওয়া হয়।

৪. বাচ্চা জন্মানোর পর কী কী নিয়ম পালন করা হয়?

~ যদি মেয়ে জন্মায় তাহলে তার তিনদিন পর 'নওরান' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে চারদিন পর এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সেদিন পূজা, নামকরণ করা হয়। পাশাপাশি সব লোকের সামনে প্রথম তাকে দেখানো হয়, কিছুটা মুখদেখানো নিয়ম এটা। ছয়মাসে মুখেভাত অনুষ্ঠান হয় যাকে 'ভাতখয়' বলা হয়।

৫. মৃত্যুর পরে কী কী নিয়ম পালন করা হয়?

~ যদি পরিবারের কোনো নারী মারা যায় সেক্ষেত্রে তিনদিন পর্যন্ত আমরা তেল, হলুদ, নুন কিছু খাইনা। এইসময় নিরামিষ সিদ্ধ খাবার খাওয়া হয়, 'চূড়া' খাওয়া হয়, দুধভাত খাওয়া হয়। আর মৃতদেহ যতক্ষণ পর্যন্ত 'চেতপ' (Chetap) অর্থাৎ খাটিয়ায় না তোলা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার খাওয়া যায়। তারপর সব মশলা ছাড়া নিরামিষ সিদ্ধ খাবার খেতে হয়। পরিবারে কোনো নারীর মৃত্যু হলে সেক্ষেত্রে তিনদিন এই নিয়ম পালন করা হয় আর পুরুষের ক্ষেত্রে চারদিন এই নিয়ম পালন করা হয়।

তিনদিন ও চারদিন আমাদের 'সেডিংমা' (Phedangma) অর্থাৎ আমাদের ব্রাহ্মণ যিনি তাকে ডেকে 'জোয়াই' নিয়ম পালন করা হয়। যে মারা গেছে তার জামাই অথবা নিজেদের জাতির কেউ আত্মীয় এসে নানারকম আমিষ রান্না করে এই নিয়মভঙ্গ করা হয়। যে রান্না করবে সে তার বাড়ির কেউ হবে না, তাদের আত্মীয় এবং লিম্বু জাতিরই হতে হবে। এরপর সেই রান্না আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। এরপর সবাই আবার সাধারণ খাবার খেতে পারবে। এরপর যেদিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয় আট-দশদিনের মাথায় 'চিন্তা' (chinta) নামক অনুষ্ঠান হয়। যেদিন সেডিংমা রাত ৮ টা থেকে পরদিন সকাল ৮ টা অবধি পূজা করে, সারারাত মন্ত্রপাঠ করা হয়। প্রতিবেশী সকলকে ডাকা হয় সেদিন। আমাদের মধ্যে লোকবিশ্বাস আছে সেদিন রাতে মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে মৃতের আত্মাকে ডেকে তার সাথে ওই সেডিংমার সাথে কথা বলা হয়। এই চিন্তা অনুষ্ঠানের আগের দিন থেকে আমরা আবার নিরামিষ খাবার খাই এবং প্রতিবেশীরা মৃতের উদ্দেশে খাবার উৎসর্গ করে। এটাই শেষ নিয়ম। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত বাড়িতে কোনো পূজা করা হয় না। এরপর একমাস পর আবার 'চোকো চিন্তা' নামে এক পূজা করা হয়। এই পূজার মাধ্যমে বাড়ির পরিবেশকে বিশুদ্ধীকরণ করা হয়।

এই সেডিংমাই আমাদের বাড়িতেই সব পূজাপাঠ করে। আমাদের সুব্বা বাড়িতে 'থুরি খাম্বা', যেটা বাঁশের, সেই পূজা সেডিংমাই করেন।

৬. তোমাদের বিবাহরীতি এবং প্রাক্‌বিবাহ পর্বে কী কী রীতি-নীতি, আচার নিয়ম পালন করা হয়?

~ আমাদের গোষ্ঠীতে লাভ ম্যারেজই হয় সাধারণত। অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ খুবই কম। আমাদের লিম্বু গোষ্ঠীতে পালিয়ে বিয়ে করতে হয়। আমাদের দেখাশোনা, এনগেজমেন্ট এইসব হয় না। কোনো ছেলে-মেয়ে নিজেরা পছন্দ করার পর, ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। আগে তো বাড়িতে কেউ জানতই না। কিন্তু এখন দিনকালের বদল হয়েছে তাই বাড়িতে জানানো হয়। ছেলে-মেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর কোনও একজন মেয়ের বাড়িতে ফোন করে বলবে যে তাদের মেয়ে এই ছেলের সাথে পালিয়েছে। এটাই আমাদের নিয়ম। পালিয়ে যাওয়ার তিনদিন পর ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে আসে, *Chor Ka Shor* বলা হয় এই নিয়মকে। এক্ষেত্রে ছেলেটি যদি অন্য জাতির হয়, সেক্ষেত্রে ছেলের পরিবারের তরফ থেকে মেয়ের বাড়িতে আসার সময় মেয়ের জাতির একজনকে অবশ্যই আনতে হবে বিয়ের কথাবার্তার জন্য। এরপর বিয়ে হবে, বিয়ের ডেট ঠিক হবে, *dhokbhet* বলে এটাকে। এইসময় একে অপরের পরিবারের

সাথে পরিচয় হয়। এই অনুষ্ঠানে বিয়ের সগুন হিসাবে মেয়ের বাড়ি ছেলের বাড়ি থেকে দু-বোতল রাম বা বিয়ারের বোতল এইরকম কিছু চাওয়া হয়। *Jar Rakshi* আমাদের ট্র্যাডিশানাল ওয়াইন। এটাই এক-দু'বোতল চাওয়া হয়। বয়স্কদের জন্য শাল দেওয়া হয়। এইসময়টা মেয়ে ছেলের বাড়িতেই থাকে। ঢোক-ভেট অনুষ্ঠানটা আসলে বাঙালিদের বিয়ের আগে আশীর্বাদের মতো। মেয়ের বিয়ের সময় ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ে নিজের বাড়িতে বিয়ে করতে আসবে।

বিয়ের 'পঞ্চা' (pancha)-তে বয়স্ক লোকরা থাকবে। এরপর একটা কাগজে মেয়ের বাড়ি থেকে পঞ্চা লিখিতভাবে নানা নিয়ম লিখে সেখানে ছেলে ও ছেলের বাড়ির লোক সাক্ষর করবে আর মেয়ের বাড়ির পঞ্চারাও স্বাক্ষর করবে। কেউ কেউ বিয়ের দিন ওই পঞ্চাদের সামনে সিঁদুর দেয়, আবার অনেকে মন্দিরে গিয়েও সিঁদুর পরায়। আমাদের সকালে বিয়ে হয়, আর সেইদিন দুপুরেই বর-বউ চলে যাবে। আবার তিনদিন পর নবদম্পতি একসাথে মেয়ের বাড়িতে আসে।

৭. তোমাদের জাতির বিশেষ অলংকার ও পোশাকের নাম কী?

~ আছে কিন্তু নাম বলতে পারব না।

৮. তোমাদের কী কী উৎসব পালন করা হয়?

~ দার্জিলিং এর যারা তারা আসলে আমাদের নিজেদের লিম্বু কমিউনিটির উৎসব পালন করে না। হিন্দুদের মতো 'দশেরা', 'মকর সংক্রান্তি', দিওয়ালি', এগুলো পালন করা হয়। মকর সংক্রান্তিতে 'তরুল', 'সিম্বালে' খাওয়া হয়। *chasoktangnam*– এই উৎসব লিম্বু বা সিকিমে পালন করে।

৯. পরিবারে কী সবাই শিক্ষিত?

~ হ্যাঁ সবাই শিক্ষিত। মাধ্যমিক পাশ বেশিরভাগ।

১০. তোমাদের গোত্র কী বা সাবকাস্ট কী?

~ 'মাডেন সাবা' আমার সাবকাস্ট বা thar। সুব্বা আর লিম্বু তো একই এর 'থার' অনেক আছে। সাবকাস্ট- 'নিম্ববাঙ' (Nimbang), (Nugoo) নুগু, সাউদেন (Seuden), আরও অনেক আছে। গোত্র, লাসা, কাসি (Lasa, Kasi)।

১১. তোমাদের জাতির বিধিনিষেধ কী?

~ আমাদের বিফ্ নিষিদ্ধ, কিন্তু সবাই খায়।

১২. তোমাদের ধর্ম কী?

~ *Yumasm.* কিন্তু আমরা লিখি হিন্দু। আমরা আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের খুব মান্য করি। আমরা মাতৃকার পূজা করি তাই Yuma অর্থাৎ দাদিমা বা ঠাকুমাকে খুব মান্য করি। এছাড়া হিন্দুদের দেবতাদের পূজাও করি। আমাদের ধূপ দেওয়ার নিয়ম নেই। ‘ধূপাত্তরো’ নামক এক জিনিস দিয়ে পূজা করা হয়। পাইন গাছ শুকিয়ে, ‘সুপ কা ধূপ’ নামক জিনিস বানিয়ে পূজা করা হয়।

১৩. তোমরা কী কী ভাষা ব্যবহার কর?

~ মাতৃভাষা নেপালি। ব্যবহারিক ভাষা নেপালি, হিন্দু, ইংলিশ। আমাদের লিম্বু Script ছিল, লিম্বু ভাষা আছে কিন্তু কেউ ব্যবহার করে না।

[এই সাক্ষাৎকারটা হিন্দি ভাষায় নেওয়া হয়েছে, সেটা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে]

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ২.৩.২৩

সাক্ষাৎকার-৩

১. তোমার নাম?- মনিকা হাঁসদা। জাতি- সাঁওতাল। জেলা– পুরুলিয়া, থানা– বান্দোয়ান, গ্রাম– ঝোড়বাঁধ। বয়স– ৩২। লিঙ্গ– মহিলা। পেশা– ছাত্রী।

২. তোমাদের বাড়ি থেকে বাজার কতদূর? গ্রামে আর কোন কোন জাতি বাস করে?

~ আমাদের বাড়ি থেকে বাজার তেরো কি.মি. দূরে। সপ্তাহে গ্রামের কাছে হাট বসে। আমাদের গ্রামে মূলত আমাদের আদিবাসীরাই থাকে। আমাদের গ্রামে ৭০টি পরিবার থাকে।

৩. একটা গ্রাম থেকে আর একটা গ্রামের দূরত্ব কত?

~ পায়ে হেঁটে দশ মিনিট। মাঝে জমি। পাশের গ্রামগুলোতেও ৫০-৬০টি করে পরিবার থাকে।

৪. তোমাদের বাড়ি কী দিয়ে তৈরী?

~ আমাদের বাড়ি মাটির। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িই মাটির। এখন একটা কি দুটো বাড়ি ইটের হচ্ছে। বাড়ির ছাউনি এ্যাসবেস্টার্স আর টালির।

৫. তোমাদের জাতির খাদ্যাভাস এবং বিশেষ কোনো খাবারের নাম?

~ আমরা দিনে রাতে ভাত খাই, শাকসব্জি। আমাদের ট্র্যাডিশানাল খাবার মাংস দিয়ে বানানো হয় মাংসপিঠা। এছাড়া লেটো নামে একধরনের খাবার হয় যা চালের গুড়ো আর মাংস কুচি দিয়ে বানানো হয়।

৬. বাচ্চা জন্মানোর পর বাড়িতে কী কী নিয়ম পালন করা হয়?

~ বাচ্চা জন্মানোর তিনদিন অথবা পাঁচদিন পর ধাইমাকে ডেকে ঘরকে শুদ্ধিকরণ করা হয়। তিনি আতপচাল বেঁটে ঘরের প্রতিটা কোণায় ছিটিয়ে দেয়। এরপর বাচ্চা ও তার মাকে স্নান করিয়ে তেল মাখিয়ে দেওয়া হয়। ওইদিন নিমপাতা গুঁড়ো করে আতপচাল দিয়ে ‘তিতাভাত’ বানানো হয় এবং গ্রামের সকলকে তা খাওয়ানো হয়। এটা কিছুটা ফ্যানভাতের মতো।

৭. এই ধাইমা কি তোমাদের স্বজাতির হয় না অন্য জাতির হয়?

~ না আমাদের অন্য জাতের হয়। তাদের আমরা 'হাড়ি' বলি। দক্ষিণা হিসাবে কাপড় আর চাল দেওয়া হয়। প্রতিবছরে একবার চাল নিয়ে যায়।

৮. তোমাদের বাচ্চার মুখেভাত অনুষ্ঠান হয়?

~ মুখেভাত অনুষ্ঠান ছয় অথবা সাতমাসে হয়। এটাকে আমাদের ভাষায় 'আইঠা' বলে। এইদিন নামকরণও করা হয়।

৯. মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে কী কী নিয়ম পালন করা হয়?

~ যে মারা যায়, তাকে নিয়ে যাওয়ার আগে হলুদ বাটা মাখানো হয়। আমাদের দাহ ও কবর দুই-ই করা হয়। আমার দাদুকে দাহ করা হয়েছে, দিদাকে কবর দেওয়া হয়েছে। আমাদের আলাদা করে শশ্মান বলে কিছু হয় না। নিজেদের জমির উপর শেষকৃত্য করে।

মারা যাওয়ার তিনদিন পর অনেক বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। আমাদের বাড়িতে দশদিন পর হয়। তাকে 'দশকর্ম' বলে। যে মুখাগ্নি করে সে খালি পায়ে আর শুধু সাদাধুতি পরিধান করে থাকবে দশদিন।, দশদিনের দিন ঘাট হয় পরদিন 'তেলনাহান' বলে একটা অনুষ্ঠান হয়।

দশদিন সম্পূর্ণ তেল, হলুদ ছাড়া নিরামিষ খাবে যে মুখাগ্নি করে সে ও তার স্ত্রী। তবে পরিবারের অন্যরা নুন, তেল, হলুদ দেওয়া নিরামিষ খায়। শ্রাদ্ধের দিন আমিষ খেয়ে নিয়মভঙ্গ হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে 'ভান্ডান' বলে। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, পূজাপাঠ করায় 'নাইকে'।

১০. প্রাক বিবাহ পর্ব এবং বিবাহতে কী কী রীতি পালন করা হয়?

~ আমাদের কখনই মেয়ের বাড়ি থেকে আগে ছেলের বাড়িতে কথা বলতে যাবে না। কোনো 'রায়বার' বা ঘটক সে ছেলের বাড়ির কথা, ছেলের কথা বা বিয়ের প্রস্তাব মেয়ের বাড়িতে দেওয়া হয়। এই রায়বারের মাধ্যমেই বিয়ের কথাবার্তা এগোয়। তারপর ছেলেপক্ষ ও মেয়েপক্ষের সব পছন্দ, পাকাদেখা হয়ে গেলে আশীর্বাদ হয়। এটাকে 'হড়ঃ চিন' বলা হয়। প্রথমে মেয়েকে আশীর্বাদ করা হলে তারপরে ছেলের আশীর্বাদ হয়। বিয়ের প্রতিটা ক্ষেত্রে রায়বারকে উপস্থিত থাকতে হয়।

আমাদের বিয়ে রাতে হয়। দুপুরে আইবুড়ো ভাত, গায়ে হলুদ তারপর বিয়ে। উঠোনো 'ছামডা' নামে একটা মাচা বানানো হয় শালগাছ দিয়ে। সন্ধ্যায় 'মাডোওয়জ্ঞা' বানানো হয়। এটা বিয়ের আসর বা

বিয়ের মন্ডপ। এখানেই সব নিয়ম পালন করা হয়। মেয়ের পরিবারের সকলে খাওয়ানোর পর আমাদের আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর পর গ্রামের লোক খাওয়ায়। এরপর গায়ে তেল-হলুদ হবে। প্রথমে গ্রামের নাইকে মেয়েকে হলুদ-তেল লাগাবে, তারপর পরিবারের সকলে। ছেলের ক্ষেত্রে আগে গায়ে হলুদ, তারপর আইবুড়ো ভাত পর্ব।

বর বিয়ে করতে এলে প্রথমে কনের বাড়িতে 'শালাদাহারি' নিয়ম পালন করা হয়। তারপর পাত্র ঘরে ঢুকবে। শালাদাহারি হল মেয়ের ভাই ও দাদার সাথে, নতুন জামাই এর পরিচয় পর্ব ও মাথায় ধুতি দিয়ে পাগড়ি দেওয়া হয়। পাশাপাশি 'খাঁন্ডাদাঃ' বলে আর এক নিয়ম পালন করা হয়। বিয়ের দিন পরিবারের যারা উপোষ করে থাকে তারা একটা তরবারি নিয়ে দাঁড়ায়। সেই তরবারিতে পিসি, পিসেমশাই সরিষার তেল তিনবার ঢালে। এরপর বিয়ের নিয়ম। একটা ঝুড়িতে মেয়েকে বসিয়ে দেওয়া হয়। মেয়ের ভাই-দাদারা ঝুড়িটা কাঁধে তুলে বিয়ের নিয়ম পালন করা হয়। পাত্রকেও কাঁধে তোলে যে 'সাদম্' বলে তাকে। 'সাদম্' মানে ঘোড়া। পাত্রপক্ষের কেউ ছেলেকে তোলে। এইভাবে কাঁধের উপরে বর-কনেকে তুলে বিয়ের নিয়ম পালন করা হয়। বিয়েতে সাদা সুতির শাড়ি হলুদ জলে ভিজিয়ে শুকনো করে সিঁদুরশাড়ি' পড়ার নিয়ম আছে, আর ছেলেরা পড়ে 'সিঁদুরধুতি'।

১১. বিয়েতে পণ দেওয়ার কী নিয়ম আছে?

~ বিয়েতে ছেলের বাড়ি থেকে বিজোড় সংখ্যার একটা টাকা মেয়ের বাড়িতে গ্রামের মাঝি, মোড়ল, গরেত, নাইকের সামনে দেওয়া হয় কন্যাপণ হিসাবে। এছাড়াও ছেলের বাড়ি থেকে মেয়েকে বিয়েতে গাভী দেওয়া হয়।

১২. তোমাদের ট্র্যাডিশানাল পোশাকের নাম কী? অলংকারের নাম কী?

~ আমাদের ট্র্যাডিশানাল পোশাককে পাঞ্চি শাড়ি আর পাঞ্চি ধুতি বলে। মেয়েরা হাতে বাউটি পড়ে। অনেকে বাঁ হাতে উল্‌কি করায়। কিন্তু খুব কম এখন।

১৩. তোমাদের উৎসব কী কী পালন করা হয়?

~ আমাদের কালীপূজার সময় সহরাই পালন করা হয়। পৌষসংক্রান্তির সময় মকর সংক্রান্তি পালন করা হয়। দোলযাত্রার সময় বাহা পরব পালন করা হয়। দুর্গাপূজার সময় দাসায় এনেচ বা ভুয়াং নাচ পালন করা হয়।

১৪. গ্রামে শিক্ষার হার কেমন?

~ বর্তমানে অনেকেই স্বাক্ষর করতে পারে। খুব শিক্ষিত সবাই নয়। আমাদের পরিবারের বাবা, দাদু, কাকা, ভাই, বোন, আমি উচ্চশিক্ষিত।

১৫. ধর্ম কী? কোন কোন দেবতা মান্য করো?

~ সারি ধরম। বাহার সময় 'জাহের আয়ু', 'মারাং বুরু', দেবতার পূজা করা হয়।

বাড়িতে তুলসীমন্ডপ আছে। আমাদের দেবতাদের নাম উচ্চারণ করতে নেই। এছাড়া 'আবগে' নামক বংশে একটা পূজা করা হয়। এই পূজার প্রসাদ পরিবার ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হয় না।

১৬. পিতা মারা যাওয়া পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হয়?

~ ছেলে থাকলে ছেলে সম্পত্তি পাবে। ছেলে না থাকলে তখন মেয়েরা পাবে।

১৭. তোমাদের ভাষা কী? কাজের সূত্রে কী কী ভাষা ব্যবহার করো?

~ মাতৃভাষা– সাঁওতালী, কাজের সূত্রে বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। আমি সংস্কৃতভাষা নিয়ে পড়াশোনা করছি, তাই সংস্কৃতভাষাও ব্যবহার করি।

১৮. তোমাদের জাতিতে বিবাহবিচ্ছেদ এর নিয়ম কী?

~ বিবাহবিচ্ছেদ হলে দুই গ্রামের সমস্ত লোককে জানায় ছেলে অথবা মেয়ে পক্ষ। ছেলের গ্রামের প্রধান মাঝি ও মেয়ের গ্রামের প্রধান ও গ্রামের সকলে উপস্থিত থাকে। যার দোষ তাকে জরিমানা করা হয়। এরপর বিয়ের সময় মেয়ের হাতে ছেলে যে লোহার চুড়ি পরায় সেটা ছেলেটা খুলে একটি ঘটিতে রাখে। ঘটিতে জল ও আমডাল থাকে। তারপর মেয়েটা ওই ঘটিটা পা দিয়ে উলটে দিয়ে দু'জনে দুই বিপরীত মুখে চলে যায়। এটাই নিয়ম। আর দ্বিতীয় বিবাহ কেউ করলে তখন সিঁদুরদান হয় না।

১৯. তোমাদের আদিবাসীদের বাড়িতে যে নানা রঙ থাকে সেগুলো কি দিয়ে রঙ হয়?

~ খড়িমাটি, কাদামাটি, লালমাটি দিয়ে বাড়ি রঙ করা হয়।

২০. তোমাদের জাতিতে নববর্ষ কবে পালন করা হয়?

~ পয়লা মাঘ থেকে আমাদের নতুন বছর শুরু হয়।

২১. তোমাদের জাতির মধ্যে কোনো লোকবিশ্বাস বা সংস্কার প্রচলিত আছে?

~ মৃত্যুর ক্ষেত্রে একটা লোকবিশ্বাস আছে। ঘাটের দিন জাদুপটকর নামে একটা লোক একটা ছবি এঁকে নিয়ে মৃতের বাড়িতে নিয়ে আসে, সেটায় দূর্বাঘাস ও কাঁচা হলুদ দিয়ে চক্ষুদান করে। বাড়িতে তাকে আমন্ত্রণ জানানো কিন্তু হয় না বা কোনও খবর ও দেওয়া হয় না। ওই জাদুপটকর স্বপ্নে জানতে পারে। সে এসে বলে যে ওই মৃতব্যক্তি স্বপ্নে সব গোপন কথা তাকে জানিয়েছে, আর সেই জাদুপটকর এসে সেইকথা পরিবারকে জানায়। এটা একটা অলৌকিকও বলা যায়, আবার হতে পারে কুসংস্কারও।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ৩.৫.২৩

১.দুর্গা পূজার সময় অনুষ্ঠিত দাঁসাই নাচ

২. গোয়াল পুজো

আদিবাসীদের (সাঁওতাল) বাড়ির দেওয়াল চিত্রণ

আদিবাসীদের (সাঁওতাল) মাটির বাড়ি

তামাং জনজাতির মানুষদের বাড়ির উপাসনা স্থল

তামাং জনজাতির মেয়েরা তাদের জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকে

মেয়ের বিয়েতে গায়ে হলুদের নিয়ম পালন করা হচ্ছে

সাঁওতাল গোষ্ঠীর বিবাহরীতি অনুসারে কনের মা বরকে বরণ করছে

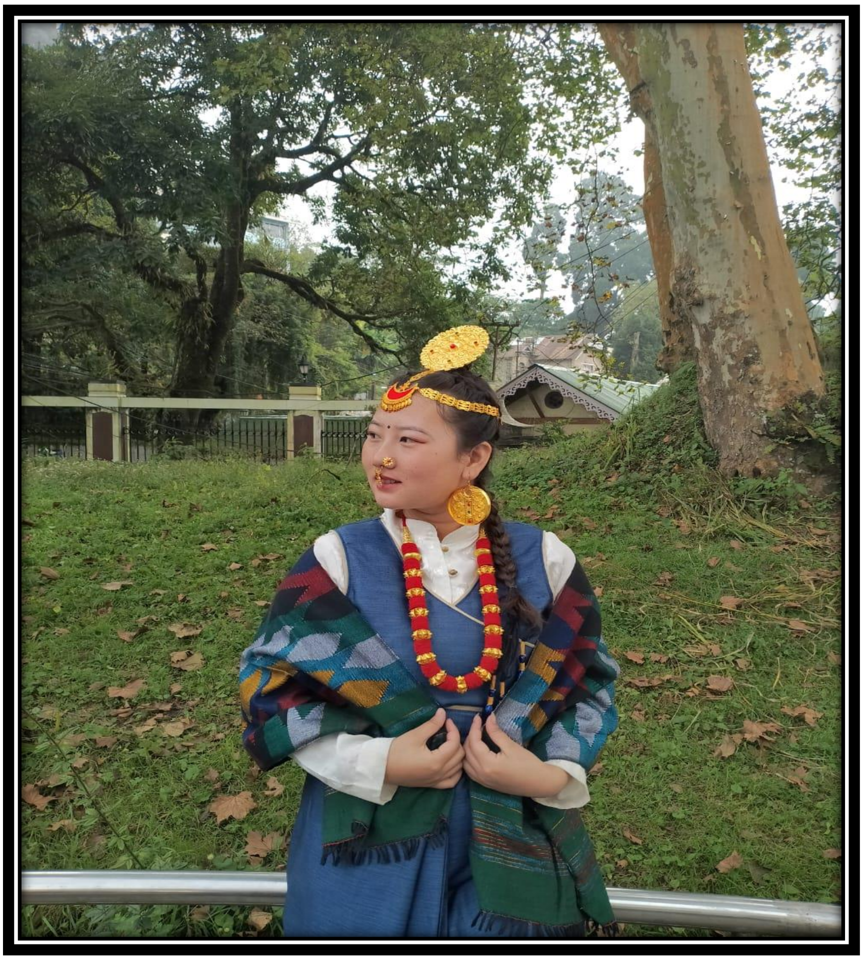

লিম্বু, সুব্বা জনজাতির মেয়ে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকে

আদিবাসীদের মূল খাদ্য- হাঁড়িয়া

গায়ে হলুদের নিয়ম- বাড়ির ছোট কোনো মেয়েরা অর্থাৎ বোনেরা গায়ে হলুদের সময় কনের মাথায়

তেল দিয়ে, চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দেবে।

বিবাহরীতি- গায়ে হলুদের জন্য শিল-নোড়ায় বাটা হলুদ শালপাতায় রাখা

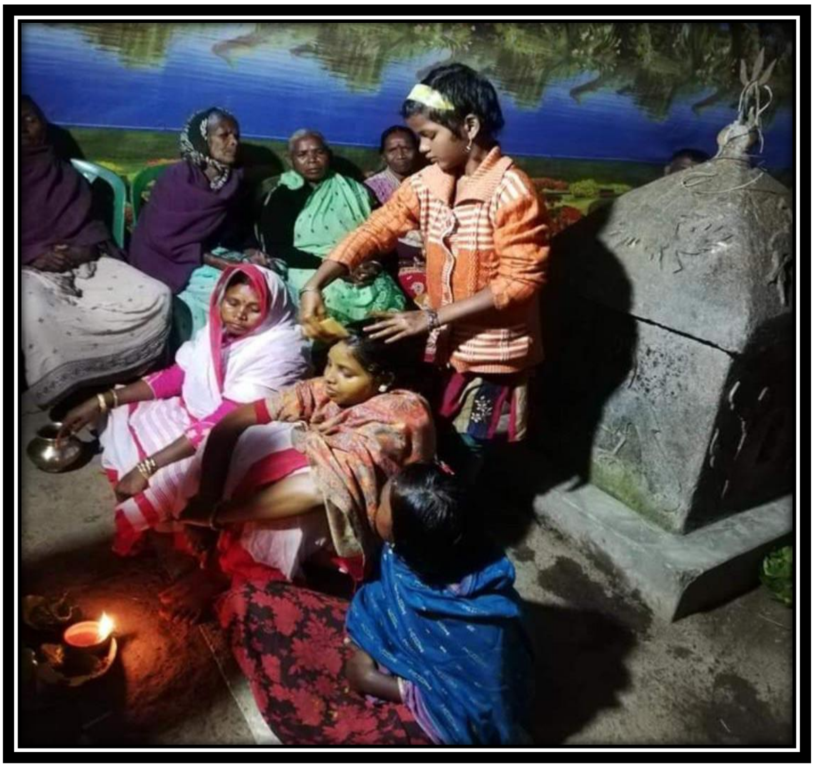

গায়ে হলুদের নিয়ম- বাড়ির ছোট কোনো মেয়েরা অর্থাৎ বোনেরা গায়ে হলুদের সময় কনের মাথায়

তেল দিয়ে, চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দেবে।

বিয়ের আগে বর ও শালার পরিচয়পর্ব। বরকে কাঁধে তুলে এই নিয়ম পালন করা হয়

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বিয়ের নিয়মানুসারে ঝুড়িতে তুলে সিঁদুরদান পর্ব

বর বিয়ে করতে এলে বাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠ সদস্য বরকে এভাবে প্রথম আপ্যায়ন করে

কনের পরনে হলুদ চোবানো শাড়ি। দাদা/ জামাইবাবুরা মিলে কনেকে ঝুড়িতে বসিয়ে বিয়ের আসরে নিয়ে আসছে। বিয়ের পূর্বে যাতে বর-কনের মুখদর্শন না হয় সেইজন্য কনের মুখ শাড়ি দিয়ে ঢাকা।

আদিবাসী কনে গায়ে হলুদের আগে সাদা-লাল পাড় শাড়িতে

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী গল্পসমগ্র (২),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪১৯,

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী গল্পসমগ্র (৩),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (অষ্টম খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৬

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (* দশম খণ্ড*),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (একাদশ খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ: বৈশাখ ১৪২১

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (ত্রয়োদশ খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (চতুর্দশ খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ: ১৪২৫

ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *সতীনাথ রচনাবলী (১),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মার্চ: ২০১৮

ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *সতীনাথ রচনাবলী (২),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ: ২০২১

ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *সতীনাথ রচনাবলী (৩),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২৩

ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ১,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সাল অনুল্লিখিত

ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪

ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ৩,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ: জুন ১৯৯৪

ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ৪,* কলকাতা: প্রাইমা পাবলিকেশন, সাল অনুল্লিখিত

ঘড়াই, অনিল, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৪

ঘড়াই, অনিল, *সেরা ৫০ টি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৪

ঘড়াই, অনিল, *পরীযান ও অন্যান্য গল্প,* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১ লা বৈশাখ, ১৩৬১

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ: মার্চ ২০১৬

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৪২১

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, *সেরা ৫০ টি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১১

চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সেরা ৫০ টি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস, শ্রী সবিতেন্দ্র রায়, শ্রী মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্পসমগ্র ১,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস, শ্রী সবিতেন্দ্র রায়, শ্রী মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪২৭

বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫

বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫

বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ, চতুর্দশ মুদ্রণ: এপ্রিল, ২০১৯

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: সাহিত্যসংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ: মে ২০১৯

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল, ২০১৯

মুখোপাধ্যায়, চিরন্তন (সঙ্ক.), *বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র ১,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯

মুখোপাধ্যায়, চিরন্তন (সঙ্ক.), *বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র ২,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪২৪

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪২৩

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২৪ অগ্রহায়ণ

মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৪

মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *পঞ্চকন্যা,* কলকাতা: বাক্‌শিল্প, জুন ১৩৭০

মজুমদার, কমলকুমার, গল্পসমগ্র, কলকাতা: সুপ্রকাশনী, ১৯৬৫

মিশ্র, ভগীরথ, *আমার একান্নটি গল্প,* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, আষাঢ় ১৩৬৫

মিশ্র, ভগীরথ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: মৌসুমি সাহিত্য মন্দির, মে ১৯৬৫

রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল, প্রথম সংস্করণ: ২০১৫

রায়, অসীম, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ২০১৭

রায়, দেবেশ, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৯২

রায়, দেবেশ, *গল্পসমগ্র ৩,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র ১,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪২৩

রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র ৪,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০৮

সেন, অভিজিৎ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৪

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ:

আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক (খণ্ড এক),* কলকাতা: অনুষ্টুপ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০১২

আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক (খণ্ড দুই),* কলকাতা: অনুষ্টুপ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০১২

আহমেদ, ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধবলি,* ঢাকা: গতিধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ: আগস্ট ২০০৫

আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ঢাকা: গতিধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ: মার্চ ২০০১

ইব্রাহিম, নীলিমা, *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯০

খাতুন, ড. আমিনা, *মহাশ্বেতাদেবীর ছোটগল্প: পদদলিত ও অবহেলিত মানুষের জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি,* কলকাতা: শিক্ষণ, মহরম নভেম্বর ২০১৪

গঙ্গোপাধ্যায়, ডা. ধীরেন্দ্রনাথ, *পাভলভ পরিচিতি,* কলকাতা: পাভলভ ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি, ২০১৭

ঘোষ, দীপঙ্কর, *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা,* কলকাতা: অমরভারতী, জানুয়ারি ২০০০

ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, জানুয়ারি ২০০৭

ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, সেপ্টেম্বর ২০১৩

ঘোষ, বিনয়, *বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব,* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, আশ্বিন ১৩৮৬

ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা: রথযাত্রা, ১৩৫৫

চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, *চর্যাগীতির ভূমিকা,* কলকাতা: ডি.এম লাইব্রেরি, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯০

চট্টোপাধ্যায়, তুষার, *লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০১

চট্টোপাধ্যায়, ড.প্রবীরকুমার, *জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে,* কলকাতা: ভাষাবন্ধন সংস্করণ: অক্টোবর ২০০৮

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস,* কলকাতা: বিচিত্রা বিদ্যা গ্রন্থমেলা, জানুয়ারি ২০০৩

চ্যাটার্জী, দেবী, *ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা, দলিত ও সামাজিক ন্যায়,* কলকাতা: গাঙচিল, জুন ২০১৮

চৌধুরী, শম্পা, *রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প সময় যেখানে নায়ক, কলকাতা:* এবং মুশায়েরা, পৌষ ১৪১৬

চক্রবর্তী, ড. বরুনকুমার, দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতি,* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিসটিবিউটর্স, নতুন সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৩

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, পঞ্চম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৬

চক্রবর্তী, স্বর্গীয় মুকুন্দ রাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডী,* এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২১

জলদাস, হরিশংকর, *বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড়,* ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *পুনশ্চ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রাজর্ষি,* কলকাতা: বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, প্রথম সংস্করণ ১২৯৩, রবীন্দ্র রচনাবলী সংস্করণ মাঘ ১৪২২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *বীথিকা,* কলকাতা: বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ভাদ্র ১৩৫২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্ররচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড),* কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪

দত্ত, বীরেন্দ্র, *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ,* কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৯৫

দত্ত, কৃত্তিবাস (সম্পা.), *আদিবাসী সমাজ,* কলকাতা: তুহিনা প্রকাশনী, পুস্তক মেলা, ২০২৩

দেবী মহাশ্বেতা ও পৃথ্বীশ সাহা (অনুবাদ), *ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ,* কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ: ২০০০

দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ,* পুস্তক বিপণী, মাঘ ২০১৬

দাশ, উত্তম, *হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন,* কলকাতা: মহাদিগন্ত, অক্টোবর ২০১৩

দাস, শ্রীস্বপনকুমার (সম্পা.), *আদিবাসী জগৎ ও স্বদেশচর্চা,* হাওড়া: আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, ২০১৮

দাস, শ্রীস্বপনকুমার (প্রকাশক), *আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র,* হাওড়া: আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৭

নস্কর, ড. সনৎকুমার, *প্রসঙ্গ: বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* কলকাতা: রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০২

নস্কর, সনৎকুমার, *প্রাগাধুনিক কথা সাহিত্য পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা,* কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ২০১২

প্রামাণিক, ড. পরমানন্দ, *আদিবাসী সংস্কৃতির রূপরেখা,* কলকাতা: ফিরে দেখা প্রকাশনী, ২০০৯

বাগচি, অরূপকুমার, *সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০১০

বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী খণ্ড ২,* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা, *মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব,* কলকাতা: অলকা, শ্রাবণ ১৪০৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, *মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, শারদোৎসব, ২০০৯

বালা, যতীন (সম্পা.), *দলিত মানুষের গল্প,* কলকাতা: গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৮

বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *আদিবাসী জীবন সংগ্রাম,* কলকাতা: বৃন্দবাক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৬ ই আগস্ট, ১৯৯৭

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল,* কলকাতা: রত্নাবলী, এপ্রিল ২০০২

বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা,* কলকাতা: বাণীশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বসু, অরূপরতন (ভাষান্তর), *সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা: স্বপ্ন,* কলকাতা: দীপায়ন, ষষ্ঠ সংস্করণ: ২০১৪

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সপ্তম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, ২০২০

ভট্টাচার্য, অরূপকুমার, *সতীনাথ ভাদুরীর জীবন ও সাহিত্য,* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, রথযাত্রা ১৯৩১

ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দশম মুদ্রণ ২০০২

ভদ্র, গৌতম (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস* , কলকাতা: প্রতিভাস, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

ভারত সরকার, *ভারতের সংবিধান,* বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৮৭

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা, কলকাতা:* দে'জ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৩৮৯

মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু, *অন্নদামঙ্গল,* কলকাতা: বামা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ: জুলাই ১৯৮৯

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.), *পঞ্চাশের দশকের কথাকার,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, বইমেলা ১৯৯৮

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অক্টোবর ২০০৪

মণ্ডল, অমলকুমার, *ভারতীয় আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রাম-সংকল্প,* কলকাতা: দেশ প্রকাশন, নভেম্বর ২০১৭

মণ্ডল, ড. চিত্ত এবং ড. প্রথমা রায় মণ্ডল (সম্পা.), *বাংলা দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: একুশ শতক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* কলকাতা: পূর্বালোক পাবলিকেশন, পূর্বালোক সংস্করণ, জুলাই ২০১২

রাণা, সন্তোষকুমার এবং কুমার রাণা, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী সমাজ,* কলকাতা: গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৮

রায়, অলোক, *বিশ শতক,* কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০

রায়, দেবেশ (সঙ্ক. ও সম্পা.), *দলিত,* কলকাতা: সাহিত্য একাডেমি, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫

রায়, হিমাংশুমোহন, *ভারতের আদিবাসী,* কলকাতা: মণ্ডল এন্ড সন্স, মহালয়া ১৩৮৭

রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা, *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০০৭

রায়চৌধুরী, ভারতজ্যোতি, *সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে,* কলকাতা: পুনশ্চ, বইমেলা ২০১১

সেন, অর্ণব, *ছোটগল্পের ভাষা সময়ের ভাষা,* কলকাতা: মনচষা, জানুয়ারি ২০০৩

সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম,* কলকাতা: বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০২১

সেন, সুজিত (সম্পা.), *জাতপাতের রাজনীতি,* কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৫৩

সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *জোয়ারভাটায় ষাটসত্তর,* কলকাতা: পাল পাবলিশার্স, মে ১৯৯৭

সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৫৯

সরকার, পবিত্র, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি,* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৩

হোসেন, সোহারাব, *বাংলা ছোটগল্পের তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি,* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১১

হোসেন, সোহারাব, *বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন,* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, নভেম্বের, ২০০৪

পত্রিকা পঞ্জি:

প্রতিধ্বনি, The echo.a Journal of Humanities & Social Science, published by Dept. of Bengali, karimganj college,volume- 2, issue- 3,assam, India, january 2014

প্রতিধ্বনি, The echo.a Journal of Humanities & Social Science, published by Dept. of Bengali, karimganj college,volume- 6, issue- 4, Assam, India, April 2018

মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *নিজের কথা,* লালনক্ষত্র পত্রিকা, শরৎ ১৩৯৩

মিশ্র, আশিষ, *রাঢ় বাংলার জনজাতির লোকায়ত আখ্যান,* কলকাতা: সুখবর পত্রিকা, ১ লা জুলাই ২০২৪

সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), *শুভশ্রী পত্রিকা,* ৪৫ বর্ষ, কলকাতা, ১৪১৩

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, *দলিত,* অষ্টম সংখ্যা, কলকাতা: গাঙচিল, এপ্রিল ২০১৯

রায়, দীপককুমার, *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা এবং আন্তর্বিদ্যা শৃঙ্খলা,* কোচবিহার: কালবৈশাখী পত্রিকা, ২০১১

রায়, সৌরভ (সম্পা.), *হিজল পত্রিকা,* বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১ম, আলিপুরদুয়ার, জুন ২০১৮

সেন, অভিজিৎ, *মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা,* নিসর্গ পত্রিকা, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৪

Man, Environment & Society, Delhi: arf journal, vol 1, no 2, 2020

International Research journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies *(IRJIMS),* scholar publications, volume-2, issue-4, karimganj, Assam, India, may 2016

Ranger, rabekh & paul fedoroff, *commentary: Zoophilia and the law*, The journal of the American academy of psychiatry and the law, December 2014

ইংরাজি সহায়কগ্রন্থ:

Bhattacharyya, Gayatri, *The protean identity of the Tamangs of India,* The Eastern Anthropologist, 2016

Culshaw, W.J. *Tribal Heritage, a Study of the Santals.* Delhi: Gyan Publishing House, 2004

Risley, H. H. *The Tribes and castes of Bengal (vol-1),* Calcutta: Bengal Secretariat press, 1891.

Risley, H.H. *The Tribes and castes of Bengal (vol2),* Calcutta: P. Mukherjee (published), 1998

Rosine Jozef Perelberg, *Freud a Modern Reader*, London & Philadelphia: Whurr Publishers, 2001

Roy, Saratchandra, *The Mundas and Their Country*, Calcutta: published by Jogendra Nath Sarkar at the city book society, 1912

Singh, K.S. *The Scheduled Tribes*, Oxford India Paperbacks, 2010.

Subba, chaitanya, *The Culture and Religion of limbus*, university of Michigan, published by K. B. Subba, 1995

ব্যবহৃত রিপোর্ট:

GOVERNMENT OF INDIA, *REPORT of the BACKWARD CLASSES COMMISION,* VOL- 1 & 2, 1980

GOVERNMENT OF INDIA, *NATIONAL COMMISION FOR SCHEDULED TRIBES*, FILENO-17/2/inclusion/2013/RU-iii

List of notified Scheduled Tribes, *The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (amendment) Act*, annexure- IB, 1976

REPORT OF THE HIGH LEVEL COMMITTEE ON SOCIO-ECONOMIC, HEALTH AND EDUCATIONAL STATUS OF TRIBAL COMMUNITIES OF INDIA, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, may 2014

The Gazatte Of India (part 2, section 3), Published by the authority, Govt. Of India, Delhi: 1950

সহায়ক অভিধানপঞ্জি:

সরকার, পবিত্র, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত (সঙ্ক.), *আকাদেমি বানান অভিধান,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সপ্তম সংস্করণ: জুলাই, ২০১১

বৈদ্যুতিন তথ্য:

https://Id.nltr.org/south_24_pgs.php

https://sanbad.net.bd/opinion/open-discussion/77413

https://irrabotee.com/in-anjaly

https://www-oncyclopedia-com.translate.goog/humanities/encyclopedias_almamacs_iranscripts_and_maps/bhutia-x-tr-si=er&-x-h=bn&-x-tr-hl=bne-x-tr-pto=tx

https://www.populationu.com/in/west-bengal-population

https://preronajibon.com/freuds-theory-of-personality/amp/

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:53e897e1-7767-4e2c-ad53-86ae7b5bb4d6

https://roar.media/bangla/main/history/history-of-naxal-movement

https://shodhganga.inflibnet.ac.in

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/tamangs-and-limbus-are-now-st/articleshow/32994949

http://inet.vidyasagar.ac.in.8080

www.arfjournals.com